মাধ্যমিক

পদার্থবিজ্ঞান



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষ
থেকে নবম–দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান

নবম–দশম শ্রেণী

রচনা

ড. শাহজাহান তপন

মুহাম্মদ আজিজ হাসান

ড. রানা চৌধুরী

সম্পাদনা

ড. আলী আসগর

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম মুদ্রণ : মার্চ, ১৯৯৬
সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর, ২০০০
পরিমার্জিত সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০০৮
পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০০৯

কম্পিউটার কম্পোজ
লেজার স্ক্যান লিমিটেড

প্রচ্ছদ
সেলিম আহ্মেদ

চিত্রাঙ্কন
রণজিত দাস
কাজী সাইফুদ্দীন আব্বাস
সমর মজুমদার

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

মুদ্রণে : অঙ্কুর আইসিটি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ওয়েব বিন্যাস)

প্রসঙ্গ কথা

শিক্ষার উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারায় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহ যাতে পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত হয়, সেই লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে আশির দশকের প্রারম্ভে প্রবর্তিত হয় নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের নতুন পাঠ্যপুস্তক। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এই পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রচলিত ছিল।

উন্নয়নের ধারায় ১৯৯৪ সালে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম সংস্কার, পরিমার্জন ও বাস্তবায়নের জন্য "শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স" গঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সময়ের সাথে সাথে দেশ ও সমাজের চাহিদা পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ২০০০ সালে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনরায় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। ২০০৮ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত শিক্ষা বিষয়ক টাস্কফোর্সের সুপারিশে প্রচ্ছদ প্রণয়ন, বানান ও তথ্যগত বিষয় সংশোধনসহ পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় করা হয়েছে। আশা করা যায় এতে করে পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষক-শিক্ষার্থীর নিকট আরো গ্রহণযোগ্য ও সময়োপযোগী বলে বিবেচিত হবে।

শিক্ষাক্রমের আলোকে মূল্যায়নকে আরো ফলপ্রসূ করার জন্য দেশের সুধীজন ও শিক্ষাবিদগণের পরামর্শের প্রেক্ষিতে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায় শেষে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। প্রত্যাশা করা যায়, এতে শিক্ষার্থীর মুখস্থনির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবন বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে বা যে-কোনো বিষয়কে বিচার-বিশ্লেষণ অথবা মূল্যায়ন করতে পারবে।

পদার্থবিজ্ঞান অতি দ্রুত অগ্রসরমান একটি বিষয়। প্রকৌশল, স্থাপত্য, কৃষি, চিকিৎসাশাস্ত্র, রসায়ন, গণিত,জীববিজ্ঞান, কম্পিউটার, মাইক্রোবায়োলজি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর পদার্থবিজ্ঞানের প্রভাব অপরিসীম। এই বিষয়সমূহে যারা উচ্চতর জ্ঞান অন্বেষণে আগ্রহী তাদের জন্য পদার্থবিজ্ঞান পাঠ আবশ্যক। পদার্থবিজ্ঞানের পাঠ যুগোপযোগী করার অভিপ্রায়ে এবং আধুনিক শিক্ষার শিখনচাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার মান আন্তর্জাতিক তুল্যমানে উন্নত করার লক্ষ্যে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি পরিমার্জন করা হয়। আশা করা যায় এই পাঠ্যসূচি শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক করবে এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

আমরা জানি, 'শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া' এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। কাজেই পাঠ্যপুস্তকের আরো উন্নয়নের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে প্রত্যাশিত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার নিরন্তর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সংস্করণে কিছু পরিমার্জন করা হয়েছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকগুলো আরো সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

যাঁরা এ পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। যাদের জন্য পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হল, আশা করি তারা উপকৃত হবে।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

ভৌত বিজ্ঞানের বিকাশ

DEVELOPMENT OF PHYSICAL SCIENCE

বিজ্ঞান আমাদের নিত্যসঙ্গী। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজে বিজ্ঞান ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভোরের ফ্লোরাইড টুথপেস্ট থেকে শুরু করে রাতের টেলিভিশন সবই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফসল। যে জাতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে যত অগ্রসর সে জাতি তত উন্নত ও সমৃদ্ধশালী। যুদ্ধাস্ত্র উদ্ভাবনের ভিতর দিয়ে মানুষ বিজ্ঞানকে ধ্বংসের কাজেও অবশ্য ব্যবহার করছে। বিজ্ঞান মানব জীবনকে করেছে সুন্দর ও সমৃদ্ধ, বাড়িয়ে দিয়েছে আরাম-আয়েশ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য।

বিজ্ঞান অনেক জটিল কাজকে সহজ করে দিয়েছে। এরোপ্লেনের কল্যাণে আমরা দ্রুত ভ্রমণ করতে পারছি। কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে চালিত যোগাযোগ ব্যবস্থা দূরকে নিকট করে দিচ্ছে। ঘরে বসেই আমরা দূরদূরান্তের খবরাখবর পাচ্ছি। নিউক্লিয় শক্তি ব্যবহার করে উন্নত দেশ উৎপাদন করছে প্রচুর তড়িৎ শক্তি। সৌরকোষের সাহায্যে সূর্যকিরণকে তড়িতে রূপান্তর করে চালানো হচ্ছে রেডিও, ক্যালকুলেটর, ঘড়ি ইত্যাদি। বিজ্ঞানের অপর এক বিস্ময় কম্পিউটার। কী না করতে পারে এই কম্পিউটার। দৈনন্দিন জীবনের হিসাব–নিকাশ থেকে শুরু করে জটিল জটিল গাণিতিক সমস্যার সমাধান। কম্পিউটার মুদ্রণ শিল্প এবং যোগাযোগ ব্যবস্থায়ও এনেছে বিপ্লব। কিন্তু বিজ্ঞানের এই সমৃদ্ধি একদিনে সম্ভব হয়নি। প্রাচীনকাল থেকে অগণিত বিজ্ঞানীর নিরলস সাধনার ফলে বিজ্ঞান আজকের এই অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে। এ অধ্যায়ে আমরা সেই প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে ভৌতবিজ্ঞানের বিকাশের এক সংক্ষিপ্ত অথচ ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণনার মাধ্যমে সেই সব নিবেদিতপ্রাণ বিজ্ঞানীদের কাজের সাথে পরিচয় ঘটানোর চেষ্টা করব। সাথে সাথে বিজ্ঞানীর কাজের ধারা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা প্রদানের মাধ্যমে তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার চেষ্টাও এই অধ্যায়ে করা হবে।

১.১। বিজ্ঞান কী

বিজ্ঞান হল পরীক্ষা নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও পদ্ধতিগতভাবে লব্ধ সুশৃঙ্খল ও সুসংবদ্ধ জ্ঞান এবং এই জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি। বিজ্ঞানে জ্ঞান, পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

বিজ্ঞানকে সাধারণত দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়। একটি হল ভৌত বিজ্ঞান এবং অপরটি জীববিজ্ঞান।

ভৌত বিজ্ঞান : যাদের জীবন নেই, তাদের সম্পর্কিত বিজ্ঞান হল জড় বিজ্ঞান বা ভৌত বিজ্ঞান। ভৌত বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের অনেক শাখা আছে। ভৌত বিজ্ঞানের অনেক শাখার মধ্যে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, আবহবিদ্যা, ভূবিদ্যা ইত্যাদি প্রধান।

১.২ প্রাচীনকালে ভৌত বিজ্ঞানের বিকাশ

আমরা বলেছি যে আধুনিক সভ্যতা বিজ্ঞানের ফসল। বিজ্ঞানের এই সমৃদ্ধির পেছনে রয়েছে বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রম, সৃজনশীল অবদান। বিজ্ঞানের কোনো জাতীয় বা রাজনৈতিক সীমা নেই। বিজ্ঞানের উন্নতি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ সকল জাতির সকল মানুষের জন্য। বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রাচীন গ্রিক ও রোম সম্রাজ্যে থেলিসের (Thales খ্রি:পূ: ৬২৪–৫৬৯) মতো বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি সূর্য গ্রহণ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য বিখ্যাত। এছাড়া তিনি বলেছিলেন, বৃত্তের ব্যাস বৃত্তকে সমদ্বিখণ্ডিত করে। তিনি লোডস্টোনের চৌম্বক ধর্ম সম্পর্কেও জানতেন। বিজ্ঞানের ইতিহাসে পিথাগোরাস (Pythagorus, খ্রি:পূ : ৫২৭–৪৯৭) একটি স্মরণীয় নাম। তিনি বিজ্ঞান, ধর্ম, গণিত ও সংগীত, ভেষজ বিজ্ঞান ও বিশ্বতত্ত্ব, শরীর, মন ও আত্মা সব কিছুকেই গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করতে

চেয়েছিলেন। তিনি আগুন, পানি, মাটি ও বায়ু এই চারটি মৌলের ধারণা দিয়েছিলেন। কম্পমান তারের ওপর তাঁর কাজ অধিক স্থায়ী অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিল। বর্তমানে বাদ্যযন্ত্র ও সংগীত বিষয়ক যে স্কেল রয়েছে তা তারের কম্পন বিষয়ক তাঁর অনুসন্ধানের আংশিক অবদান।

খ্রিষ্টের জন্মের চারশ বছর আগে গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস (Democritus, খ্রিঃ পূ : ৪৬০–৩৭০) ধারণা দেন যে পদার্থের অবিভাজ্য একক রয়েছে। তিনি একে নাম দেন পরমাণু। পরমাণু সম্পর্কে তাঁর এ ধারণা বর্তমান ধারণার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা হলেও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রাচীন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ অ্যারিস্টার্কাস (Aristarchus, খ্রিঃ পূ : ৩১০–২৩০)। সূর্যই যে সৌর জগতের কেন্দ্র এবং পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগুলো তার চার দিকে ঘুরে চলেছে – একথা বলেছেন তিনিই প্রথম। অ্যারিস্টার্কাসের এই মৌলিক ও বৈপ্লবিক মতামত কিন্তু মোটেও সেকালের মানুষের পছন্দ হয়নি। কারণ বিশ্বে তখন প্লেটো (Plato, খ্রিঃ পূ : ৪২৮–৩৪৮) ও অ্যারিস্টটলের (Aristotle খ্রিঃ পূ : ৩৮৪–৩২২) মতবাদের প্রচণ্ড প্রতাপ। তাঁদের মতে সূর্য, গ্রহ ও নক্ষত্রগুলো নিশ্চল পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। বিভিন্ন বিষয়ে অ্যারিস্টটলের মতো অগাধ পান্ডিত্য তখনকার দিনে আর কারো ছিল না। ফলে তার ধারণাই ক্রমে সবার মনে স্থায়ী আসন গেড়ে বসে গেল। তখনকার দিনের পণ্ডিতরা বলতেন, অ্যারিস্টটল জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল বিষয় নিয়েই চিন্তা করেছেন। অ্যারিস্টটলেই সব সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে। অ্যারিস্টটলে যা নেই তা নিয়ে মাথা ঘামানোরও প্রয়োজন নেই। অ্যারিস্টটলের মৃত্যুর বার বছর পরে জন্ম গ্রহণ করেও অ্যারিস্টার্কাস জনগণকে অ্যারিস্টটলের ধারণার জগতের বাইরে আনতে পারেননি।

বিখ্যাত গ্রিক গণিতবিদ আর্কিমিডিস (Archimedes, খ্রিঃ পূ : ২৮৭–২১২) লিভারের নীতি ও তরলে নিমজ্জিত বস্তুর ওপর ক্রিয়াশীল ঊর্ধ্বমুখী বলের সূত্র আবিষ্কার করে ধাতুর ভেজাল নির্ণয় করতে সমর্থ হন। তিনি গোলীয় দর্পণের সাহায্যে সূর্যের রশ্মি কেন্দ্রীভূত করে আগুন ধরানোর কৌশলও জানতেন।

বিজ্ঞানের ঊষালগ্নের এ সকল আবিষ্কারের তাৎপর্য গভীর। কোনো বিষয়ের অগ্রগতি নির্ভর করে ঐ বিষয়ে অবিরত নতুন ধারণা ও নতুন আবিষ্কার বা নতুন উদ্ভাবনের ওপর।

১.৩। ভৌত বিজ্ঞানের বিকাশে মুসলিম অবদান

আর্কিমিডিসের পর কয়েক শতাব্দীকাল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মন্থরগতিতে চলে। একে বিজ্ঞানের বন্ধ্যাকাল বলা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে ইউরোপে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার পুনর্জীবন ঘটেনি। এই সময়ে পশ্চিম ইউরোপীয় সভ্যতা বিশেষভাবে গ্রহণ করেছিল বাইজানটাইন ও মুসলিম সভ্যতার জ্ঞানের ধারা। আরব জগতে গ্রিক জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুবাদের মাধ্যমে পরিচিত ছিল। আরবরা বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানেও বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। মুসলিম বিজ্ঞানীদের মধ্যে জাবির ইবনে হাইয়ান (Jabir Ibn Haiwan) ও ইবনে সিনা (Ibn Sina, ৯৭৯–১০৩৭) 'আলকেমির' উন্নতি সাধন করেন। 'আলকেমির' বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে এর মধ্যে একদিকে যেমন ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার যোগ ছিল তেমনি আবার রাসায়নিক শিল্প কৌশল ও কুশলতার ঐতিহ্যের সাথেও সম্পর্কযুক্ত ছিল। 'আলকেমি' থেকে বর্তমান কেমিস্ট্রি বা রসায়ন নামের উদ্ভব। ইবনে সিনা একাধারে ছিলেন রসায়নবিদ, চিকিৎসক, দার্শনিক, গণিতজ্ঞ এবং জ্যোতির্বিদ। তিনি গ্রিক (প্রকৃতপক্ষে এশিয়া মাইনরের অধিবাসী) চিকিৎসাবিদ গ্যালেনের (Galen, জন্ম ১২৯) তত্ত্বের উন্নতি সাধন করেন। আরব রসায়নবিদরা বহু রাসায়নিক যন্ত্রপাতির উদ্ভব ঘটান। পরিশ্রুতন (Filtration), পাতন (Distillation), ঊর্ধ্বপাতন (Sublimation) প্রভৃতি প্রক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক রূপ দান করেন আরবরা এবং চিকিৎসায় রসায়নের প্রয়োগ তাঁদের হাতেই পূর্ণতা পায়।

আবু আব্দুল্লাহ ইবনে মুসা আল–খোয়ারিজমি (Abu Abdullah Ibn Musa Al-Khwarizmi. মৃত্যু ৮৫০) বীজগণিত ও ত্রিকোণমিতির ভিত প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল জিবর ওয়াল মুকাবিলা' এর নাম থেকে ' অ্যালজেবরা' শব্দের উৎপত্তি। তাঁর উত্তরসূরীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন পরিব্রাজক আল – বেরুনী (Al Beruni,

৯৭৩–১০১৬) এবং বিখ্যাত কবি ওমর খৈয়াম (Omar Khaiyam, ১০১৯–১১৩৫)। মুসলিম জ্যোতির্বিদদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন আল বাত্তনি (Al Battani, ৮৫৮–৯২৯), আল ফারাজী (Al Fazari,মৃত্যু ৭৭)। গ্রহ নক্ষত্রের উন্নতি নির্ণয়ের জন্য অ্যাস্ট্রোলাব (Astrolab) নামক যন্ত্র আবিষ্কার করেন। জ্যোতির্বিদ্যা গবেষণার আর একটি অতীব প্রয়োজনীয় যন্ত্র সেক্সট্যান্ট (Sextant) একাদশ শতকে প্রথম আবিষ্কার করেন আল খুজান্দী নামে একজন মুসলিম বৈজ্ঞানিক। আলোকতত্ত্বের ক্ষেত্রে ইবনে আল হাইথাম (Ibn-Al-Haitham, ৯৬৫–১০৩৯) ও আল হাজেন (Al Hazhen, ৯৬৫–১০৩৮) এর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। টলেমী (Ptolemy ১২৭–১৫১) ও অন্যান্য প্রাচীন বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন যে কোনো বস্তু দেখার জন্য চোখ নিজে আলোকরশ্মি পাঠায়। আল–হাজেন এই মতের বিরোধিতা করেন এবং বলেন যে বস্তু থেকে আলো আমাদের চোখে আসে বলেই আমরা বস্তুকে দেখতে পাই। ম্যাগনিফাইং গ্লাস বা আতশী কাচ নিয়ে পরীক্ষা তাঁকে উত্তল লেন্সের আধুনিক তত্ত্বের কাছাকাছি নিয়ে আসে। প্রতিসরণ সম্পর্কে টলেমীর স্থূল (Crude) সূত্র সম্পর্কে তিনি বলেন যে, আপতন কোণ প্রতিসরণ কোণের সমানুপাতিক এটি শুধু ক্ষুদ্র কোণের বেলায় সত্য।

মুসলিম বিজ্ঞানীদের মধ্যে আরেকজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী হলেন ইবনে ইউনুস। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী ২০০ বছরের জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণের রেকর্ড জমা করে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক একটি সারণি তৈরি করেন। এই সারণির নাম ছিল হাকেমাইট অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল টেবিল। আল-হাকিম ঐ সময়ে কায়রোর খলিফা ছিলেন। তিনি ৯৯৫ সালে House of Science বা বিজ্ঞানাগার নির্মাণ করেন। ইবনে ইউনুস ১০০৯ সালে মারা যান। এছাড়া আল-মাসুদী প্রকৃতির ইতিহাস (History of Nature) বিষয়ে একটি এনসাইক্লোপিডিয়া লেখেন। এই গ্রন্থে উইন্ডমিল (Windmill) বা বায়ুকলের উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমানে পৃথিবীর অনেক দেশে এই বায়ুকলের সাহায্যে তড়িৎশক্তি উৎপাদন করা হচ্ছে। আল-মাসুদী ৯৫৭ সালে মারা যান।

১.৪. ভৌত বিজ্ঞানের বিকাশে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান

ভারতীয় উপমহাদেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যে কণাদ, আর্যভট্ট (জন্ম ৪৭৬), বরাহ মিহির (জন্ম ৫০৫)ও মহাবীরের নাম উল্লেখযোগ্য। মহাবীর 'সিদ্ধান্ত' নামক গ্রন্থে ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক কাজ তুলে ধরেন। আর্যভট্ট গণিতে অবদান রাখেন, তিনি গাণিতিক প্রমাণের যোগফল পর্যালোচনা করেন এবং দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধানের প্রচেষ্টা নেন। মহাবীর যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের কাজ এবং শূন্যের ব্যবহার আলোচনা করেন। উপমহাদেশের দার্শনিক কণাদ পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণার নাম দেন পরমাণু। ভাস্করাচার্য প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ। তিনি নির্ভুলভাবে পৃথিবীর ব্যাস নির্ণয় করতে সমর্থ হন। তাঁর গণনায় পৃথিবীর ব্যাস পাওয়া গিয়েছিল ৭১৮২ মাইল। বর্তমানকালের গণনায় তার মান ৭৯২৬ মাইল। পৃথিবীর ব্যাস থেকে পরিধি নির্ণয় করতে হলে π–এর মান জানার প্রয়োজন। প্রাচীন ভারতীয় পন্ডিতের π–এর মান ৩.১৬২৩ নির্ণয় করেন। ভাস্করাচার্য ২২/৭ কে π–এর মান হিসেবে প্রচার করেন। বর্তমানকালের হিসাব থেকে এই মান পাওয়া যায় প্রায় ৩.১৪১৬ বা প্রায় ২২/৭।

১.৫ মধ্যযুগ ভৌত বিজ্ঞানের বিকাশ

নবম থেকে দ্বাদশ শতকে পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে আরবের নিবিড় সংযোগের ফলে উভয় পক্ষই লাভবান হয়েছিল। ইউরোপীয় সভ্যতার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার পুনরুজ্জীবনের ফলে বিশ্বজগৎকে নতুন করে দেখার তাগিদ অনুভূত হল এবং এভাবেই হল পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের জন্ম। চারদিকে নতুন নতুন পরীক্ষা সম্পাদিত হতে থাকে আর এসব পরীক্ষার ব্যাখ্যার জন্য জন্ম লাভ করতে থাকে নতুন নতুন ধারণার। ত্রয়োদশ শতকের সবচেয়ে পন্ডিত মানুষ ছিলেন অ্যালবার্টাস ম্যাগনাস (Albertus Magnus, ১১৯৩–১২৮০) তাঁর মতে – 'বিজ্ঞান যা শোনা যায় তাকেই বিশ্বাস করা নয়। বিজ্ঞান হল প্রাকৃতিক ঘটনার যথার্থ কারণের অনুসন্ধান।' মধ্যযুগে যখন নিয়মের প্রতি অন্ধ আনুগত্যই ছিল সাধারণ নিয়ম, সে সময় তাঁর এই বৈজ্ঞানিক মানসিকতা লক্ষ করার মত। রজার বেকন (Roger Bacon,১২১৪–১২৯) ছিলেন পরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবক্তা। তাঁর মতে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার মাধ্যমেই বিজ্ঞানের সব সত্য যাচাই করা উচিত।

লিউনার্দো দা ভিঞ্চি (Leonardo da Vinci, ১৪৫২–১৫১৯) পনের শতকের শেষদিকে পাখির উড়া পর্যবেক্ষণ করে উড়োজাহাজের একটি মডেল তৈরি করেছিলেন। তিনি মূলত একজন চিত্রশিল্পী ছিলেন, কিন্তু বলবিদ্যা সম্পর্কে তাঁর উল্লেখযোগ্য জ্ঞান ছিল। ফলে তিনি কিছু সাধারণ যন্ত্র দক্ষতার সাথে উদ্ভাবন করতে সক্ষম হন।

গ্যালিলিও–নিউটনীয় যুগে সংখ্যায় কম হলেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন বিজ্ঞানী জন্মগ্রহণ করেন। ডা: গিলবার্ট (Gilbert, ১৫৪০–১৬০৩) চুম্বকত্ব নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা ও তত্ত্ব প্রদানের জন্য চিরস্মরণীয়। আলোর প্রতিসরণের সূত্র আবিষ্কার করেন জার্মানীর স্নেল (Snell, ১৫৯১–১৬২৬)। হাইগেন (Huygen, ১৬২৬–১৬৯৫) পেন্ডুলামীয় গতি পর্যালোচনা করেন, ঘড়ির যান্ত্রিক কৌশলের বিকাশ ঘটান এবং আলোর তরঙ্গাতত্ত্ব উদ্ভাবন করেন। রবার্ট হুক (Robert Hooke, ১৬৩৫–১৭০৩) বিকৃতকরণ বল (Distoring force)-এর ক্রিয়ার স্থিতিস্থাপক বস্তুর ধর্ম অনুসন্ধান করেন। বিভিন্ন চাপে গ্যাসের ধর্ম বের করার জন্য পরীক্ষা–নিরীক্ষা চালান বিজ্ঞানী রবার্ট বয়েল (Robert Boyle, ১৬২৭–১৬৯১)। ভন গুয়েরিক (Von Guericke) বায়ু পাম্প আবিষ্কার করেন, বিজ্ঞানী রোমার (Romer, ১৬৪৪–১৭১০) বৃহস্পতির একটি উপগ্রহের গ্রহণ পর্যবেক্ষণ করে আলোর বেগ পরিমাপ করেন, কিন্তু তাঁর সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের কেউই বিশ্বাস করেননি যে আলোর বেগ এত বেশি হতে পারে।

১.৬ কেপলার, গ্যালিলিও ও নিউটন এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উদ্ভব

কোপারনিকাস যে সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্বের ধারণা উপস্থিত করেন কেপলার সেই ধারণার সাধারণ গাণিতিক বর্ণনা দেন তিনটি সূত্রের সাহায্যে। কেপলারের সাফল্যের মূল ভিত্তি হল, তিনি প্রচলিত বৃত্তাকার কক্ষপথের পরিবর্তে উপবৃত্তকার কক্ষপথ কল্পনা করলেন। গ্রহদের গতিপথ সম্পর্কে তাঁর গাণিতিক সূত্রগুলোর সত্যতা তিনি যাচাই করলেন গ্রহদের গতিপথ সম্পর্কে তাঁর গুরু টাইকোব্রাহের পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যের দ্বারা। কেপলারের গাণিতিক সূত্রগুলো পরিমাণগতভাবে গ্রহদের গতিপথ নির্ধারণ করলেও তা ছিল নিছক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যকে সমীকরণের মধ্যে ধারণ করার ব্যাপার।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রথম সূচনা ঘটে ইটালির বিখ্যাত বিজ্ঞানী গ্যালিলিওর অবদানের ভিতর দিয়ে। তিনি প্রথম দেখান যে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ এবং সুশৃঙ্খলভাবে ভৌত রাশির সংজ্ঞার্থ ও এদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ বৈজ্ঞানিক কর্মের মূল ভিত্তি। তিনিই অ্যারিস্টটলের 'কেন?' প্রশ্নের পরিবর্তে 'কেমন করে ?' এই প্রশ্নের প্রবর্তন করেন। গ্যালিলিও'র মৃত্যুর বছরেই নিউটনের জন্ম। গ্যালিলিও'র উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে পূর্ণতর রূপ প্রদান করেন নিউটন। গাণিতিক তত্ত্ব নির্মাণ ও পরীক্ষার মাধ্যমে সে তত্ত্বের সত্যতা যাচাইয়ের বৈজ্ঞানিক যে ধারা তা প্রতিষ্ঠিত হয় নিউটনের বিস্ময়কর প্রতিভার দ্বারা। গ্যালিলিও সরণ, গতি, ত্বরণ, সময় ইত্যাদির সংজ্ঞার্থ ও এদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করেন। ফলে তিনি বস্তুর পতনের নিয়ম আবিষ্কার ও সৃতিবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করেন। নিউটন আবিষ্কার করেন বলবিদ্যা ও বলবিদ্যার বিখ্যাত তিনটি সূত্র। আলোকবিদ্যায়ও তাঁর অবদান রয়েছে। গণিতের নতুন শাখা ক্যালকুলাসও তাঁর আবিষ্কার।

গ্রহদের গতিপথ সম্পর্কে কেপলারের সূত্রগুলোর মূল উৎসরূপে মহাকর্ষের তত্ত্ব তিনি আবিষ্কার করেন। নিউটনের অবদান এতই গভীর ও সুদূরপ্রসারী যে সনাতনী পদার্থবিজ্ঞানকে নিউটনীয় পদার্থবিজ্ঞান বলা হয়।

১.৭ ভৌত বিজ্ঞানের বিকাশ ও শিল্প বিপ্লব

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বৃটেনের শিল্প ক্ষেত্রে বহু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এই অপূর্ব পরিবর্তনকে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব নামে অভিহিত করা হয়। এই বিপ্লবে শিল্প উৎপাদনের কাঠামো, কলাকৌশল ও উৎপাদন পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। কারিগরি ক্ষেত্রে নাটকীয় উন্নতি শিল্প বিপ্লবের অন্যতম কারণ।

শিল্প বিপ্লবের আগে থেকেই ইংল্যান্ড জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইউরোপে নেতৃত্বের আসনে আসীন ছিল। ১৬৬০ সালে রয়েল

একাডেমী প্রতিষ্ঠার ফলে দেশের লোকের মধ্যে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতার জন্ম হয়। নিউটনের মত বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ বিষয়ের সাহায্যে বিভিন্ন কারিগরি উন্নয়ন ও যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ঘটে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উৎপাদনের কলাকৌশলকে উন্নত ও কারিগরি জ্ঞানকে বিকশিত করে। জেমস্ ওয়াটের বাষ্পীয় ইঞ্জিন শিল্প বিপ্লবের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যানবাহনে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের সংযুক্তি যাতায়াত ও চলাচল ব্যবস্থায় অকল্পণীয় গতি সঞ্চার করে। ফলে মালামাল সর্বত্র দ্রুত বণ্টন সম্ভব হওয়ায় জিনিসপত্রের চাহিদা ও বিক্রি বেড়ে যায় অনেকগুণ। চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্যে শিল্পোদ্যোক্তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় নতুন নতুন আবিষ্কারও ত্বরান্বিত হয়। এ সময়ে ধাতু গলানোর চুল্লি আবিষ্কার হওয়ায় লোহা ও ইস্পাত শিল্পের অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়। তদুপরি বস্ত্রশিল্পে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার, কয়লা শিল্পের প্রসেসিং ইত্যাদি শিল্প বিপ্লবকে উৎসাহিত ও অগ্রগামী করে তোলে। যন্ত্রপাতি ও কৌশলগত আবিষ্কারের ফলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এই লাভ পুন: বিনিয়োগ করে ইংল্যান্ডের পক্ষে দ্রুত শিল্পায়ন করা সম্ভব হয়। শিল্পোন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য শিল্পপতিতরা বিজ্ঞান সাধনার পিছনেও বিনিয়োগে উৎসাহী হন, ফলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশ ও গতি লাভ করে।

১.৮ আধুনিক ভৌত বিজ্ঞানের উদ্ভব

উনিশ শতকের আবিষ্কার ও উদ্ভাবন ইউরোপকে শিল্প বিপ্লবের দিকে নিয়ে যায়। হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান ওরস্টেড (Hans Chiristian Oersted ১৭৭৭ –১৮৫১) দেখান যে, তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া আছে। এই আবিষ্কার মাইকেল ফ্যারাডে (Michael Faraday, ১৭৯১–১৮৬৭), হেনরী (Henry, ১৭৯৭–১৮৭৯) ও লেন্জ (Lenz, ১৮০৪–১৮৬৫) কে পরিচালিত করে চৌম্বক ক্রিয়া তড়িৎপ্রবাহ উৎপাদন করে এই ঘটনা আবিষ্কারের দিকে। আসলে এটি হল যান্ত্রিক শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়া আবিষ্কার। আমাদের অধিকাংশ তড়িৎ সম্বন্ধীয় শিল্পের ভিত্তি হল এ আবিষ্কার।

১৮৬৪ সালের মহান তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (James Clerk Maxwell, ১৮৩১–১৮৭৯) আলোর তড়িৎ চুম্বকীয় তত্ত্বের বিকাশ ঘটান। ১৮৮৮ সালে হেনরিখ হার্জও (Heinrich Hertz, ১৮৫৭–১৮৯৪) এ রকম বিকিরণ উৎপাদন ও উদঘাটন করেন। ১৮৯৬ সালে মার্কনী (Marconi) এরকম তরঙ্গ ব্যবহার করে অধিক দূরত্বে মোর্সকোডে সংকেত পাঠানোর ব্যবস্থার উদ্ভাবন করেন। এভাবে বেতার যোগাযোগ জন্ম লাভ করে। এ শতকের শেষের দিকে রনজেন (Roentgen, ১৯৫৪–১৯২৩) এক্স–রে এবং বেকেরেল (H. Becquerel, ১৮৫২–১৯০৮) ইউরেনিয়ামের তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করেন।

বিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটে। এ মত প্রকাশ করা হয়ে থাকে যে ১৯০০ সাল থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে যে পরিমাণ অগ্রগতি হয়েছে তা অতীতের সব অগ্রগতির পরিমাণকে ছাড়িয়ে গেছে। বিকিরণ বিষয়ক ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের (Max Planck, ১৮৫৮–১৯৪৭) কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও আলবার্ট আইনস্টাইনের (Albert Einstein, ১৮৭৯–১৯৫৫) আপেক্ষিক তত্ত্ব পূর্বের পরীক্ষালব্ধ ফলাফলকেই শুধু ব্যাখ্যা করেনি, এমন ভবিষ্যৎ বাণীও সম্ভব হয়েছে যা আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। আর্নেস্ট রাদারফোর্ডের (Ernest Rutherford, ১৮৭১–১৯৩৭) পরমাণু বিষয়ক নিউক্লিয় তত্ত্ব ও নীলস্ বোরের হাইড্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রন স্তরের ধারণা পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞানের সম্ভবত প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ধাপ ছিল। এ শতকে পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞানের যে উন্নতি হয়েছিল তা ছিল সত্যিই বিস্ময়কর।

পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ঘটে ১৯৩৮ সালে। এই সময় ওটো হান (Otto Hann, ১৮৭৯–১৯৬৮) ও স্ট্রেসম্যান (Strassmann, ১৯০২) বের করেন যে পরমাণু ফিশনযোগ্য। ফিশনের ফলে একটি বড় আকারের পরমাণু ভেঙে দুটি মাঝারি আকারের পরমাণুতে রূপান্তরিত হয় এবং পরমাণুর ভরের একটি অংশ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়– জন্ম হয় পারমাণবিক বোমার। বর্তমানে পরমাণু থেকে যে শক্তি আমরা পাচ্ছি তা অতীতের সমস্ত উৎস থেকে প্রাপ্ত শক্তির তুলনায় বিপুল। শক্তির এ বিপুল উৎস মানুষের কল্যাণ না ধ্বংসে ব্যবহৃত হবে তা নির্ভর করে বিশ্বের বিভিন্ন সরকারের নিয়ন্ত্রণে যারা আছেন তাঁদের ওপর।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে পদার্থবিজ্ঞানের রয়েছে অভূতপূর্ব অবদান। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বিভিন্ন চিকিৎসায় ব্যবহৃত হচ্ছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আবিষ্কারেও পদার্থবিজ্ঞান অগ্রণী ভূমিক পালন করছে। এছাড়া তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে বিকাশ লাভ করেছে পরমাণু তত্ত্ব, কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও আপেক্ষিকতা তত্ত্ব ।

বিংশ শতাব্দীতে আকাশ ভ্রমণ, মহাশূন্যে ভ্রমণ, পারমাণবিক শক্তি, ইলেকট্রনিক্স ইত্যাদির বিপুল উন্নতি সাধিত হয়। নতুন নতুন ওষুধ যেমন পেনিসিলিন, অ্যান্টিবায়োটিকস আবিষ্কৃত হয়। ম্যালেরিয়া, পোলিও, যক্ষ্মা প্রভৃতি মারাত্মক রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। আকাশ ভ্রমণের জন্য নতুন ও দ্রুতগামী এরোপ্লেন আবিষ্কৃত হয়। মহাশূন্য সম্পর্কে বিভিন্ন জ্ঞান আহরণের জন্য মানুষ মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করে। চাঁদের মাটিতে মানুষের পদার্পণ ঘটে, মঙ্গল গ্রহে রকেট ছোটে। কৃত্রিম উপগ্রহ আবহাওয়ার পূর্বাভাসদানে কিংবা যোগাযোগকে সহজ করতে চমৎকার অবদান রাখছে।

নিউক্লিয় বা পারমাণবিক শক্তি অতিদ্রুত বিকাশ লাভ করে এবং শক্তির একটি প্রধান উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়। বিভিন্ন ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম ও কম্পিউটার মানুষের ক্ষমতাকে অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে। মানুষের জীবন যাত্রাকে আরও সহজ, আরও সুন্দর এবং উপভোগ্য করার জন্য বহু ব্যবস্থা বিজ্ঞান করেছে।

বিংশ শতাব্দীতে আমাদের বাংলাদেশের কয়েকজন বিজ্ঞানী বিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অবদান রেখে দুনিয়ায় পরিচিত হয়েছেন। তাদের মধ্যে জগদীশচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, মেঘনাদ সাহা, কুদরাত-ই-খুদা প্রমুখ বিজ্ঞানী উল্লেখযোগ্য।

১.৯। সভ্যতার বিবর্তনে পদার্থবিজ্ঞানের অবদান

পদার্থবিজ্ঞান হলো প্রাচীন গ্রিসের মত পুরনো এবং আগামী দিনের সংবাদপত্রের মত নতুন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে এটি সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী। মানব সভ্যতার বিবর্তনে বিজ্ঞানের যে অবদান তার বিপুল অংশ এ পদার্থবিজ্ঞানের অবদান। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন আরাম-আয়েশ থেকে শুরু করে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন উন্নতিতে পদার্থবিজ্ঞানের দান অপরিসীম।

আমরা পদার্থবিজ্ঞানে যেসব আবিষ্কার ও নীতি পড়ব সেখানে রয়েছে প্রাচীন পন্ডিত যেমন, আর্কিমিডিস, ডেমোক্রিটাস ও থেলিসের অবদান।

সপ্তদশ, অষ্টাদশ, উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে। এসব সম্ভব হয়েছে গ্যালিলিওর পড়ন্ত বস্তু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বয়েলের গ্যাস নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা, নিউটনের মহাকর্ষ ও আলোক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং ভোল্টার তড়িৎ সম্পকির্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে। এ অগ্রগতি এতই বেশি ছিল যে, কোনো এক বিখ্যাত বিজ্ঞানী মন্তব্য করেছিলেন যে, সব গুরুত্বপুর্ণ আবিষ্কার হয়ে গেছে। ভবিষ্যতের বিজ্ঞানীদের জন্য শুধু বাকি রইল এগুলোকে আরও উন্নত করা। এরপর অতিদ্রুত আবিষ্কার হয় এক্স-রে, তেজস্ক্রিয়তা, পরমাণু গঠন, বেতার তরঙ্গ এবং আপেক্ষিকতা তত্ত্ব।

বর্তমানে এসব আবিষ্কারের সুফল আমরা ভোগ করছি। পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত গতিতে ও উচুঁতে আমরা ভ্রমণ করতে পারছি। রঙিন টেলিভিশন আমাদের আনন্দের উৎস হয়েছে। নিউক্লিয় বিক্রিয়া থেকে পাচ্ছি প্রচুর তড়িৎশক্তি। ইলেকট্রনিক কম্পিউটারে জটিল সব সমস্যার সমাধান করতে পারছি সানন্দে। মহাশূন্যে পাঠান হচ্ছে নতুন নতুন উপগ্রহ এবং উপগ্রহ মহাশূন্য সম্পর্কে সরবরাহ করছে নতুন নতুন তথ্য। দূর পাল্লার মিসাইল দূর থেকে লক্ষবস্তুর আঘাত হানছে। যে সময়টুকুতে তুমি বিজ্ঞানের অবদান সম্পর্কে পড়ছ সে সময়ে নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার ঘটে গেছে।

পদার্থবিজ্ঞানের প্রভূত অগ্রগতি মানব জীবনকে করছে অনেক সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী। আমাদের জীবনে চুম্বক, তড়িৎ,

আলোক, শব্দ ও নিউক্লিয় পদার্থবিজ্ঞানের রয়েছে অপরিসীম অবদান। চুম্বক ও তড়িৎ বিজ্ঞানের কল্যাণে আমরা পেয়েছি আরাম আয়েশ ও চিত্তবিনোদনের বিভিন্ন মাধ্যম। বৈদ্যুতিক বাতি আমাদের ঘর আলোকিত করছে, বৈদ্যুতিক পাখা শীতল বাতাস ছড়িয়ে দিচ্ছে, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের সাহায্যে আমরা দূরদূরান্তে খবর পাঠাতে পারছি। রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা আমাদের চিত্তবিনোদনে সহায়তা করছে। দ্রুতগামী উড়োজাহাজ আমাদের নিয়ে যাচ্ছে দূরদূরান্তে। এছাড়াও বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি, রেফ্রিজারেটর, মোটরগাড়ি, ট্রেন, বাস, বৈদ্যুতিক চুল্লি আমাদের জীবনে অনেক সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়ে দিয়েছে।

পদার্থবিজ্ঞানের মূল অবদান অবশ্য প্রকৃতির মৌলিক নিয়মগুলোর আবিষ্কার। ক্ষুদ্রতম যেসব কণিকা দিয়ে বস্তু জগৎ তৈরি এবং মৌলিক যে বলগুলো প্রকৃতিতে কাজ করছে তা আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে পদার্থবিজ্ঞানের উদ্ভাবিত তত্ত্ব ও পরীক্ষণ দ্বারা, পদার্থবিজ্ঞানের কল্যাণে পরমাণুর অভ্যন্তর থেকে মহাবিশ্বের দূরতম গ্যালাক্সি সম্পর্কে ক্রমাগত শুদ্ধতর উপলব্ধি আমরা অর্জন করছি। অবশ্য বড় বড় বিজ্ঞানীদের মতে, বিজ্ঞান ও আবিষ্কারের কোনো সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই। বস্তুত কোনো সৃজনশীল কাজেরই সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি আগে থেকে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। এ জন্যই বলা হয়ে থাকে যত বিজ্ঞানী জন্মগ্রহণ করেছেন তত পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে বিজ্ঞান চর্চার।

১.১০। বিজ্ঞানীর কাজের ধারা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

বিজ্ঞানের সাথে জড়িত আছে পরীক্ষা, নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ। এসব কাজ করতে হবে পদ্ধতিগতভাবে, সুশৃঙ্খল উপায়ে বিজ্ঞান সম্মত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা, বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ ও বিভিন্ন গবেষণা করেন । তাঁদের কাজের ধারা বিভিন্ন হতে পারে। কিন্তু সবাই ধারাবাহিকভাবে কাজ করেন, পদ্ধতিগতভাবে সুশৃঙ্খল উপায়ে কাজ সম্পন্ন করেন। তাঁরা বিভিন্ন কাজ করলেও তাঁদের কাজের ধারার মধ্যে একটা পদ্ধতিগত মিল আছে। বিজ্ঞানীদের ব্যবহৃত এই যে সাধারণ পদ্ধতি তাকে বলা হয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিকাশে চারজন বিজ্ঞানীর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁদের কাজের ধারা থেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিকাশ সহজে বোঝা যায়। এরা হলেন গ্রিক দেশের খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দির বিজ্ঞানী ও দার্শনিক অ্যারিস্টটল। ষোড়শ শতাব্দীর বিখ্যাত লেখক ফ্রান্সিস বেকন (F.Bacon. ১৫৬১ – ১৬১৬)। ইতালির বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদ গ্যালিলিও এবং পদার্থবিজ্ঞানী ও গণিতবিদ স্যার আইজ্যাক নিউটন।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে কাজ করেন তা সংক্ষেপে নিচে বলা হল :

১। বিজ্ঞানী পর্যবেক্ষণ করেন। (বেকন)

ফ্রান্সিস বেকন কোনো ঘটনা বা সত্যের পর্যবেক্ষণের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করতেন। তিনি কোনো ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে সংগৃহীত তথ্যের ওপর বেশি জোর দিতেন। তিনি মনে করতেন বিচার বুদ্ধির সাহায্যে তত্ত্বে পৌঁছান যায়।

২। কোনো কিছু কেন ঘটে ? কীভাবে ঘটে ? বিজ্ঞানী সে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন। (গ্যালিলিও) গ্যালিলিও বেকনের মত শুধু পর্যবেক্ষণেই জোর দিতেন না। তাঁর প্রশ্ন ছিল কোনো কিছু কেন ঘটে? কীভাবে ঘটে? তিনি কোনো কিছু কেন ঘটে এবং কীভাবে ঘটে তা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করে যাচাই করতেন। তিনি গতি বিষয়ক গাণিতিক সূত্র এবং দোলকের সূত্র প্রদান করেন। দোলকের গতি পর্যবেক্ষণ করে দোলকের সূত্র প্রদান করেন। তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া কোনো কিছু গ্রহণ করতেন না। তিনি ছিলেন পরীক্ষণ নির্ভর বিজ্ঞানী।

৩। বিজ্ঞানী তাঁর পর্যবেক্ষণকে যাচাই করেন, পরীক্ষণের জন্য চিন্তা করেন এবং তত্ত্ব প্রদান করেন। (অ্যারিস্টটল)

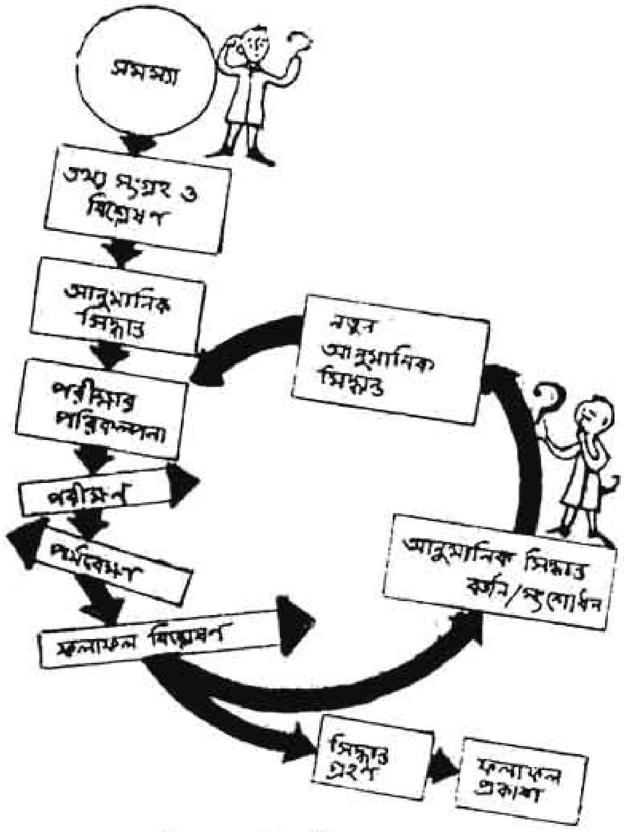
অ্যারিস্টটলের কাজের ধারার বৈশিষ্ট্য ছিল যে তিনি শুধু প্রশ্ন করতেন এবং এসব প্রশ্নের উত্তরদানের জন্য তত্ত্ব তৈরি করতেন।

৪। বিজ্ঞানী তার তত্ত্বকে যাচাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পরীক্ষণের ব্যবস্থা করেন। (গ্যালিলিও, নিউটন)

গ্যালিলিও পরীক্ষণের ওপর বেশি জোর দিতেন এবং নিউটন পরীক্ষণ ও প্রাপ্ত ফলাফলকে গাণিতিক সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশের প্রতি জোর দিতেন।

৫। বিজ্ঞানী তাঁর পরীক্ষালব্ধ ফলাফল থেকে তাঁর তত্ত্বকে প্রয়োজনে পরিবর্তন বা সংশোধন করেন।

৬। বিজ্ঞানী অন্যান্য পর্যবেক্ষণ ব্যাখ্যা করতে বা ভবিষ্যতের ঘটনাবলি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। উপরিউক্ত ধাপগুলো সমন্বয়ে গঠিত হয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। নিচের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির একটি প্রবাহ চিত্র দেওয়া হল।



চিত্র ১.১ বিজ্ঞানীদের কাজের ধাপ

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধাপ :

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিভিন্ন ধাপকে নিম্নোক্তভাবে লেখা যায়:

১। সমস্যা নির্দিষ্টকরণ।

২। সমস্যাটি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ।

৩। অনুমিত সিদ্ধান্ত (Hypothesis) গ্রহণ।

৪। পরীক্ষার পরিকল্পনা, পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও অনুমিত সিদ্ধান্ত যাচাই।

৫। পরীক্ষালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বর্জন বা সংশোধন।

৬। ফল প্রকাশ।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কি শুধু বিজ্ঞানীরাই ব্যবহার করেন? না, যে কোনো সাধারণ লোকও এ পদ্ধতি তার দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করতে পারেন। যে কোনো ব্যক্তি এসব ধাপ অনুসরণ করে কোনো কাজ করলেই তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করছেন বলা যায়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কে বৃহস্পতির একটি উপগ্রহের গ্রহণ পর্যবেক্ষণ করে আলোর বেগ পরিমাপ করেন?

ক. কেপলার খ. রোমার

গ. গ্যালিলিও ঘ. ড: গিলবার্ট

২। বিজ্ঞান হচ্ছে–

i. পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান

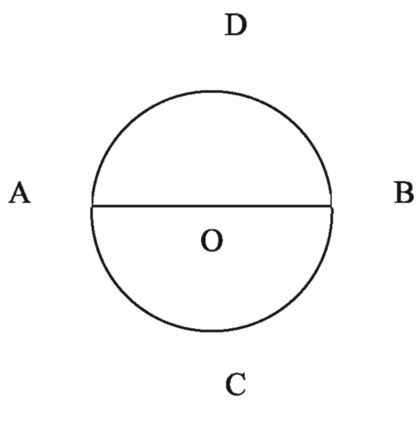
ii. পর্যবেক্ষণ ও পদ্ধতিগতভাবে লব্দ সুশৃঙ্খল ও সুসংবদ্ধ জ্ঞান

iii. জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii



উপরের চিত্র থেকে নিচের (৩–৪) নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

৩। A C B D A ও A B এর অনুপাত হচ্ছে–

(ক) α (খ) β (গ) γ (ঘ) π

৪। অনুপাতটির অপেক্ষাকৃত সঠিক মান কোনটি

ক. 3.1614 খ. 3.1615

গ. 3.1416 ঘ. 3.1417

সৃজনশীল প্রশ্ন

একই গ্রামে বাবলু ও করিমদের পরিবার বাস করে। নিরাপদ পানির জন্য দুটি পরিবারই আলাদা আলাদা নলকূপ ব্যবহার করে। বেশ কিছুদিন যাবত বাবলু লক্ষ করছে তাদের পরিবারের অনেকের হাতে এবং পায়ের তালুতে ফোসকার মতো ক্ষত সৃষ্টি হচ্ছে। করিমের পরিবারের কোনো সদস্যের এ ধরনের সমস্যা নেই। বিষয়টি বাবলুকে চিন্তিত করে। তার ধারণা নলকূপের পানিই এজন্য দায়ী। তাই সে দুটি নলকূপ থেকেই পানি নিয়ে গবেষণাগারে পরীক্ষা করান। পরীক্ষায় বাবলুদের নলকূপের পানিতে আর্সেনিকের পরিমাণ বেশি পাওয়া যায়। পরীক্ষার ফলাফল একজন বিশেষজ্ঞকে দেখালে তিনি জানান, বাবলুদের নলকূপের পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা বেশি। এ পানি স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ নয়। তিনি বাবলুকে নিরাপদ পানি পান করার পরামর্শ দেন।

ক. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধাপ কয়টি?

খ. বাবলুর অনুমিত সিদ্ধান্তটি নিজের ভাষায় লেখ।

গ. আর্সেনিক শনাক্তকরণের প্রক্রিয়াটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধাপের সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বাবলু একজন বিজ্ঞানী না বিজ্ঞানমনষক লোক –তোমার মতামতের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরিমাপ
MEASUREMENT

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রায় প্রতিটি কাজের সাথে মাপ-জোখের ব্যাপারটি জড়িত। এছাড়া বিভিন্ন গবেষণার কাজে প্রয়োজন হয় সূক্ষ্ম মাপ-জোখের। পদার্থবিজ্ঞানের প্রায় সকল পরীক্ষণেই পদার্থের পরিমাণ, বলের মান, অতিবাহিত সময়, শক্তির পরিমাণ ইত্যাদি জানতে হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের মাপ-জোখের বিষয়টাকে বলা হয় পরিমাপ। এই অধ্যায়ে আমরা পরিমাপ, পরিমাপের একক, এককের আন্তর্জাতিক পদ্ধতি, পরিমাপের যন্ত্র-স্লাইড ক্যালিপার্স, স্ক্রুগজ, তুলা যন্ত্র ও এদের ব্যবহার আলোচনা করব। এছাড়া আলোচিত হবে মাত্রা ও মাত্রা সমীকরণ।

২.১। পরিমাপ কী

সাধারণভাবে পরিমাপ বলতে বোঝায় কোনো কিছুর পরিমাণ নির্ণয় করা। যেমন আমার বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব 500 মিটার। সোহেল বাজার থেকে 3 কিলোগ্রাম চিনি কিনে আনল। 500 মিটার হল বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্বের পরিমাণ। 3 কিলোগ্রাম হল সোহেলের কিনে আনা চিনির ভরের পরিমাণ। মিতার ক্লাস থেকে স্কুলের অফিসে যেতে 45 সেকেন্ড সময় লাগে। এখানে 45 সেকেন্ড সময়ের পরিমাণ।

সুতরাং, কোনো কিছুর পরিমাণ নির্ণয় করাকে বলা হয় পরিমাপ।

আমরা দূরত্ব পরিমাপে ব্যবহার করেছি মিটার, ভর পরিমাপে ব্যবহার করেছি কিলোগ্রাম এবং সময় পরিমাপে ব্যবহার করেছি সেকেন্ড। এই মিটার, কিলোগ্রাম ও সেকেন্ড হল পরিমাপের তিনটি একক। পরিমাপের এরকম অনেক একক আছে।

২.২। পরিমাপের একক
Units of Measurement

যেকোনো পরিমাপের জন্য প্রয়োজন একটি স্ট্যান্ডার্ড বা আদর্শের যার সাথে তুলনা করে পরিমাপ করা হয়। এ নির্দিষ্ট পরিমাপের সাথে তুলনা করে সমগ্র ভৌত রাশিকে পরিমাপ করা যায়। পরিমাপের এ আদর্শ পরিমাণকে বলা হয় পরিমাপের একক (Unit)। মনে করা যাক কোনো লাঠির দৈর্ঘ্য 5 মিটার। এখানে মিটার হল দৈর্ঘ্যের একক এবং 5 মিটার বলতে বুঝায় পাঁচটি এক মিটারের পাঁচ গুণ দৈর্ঘ্য। ক্ষেত্রফল, আয়তন, ভর, শক্তি, বল, সময় ইত্যাদি মাপার জন্য ভিন্ন ভিন্ন একক রয়েছে। পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতিতে এসব এককের ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে। এ এককগুলো হবে সুবিধাজনক আকারের, যা সহজে ও সঠিকভাবে পুনরুৎপাদন করা যায়। এ এককগুলো আবার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

যে আদর্শ পরিমাপের সাথে তুলনা করে ভৌত রাশিকে পরিমাপ করা হয় তাকে বলা হয় পরিমাপের একক।

মিটার, কিলোমিটার, কিলোগ্রাম, সেকেন্ড, জুল ইত্যাদি এককের উদাহরণ। যেমন- আমার বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব 1 কিলোমিটার।

২.৩ । মৌলিক ও লব্ধ রাশি
Fundamental and Derived Quantities

এ ভৌত জগতে যা কিছু পরিমাপ করা যায় তাকে আমরা রাশি বলি। যেমন, একটি টেবিলের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা যায়, দৈর্ঘ্য একটি রাশি। তোমার দেহের ভর পরিমাপ করা যায়, ভর একটি রাশি। তুমি কতক্ষণ ধরে বইটি পড়ছো সেই

সময় মাপা যায়, সময় একটি রাশি। তুমি যদি একটি বস্তু তুলতে বল প্রয়োগ কর, সে বল পরিমাপ করা যায়, সুতরাং বল একটি রাশি। এ ভৌত জগতে এরূপ বহু রাশি আছে। এখন দেখা যায়, এ সকল রাশির মধ্যে অল্প কয়েকটি রাশি আছে যে গুলো পরিমাপ করতে অন্য কোনো রাশির সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। এ রাশিগুলো মৌলিক রাশি। যেমন, টেবিলের দৈর্ঘ্য মাপতে গেলে কেবল দৈর্ঘ্য মাপলেই চলে। এ দৈর্ঘ্য মাপার জন্য অন্য কোনো রাশি মাপতে হয় না বা অন্য রাশি মাপার দরকার হয় না। সুতরাং দৈর্ঘ্য একটি মৌলিক রাশি। অপর দিকে অনেক রাশি আছে যেগুলো মাপতে হলে অন্য রাশির সাহায্য দরকার হয়। যেমন, লোহার ঘনত্ব পরিমাপ করতে হলে এক খন্ড লোহার ভর এবং আয়তন পরিমাপ করতে হবে এবং ভরকে আয়তন দিয়ে ভাগ করে ঘনত্ব বের করতে হবে। আবার আয়তন মাপতে হলে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা মাপতে হবে অর্থাৎ, তিনবার বা তিনদিকে দৈর্ঘ্য মাপতে হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু রাশি আছে, যেগুলো মূল রাশি; এগুলো অন্য রাশির ওপর নির্ভর করে না। এ রাশিগুলোকে মৌলিক রাশি বলা হয়।

আর অন্য সকল রাশি মৌলিক রাশিগুলো থেকে লাভ করা যায় বা এক বা একাধিক মৌলিক রাশির গুণফল বা ভাগফল থেকে প্রতিপাদন করা যায়। এদেরকে বলা হয় লব্ধ রাশি বা যৌগিক রাশি।

মৌলিক রাশি : যে সকল রাশি স্বাধীন বা নিরপেক্ষ যেগুলো অন্য রাশির ওপর নির্ভর করে না বরং অন্যান্য রাশি এদের ওপর নির্ভর করে তাদেরকে মৌলিক রাশি বলে।

জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখা প্রশাখায় মাপ-জোখের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা এরূপ সাতটি রাশিকে মৌলিক রাশি রূপে চিহ্নিত করেছেন। এগুলো হল (১) দৈর্ঘ্য (২) ভর (৩) সময় (৪) তাপমাত্রা (৫) তড়িৎ প্রবাহ (৬) দীপন ক্ষমতা (৭) পদার্থের পরিমাণ।

লব্ধ রাশি : যে সকল রাশি মৌলিক রাশির ওপর নির্ভর করে বা মৌলিক রাশি থেকে লাভ করা যায় তাদেরকে লব্ধ রাশি বলে।

বেগ,ত্বরণ, বল, কাজ, তাপ, বিভব ইত্যাদি রাশিগুলো মৌলিক রাশিসমূহ থেকে লাভ করা যায় বলে এগুলো লব্ধ রাশি।

যেমন: বল = ভর × ত্বরণ

$$= \text{ভর} \times \frac{\text{বেগ}}{\text{সময়}}$$

$$= \text{ভর} \times \frac{\text{দূরত্ব}}{\text{সময়}^2} \text{।}$$

সুতরাং বল একটি লব্ধ রাশি।

২.৪। মৌলিক একক ও লব্ধ একক
Fundamental and Derived Units

মৌলিক রাশির একককে মৌলিক একক বলা হয়। যেমন, দৈর্ঘ্যের একক মিটার। মিটার একটি মৌলিক একক । মিটার অন্য কোনো এককের ওপর নির্ভর করে না।

যে সকল একক মৌলিক একক থেকে লাভ করা যায় তাদেরকে লব্ধ একক বলে। যেমন বলের একক নিউটন একটি লব্ধ একক। নিউটন নির্ভর করে মিটার, কিলোগ্রাম ও সেকেন্ডের ওপর ।

$$1 \text{ নিউটন} = \frac{1 \text{ কিলোগ্রাম} \times 1 \text{ মিটার}}{\text{সেকেন্ড}^2}$$

২.৫। এককের আন্তর্জাতিক পদ্ধতি
International System of Units

দৈনন্দিন কাজকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে প্রাচীনকাল থেকেই মাপ-জোখের প্রচলন ছিল। এ মাপ-জোখের জন্য বিভিন্ন রাশির স্থানীয় বা এলাকা ভিত্তিক বহু একক প্রচলন ছিল। যেমন কিছুকাল পূর্বেও আমাদের দেশে ভরের একক

হিসাবে মণ, সের ইত্যাদি চালু ছিল। দূরত্ব নির্দেশ করতে আমরা এখনও মাইল ব্যবহার করে থাকি। দৈর্ঘ্যের জন্য গজ, ফুট, ইঞ্চি এখনও প্রচলিত আছে। বৈজ্ঞানিক তথ্যের আদান-প্রদান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য সারা বিশ্বে মাপ জোখের একই রকম আদর্শের (Standard) প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ তাগিদ থেকে 1960 সাল থেকে দুনিয়া জোড়া বিভিন্ন রাশির একই রকম একক চালু করার সিদ্ধান্ত হয়। এককের এই পদ্ধতিকে বলা হয় এককের আন্তর্জাতিক পদ্ধতি (International Systems of Units) বা সংক্ষেপে এস.আই (SI)। সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক পদ্ধতি চালুর পূর্বে বৈজ্ঞানিক হিসাব-নিকাশের ক্ষেত্রে এককের তিনটি পদ্ধতি চালু ছিল – সি.জি.এস (CGS) পদ্ধতি (Centimeter Gram Second System), এম.কে.এস (MKS) পদ্ধতি (Meter Kilogram Second System) এবং এফ.পি.এস (FPS) পদ্ধতি (Foot Pound Second System)। আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে এম.কে.এস পদ্ধতিকে আত্মীকরণ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে প্রতিটি ভৌত রাশির জন্য কেবল একটি একক নির্ধারিত করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে সাতটি মৌলিক রাশির জন্য সাতটি মৌলিক একক ধরা হয়েছে এবং বাকি সকল একক এক বা একাধিক মৌলিক এককের গুণফল বা ভাগফল থেকে প্রতিপাদন করা হয়েছে। কাজের সুবিধার জন্য এককগুলোর গুণিতক বা উপ-গুণিতক ব্যবহার করা যায় এবং এককের সাথে সুবিধাজনক উপসর্গ যুক্ত করে তা পাওয়া যায়। ২.১ সারণিতে আন্তর্জাতিক পদ্ধতির (SI) মৌলিক এককগুলোর নাম ও প্রতীক দেওয়া হল। পাশাপাশি সি.জি.এস পদ্ধতিতে এ সকল মৌলিক রাশির একক উল্লেখ করা হল।

সারণি ২.১ । মৌলিক রাশি ও তাদের একক

রাশি	রাশির প্রতীক	এস.আই একক	এককের প্রতীক	সি.জি.এস একক
১. দৈর্ঘ্য (length)	l	মিটার (meter)	m	সেন্টিমিটার (cm)
২. ভর (mass)	m	কিলোগ্রাম (kilogram)	kg	গ্রাম (g)
৩. সময় (time)	t	সেকেন্ড (second)	s	সেকেন্ড (s)
৪. তাপমাত্রা (temperature)	θ, T	কেলভিন (kelvin)	K	ডিগ্রি সেলসিয়াস (°C)
৫. তড়িৎ প্রবাহ (electric current)	I	অ্যাম্পিয়ার (ampere)	A	অ্যাম্পিয়ার
৬. দীপনক্ষমতা (luminous intensity)	I	ক্যান্ডেলা (candela)	Cd	ক্যান্ডেলা পাওয়ার (cp)
৭. পদার্থের পরিমাণ (amount of substance)	n	মোল (mole) Kilo mole	K mol	mole

সি.জি.এস (C.G.S) পদ্ধতি

সি.জি.এস বা সেন্টিমিটার গ্রাম সেকেন্ড পদ্ধতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মেট্রিক পদ্ধতির প্রথম অভিযোজন। এ পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক হল সেন্টিমিটার **(cm),** ভরের একক গ্রাম **(gm)** এবং সময়ের একক সেকেন্ড **(sec)**। এজন্যই এর নাম সি.জি.এস পদ্ধতি।

২.৬। এস.আই (SI) এর মৌলিক এককসমূহ
Fundamental Units in SI

মৌলিক রাশির এককসমূহ যেহেতু অন্য এককগুলোর ওপর নির্ভর করে না, তাই মৌলিক একক ইচ্ছেমত নির্বাচন করা যায়। কিন্তু সেই নির্বাচনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃত থাকতে হবে। এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্যও থাকতে হবে। যেমন এটি হতে হবে অপরিবর্তী – স্থান, কাল, পাত্র কোনো কিছুর ওপর নির্ভর করবে না। কালের বিবর্তনে সময় বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে এর কোনো পরিবর্তন হবে না। সহজে এককটি পুনরুৎপাদন করা যাবে। 1960 সালে এককের আন্তর্জাতিক পদ্ধতি চালুর সময় মৌলিক এককগুলোর যে আদর্শ বা স্ট্যান্ডার্ড গ্রহণ করা হয়েছিল পরবর্তীকালে উপযুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জনের লক্ষ্যে এদের অনেকগুলোর আদর্শ বদল করা হয়েছে, কিন্তু তাতে এককগুলোর মানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। যেমন এখন আলোর অতিক্রান্ত দূরত্ব দিয়ে মিটারকে সংজ্ঞায়িত করা হয়, তার আগে এক প্রকার আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সাহায্যে মিটারের সংজ্ঞা দেওয়া হত। তারও আগে প্যারিসের নিকটে স্যাভ্রেতে রাখা একটি দণ্ডের দৈর্ঘ্যকে মিটারের আদর্শ ধরা হত। নিচে আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে মৌলিক এককগুলোর জন্য সর্বশেষ গৃহীত আদর্শ বর্ণনা করা হল।

দৈর্ঘ্যের একক : মিটার : ভ্যাকিউয়ামে (বায়ু শূন্য স্থানে) আলো $\frac{1}{299\,792\,458}$ সেকেন্ডে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে 1 মিটার (m) বলে।

ভরের একক : কিলোগ্রাম : ফ্রান্সের স্যাভ্রেতে ইন্টারন্যাশনাল ব্যুরো অব ওয়েটস্ এন্ড মেজারস-এ রক্ষিত প্লাটিনাম-ইরিডিয়াম সংকর ধাতুর তৈরি একটি সিলিন্ডারের ভরকে 1 কিলোগ্রাম (kg) বলে। এ সিলিন্ডারটির ব্যাস 3.9 cm এবং উচ্চতাও 3.9 cm।

সময়ের একক : সেকেন্ড : একটি সিজিয়াম– 133 পরমাণুর 9 192 631 770 টি স্পন্দন সম্পন্ন করতে যে সময় লাগে তাকে 1 সেকেন্ড (s) বলে।

তাপমাত্রার একক : কেলভিন : পানির ত্রৈধ বিন্দুর (triple point) তাপমাত্রার $\frac{1}{273.16}$ ভাগকে 1 কেলভিন (K) বলে।

তড়িৎ প্রবাহের একক : অ্যাম্পিয়ার : ভ্যাকিউয়ামে (বায়ু শূন্য স্থানে) এক মিটার দূরত্বে অবস্থিত অসীম দৈর্ঘ্যের এবং উপেক্ষণীয় প্রস্থচ্ছেদের দুটি সমান্তরাল সরল পরিবাহীর প্রত্যেকটিতে যে পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহ চললে পরস্পরের মধ্যে প্রতি মিটার দৈর্ঘ্যে 2×10^{-7} নিউটন বল উৎপন্ন হয় তাকে 1 অ্যাম্পিয়ার (A) বলে।

দীপন ক্ষমতার একক : ক্যান্ডেলা : 101 325 প্যাসকেল চাপে প্লাটিনামের হিমাঙ্কে (2042 K) কোনো কৃষ্ণ বস্তুর (black body) পৃষ্ঠের $\frac{1}{600000}$ বর্গমিটার পরিমিত ক্ষেত্রফলের পৃষ্ঠের অভিলম্ব বরাবর দীপন ক্ষমতাকে 1 ক্যান্ডেলা (cd) বলে।

পদার্থের পরিমাণের একক : মোল : যে পরিমাণ পদার্থে 0.012 কিলোগ্রাম কার্বন –12 এ অবস্থিত পরমাণুর সমান সংখ্যক প্রাথমিক ইউনিট (যেমন, পরমাণু, অণু, আয়ন, ইলেকট্রন ইত্যাদি বা এগুলোর নির্দিষ্ট কোনো গ্রুপ) থাকে তাকে 1 মোল (mol) বলে।

উপলব্ধি এবং ব্যবহারের সুবিধার জন্য অনেক সময় এ সকল এককের গুণিতক ও উপগুণিতক ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে,

1 কিলোমিটার (km) = 10^{3} মিটার (m)

1 সেন্টিমিটার(cm) = 10^{-2} মিটার (m)

1 মিলিমিটার (mm) = 10^{-3} মিটার (m)

1 টন (t) = 10^3 কিলোগ্রাম (kg)
1 গ্রাম (g) = 10^{-3} কিলোগ্রাম (kg)
1 মিলিগ্রাম (mg) = 10^{-6} কিলোগ্রাম (kg)
1 মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার (μ A) = 10^{-6} অ্যাম্পিয়ার (A)

সচরাচর যে সকল উপসর্গ যোগ করে কোনো এককের বড় ও ছোট একক গঠন করা হয় ২.২ সারণিতে তা প্রদত্ত হল।

২.৭। সংখ্যার বৈজ্ঞানিক প্রতীক : দশের সূচকের ব্যবহার
Science Notation : Use of Power of 10

বিজ্ঞানীরা এমন অনেক রাশি ব্যবহার করে থাকেন যেগুলোর মান খুব বড় বা খুব ছোট হতে পারে। যেমন আলোর দ্রুতি প্রায় 30,00,00,000 ms^{-1} এবং ইলেকট্রনের আধানের পরিমাণ 0.00000000000000000016 কুলম্ব। স্বাভাবিক ভাবেই এ জাতীয় সংখ্যা পড়া,লেখা, বুঝা এবং মনে রাখা খুবই অসুবিধাজনক। আমরা 10 (দশ) সংখ্যাটির ঘাত (power) ব্যবহার করে এ সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারি।

আমরা লক্ষ করি,
$10^0 = 1$
$10^1 = 10$
$10^2 = 10 \times 10 = 100$
$10^3 = 10 \times 10 \times 10 = 1000$

ইত্যাদি । শূন্যের সংখ্যা 10 কত শক্তিতে উন্নীত করা হয়েছে তা নির্দেশ করে এবং তাকে 10 এর সূচক বলে। উদাহরণ স্বরূপ আলোর দ্রুতিকে 3×10^8 ms^{-1} হিসেবে প্রকাশ করা যায়।
1 এর চেয়ে ছোট সংখ্যার ব্যাপারে আমরা লক্ষ করি;

$$10^{-1} = \frac{1}{10} = 0.1$$

$$10^{-2} = \frac{1}{10\times10} = 0.01$$

$$10^{-3} = \frac{1}{10\times10\times10} = 0.001$$

ইত্যাদি । কোনো সংখ্যাকে 10 এর যে কোনো ঘাত এবং 1 থেকে 10 এর মধ্যে অবস্থিত অপর সংখ্যার গুণফল হিসেবে প্রকাশ করা হলে তাকে বৈজ্ঞানিক প্রতীক বলে। যেমন 6733000000 হল 6.733×10^9 এবং 0.00000846 হল 8.46×10^{-6} । সুতরাং দেখা যাচ্ছে এ প্রতীকে প্রকাশিত সংখ্যাটির 10-এর ধনাত্মক সূচক যত, দশমিক বিন্দুকে ডান দিকে তত ঘর সরালে আর 10-এর ঋণাত্মক সূচক যত দশমিক বিন্দুকে বাম দিকে তত ঘর সরালে মূল সংখ্যাটি পাওয়া যায়।
বৈজ্ঞানিক প্রতীকে প্রকাশিত সংখ্যার ক্ষেত্রে গুণের নিম্নোক্ত সাধারণ নিয়মটি খাটে :

$$10^m \times 10^n = 10^{m+n}$$

এখানে m এবং n যে কোনো সংখ্যা – ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হতে পারে। যেমন $10^6 \times 10^7 = 10^{13}$, $10^7\times10^{-20} = 10^{-13}$।
ভাগের ক্ষেত্রেও নিম্নোক্ত নিয়মটি প্রযোজ্য

$$= \frac{10^n}{10^m} = 10^n \times 10^{-m} = 10^{n-m}$$

যেমন $10^6 \div 10^4 = 10^{6-4} = 10^2$ বা $10^3 \div 10^{-7} = 10^{3-(-7)} = 10^{10}$

সারণি ২.২ : দশের সূচক ও তাদের নাম

উপসর্গ	উৎপাদক	সংকেত	উদাহরণ
পেটা (peta)	10^{15}	P	1 পেটা মিটার =1 pm=10^{15}m
টেরা (tera)	10^{12}	T	1 টেরা গ্রাম = 1 tg =10^{12}g
গিগা (giga)	10^{9}	G	1 গিগা জুল = 1 GJ=10^{9}J
মেগা(mega)	10^{6}	M	1 মেগা ওয়াট = 1 MW=10^{6}W
কিলো(kilo)	10^{3}	k	1 কিলোভোল্ট = 1 kV=10^{3}V
হেক্টো(hecto)	10^{2}	h	1 হেক্টো প্যাসকেল = 1 hPa=10^{2}Pa
ডেকা(deca)	10^{1}	d a	1 ডেকা নিউটন = 1 daN=10N
ডেসি(deci)	10^{-1}	d	1 ডেসি ওহম = 1 dΩ=10^{-1}Ω
সেন্টি(centi)	10^{-2}	c	1 সেন্টিমিটার = 1 cm=10^{-2}m
মিলি(milli)	10^{-3}	m	1 মিলি অ্যাম্পিয়ার = 1 mA=10^{-3}A
মাইক্রো(micro)	10^{-6}	μ	1 মাইক্রো ভোল্ট = 1 μV=10^{-6}V
ন্যানো(nano)	10^{-9}	n	1 ন্যানো সেকেন্ড = 1 ns=10^{-9}s
পিকো(pico)	10^{-12}	p	1 পিকো ফ্যারাড = 1 pF=10^{-12} F
ফেমটো (femto)	10^{-15}	f	1 ফেমটো মিটার = 1 fm=10^{-15} m

২.৮। মাত্রা Dimensions

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে কোনো ভৌত রাশি এক বা একাধিক মৌলিক রাশির সমন্বয়ে গঠিত সুতরাং যে কোনো ভৌত রাশিকে বিভিন্ন সূচকের (power) এক বা একাধিক মৌলিক রাশির গুণফল হিসেবে প্রকাশ করা যায়। কোনো ভৌত রাশিতে উপস্থিত মৌলিক রাশিগুলোর সূচককে রাশিটির মাত্রা বলে। যেমন বল = ভর × ত্বরণ = ভর $\times \frac{\text{বেগ}}{\text{সময়}}$ = ভর $\times \frac{\text{দৈর্ঘ্য}}{\text{সময়}^২}$ । এখন দৈর্ঘ্যের মাত্রা L, ভরের মাত্রা M, সময়ের মাত্রা T বসালে বলের মাত্রা পাওয়া যাবে $\frac{ML}{T^2}$ বা MLT^{-2} অর্থাৎ, বলের রয়েছে ভরের মাত্রা (1) দৈর্ঘ্যের মাত্রা (1) এবং সময়ের মাত্রা (–2)। যে সমীকরণের সাহায্যে কোনো রাশির মাত্রা প্রকাশ করা হয়ে থাকে তাকে মাত্রা সমীকরণ বলে । মাত্রা সমীকরণে মাত্রা নির্দেশ করতে তৃতীয় বন্ধনী [ ] ব্যবহার করা হয়। যেমন বলের মাত্রা সমীকরণ

$$[F]= [MLT^{-2}]$$

২.৩ সারণিতে বিভিন্ন রাশির মাত্রা দেখানো হল। মাত্রা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা কোনো সমীকরণ বা ফর্মুলার সঠিকতা যাচাই করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ

$$s = ut + \frac{1}{2} at^2$$

সমীকরণটি বিবেচনা করা যাক। আমরা জানি কেবলমাত্র একই জাতীয় রাশির যোগ, বিয়োগ বা সমতা সম্ভব। সুতরাং একটি সমীকরণের প্রতিটি পদ অবশ্যই একই জাতীয় রাশিকে নির্দেশ করতে হবে, অর্থাৎ, প্রতিটি পদের মাত্রা একই হতে হবে। এখন উপরিউক্ত সমীকরণে তিনটি পদ আছে, বাদিকে একটি এবং ডানদিকে দুটি। এ সমীকরণে S হল সরণ– এর মাত্রা L,

u হল আদি বেগ, এর মাত্রা $\frac{L}{T} = LT^{-1}$

a হল ত্বরণ, এর মাত্রা $\frac{L}{T^2} = LT^{-2}$

t হল সময়, এর মাত্রা T

$\therefore$ ut-এর মাত্রা হল = $LT^{-1} \times T = L$

at^2-এর মাত্রা হল, $LT^{-2} \times T^2 = L$

দেখা যাচ্ছে উপরিউক্ত সমীকরণের বাম দিকের পদটির মাত্রা L এবং ডান দিকের দুটি পদের মাত্রাও L সুতরাং সমীকরণটি সিদ্ধ।

সারণি ২.৩ : বিভিন্ন ভৌত রাশির সংকেত, একক ও মাত্রা

রাশি			এস.আই.একক			মাত্রা
নাম	ইংরেজি পরিভাষা	সংকেত	নাম	সংকেত	প্রতিপাদন	
দৈর্ঘ্য	length	l	মিটার	m	m	L
ভর	mass	m	কিলোগ্রাম	kg	kg	M
সময়	time	t	সেকেন্ড	s	s	T
সরণ	displacement	s	মিটার	m	m	L
ক্ষেত্রফল	area	A	মিটার ^{2}	m^2	m.m	L^2
আয়তন	volume	V	মিটার ^{3}	m^3	$m^2.m$	L^3
বেগ, দ্রুতি	velocity,speed	u	মিটার/সেকেন্ড	ms^{-1}	$m.s^{-1}$	LT^{-1}
ত্বরণ	acceleration	a	মিটার/সেকেন্ড^2	ms^{-2}	$m.s^{-1}\ s^{-1}$	LT^{-2}
ভরবেগ	momentum	p	কিলোগ্রাম-মিটার/সেকেন্ড	$kg\ ms^{-1}$	$kg.ms^{-1}$	MLT^{-1}
বল	force	F	নিউটন	N	$kg.ms^{-2}$	MLT^{-2}
কাজ	work	W	জুল	J	N.m	ML^2T^{-2}
ক্ষমতা	power	p	ওয়াট	W	$J.\ s^{-1}$	ML^2T^{-3}
শক্তি	energy	E	জুল	J	N.m	$ML^2\ T^{-2}$
ঘনত্ব	density	ρ	কিলোগ্রাম/মিটার ^{3}	$kg\ m^{-3}$	$kg.m^{-3}$	ML^{-3}
চাপ	pressure	p	প্যাসকেল	Pa	$N.m^{-2}$	$ML^{-1}\ T^{-2}$
দোলনকাল	time period	T	সেকেন্ড	s	s	T
তরঙ্গ দৈর্ঘ্য	wave length	λ	মিটার	m	m	L
কম্পাঙ্ক	frequency	f	হার্জ	Hz	s^{-1}	T^{-1}
তাপমাত্রা	temperature	θ	কেলভিন	K	K	θ
প্রসারণ সহগ	co-efficient of expansion	α,β,γ	প্রতি কেলভিন	K^{-1}	K^{-1}	θ^{-1}
তাপ	quantity of heat	Q	জুল	J	N.m	$ML^2\ T^{-2}$
তাপ ধারণ ক্ষমতা	heat capacity	C	জুল/কেলভিন	$J.K^{-1}$	$J.K^{-1}$	$ML^2\ T^{-2}\theta^{-1}$
আপেক্ষিক সুপ্ত তাপ	specific latent heat	l	জুল/কিলোগ্রাম	$J.kg^{-1}$	$J.kg^{-1}$	$L^2\ T^{-2}$
তাপ পরিবাহকত্ব	thermal conductivity	K	ওয়াট /মিটার - কেলভিন	$Wm^{-1}\ K^{-1}$	$J\,s^{-1}\,m^{-1}K^{-1}$	$MLT^{-3}\ \theta^{-1}$
দীপন ক্ষমতা	luminous intensity	l	ক্যান্ডেলা	cd	cd	J
আলোক ফ্লাক্স	luminous flux	Q	লুমেন	lm	cd. sr	J
দীপন তীব্রতা	illumination	E	লাক্স	lx	$lm.m.^{-2}$	JL^{-2}
লেন্সের ক্ষমতা	power of a lens	p	ডাই অপ্টার	d	m^{-1}	L^{-1}

বিবর্ধন	magnification	m		- -	- -	- -
তড়িৎ প্রবাহ	electric current	I	অ্যাম্পিয়ার	A	A	I
আধান	charge	q,Q	কুলম্ব	C	A.s	IT
তড়িৎ তীব্রতা	electric field strenth electric intensity	E	নিউটন/কুলম্ব	NC^{-1} $=Vm^{-1}$	$N.C^{-1}$	$MLT^{-3}I^{-1}$
তড়িৎ বিভব	electric potential	V	ভোল্ট	V	$J.C^{-1}$	$ML^2T^{-3}I^{-1}$
রোধ	resistance	R	ওহম	Ω	$V.A^{-1}$	$ML^2T^{-3}I^{-2}$
পরিবাহিতা	conductance	G	সিমেন্স	S	$V^{-1}A$	$M^{-1}L^{-2}T^3I^2$
পরিবাহকত্ব	conductivity	σ	প্রতি ওহম প্রতি মিটার	$\Omega^{-1}m^{-1}$	$\Omega^{-1}m^{-1}$	$M^{-1}L^{-3}T^3I^2$
আপেক্ষিক রোধ	specific resistance, resistivty	ρ	ওমহ -মিটার	Ωm	Ωm	$ML^3T^{-3}I^{-2}$
তড়িচ্চালক শক্তি	electromotive force	e,E	ভোল্ট	V	JC^{-1}	$ML^2T^{-3}I^{-1}$

২.৯. পরিমাপের যন্ত্রাদি

Measuring Instruments

পরিমাপের জন্য আমরা বিভিন্ন যন্ত্র ব্যবহার করে থাকি। পরিমাপের ক্ষেত্রে বিভিন্নতার জন্য এবং অধিকতর সঠিকতা অর্জনের লক্ষ্যেই প্রধানত এসব যন্ত্রের ব্যবহার করে থাকি। বৈজ্ঞানিক পরিমাপের ক্ষেত্রে যেসব যন্ত্রাদি সচরাচর ব্যবহৃত হয় তাদের থেকে আমরা নিম্নোক্ত যন্ত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করব।

(ক) মিটার স্কেল (Metre Scale)

(খ) ভার্নিয়ার স্কেল(Vernier Scale)

(গ) স্লাইড কালিপার্স (Slide Callipers)

(ঘ) স্ক্রু গজ (Screw Gauge)

(ঙ) তুলাযন্ত্র (Balance)

(ক) মিটার স্কেল

Metre Scale

পরীক্ষাগারে দৈর্ঘ্য পরিমাপের সবচেয়ে সরল যন্ত্র হল মিটার স্কেল । এর দৈর্ঘ্য 1 মিটার বা 100 সেন্টিমিটার। এজন্য একে মিটার স্কেল বলা হয়। এ স্কেলের এক পার্শ্ব সেন্টিমিটার এবং অপর পার্শ্ব ইঞ্চিতে দাগ কাটা থাকে। প্রত্যেক সেন্টিমিটারকে সমান দশ ভাগে ভাগ করা থাকে। এ প্রত্যেকটি ভাগকে বলা হয় 1 মিলিমিটার বা 0.1 সেন্টিমিটার। প্রত্যেক ইঞ্চিকে সমান আট ভাগ, দশ ভাগ বা ষোল ভাগে ভাগ করা হয়।

মিটার স্কেলের সাহায্যে যে দণ্ড বা কাঠির দৈর্ঘ্য মাপতে হবে তার একপ্রান্ত স্কেলের 0 দাগে বা কোনো সুবিধাজনক দাগে স্থাপন করতে হবে। দণ্ডের অপর প্রান্ত স্কেলের যে দাগের সাথে মিশেছে তার পাঠ নিতে হবে। দণ্ডের দুটি প্রান্ত পাঠের বিয়োগফল হলো দণ্ডের দৈর্ঘ্য। সাধারণভাবে যে দণ্ডের দৈর্ঘ্য মাপতে হবে তার বাম প্রান্ত স্কেলের x দাগে স্থাপন করলে যদি ডান প্রান্ত y দাগের সাথে মিশে যায় তবে দণ্ডের দৈর্ঘ্য L হবে, $L = y - x$। এ স্কেলের সাহায্যে মিলিমিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্য সঠিকভাবে মাপা হয়। এর চেয়ে সূক্ষ্ম পরিমাপ করতে হলে ব্যবহার করতে হয় ভার্নিয়ার স্কেল।

(খ) ভার্নিয়ার স্কেল

Vernier Scale

সাধারণ মিটার স্কেলে আমরা মিলিমিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্য মাপতে পারি। মিলিমিটারের ভগ্নাংশ যেমন 0.2 মিলিমিটার, 0.6 মিলিমিটার বা 0.8 মিলিমিটার ইত্যাদি মাপতে হলে আমাদের ব্যবহার করতে হয় ভার্নিয়ার স্কেল। গণিত শাস্ত্রবিদ পিয়েরে ভার্নিয়ার এ স্কেল আবিষ্কার করেন। তাঁর নামানুসারে এ স্কেলের নাম ভার্নিয়ার স্কেল।

মূল স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগের ভগ্নাংশের নির্ভুল পরিমাপের জন্য মূল স্কেলের পাশে যে ছোট আর একটি স্কেল ব্যবহার করা হয় তার নাম ভার্নিয়ার স্কেল। ভার্নিয়ার স্কেলকে মিটার স্কেলের সাথে ব্যবহার করে মিলিমিটারের ভগ্নাংশ সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়।

ভার্নিয়ার স্কেল মূল বা প্রধান স্কেলের পাশে সংযুক্ত থাকে এবং প্রধান স্কেলের পাশ দিয়ে সামনে বা পেছনে সরানো যায়। ধরা যাক একটি ভার্নিয়ার স্কেলে দশটি ভাগ আছে (দশটি দাগ কাটা) । এ দশভাগ প্রধান স্কেলের নয়টি ক্ষুদ্রতম ভাগের সমান (চিত্র ২.১)। প্রধান স্কেলের নয়টি ক্ষুদ্রতম ভাগ হল 9 মিলিমিটার বা 0.9 সেন্টিমিটার। ভার্নিয়ার স্কেলের 10 ভাগ যেহেতু প্রধান স্কেলে 9 ক্ষুদ্রতম ভাগের সমান সুতরাং ভার্নিয়ার স্কেলের ভাগগুলো প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগের চেয়ে সামান্য ছোট। প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগের চেয়ে ভার্নিয়ার স্কেলের এক ভাগ কতটুকু ছোট তার পরিমাণকে বলা হয় ভার্নিয়ার ধ্রুবক **(Vernier constant)**। একটি সহজ সূত্র দ্বারা ভার্নিয়ার ধ্রুবক নির্ণয় করা যায় তা হল, ভার্নিয়ার ধ্রুবক = $\frac{s}{n}$ যেখানে s প্রধান স্কেলের 1 ক্ষুদ্রতম ভাগের দৈর্ঘ্য এবং n ভার্নিয়ারের ভাগের সংখ্যা।

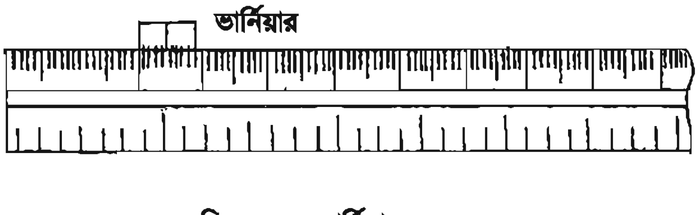
উপর্যুক্ত ক্ষেত্রে s = 1 মি মি এবং n = 10 ভাগ

$$\therefore \text{ ভার্নিয়ার ধ্রুবক} = \frac{s}{n} = \frac{1 \text{ মিমি}}{10} = 0.1 \text{ মিমি} = 0.01 \text{ সেমি}$$

কোনো কোনো সময় ভার্নিয়ার স্কেলের 20 ভাগ প্রধান স্কেলের 19 ক্ষুদ্রতম ভাগের সমান থাকে এবং প্রধান স্কেলের এক ক্ষুদ্রতম ভাগ 1mm এর চেয়ে কম থাকে। তখন ভার্নিয়ার ধ্রুবক পরিবর্তিত হয়ে যায়। ভার্নিয়ার ধ্রুবক নির্ভর করে প্রধান স্কেল ভার্নিয়ার স্কেলের দাগ কাটার বৈশিষ্ট্যের ওপর।

ভার্নিয়ার স্কেলের সাহায্যে পরিমাপ

মনে করা যাক, AB দণ্ডের দৈর্ঘ্য বের করতে হবে (চিত্র ২.১)। দণ্ডটির A প্রান্ত প্রধান স্কেলের শূন্য (0) দাগের সাথে মিলিয়ে ভার্নিয়ারটি সামনে বা পেছনে সরিয়ে দণ্ডের B প্রান্তের সাথে মিলানো হয়। মনে করা যাক, দণ্ডের B প্রান্ত স্কেলের M মি মি দাগ অতিক্রম করেছে তাহলে এর দৈর্ঘ্য M ও (M+1) মি মি এর মাঝামাঝি। এ M মি মি এর চেয়ে বাড়তি দৈর্ঘ্য ভার্নিয়ার ব্যবহার করে বের করতে হবে। এর দৈর্ঘ্যটুকু হবে ভার্নিয়ার পাঠ।



চিত্র : ২.১ ভার্নিয়ার স্কেল

এবার দেখতে হবে ভার্নিয়ারের কোন দাগটি প্রধান স্কেলের কোন একটি দাগের সাথে মিলেছে। যদি কোনো দাগ না মিলে থাকে তাহলে দেখতে হবে ভার্নিয়ারের কোন দাগটি প্রধান স্কেলের কোন একটি দাগের সাথে সবচেয়ে কাছাকাছি হয়েছে। ভার্নিয়ার স্কেলের এ দাগই হবে ভার্নিয়ারের সমপাতন।

মনে করা যাক, ভার্নিয়ারের V নম্বর দাগটি প্রধান স্কেলের একটি দাগের সাথে মিলেছে বা কাছাকাছি হয়েছে। সুতরাং যন্ত্রের ভার্নিয়ার ধ্রুবক VC হলে দণ্ডের দৈর্ঘ্য = প্রধান স্কেল পাঠ + ভার্নিয়ার স্কেল পাঠ
= প্রধান স্কেল পাঠ + ভার্নিয়ার সমপাতন × ভার্নিয়ার ধ্রুবক
অর্থাৎ, $L = M + V \times VC$

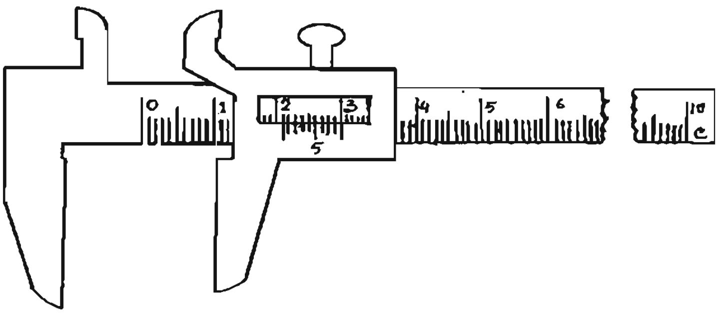
ধরা যাক, দণ্ডের B প্রান্ত প্রধান স্কেলের 14 মি মি দাগ অতিক্রম করেছে এবং ভার্নিয়ারের 3 নম্বর দাগটি প্রধান স্কেলের একটি দাগের সাথে মিলেছে। তাহলে দণ্ডের দৈর্ঘ্য হবে

$L = 14$ মি মি $+ 3 \times 0.1$ মি মি (ভার্নিয়ার ধ্রুবক হলো 0.1 মি মি)
$14.3 \text{ mm} = 1.43 \text{ cm}$

(গ) স্লাইড ক্যালিপার্স

Slide callipers

স্লাইড ক্যালিপার্সের অপর নাম ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স। কারণ, এ যন্ত্র দ্বারা মাপজোখের বেলায় ভার্নিয়ার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। একটি আয়তকার ইস্পাত দণ্ডের গায়ে দাগ কেটে স্লাইড ক্যালিপার্সের মূল বা প্রধান স্কেল তৈরি করা হয়। প্রধান স্কেলের যে প্রান্তে শূন্য দাগ কাটা থাকে অর্থাৎ, যে প্রান্ত থেকে স্কেলের সূচনা হয় সে প্রান্তে একটি ধাতব চোয়াল আটকানো থাকে। প্রধান স্কেলের গায়ে চোয়াল যুক্ত একটি ভার্নিয়ার স্কেল পরানো থাকে। চিত্র ২.২ । এ চোয়ালযুক্ত ভার্নিয়ার প্রধান স্কেলের উপর সামনে বা পেছনে সরানো যায়। এ স্কেলের



চিত্র ঃ ২.২ স্লাইড ক্যালিপার্স

সাথে একটি স্ক্রু থাকে। এ স্ক্রুর সাহায্যে ভার্নিয়ার স্কেলকে প্রধান স্কেলের গায়ে যে কোনো জায়গায় আটকিয়ে রাখা যায়। মূল স্কেলের চোয়াল এবং ভার্নিয়ার স্কেলের চোয়াল যখন লেগে থাকে তখন সাধারণত ভার্নিয়ার স্কেলের শূন্য দাগ প্রধান স্কেলের শূন্য দাগের সাথে মিলে যায়। অনেক যন্ত্রে নাও মিলতে পারে। তখন বুঝতে হবে যান্ত্রিক ত্রুটি রয়েছে এবং এর জন্য পাঠ সংশোধন করে নিতে হয়। ভার্নিয়ারের শূন্য দাগ মূল স্কেলের শূন্য দাগের ডান পাশে থাকলে ত্রুটি হবে ধনাত্মক আর যদি ভার্নিয়ারের শূন্য দাগ প্রধান স্কেলের শূন্য দাগের বাম পাশে থাকে তাহলে ত্রুটি হবে ঋণাত্মক । এ যান্ত্রিক ত্রুটি সব সময়ই আপাত পাঠ থেকে বিয়োগ করতে হয়। কোনো দণ্ডের আপাত পাঠ যদি L' এবং যান্ত্রিক ত্রুটি যদি হয় e তাহলে প্রকৃত পাঠ অর্থাৎ, দৈর্ঘ্য হবে –
$L = L' - (\pm e)$

স্লাইড ক্যালিপার্স কী করে ব্যবহার করতে হয় ?

যে বস্তু বা দণ্ডের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হবে তা স্লাইড ক্যালিপার্সের চোয়াল দুটির মাঝে স্থাপন করতে হয়। ভার্নিয়ার স্কেলের সাথে লাগানো চোয়াল ঠেলে সামনে আনতে হয় যাতে প্রধান স্কেলের চোয়াল ও ভার্নিয়ারের চোয়াল বস্তুটিকে বিপরীত দিক থেকে স্পর্শ করে। এখন স্ক্রুর সাহায্যে ভার্নিয়ারটি প্রধান স্কেলের সাথে দৃঢ়ভাবে আটকে দিই। এবার

প্রধান স্কেলের পাঠ ও ভার্নিয়ারের পাঠ নিই।

সুতরাং বস্তুটির দৈর্ঘ্য = প্রধান স্কেল পাঠ (M) + ভার্নিয়ার সমপাতন (V) $\times$ ভার্নিয়ার ধ্রুবক (VC)– [(যান্ত্রিক ত্রুটি (($\pm$ e)]

স্লাইড ক্যালিপার্সের ব্যবহার :

স্লাইড ক্যালিপার্স ব্যবহৃত হয়।

(ক) বস্তুর দৈর্ঘ্য নির্ণয়ে।

(খ) চোঙ বা বেলনের উচ্চতা নির্ণয়ে।

(গ) ফাঁপা নলের অন্তঃব্যাস ও বহির্ব্যাস নির্ণয়ে।

(ঘ) স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে আয়তন নির্ণয় :

(১) আয়তাকার বস্তু

(২) গোলকের আয়তন নির্ণয়

(৩) সিলিন্ডার বা চোঙ বা বেলনের আয়তন নির্ণয়

১. আয়তকার বস্তুর আয়তন নির্ণয় :

কোনো আয়তাকার বস্তুর আয়তন V হলে,

$$V = L \times B \times H$$

এখানে, L = বস্তুর দৈর্ঘ্য, B = বস্তুর প্রস্থ এবং H = বস্তুর উচ্চতা। স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্য L, B ও H নির্ণয় করে উপরিউক্ত সূত্রের সাহায্যে আয়তন নির্ণয় করা হয়। (আয়তন নির্ণয়ের বিস্তারিত পদ্ধতির জন্য ব্যবহারিক অংশে ১নং পরীক্ষণ দ্রষ্টব্য)।

২. গোলকের আয়তন নির্ণয় :

কোনো গোলকের আয়তন V হলে,

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi\left(\frac{d}{2}\right)^3$$

$$= \frac{1}{6}\pi d^3$$

যেখানে, r = গোলকের ব্যাসার্ধ এবং d = গোলকের ব্যাস। স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে গোলকের ব্যাস নির্ণয় করে উপরিউক্ত সূত্রের সাহায্যে আয়তন নির্ণয় করা হয়।

৩. সিলিন্ডার বা বেলনের আয়তন নির্ণয় :

কোনো বেলনের আয়তন V হলে

$$V = \pi r^2 h = \pi\left(\frac{d}{2}\right)^2 h$$

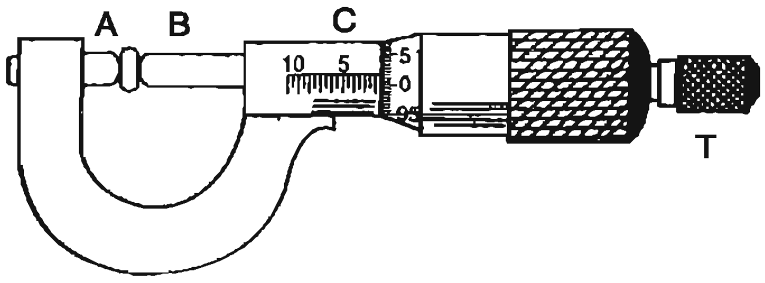
$$= \frac{1}{4}\pi d^2 h$$

যেখানে, r = বেলনের ব্যাসার্ধ, d = বেলনের ব্যাস এবং h বেলনের উচ্চতা।
স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে বেলনের ব্যাস ও উচ্চতা নির্ণয় করে উপরিউক্ত সূত্রের সাহায্যে আয়তন নির্ণয় করা হয়।

(ঘ) স্ক্রু গজ

The Screw Gauge

এ যন্ত্রটি অপর নাম মাইক্রোমিটার স্ক্রু গজ। এ যন্ত্রের সাহায্যে তারের ব্যাসার্ধ, সরু চোঙের ব্যাসার্ধ ও ছোট দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা যায়। এতে রয়েছে দুই প্রান্তে দুটি সমান্তরাল বাহু বিশিষ্ট U আকৃতির ফ্রেম কাঠামো F [চিত্র ২.৩]। এর এক বাহুর সমতল পিঠ A–এর সাথে একটি সমতল প্রান্ত বিশিষ্ট দণ্ড বা কীলক স্থায়ীভাবে আটকানো রয়েছে এবং অপর বাহুতে রয়েছে একটি ফাঁপা নল C। এ নলে রয়েছে মিলিমিটারে দাগাঙ্কিত একটি সরল স্কেল। একটি বেলনাকৃতির টুপি T পরিহিত একটি স্ক্রু । স্ক্রুটি ফাঁপা নল C–এর ভিতর চলাফেরা করতে পারে। বেলনাকৃতি টুপি T–এর কিনারাকে সাধারণত 50 বা 100 ভাগ করা হয়। স্ক্রুর মাথা B যখন স্থায়ী কীলক বা সমতল প্রান্ত বিশিষ্ট দণ্ড (A) স্পর্শ করে তখন বৃত্তাকার স্কেলের শূন্য দাগ রৈখিক স্কেলের শূন্য দাগের সাথে মিলে যায়। এরকম অবস্থায় দুটি স্কেলের শূন্য দাগ যদি না মিলে তাহলে বুঝতে হবে যান্ত্রিক ত্রুটি রয়েছে।



চিত্র ২.৩ স্ক্রু গজ

টুপি T একবার ঘুরালে এর যতটুকু সরণ ঘটে এবং রৈখিক স্কেল বরাবরে যে দৈর্ঘ্য এটি অতিক্রম করে তাকে বলা হয় স্ক্রুর পিচ বা পিচ (Pitch)। বৃত্তাকার স্কেলের মাত্র একভাগ ঘুরালে–এর প্রান্ত বা স্ক্রুটি যতটুকু সরে আসে তাকে বলা হয় যন্ত্রের লঘিষ্ঠ গণন (Least count)। যন্ত্রের পিচ–কে বৃত্তাকার স্কেলের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে লঘিষ্ঠ মান পাওয়া যায়। সুতরাং

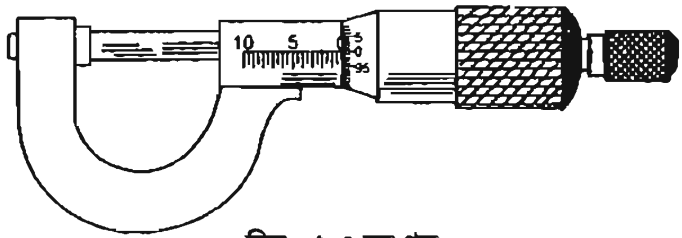
$$\text{লঘিষ্ঠ গণন} = \frac{\text{পিচ}}{\text{বৃত্তাকার স্কেলের ভাগের সংখ্যা}}$$

বৃত্তাকার স্কেলে সাধারণত 100 ভাগ থাকে এবং এই যন্ত্রে পিচ থাকে 1 মি মি

$$\therefore \text{লঘিষ্ঠ গণন} = \frac{1}{100} \text{ মি মি} = 0.01 \text{ মি মি}$$

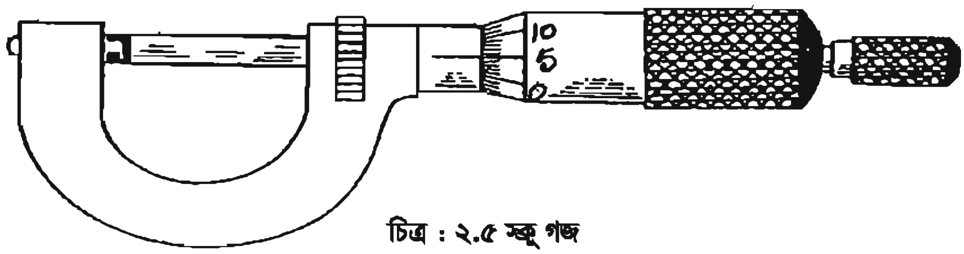
স্ক্রু গজের যান্ত্রিক ত্রুটি (Instrumental error)" স্ক্রু গজে দুই ধরনের যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা যায়, যথা : শূন্য ত্রুটি (Zero error) ও ব্যাকল্যাশ ত্রুটি বা পিছট ত্রুটি (Backlash error)।

শূন্য ত্রুটি : স্ক্রুর মাথা যখন স্থায়ী কীলক বা সমতল প্রান্ত বিশিষ্ট দণ্ড A স্পর্শ করে তখন বৃত্তাকার স্কেলের শূন্যদাগ রৈখিক স্কেলের শূন্য দাগের সাথে মিলে যাওয়া উচিত [চিত্র ২.৪)। যদি না মিলে তাহলে বুঝতে হবে যান্ত্তিক ত্রুটি রয়েছে।



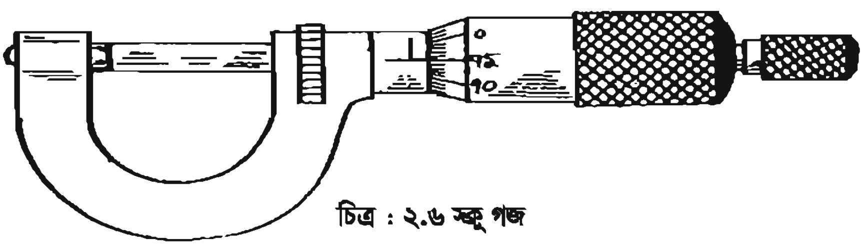
চিত্র : ২.৪ স্ক্রু গজ

বৃত্তাকার স্কেলের শূন্য দাগ যদি রৈখিক স্কেলের শূন্য দাগ পর্যন্ত না পৌঁছে অর্থাৎ, বৃত্তাকার স্কেলের শূন্য দাগ রৈখিক স্কেলের শূন্যদাগের নিচে থাকে [চিত্র ২.৫] তাহলে যান্ত্রিক ত্রুটি হবে ধনাত্মক (+e)।



চিত্র : ২.৫ স্ক্রু গজ

এ অবস্থায় বৃত্তাকার স্কেলের শূন্য দাগ রৈখিক স্কেলের শূন্য দাগের যে কয়ঘর পিছনে থাকে, সেই ঘর সংখ্যাকে লঘিষ্ঠ গণন দিয়ে গুণ করে যান্ত্রিক ত্রুটির মান নির্ণয় করা হয়। আর যদি বৃত্তাকার স্কেলের শূন্য দাগ রৈখিক স্কেলের শূন্য দাগ অতিক্রম করে যায় অর্থাৎ, যদি বৃত্তাকার স্কেলের শূন্য দাগ শূন্য দাগের উপরে থাকে [চিত্র ২.৬] তা হলে যান্ত্রিক ত্রুটি হবে ঋণাত্মক (–e)



চিত্র : ২.৬ স্ক্রু গজ

এ অবস্থায় বৃত্তাকার স্কেলের যে কয় ঘর রৈখিক স্কেলের শূন্য দাগের ওপরে থাকে, ঘর সংখ্যাকে লঘিষ্ঠ গণন দিয়ে গুণ করে যান্ত্রিক ত্রুটির মান নির্ণয় করা হয়। স্মরণ রাখতে হবে : শুদ্ধমান পাওয়ার জন্য নির্ণীত বা আপাত দৈর্ঘ্য থেকে যান্ত্রিক ত্রুটি সবসময় বিয়োগ করতে হয়। অর্থাৎ, আপাত দৈর্ঘ্য L' হলে, প্রকৃত দৈর্ঘ্য $L = L' - (\pm e)$।

ব্যাকল্যাশ ত্রুটি বা পিছন ত্রুটি : যে সকল যন্ত্র, স্ক্রু, নাট ইত্যাদি নীতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি সে সকল যন্ত্রেই এই ত্রুটি কম বেশি দেখা যায়। নতুন অবস্থায় এ ত্রুটির পরিমাণ একেবারে নেই বললেই চলে। কিন্তু ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে স্ক্রু ক্ষয় হয়ে আলগা হয়ে পড়ে ফলে স্ক্রু কে উভয় দিকে একই পরিমাণ ঘূর্ণনে সরণ সমান হয় না। একে ব্যাকল্যাশ ত্রুটি বা পিছট ত্রুটি বলে। পাঠ নেওয়ার সময় স্ক্রুকে একই দিকে ঘুরিয়ে এ ত্রুটি পরিহার করা যায়।

কী করে ব্যবহার করতে হয় ?

যে তারের ব্যাস মাপতে হবে বা যে পাতের পুরুত্ব বের করতে হবে তাকে A ও B এর মাঝে স্থাপন করতে হবে। তার বা পাতটি এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে এর এক পাশ A–কে এবং অপর পাশ B–কে স্পর্শ করে। এবার বৃত্তাকার ও রৈখিক স্কেলের পাঠ নিতে হবে। মনে করা যাক রৈখিক স্কেলের পাঠ L মি মি এবং বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ সংখ্যা C । সুতরাং তারের ব্যাস বা পাতের পুরুত্ব হবে :

ব্যাস বা পুরুত্ব = রৈখিক স্কেল পাঠ + বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ সংখ্যা × লঘিষ্ঠ গণন

= L মি মি + C × L C = L মি মি + C × 0.01 মি মি = (L + 0.01 C) মি মি

মনে করা যাক, রৈখিক স্কেলের পাঠ 2 মি মি এবং বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ সংখ্যা 30, তখন তারের ব্যাস = 2 মি মি + 30 × 0.01 মি মি, = 2 মি মি + 0.3 মি মি = 2.3 মি মি।

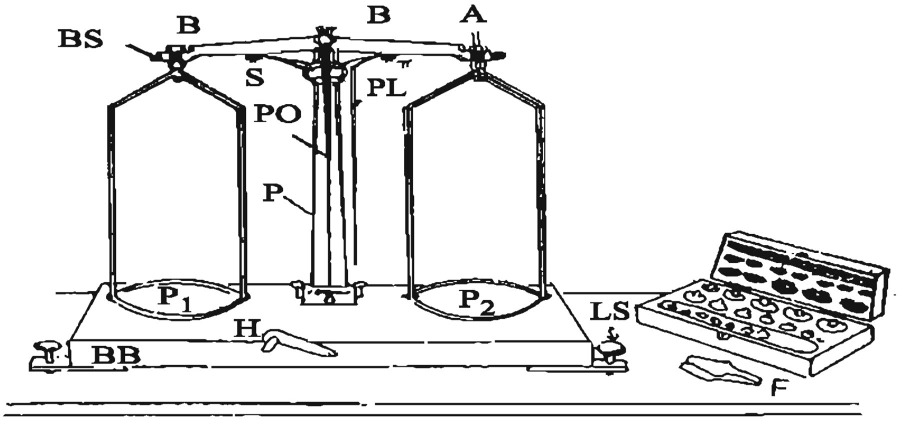
স্ক্রুগজের সাহায্যে তারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল নির্ণয় : বৃত্তাকার প্রস্থচ্ছেদ বিশিষ্ট কোনো তারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল A হলে ,

$$A = \pi r^2 = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}\pi d^2$$

যেখানে, r = তারের ব্যাসার্ধ এবং d = তারের ব্যাস। স্ক্রু গজের সাহায্যে তারের ব্যাস নির্ণয় করে উপরিউক্ত সূত্রের সাহায্যে প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা হয়। [প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের বিস্তারিত পদ্ধতির জন্য ব্যবহারিক অংশের পরীক্ষণ দ্রষ্টব্য]।

(ঙ) তুলা যন্ত্র

কোনো কোনো সময় পদার্থবিজ্ঞান বা রসায়নে খুব অল্প পরিমাণ জিনিসের ভর সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করতে হয়, যা সাধারণ নিক্তি দিয়ে করা যায় না। বস্তু বা পদার্থের পরিমাণ যত কম হবে তার ভর পরিমাপের নিক্তি হতে হবে তত সূক্ষ্ম। এরকম একটি সূক্ষ্ম নিক্তি হল তুলা যন্ত্র বা তুলা। এ যন্ত্র পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন ল্যাবরেটরিতে কোনো অল্প জিনিসের ভর সূক্ষ্মভাবে পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয়। কারণ ল্যাবরেটরি বা পরীক্ষাগারে কোনো জিনিসের ভর পরিমাপ সঠিক না হলে পরীক্ষণ থেকে ভুল ফলাফল আসতে পারে এবং পরীক্ষণটির উদ্দেশ্য ভণ্ডুল হয়ে যেতে পারে।



চিত্র : ২.৭

গঠন প্রণালি : তুলাযন্ত্রে সাধারণ নিক্তির মত দুটি সমান ওজনের পাল্লা বা তুলাপাত্র (Scale pan) P_1 ও P_2 নিক্তির দুই প্রান্তে থাকে। এ পাল্লা দুটি একটি ধাতব দণ্ড বা বিম AB–এর দুই প্রান্তে দুটি খাঁজের মধ্যে উল্টানো ছুরির ফালের উপর দুটি সমান ওজনের ফ্রেমের সাহায্যে ঝুলানো থাকে। AB বিমের কেন্দ্রে একটি ছুরি (knife) আটকিয়ে দেওয়া হয়। এটি নিচের দিকে মুখ করে থাকে।

AB বিমটিকে একটি উল্লম্ব ফাঁপা থাম P–এর উপর রাখা হয়। এ থামটি কাঠের ভিত বা পাটাতন (BB)–এর মাঝখানে দৃঢ়ভাবে আটকানো থাকে। এই পাটাতনের সাথে তিনটি লেভেলিং স্ক্রু (LS) থাকে। (তৃতীয়টি চিত্রে দেখানো হয়নি)। এসব স্ক্রুর সাহায্যে যন্ত্রটিকে লেভেলিং করা হয়। ফাঁপা থামটির মধ্যে একটি নিরেট ধাতবদণ্ড পাটাতন সংলগ্ন হাতল H ঘুরিয়ে ওঠানো নামানো যায়।

বিম AB–এর ঠিক মধ্যস্থলে একটি ত্রিকোণাকৃতি অ্যাগেট পাথরের মোটা দিকটা আটকিয়ে সরু ধারটা থামটির নিরেট দন্ডের উপর অবস্থিত একটি অ্যাগেট প্লেটের উপর বসানো থাকে। নিরেট দন্ডকে উপরে তুললে বিম AB অ্যাগেট পাথরের সুরু দিকটাকে ফালক্রাম করে দুলতে পারে।

তুলাদণ্ডের মধ্যস্থলে একটি লম্বা সূচকের (PO) চওড়া দিকটা আটকে এর নিচের সরু প্রান্তকে একটি স্কেলের উপর মুক্ত রাখা হয়। তুলাদন্ড অনুভূমিক থাকলে সূচকের সরু প্রান্ত স্কেলের o দাগের উপর থাকে। ওলন দড়ি (PL) ও পাটাতনের নিচের স্ক্রুর সাহায্যে দণ্ডটিকে অনুভূমিক করা হয়। সমগ্র যন্ত্রটিকে একটি কাচের বাক্সে রাখা হয়।

তুলাযন্ত্রটি ব্যবহার করার সময় হাতল H ঘুরিয়ে থামটিকে উপরে ওঠাতে হবে এতে AB বিমটিও উপরে ওঠবে এবং ছুরির কিনারার উপর মুক্তভাবে দুলতে থাকবে। দণ্ডের সাথে পাল্লা দুটিও উপরে নিচে দুলতে থাকবে। হাতল H উল্টা দিকে ঘুরালে থাম নিচে নেমে যাবে বিম AB ও পাল্লার দোলন বন্ধ হয়ে যাবে।

AB বিম দুলতে থাকলে সূচক কাঁটাটি নিচের স্কেলের উপর ডানে বায়ে দুলতে থাকবে। পাল্লায় কোনো জিনিস না থাকলে সূচকটির দোলন স্কেলের শূন্য দাগের দু'পাশে সমান হবে। এই দোলন শূন্য দাগের দুপাশে সমান না হলে AB বিমের দুই পাশের সমন্বয় স্ক্রু (BS) দ্বারা এমনভাবে সমন্বয় করে নিতে হবে যাতে সূচকের দোলন স্কেলের শূন্য দাগের দুপাশে সমান হয়। থাম P উলম্ব হল কিনা তা ওলন রেখা PL দ্বারা দেখে নিতে হয়।

কোনো বস্তু বা জিনিসের ভর মাপতে হলে বস্তুটিতে বামদিকের পাল্লায় রাখতে হয় এবং ডানদিকের পাল্লায় একটা একটা করে জ্ঞাত বা জানা বাটখারা ধীরে ধীরে রাখতে হয় যতক্ষণ না সূচকটি স্কেলের শূন্য দাগের দুই পাশে সমানভাবে দুলতে থাকে। এভাবে জানা বাটখাড়ার সাহায্যে বস্তুর ভর নির্ণয় করা যায়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। আন্তর্জাতিক পদ্ধতিকে (S. I) ভরের একক কোনটি?

ক. গ্রাম খ. কিলোগ্রাম

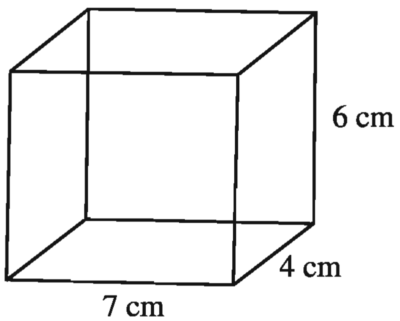
গ. মোল ঘ. পাউন্ড

২। একটি দণ্ডকে স্লাইড ক্যালিপার্সে স্থাপনের পর যে পাঠ পাওয়া গেল তা হচ্ছে প্রধান স্কেল 2 cm, ভার্নিয়ার পাঠ 3 এবং ভার্নিয়ার ধ্রুবক 1mm দণ্ডটির দৈর্ঘ্য কত ?

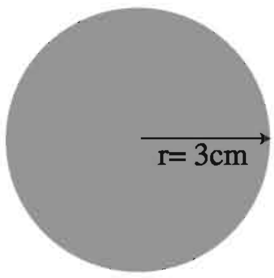
ক. 2.03 cm খ. 2.3 cm

গ. 2.03 mm ঘ. 2.3 mm

নিচের চিত্র হতে ৩নং ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



চিত্র 'ক'



চিত্র 'খ'

৩। খ চিত্রটির আয়তন-

(ক) $\frac{1}{3}\pi r^3$ (খ) $\frac{4}{3}\pi r^3$

(গ) $\frac{3}{4}\pi r^3$ (ঘ) πr^3

৪। ক ও খ চিত্রের আয়তনের অনুপাত -

(ক) 1 : 0.673 (খ) 1 : 0.0673

(গ) 1 : 0.763 (ঘ) 1 : 0.637

৫। তিনটি বিবৃতি দেওয়া হল-

i. ভর পরিমাপে ব্যবহৃত সংকর ধাতুর তৈরি সিলিন্ডারটির ব্যাস 3.9 cm এবং উচ্চতা 3.9 cm.

ii. পানির ত্রৈধ বিন্দুর তাপমাত্রার $\frac{1}{273}$ ভাগকে এক কেলভিন বলে

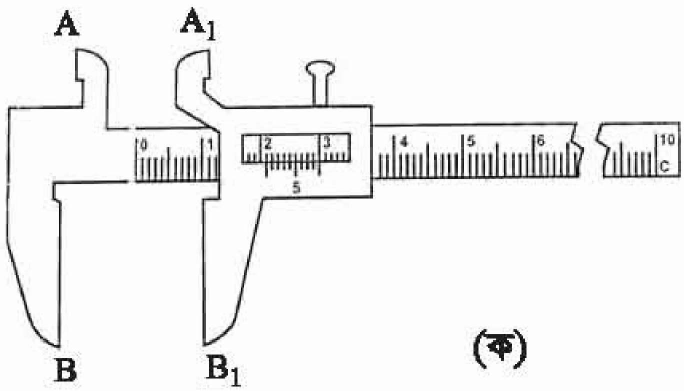
iii. সিজিয়াম- 133 পরমাণু 1 সেকেন্ডে 9192631770 টি স্পন্দন সম্পন্ন করে।

বিবৃতি তিনটির আলোকে নিচের কোনটি সঠিক

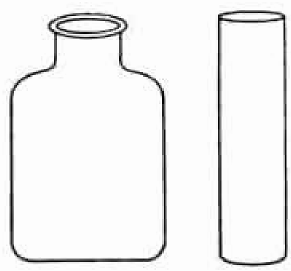
ক. i খ. ii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন



(ক)



(খ)

প্রদর্শিত চিত্রের আলোকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ক. 'ক' চিত্রে প্রদর্শিত যন্ত্রের নাম কী?

খ. 'ক' চিত্রের AA_1 ও BB_1 অংশের পার্থক্য লিখ।

গ. 'ক' নং যন্ত্রের সাহায্যে কীভাবে 'খ' নং চিত্রের অন্তঃব্যাস নির্ণয় করা যায়।

ঘ. বাস্তব জীবনে 'ক' চিত্রে প্রদর্শিত যন্ত্রটি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।

তৃতীয় অধ্যায়

গতি

MOTION

পদার্থবিজ্ঞানের একটি প্রধান শাখা হচ্ছে বলবিজ্ঞান–যেখানে বলের ক্রিয়াধীন বস্তুর স্থিতি ও গতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ অধ্যায়ে আমরা বলবিজ্ঞানের কিছু প্রাথমিক ধারণা আলোচনা করব। গতি সংক্রান্ত বিভিন্ন রাশির সংজ্ঞা, মাত্রা ও একক; পারস্পরিক সম্পর্কসূচক গতির সমীকরণ, নিউটনের গতি বিষয়ক সূত্রাবলি বিশদভাবে আলোচিত হবে এ অধ্যায়ে। বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হচ্ছে ভরবেগের সংরক্ষণ। এটি নিয়েও আলোচনা করা হবে এ অধ্যায়ের শেষ দিকে।

৩.১। স্কেলার রাশি ও ভেক্টর রাশি

Scalars and Vectors

ভৌতজগতে যা কিছু পরিমাপ করা যায় তাকেই রাশি বলে। যেমন কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য, ভর, আয়তন, ঘনত্ব ইত্যাদি পরিমাপ করা যায়। এগুলো সবই রাশি। কোনো রাশি যখন পরিমাপ করা হয় তখন তার একটি মান থাকে। এ মান প্রকাশ করতে আমরা একটি সংখ্যা এবং একটি একক ব্যবহার করি। যেমন, আমরা যদি বলি রণির উচ্চতা 1.5 মিটার, তাহলে বুঝা যায় দৈর্ঘ্যের একক মিটার, আর রণির উচ্চতা তার 1.5 গুণ। কিন্তু কেবল মান দিয়েই সকল রাশিকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায় না। যেমন, আমরা যদি বলি একটি গাড়ি ঘণ্টায় 30 কিলোমিটার বেগে চলছে, তাহলে এটা বুঝা যাবে যে গাড়িটি এক ঘণ্টায় 30 km দূরত্ব অতিক্রম করেছে, কিন্তু গাড়িটি কোন দিকে সে দূরত্ব অতিক্রম করেছে, তা জানা যাবে না। গাড়িটির গতির প্রকৃত অবস্থা বুঝতে হলে গাড়িটির বেগ কোন দিকে সেটাও উল্লেখ করতে হবে। দিকের বিবেচনায় আমরা বস্তু জগতের সকল রাশিকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি; যথা –

১। স্কেলার রাশি

২। ভেক্টর রাশি।

স্কেলার রাশি : যে সকল ভৌত রাশিকে শুধু মান দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায়, দিক নির্দেশের প্রয়োজন হয় না তাদেরকে স্কেলার রাশি বলে। দৈর্ঘ্য, ভর, দ্রুতি, কাজ, শক্তি, সময়, তাপমাত্রা ইত্যাদি স্কেলার রাশির উদাহরণ।

ভেক্টর রাশি : যে সকল ভৌত রাশিকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করার জন্য মান ও দিক উভয়ের প্রয়োজন হয় তাদেরকে ভেক্টর রাশি বলে। যেমন – সরণ, ওজন, বেগ, ত্বরণ, বল, তড়িৎ তীব্রতা, চৌম্বক তীব্রতা ইত্যাদি।

৩.১ সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে প্রতিটি ভেক্টরকে মান ও দিক দিয়ে আর স্কেলার রাশিগুলোকে কেবল মান দিয়ে নির্দেশ করা হয়েছে।

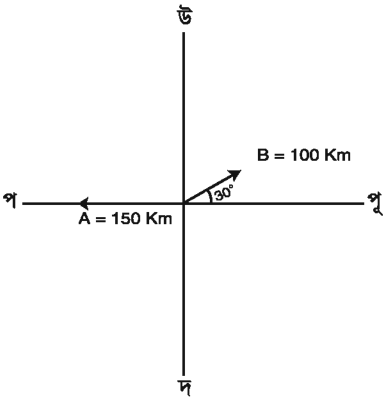
সারণি ৩.১ : স্কেলার ও ভেক্টর রাশির উদাহরণ

স্কেলার রাশি			ভেক্টর রাশি		
নাম	সংকেত	উদাহরণ	নাম	সংকেত	উদাহরণ
দূরত্ব	d	40m	সরণ	**s**	40m পূর্ব দিকে
দ্রুতি	v	$30ms^{-1}$	বেগ	**V**	$30ms^{-1}$ উত্তর দিকে
সময়	t	15s	বল	**F**	100 N উপরের দিকে
শক্তি	E	2000J	ত্বরণ	**a**	$98\ ms^{-2}$ নিচের দিকে

ভেক্টর রাশির নির্দেশনা

Representation of a Vector

কোনো রাশির সংকেতের উপর তীর চিহ্ন দিয়ে ভেক্টর রাশি নির্দেশ করা হয়, যেমন $\vec{A}$ বা $|\vec{A}|$। A ভেক্টর রাশি $\vec{A}$-এর মান নির্দেশ করে। ছাপার ক্ষেত্রে অনেক সময় $\vec{A}$-এর বদলে বোল্ড হরফ **A** দিয়ে ভেক্টর এবং সাধারণ হরফ A দিয়ে রাশিটির মান প্রকাশ করা হয়।

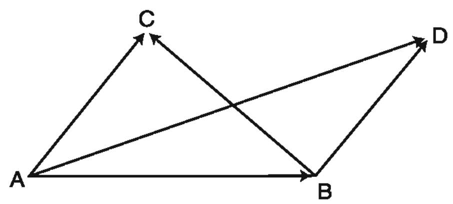


চিত্র : ৩.১

চিত্রে কোনো ভেক্টর রাশিকে একটি তীর চিহ্নিত সরলরেখা দ্বারা নির্দেশ করা হয়। সরল রেখার দৈর্ঘ্য রাশিটির মান এবং তীর চিহ্ন এর দিক নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ ৩.১ চিত্রে সরণ 50 km কে 1 cm দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। সুতরাং ঐ চিত্রে A ভেক্টরটি যার দৈর্ঘ্য 3 cm, সেটি পশ্চিম দিকে 150 km সরণ নির্দেশ করে। B ভেক্টরটি পূর্বদিকের সাথে 30° কোণে উত্তর দিকে 100 km সরণ নির্দেশ করে।

ভেক্টর রাশির যোগ ও বিয়োগ

দুই বা ততোধিক এক জাতীয় ভেক্টর রাশি যোগ করলে একটি নতুন ভেক্টর রাশি পাওয়া যায়। এ নতুন রাশিটিকে দুই বা ততোধিক ভেক্টর রাশির লব্ধি বলে। আর যে ভেক্টরগুলো যোগ করে লব্ধি ভেক্টর পাওয়া যায় তাদের প্রত্যেককে লব্ধি ভেক্টরের উপাংশ বলে। যোগের জন্য ভেক্টর রাশি দুটি অবশ্যই একই জাতীয় হতে হবে। বেগ, ত্বরণ ইত্যাদি ভেক্টর রাশি। বেগের সাথে বেগ কিংবা ত্বরণের সাথে ত্বরণের যোগ সম্ভব। কিন্তু বেগের সাথে ত্বরণের যোগ সম্ভব নয়। এ কথাটি অবশ্য স্কেলার রাশির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেমন তাপমাত্রার সাথে শক্তির যোগ সম্ভব নয়।



চিত্র : ৩.২

দুটি স্কেলার রাশির যোগ সাধারণ বীজগণিতের সূত্রানুসারে করা যায়, যেমন $4 + 3 = 7$। কিন্তু দুটি ভেক্টর রাশির যোগ এভাবে করা যায় না। দুটি ভেক্টর রাশির যোগফল শুধু রাশিগুলোর মানের ওপর নির্ভর করে না, তাদের মধ্যবর্তী কোণের ওপরও নির্ভর করে। ধরা যাক, একটি কণা A থেকে 4 cm সরে B-তে গেল (চিত্র ৩.২)। এরপর BC বরাবর সে 3cm. দূরত্ব অতিক্রম করে। তাহলে কণাটির সরণ হল AC। আর যদি কণাটি AB এরপর BC বরাবর না গিয়ে BD বরাবর 3 cm দূরত্ব অতিক্রম করে, তাহলে তার সরণ হবে AD। চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে AC ও AD সমান নয়, অর্থাৎ, এখানে রাশি দুটির মানের সাথে দিক জড়িত থাকায় তাদের যোগ সাধারণ গাণিতিক নিয়মে $4 + 3 = 7$ হল না। দুটি ভেক্টর রাশির মান যদি 4 cm এবং 3 cm হয় তবে তাদের মধ্যবর্তী কোণের ওপর নির্ভর করে যোগফলের মান 1 cm থেকে শুরু করে 7 cm পর্যন্ত যে কোনো সংখ্যা হতে পারে। কাজেই ভেক্টর রাশির যোগ সাধারণ বীজগাণিতিক নিয়মে করা যায় না, তা জ্যামিতিক উপায়ে করতে হয়।

ভেক্টর রাশি ও স্কেলার রাশির পার্থক্য

ভেক্টর রাশি	স্কেলার রাশি
১. যে সকল ভৌত রাশিকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করার জন্য মান ও দিক উভয়ের প্রয়োজন হয় তাদেরকে ভেক্টর রাশি বলে। যেমন– সরণ, বেগ, ওজন	১. যে সকল ভৌত রাশিকে শুধু মান দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায়, দিক নির্দেশের প্রয়োজন হয় না তাদেরকে স্কেলার রাশি বলে। যেমন– দৈর্ঘ্য, দ্রুতি, ভর।
২. শুধু মান অথবা শুধু দিক অথবা উভয়ের পরিবর্তন হলে ভেক্টর রাশির পরিবর্তন হয়।	২. শুধু মানের পরিবর্তন হলে স্কেলার রাশির পরিবর্তন হয়।
৩. ভেক্টর রাশির যোগ, বিয়োগ, গুণ ইত্যাদি বীজগণিতের নিয়মে হয় না।	৩. স্কেলার রাশির যোগ, বিয়োগ, গুণ ইত্যাদি বীজগণিতের নিয়মানুসারে হয়।

৩.২ স্থিতি ও গতি

Rest and Motion

স্থিতি : সময়ের পরিবর্তনের সাথে পরিপার্শ্বের সাপেক্ষে যখন কোনো বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে না তখন ঐ বস্তুকে স্থিতিশীল বা স্থির বলে। আর এ অবস্থান অপরিবর্তিত থাকাকে বলে স্থিতি।

গতি : সময়ের পরিবর্তনের সাথে পরিপার্শ্বের সাপেক্ষে যখন কোনো বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে তখন তাকে গতিশীল বলা হয়। আর অবস্থানের এ পরিবর্তনের ঘটনাকে গতি বলে।

[**পরম স্থিতি ও পরম গতি :** কোনো বস্তু স্থিতিশীল না গতিশীল তা বুঝার জন্য বস্তুর আশপাশ থেকে আর একটা বস্তুকে নিতে হবে যাকে আমরা প্রসঙ্গ বস্তু (Reference object) বলতে পারি। এ প্রসঙ্গ বস্তু ও আমাদের আলোচ্য বস্তুর পারস্পরিক অবস্থান যদি সময়ের সাথে অপরিবর্তিত থাকে তাহলে আলোচ্য বস্তুটি প্রসঙ্গ বস্তুটির সাপেক্ষে স্থির বলে ধরা হয়। আলোচ্য বস্তু ও প্রসঙ্গ বস্তু যদি একই দিকে একই বেগে চলতে থাকে তাহলেও কিন্তু সময়ের সাথে বস্তুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বের কোনো পরিবর্তন ঘটবে না, যদিও প্রকৃতপক্ষে বস্তুটি গতিশীল। চলন্ত ট্রেনের কামরার দুই বন্ধু যদি মুখোমুখি বসে থাকে, তবে একজনের সাপেক্ষে অন্যের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয় না। সুতরাং স্থিতিশীল বলা যেতে পারে। সেরূপ পরম স্থিতিশীল প্রসঙ্গ বস্তুর সাপেক্ষে কোনো বস্তুর গতিকে আমরা পরম গতি বলি। কিন্তু এ মহাবিশ্বে এমন কোনো প্রসঙ্গ বস্তু পাওয়া সম্ভব নয় যা প্রকৃতপক্ষে স্থির রয়েছে কারণ পৃথিবী প্রতিনিয়ত সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, সূর্য ও তার গ্রহ, উপগ্রহ নিয়ে নভোমণ্ডলের চারদিকে ঘুরছে। কাজেই আমরা যখন কোনো বস্তুকে স্থিতিশীল বা গতিশীল বলি, তা আমরা কোনো আপাত স্থিতিশীল বস্তুর সাপেক্ষে বলে থাকি। কাজেই আমরা বলতে পারি এ মহাবিশ্বের সকল স্থিতিই আপেক্ষিক–সকল গতিই আপেক্ষিক। কোনো গতিই পরম নয়, পরম নয় কোনো স্থিতিই।]

৩.৩। দূরত্ব ও সরণ

Distance and Displacement

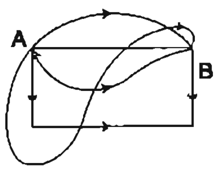
ধরা যাক, অভি তার স্কুলের গেট থেকে 100 m দৌড়ে গেল। সুতরাং অভি তার অবস্থানের পরিবর্তন করল। যদি প্রশ্ন করা যায় অভি এখন কোথায় আছে ? উত্তরে হয়তো অনেকেই বলবে 100m দূরে আছে। উত্তরটা আংশিক ঠিক, অভি গেট থেকে 100m দূরে আছে সত্য, কিন্তু ঠিক কোন জায়গায় আছে তা বলা যাবে না। কেননা অভি গেট থেকে উত্তর,

দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম বা অন্য যে কোনো দিকে 100m দূরে থাকতে পারে। অভির অবস্থানের পরিবর্তন সঠিকভাবে জানতে হলে অভি কোন দিকে 100m দূরে গেছে তা জানতে হবে। যদি বলা হয় অভি গেট থেকে 100m পূর্বদিকে দৌড়ে গেছে, তাহলে নিশ্চিতভাবে অভির অবস্থান জানা যাবে। গেট থেকে সোজা পূর্ব দিকে 100m গেলেই অভিকে পাওয়া যাবে। প্রথম ক্ষেত্রে আমরা অভির অবস্থানের পরিবর্তন বুঝাবার জন্য যে রাশিটি ব্যবহার করেছি তা হল দূরত্ব। এটি একটি স্কেলার রাশি। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমরা দূরত্বের সাথে সাথে দিকও উল্লেখ করেছি–সেটি সরণ। এটি একটি ভেক্টর রাশি। একটি নির্দিষ্ট দিকে যে দূরত্ব বা অবস্থানের পরিবর্তন তা হল সরণ।

নির্দিষ্ট দিকে বস্তুর পারিপার্শ্বিকের সাপেক্ষে অবস্থানের পরিবর্তনকে সরণ বলে।

কোনো বস্তুর আদি অবস্থান ও শেষ অবস্থানের মধ্যবর্তী ন্যূনতম দূরত্ব অর্থাৎ, সরল রৈখিক দূরত্বই হচ্ছে সরণের মান এবং সরণের দিক হচ্ছে বস্তুর আদি অবস্থান থেকে শেষ অবস্থানের দিকে।

সরণ বস্তুর গতিপথের ওপর নির্ভর করে না। কোনো একটি বস্তুর A থেকে B অবস্থানের (চিত্র ৩.৩) বিভিন্ন পথে যেতে পারে। কিন্তু বস্তুটির সরণ হবে A থেকে B এর দিকে। A ও B এর মধ্যবর্তী ন্যূনতম দূরত্ব অর্থাৎ, এক্ষেত্রে AB সরল রৈখিক দূরত্ব হল সরণের মান S = AB এবং দিক হল A থেকে B এর দিকে। যেহেতু সরণের মান ও দিক উভয়ই আছে, কাজেই এটি একটি ভেক্টর রাশি।



চিত্র : ৩.৩

মাত্রা : সরণের মাত্রা হল দৈর্ঘ্যের মাত্রা ।

অতএব, $S = [L]$

একক : সরণের একক হল দৈর্ঘ্যের একক অর্থাৎ, মিটার (m) । কোনো বস্তুর সরণ 50 m উত্তর দিকে বলতে বুঝায় বস্তুটি তার আদি অবস্থান থেকে 50 m উত্তর দিকে সরে গেছে।

৩.৪। দ্রুতি ও বেগ

Speed and Velocity

(ক) **দ্রুতি** : আগের অনুচ্ছেদের উদাহরণে অভি যদি এ 100 মিটার দূরত্ব 50 সেকেন্ডে পার হয়ে থাকে তাহলে সে প্রতি সেকেন্ডে 2 মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছে। আমরা বলি তার দ্রুতি 2 মিটার/ সেকেন্ড। সে কত দ্রুত এ দূরত্ব অতিক্রম করেছে তা বুঝার জন্য আমরা দ্রুতি শব্দ ব্যবহার করেছি। দ্রুতি বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তনের হার নির্দেশ করে । সময়ের সাথে কোনো বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তনের হারকে দ্রুতি বলে।

$$\text{দ্রুতি} = \frac{\text{দূরত্ব}}{\text{সময়}}$$

কোনো বস্তু যদি t সময়ে d দূরত্ব অতিক্রম করে,

$$\text{তাহলে দ্রুতি}, v = \frac{d}{t} \quad \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots (৩.১)$$

দ্রুতি দ্বারা অবস্থানের পরিবর্তনের হার কোন দিকে ঘটেছে তা জানা যায় না, ফলে দ্রুতির কোনো দিক নেই। সুতরাং দ্রুতি একটি স্কেলার রাশি। কোনো বস্তুর গতিকালে যদি কখনো দ্রুতির মানের কোনো পরিবর্তন না হয় অর্থাৎ, বস্তুটি যদি সর্বদা সমান সময়ে সমান দূরত্ব অতিক্রম করে তাহলে ঐ বস্তুর দ্রুতিকে সুষম দ্রুতি বলে। আর যদি সমান সময়ে বস্তু সমান দূরত্ব অতিক্রম না করে তাহলে সে দ্রুতিকে অসম দ্রুতি বলে।

বস্তু যদি সুষম দ্রুতিতে না চলে তাহলে তার অতিক্রান্ত দূরত্বকে সময় দিয়ে ভাগ করলে গড় দ্রুতি পাওয়া যায়।

সুতরাং গড় দ্রুতি = $\frac{\text{মোট দূরত্ব}}{\text{সময়}}$

আবার, অভির কথা ধরা যাক। অভি 50 সেকেন্ডে 100 মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছে। তাই তার গড় দ্রুতি প্রতি সেকেন্ডে 2 মিটার। এখানে গড় দ্রুতি বলার কারণ অভি যে তার চলার পথে প্রত্যেক সেকেন্ডে 2 মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছে এমন কোনো কথা নেই। সে কখনও এর চেয়ে দ্রুত গিয়ে থাকতে পারে আবার এর চেয়ে আস্তেও চলতে পারে। মোট কথা, সে প্রতি এক সেকেন্ডে গড়ে 2 মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছে।

আমরা যদি কোনো একটি বিশেষ মুহূর্তে তার দ্রুতি জানতে চাই, যেমন তার চলা শুরু করার ঠিক 21 সেকেন্ড পূর্ণ হওয়ার মুহূর্তে তার দ্রুতি কত ছিল তাহলে সেটা হবে তার ঐ মুহূর্তের সত্যিকার দ্রুতি বা তাৎক্ষণিক দ্রুতি। সেটা শূন্যও হতে পারে, যেমন, ঐ সময় জিরিয়ে নেওয়ার জন্য অভি যদি দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে ঐ সময় সে কোনো দূরত্ব অতিক্রম করেনি, তাই তার দ্রুতি শূন্য। কোনো মুহূর্তের তাৎক্ষণিক দ্রুতি পেতে হলে ঐ মুহূর্তে খুব ক্ষুদ্র সময় ব্যবধান দিয়ে বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্ব জেনে তাকে সময় ব্যবধান দিয়ে ভাগ করতে হবে। খুব ক্ষুদ্র সময় ব্যবধান Δt তে যদি বস্তুর দূরত্বের পরিবর্তন Δd হয় তাহলে তাৎক্ষণিক দ্রুতি $v = \frac{\Delta d}{\Delta t}$।

Δ (ডেল্টা) প্রতীক চিহ্নটি Δ এর পরে স্থাপিত রাশিটির পরিবর্তন নির্দেশ করে। যেমন Δd (পড়তে হল "ডেল্টা d") দূরত্বের পরিবর্তন বুঝায় এবং Δt (পড়তে হয় "ডেল্টা t") সময়ের পরিবর্তন নির্দেশ করে। Δd বা Δt কিন্তু Δ এবং d বা Δ এবং t এর গুণফল নয়, এগুলো এক একটি প্রতীক। Δd এর একক হল d এর একক (যেমন মিটার) এবং Δt এর একক হল t এর একক (যেমন সেকেন্ড)।

মাত্রা : দ্রুতির মাত্রা হল $\frac{\text{দূরত্ব}}{\text{সময়}}$ এর মাত্রা।

$$\therefore [v] = \left[\frac{L}{T}\right] = [LT^{-1}]$$

একক : দ্রুতির একক $\frac{\text{দূরত্ব}}{\text{সময়}}$ এর একক

অর্থাৎ, বা ms^{-1} । কোনো গাড়ির দ্রুতি 20 ms^{-1} বলতে বুঝায় গাড়িটি 1s–এ 20m পথ অতিক্রম করে।

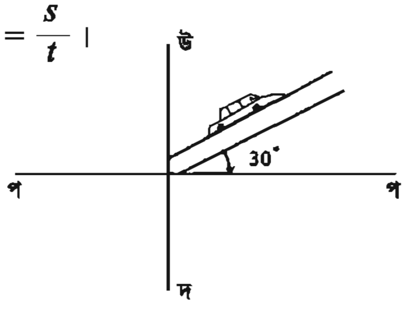
(খ) বেগ (Velocity)

অনেক সময় আমরা সাধারণত কথাবার্তায় বেগ শব্দ ব্যবহার করি এবং অনেকে তা করে থাকি দ্রুতি বুঝাতে। কিন্তু বিজ্ঞানের পরিভাষায় শব্দ দুটি মোটেই এক নয়। দ্রুতি কেবল কোনো বস্তুর দূরত্বের বা অবস্থানের পরিবর্তনের হার নির্দেশ করে, কোনদিকে সে পরিবর্তন হয়েছে তা বুঝায় না। বেগ দূরত্বের পরিবর্তনের হার বুঝাবার পাশাপাশি কোন দিকে সে পরিবর্তন ঘটে তাও নির্দেশ করে অর্থাৎ, নির্দিষ্ট দিকে দূরত্বের পরিবর্তনের হার তথা সরণের হারকে বুঝায়। সুতরাং সময়ের সাথে কোনো বস্তুর সরণের হারকে বেগ বলে অর্থাৎ, বস্তু নির্দিষ্ট দিকে একক সময়ে যে পথ অতিক্রম করে তাই বেগ।

যদি কোনো বস্তু t সময়ে নির্দিষ্ট দিকে s দূরত্ব অতিক্রম করে তাহলে বেগ $v = \frac{s}{t}$ ।

মাত্রা : বেগের মাত্রা ও দ্রুতির মাত্রা একই অর্থাৎ, $\{LT^{-1}\}]$

একক : বেগের একক ও দ্রুতির একক একই অর্থাৎ, ms^{-1}।
বেগের মান ও দিক দুইই আছে। তাই বেগ একটি ভেক্টর রাশি। উদাহরণ হিসেবে একটি রাস্তার কথা ধরা যাক। রাস্তাটি কোনো স্থানে পূর্বদিকের সাথে 30° কোণ করে সোজা উত্তর দিকে চলে গেছে (চিত্র ৩.৪) সেই রাস্তায় যদি



চিত্র : ৩.৪

একটি গাড়ি 20 kmh^{-1} সমদ্রুতিতে চলে তাহলে আমরা সঠিকভাবেই বলতে পারবো গাড়িটির বেগ পূর্ব দিকের সাথে 30° কোণে উত্তর দিকে 20 kmh^{-1}। কিন্তু যদি ঐ গাড়িটিই একটি বৃত্তাকার পথে 20 kmh^{-1} সমদ্রুতিতেই চলে, তাহলে তার গতির দিক ক্রমাগত পরিবর্তন হবে। সুতরাং এর বেগও ক্রমাগত পরিবর্তন হবে যদিও এর দ্রুতি সব সময় একই থাকবে। বস্তুর বেগের মানই তার দ্রুতি। বেগ দু রকমের হতে পারে যথা – সুষম বেগ এবং অসম বেগ।

সুষম বেগ : যদি গতিশীল কোনো বস্তুর বেগের মান ও দিক অপরিবর্তিত থাকে তাহলে সেই বস্তুর বেগকে সুষম বেগ বলে। শব্দের বেগ সুষম বেগের একটি প্রকৃষ্ট প্রাকৃতিক উদাহরণ। শব্দ নির্দিষ্ট দিকে সব সময় সমান সময়ে সমান পথ অতিক্রম করে আর তা হচ্ছে 0° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বায়ুতে প্রতি সেকেন্ডে 332 m। শব্দ কোনো নির্দিষ্ট দিকে প্রথম সেকেন্ডে 332m, দ্বিতীয় সেকেন্ডে 332 m এবং এরূপ প্রতি সেকেন্ডে 332 m করে চলতে থাকে। এখানে শব্দের বেগের মান ও দিক একই থাকায় শব্দের বেগ 332 ms^{-1} হল সুষমবেগ।

অসম বেগ : কোনো বস্তুর যদি গতিকালে তার বেগের মান বা দিক বা উভয়ের পরিবর্তন ঘটে তাহলে বস্তুর সে বেগকে অসম বেগ বলে। অর্থাৎ, কোনো বস্তু যদি সমান সমান সময়ে সমান সমান দূরত্ব অতিক্রম না করে কিংবা চলার সময় গতির দিক পরিবর্তন করে তাহলে সে বেগ অসম হবে।

দূরত্ব-সময় লেখ থেকে বেগ নির্ণয়
Velocity from Distance-Time graph

জটিলতা পরিহারের জন্য আমরা এ অধ্যায়ে কেবল একমাত্রিক গতি অর্থাৎ, সরল রেখা বরারব চলমান বস্তুর গতি আলোচনা করব। এ ক্ষেত্রে একটি গতিশীল বস্তুর বেগের দিকের পরিবর্তন হবে না, সুতরাং বেগের কেবল মানের পরিবর্তনের জন্য বেগের পরিবর্তন ঘটবে।

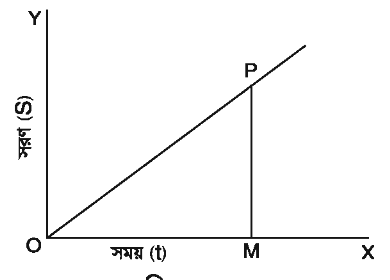
সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে একটি গতিশীল বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে। বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্ব সময়ের ওপর নির্ভর করে। এই সম্পর্ক একটি লেখের (graph) এর মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। এক্ষেত্রে ছক কাগজের (graph paper) X –অক্ষ বরাবর সময় (t) এবং Y– অক্ষ বরাবর অতিক্রান্ত দূরত্ব (s) স্থাপন করা হয়। এ লেখকে দূরত্ব সময়-লেখ বলা হয়। এ লেখ থেকে সহজে বস্তুর বেগ নির্ণয় করা যায়। নিম্নে সুষম বেগ ও অসম বেগের ক্ষেত্রে দূরত্ব-সময় লেখ থেকে বেগ নির্ণয়ের পদ্ধতি আলোচনা করা হল।

১. সুষম বেগ

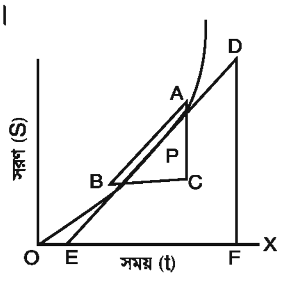
যখন একটি বস্তু সুষম বেগে চলে তখন সেটি সমান সময়ে সমান দূরত্ব অতিক্রম করে। সুতরাং X–অক্ষের দিকে সময় (t) এবং Y অক্ষের দিকে দূরত্ব (s) দিয়ে দূরত্ব-সময় লেখ আঁকলে সেটি একটি সরল রেখা হবে (চিত্র ৩.৫) এখন আমরা এই লেখের ওপর যে কোনো একটি বিন্দু P নেই। P থেকে X-অক্ষের ওপর PM লম্ব টানি। তাহলে যে কোনো সময় t = OM এর জন্য অতিক্রান্ত দূরত্ব s = PM পাওয়া যায়।

সুতরাং বেগ $= \frac{\text{দূরত্ব}}{\text{সময়}} = \frac{PM}{OM}$

$\frac{PM}{OM}$ কে OP রেখার নতি (gradient) বা ঢাল (slope) বলে।



চিত্র : ৩.৫



চিত্র : ৩.৬

২. অসম বেগের ক্ষেত্রে

৩.৬ চিত্রে অসমবেগে গতিশীল একটি বস্তুর দুরত্ব-সময় লেখ দেখানো হল। যেহেতু এক্ষেত্রে বস্তুটি সমান সময়ে সমান দূরত্ব অতিক্রম করে না তাই লেখটি সরল রেখা হবে না। এটি একটি বক্ররেখা হবে। যেহেতু এ ক্ষেত্রে বস্তুটি সুষম বেগে চলছে না, কাজেই গতিকালের সকল মুহূর্তে এর বেগ সমান হয় না। ধরা যাক কোনো একটি বিশেষ মুহূর্তে বস্তুটির বেগ বের করতে হবে, যাকে বক্র রেখাটিতে P বিন্দু দিয়ে নির্দেশ করা হয়েছে। P বিন্দুতে বেগ নির্ণয় করতে হলে আমাদেরকে একটি অতি ক্ষুদ্র সমকোণী ত্রিভুজ ABC বিবেচনা করতে হবে যার অতিভুজ AB এত ক্ষুদ্র যে এটি P বিন্দুর অতি সন্নিকটে বক্ররেখার সাথে কার্যত মিলে যায়। অন্য কথায়, আমরা এ বক্ররেখার একটি খন্ডাংশ বিবেচনা করছি যেটি সরলরেখা রূপে গণ্য করার মত যথেষ্ট ক্ষুদ্র।

তাহলে, P বিন্দুতে বেগ = $\frac{\text{AC দ্বারা নির্দেশিত দূরত্ব}}{\text{BC দ্বারা নির্দেশিত সময় ব্যবধান}}$

বা, $v = \frac{AC}{BC}$

কিন্তু এত ছোট ত্রিভুজ বিবেচনা করে তার থেকে পরিমাপ করে সঠিক ফল পাওয়া মুশকিল। তাই আমরা P বিন্দুতে ED স্পর্শক আঁকি এবং ABC ত্রিভুজ এর সদৃশ কিন্তু অপেক্ষাকৃত বড় ত্রিভুজ DEF অঙ্কন করি।

এখন ত্রিভুজ ABC এবং ত্রিভুজ DEF থেকে পাই, $\frac{AC}{BC} = \frac{DF}{EF}$

$v = \frac{DF}{EF}$

কিন্তু $\frac{DF}{EF}$ হল ED এর ঢাল।

সুতরাং P বিন্দুতে বেগ হল ঐ বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের ঢাল । তাই বলা যায় দূরত্ব–সময় লেখের যে কোনো বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের ঢাল ঐ বিন্দুতে বেগ নির্দেশ করে।

দ্রুতি ও বেগের পার্থক্য

দ্রুতি	বেগ
১। সরল বা বক্রপথে সময়ের সাথে বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তনের হারকে দ্রুতি বলে	১। সময়ের সাথে বস্তুর সরণের হারকে বেগ বলে
২। দ্রুতি স্কেলার রাশি।	২। বেগ ভেক্টর রাশি।
৩। শুধু মানের পরিবর্তন হলে দ্রুতির পরিবর্তন হয়।	৩। শুধু মানের কিংবা শুধু দিকের অথবা উভয়ের পরিবর্তন হলে বেগের পরিবর্তন হয়।
৪। বস্তুর বেগের মানই দ্রুতি।	৪। নির্দিষ্ট দিকে দ্রুতিই বেগ।

৩.৫। ত্বরণ
Acceleration

কোনো বস্তু যদি সুষম বেগে না চলে তাহলে বস্তুর বেগের মানের কিংবা দিকের বা উভয়ের পরিবর্তন হতে পারে। বস্তুর বেগের পরিবর্তন হলে আমরা বলি বস্তুর ত্বরণ হচ্ছে।

সময়ের সাথে বস্তুর অসম বেগের পরিবর্তনের হারকে ত্বরণ বলে।

কোনো বস্তুর আদি বেগ যদি u হয় এবং t সময় পরে তার শেষ বেগ যদি v হয় তাহলে,

t সময়ের বেগের পরিবর্তন = v - u

$\therefore$ একক সময়ে বেগের পরিবর্তন = $\frac{v-u}{t}$

$\therefore$ বেগ পরিবর্তনের হার, অর্থাৎ, ত্বরণ, $a = \frac{v-u}{t}$ ... ... (৩.২)

সুতরাং ত্বরণ = $\frac{\text{বেগের পরিবর্তন}}{\text{সময়}}$

সরল পথে চলমান বস্তুর সময়ের সাথে বেগ বৃদ্ধির হারকে ধনাত্মক ত্বরণ এবং সময়ের সাথে বস্তুর বেগ হ্রাসের হারকে ঋণাত্মক ত্বরণ ধরা হয়। অনেক সময় ঋণাত্মক ত্বরণকে মন্দন (retardation) বলা হয়।

মাত্রা : ত্বরণের মাত্রা হল $\frac{\text{বেগ}}{\text{সময়}}$ এর মাত্রা

অর্থাৎ, ত্বরণ= $\frac{\text{বেগ}}{\text{সময়}} = \frac{\text{বেগ}}{\text{সময় X সময়}} = \frac{\text{সরণ}}{\text{সময়}^{২}}$

$$[a] = \frac{L}{T^2} = [LT^{-2}]$$

একক : ত্বরণের একক হল $\frac{\text{বেগ}}{\text{সময়}}$ এর একক।

অর্থাৎ, $\frac{ms^{-1}}{s}$ বা ms^{-2} ।

কোনো বস্তুর ত্বরণ 6 ms^{-2} দক্ষিণ দিকে বলতে বুঝায় বস্তুটির বেগ দক্ষিণ দিকে 1s–এ 6ms^{-1} বৃদ্ধি পায়।

ত্বরণ দুরকমের হতে পারে, যথা– সুষম ত্বরণ ও অসম ত্বরণ।

সুষম ত্বরণ ও অসম ত্বরণ : কোনো বস্তুর বেগ যদি নির্দিষ্ট দিকে সব সময় একই হারে বাড়তে থাকে তাহলে সে ত্বরণকে সুষম ত্বরণ বলে। আর বেগ বৃদ্ধির হার যদি সমান না থাকে, তাহলে সে ত্বরণকে অসম ত্বরণ বলা হয়।

সুষম ত্বরণের একটি উদাহরণ হল অভিকর্ষের প্রভাবে মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তুর ত্বরণ। যদি একটি বস্তু ভূপৃষ্ঠে মুক্তভাবে পড়তে থাকে তখন তার ত্বরণ হয় 9.8 ms^{-2} অর্থাৎ ,বস্তুটি যখন ভূপৃষ্ঠের দিকে আসতে থাকে তখন এর বেগ প্রতি সেকেন্ডে 9.8 ms^{-1} করে বাড়তে থাকে। উচুঁ থেকে একটি বস্তু ছেড়ে দিলে প্রথম সেকেন্ডে এর বেগ বাড়ে 9.8 ms^{-1}, দ্বিতীয় সেকেন্ডেও এর বেগ বাড়ে 9.8 ms^{-1} এরূপ প্রতি সেকেন্ডে এর বেগ 9.8 ms^{-1} করে বাড়তে থাকে। এখানে ভূ-কেন্দ্রের দিকে একই হারে বেগ বাড়তে থাকার দরুন সব সময়ই বস্তুর একই ত্বরণ হচ্ছে, তাই বস্তুটির ত্বরণ সুষম ত্বরণ। ত্বরণের ন্যায় মন্দনও দুরকমের হতে পারে, সমমন্দন ও সুষম মন্দন। খাড়া উপরের দিকে নিক্ষিপ্ত বস্তু সুষম মন্দনে উপরের দিকে ওঠতে থাকে। একটি বস্তুকে যখন খাড়া উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হয় তখন বস্তু যতক্ষণ উপরের দিকে ওঠতে থাকে ততক্ষণ বস্তুটির একই হারে মন্দন হতে থাকে। এ ক্ষেত্রে বস্তুর বেগ প্রতি সেকেন্ডে 9.8 ms^{-1} কমতে থাকে।

উদাহরণ ৩.১। একটি গাড়ির বেগ $10\ ms^{-1}$ থেকে সুষমভাবে বৃদ্ধি পেয়ে $5\ s$ পরে $25\ ms^{-1}$ হয়। গাড়িটির ত্বরণ বের কর।

সমাধান :

আমরা জানি,

$$a = \frac{v - u}{t}$$

বা $$a = \frac{25ms^{-1} - 10ms^{-1}}{5s}$$

$$= \frac{15ms^{-1}}{5s}$$

$$= 3\ ms^{-2}$$

উ: $3\ ms^{-2}$

এখানে,

আদি বেগ $u = 10\ ms^{-1}$

শেষ বেগ $v = 25\ ms^{-1}$

সময়, $t = 5\ s$

ত্বরণ, $a = ?$

উদাহরণ ৩.২। একটি গাড়ির বেগ $27ms^{-1}$ থেকে সুষমভাবে হ্রাস পেয়ে $8\ s$ পরে $11ms^{-1}$ হয়। গাড়িটির ত্বরণ বের কর।

সমাধান :

আমরা জানি,

$$a = \frac{v - u}{t}$$

বা $$= \frac{11ms^{-1} - 27ms^{-1}}{8s}$$

$$= \frac{-16ms^{-1}}{8s}$$

$$= -2\ ms^{-2}$$

এখানে,

আদি বেগ $u = 27\ ms^{-1}$

শেষ বেগ $v = 11\ ms^{-1}$

সময়, $t = 8\ s$

ত্বরণ, $a = ?$

এখানে ঋণাত্মক চিহ্নের অর্থ গাড়িটি তার আদিবেগের বিপরীত দিকে ত্বরিত হচ্ছে। অন্য কথায় গাড়িটির মন্দন হচ্ছে।
উ: $-2\ ms^{-2}$

বেগ–সময় লেখ থেকে ত্বরণ নির্ণয়

Acceleration from Velocity - Time Graph

অসম বেগে চলমান বস্তুর বেগ সময়ের ওপর নির্ভর করে। এ সম্পর্ক একটি লেখের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। এ ক্ষেত্রে ছক কাগজের X –অক্ষ বরাবর সময় (t) এবং Y –অক্ষ বরাবর বেগ (v) স্থাপন করা হয়। এ লেখকে বেগ–সময় লেখ বলা হয়। এ লেখ থেকে সহজে ত্বরণ অর্থাৎ, সময়ের সাথে বেগের পরিবর্তনের হার নির্ণয় করা যায়। নিম্নে সুষম ত্বরণের ক্ষেত্রে বেগ-সময় লেখ থেকে ত্বরণ নির্ণয়ের পদ্ধতি আলোচনা করা হল।

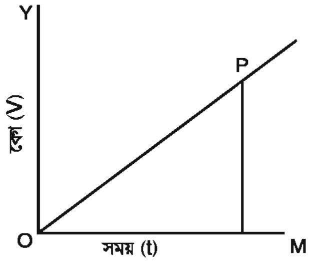
সুষম ত্বরণের ক্ষেত্রে

একটি বস্তু যখন সুষম ত্বরণে চলে তখন তার সমান সময়ে বেগের বৃদ্ধি সমান হয়। সুতরাং X–অক্ষের দিকে সময়

(t) এবং Y–অক্ষের দিকে বেগ (v) দিয়ে বেগ-সময় লেখ আঁকলে সেটি একটি সরল রেখা হবে (চিত্র ৩.৭)। এখন আমরা এ লেখের ওপর যে কোনো একটি বিন্দু P নেই। P থেকে X–অক্ষের ওপর PM লম্ব টানি। তাহলে যে কোনো সময় OM এর জন্য বেগের পরিবর্তন PM পাওয়া যায়।

সুতরাং ত্বরণ, a = $\frac{\text{বেগের পরিবর্তন}}{\text{সময় ব্যবধান}} = \frac{PM}{OM}$

কিন্তু $\frac{PM}{OM}$ হচ্ছে OP এর ঢাল বা নতি।



চিত্র : ৩.৭

বেগ ও ত্বরণের পার্থক্য

বেগ	ত্বরণ
১। সময়ের সাথে বস্তুর সরণের হারকে বেগ বলে।	১। সময়ের সাথে বস্তুর অসম বেগের পরিবর্তনের হারকে ত্বরণ বলে।
২। বেগে মাত্রা : $[LT^{-1}]$	২। ত্বরণের মাত্রা : $[LT^{-2}]$
৩। বেগের একক ms^{-1}	৩। ত্বরণের একক ms^{-2}

৩.৬। গতির সমীকরণ

Equations of Motion

প্রথম সমীকরণ : শেষ বেগ, ত্বরণ এবং গতিকালের সম্পর্ক

v = u + at সমীকরণ প্রতিপাদন

মনে করি কোনো বস্তু u আদিবেগ নিয়ে a সুষম ত্বরণে t সময় চলে v শেষ বেগ প্রাপ্ত হয়।

সুতরাং t সময়ে বেগের পরিবর্তন হয় v – u । আমরা জানি বেগের পরিবর্তনের হারই ত্বরণ।

$\therefore \quad a = \frac{v - u}{t}$

বা, $v - u = at$

বা, $v = u + at$ ... ... (৩.৩)

অর্থাৎ, শেষবেগ = আদিবেগ + ত্বরণ × গতিকাল

[বিশেষ ক্ষেত্র : যদি কোনো বস্তুর আদি বেগ না থাকে অর্থাৎ, স্থির অবস্থান থেকে চলে তাহলে

$u = 0$

$\therefore v = at$ .... (1)

যেহেতু ত্বরণ a ধ্রুব তাই (1) সমীকরণ থেকে দেখা যায় যে,

$\therefore v \propto t$

অর্থাৎ, স্থির অবস্থান থেকে সুষম ত্বরণে চলমান বস্তুর যে কোনো সময়ে বেগ সময়ের সমানুপাতিক।]

দ্বিতীয় সমীকরণ : সরণ, শেষবেগ ও গতিকালের সম্পর্ক

$s = \left(\frac{u+v}{2}\right) t$ সমীকরণ প্রতিপাদন

মনে করি কোনো বস্তু u আদিবেগ নিয়ে সুষম ত্বরণে চলে s দূরত্ব অতিক্রম করে অর্থাৎ, বস্তুটির সরণ হয় s । যেহেতু বস্তুটি সুষম ত্বরণে চলে, তাই এর গড় বেগ হবে এর আদিবেগ ও শেষ বেগের গাণিতিক গড়ের সমান,

অর্থাৎ, গড় বেগ $= \frac{v+u}{2}$

আবার, আমরা জানি, গড় বেগ $= \frac{\text{সরণ}}{\text{সময়}} = \frac{s}{t}$

সুতরাং উপরিউক্ত সমীকরণ দুটি থেকে আমরা পাই

$\frac{s}{t} = \frac{v+u}{2}$

বা, $s = \left(\frac{u+v}{2}\right) t$ ... ... (৩.৪)

তৃতীয় সমীকরণ : সরণ, ত্বরণ ও গতিকালের সম্পর্ক

$\mathbf{s = ut + \frac{1}{2} at^2}$ সমীকরণ প্রতিপাদন

মনে করি কোনো বস্তু u আদিবেগ নিয়ে a সুষম ত্বরণে চলে t সময়ে v শেষ বেগ প্রাপ্ত হয়। মনে করি এ সময়ে বস্তুটি s দূরত্ব অতিক্রম করে অর্থাৎ, বস্তুটির সরণ হয় s । তাহলে বস্তুর গড় বেগ $\bar{v}$ হবে।

$\bar{v} = \frac{s}{t}$

বা, $s = \bar{v}\, t$ ... ... (1)

আবার বস্তুটি সুষম ত্বরণে চলে বলে গড় বেগ হবে এর আদি বেগ ও শেষ বেগের গাণিতিক গড়ের সমান,

অর্থাৎ $\bar{v} = \frac{u+v}{2}$ ... ... (2)

(1) সমীকরণে এ মান বসিয়ে আমরা পাই,

$s = \frac{u+v}{2} t$ ... ... (3)

আবার আমরা জানি সময়ের সাথে অসম বেগের পরিবর্তনের হারকে ত্বরণ বলে, অর্থাৎ,

$a = \frac{u - v}{t}$

বা, $v - u = at$

বা, $v = u + at$

v এর এ মান (3) সমীকরণে বসিয়ে আমরা পাই

$s = \left(\frac{u+u+at}{2}\right) \times t$

বা $s = ut + \frac{1}{2} at^2$ ... ... (৩.৫)

অর্থাৎ দূরত্ব = আদি বেগ × গতি কাল + $\frac{1}{2}$ ত্বরণ × (গতিকাল)২

*[বিশেষ ক্ষেত্র : শুরুতে বস্তু স্থির থাকলে $u = 0$

$\therefore S = \frac{1}{2} at^2$ .... (4)

যেহেতু ত্বরণ ধ্রুব তাই (4) সমীকরণ থেকে দেখা যায়

$S \propto t^2$

অর্থাৎ, স্থির অবস্থান থেকে সুষম ত্বরণে চলমান বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্ব সময়ের বর্গের সমানুপাতিক।]

চতুর্থ সমীকরণ : সরণ, ত্বরণ ও শেষ বেগের সম্পর্ক

$v^2 = u^2 + 2as$ সম্পর্ক প্রতিপাদন

মনে করি কোনো বস্তু u আদি বেগ নিয়ে a সুষম ত্বরণে t সময় চলে v শেষ বেগ প্রাপ্ত হয়। এ সময়ে বস্তুটি s দূরত্ব অতিক্রম করে, অর্থাৎ, বস্তুটির সরণ হয় s। তাহলে বস্তুর গড় বেগ $\bar{v}$ হবে,

$\bar{v} = \frac{s}{t}$

বা, $s = \bar{v}\, t$ ... . (1)

আবার, বস্তুটি সুষমে ত্বরণে চলে বলে এর গড় বেগ হবে এর আদি বেগ ও শেষ বেগের গাণিতিক গড়ের সমান,

অর্থাৎ, $\bar{v} = \frac{u+v}{2}$ ... . (2)

(1) সমীকরণে এ মান বসিয়ে আমরা পাই,

$s = \left(\frac{u+v}{2}\right) t$ ... . (3)

আবার, আমরা জানি সময়ের সাথে অসম বেগের পরিবর্তনের হারকে ত্বরণ বলে, অর্থাৎ

$a = \frac{v-u}{t}$ বা, $t = \frac{v-u}{a}$ $\therefore$ t - এর এই মান (3) সমীকরণে বসিয়ে আমরা পাই,

$s = \frac{(u+v)}{2} \times \frac{(v-u)}{a}$

$s = \frac{v^2 - u^2}{2a}$

বা, $v^2 - u^2 = 2as$

$\therefore v^2 = u^2 + 2as$ ... ... (৩.৬)

*[বিশেষ ক্ষেত্র : শুরুতে বস্তু স্থির থাকলে, $u = 0$

$\therefore v^2 = 2as$ ... ... (4)

যেহেতু ত্বরণ a ধ্রুব তাই (4) সমীকরণ থেকে দেখা যায়

$v^2 \propto s$

$v \propto \sqrt{s}$

অর্থাৎ, স্থির অবস্থান থেকে সমত্বরণে বস্তুর যে কোনো সময়ের বেগ বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্বের বর্গমূলের সমানুপাতিক]

উদাহরণ ৩.৩। $72\ kmh^{-1}$ বেগে চলন্ত একটি গাড়িতে 6s যাবত $1.5ms^{-2}$ ত্বরণ প্রয়োগ করা হল। গাড়িটির শেষ বেগ কত এবং ত্বরণ কালে কত দূরত্ব অতিক্রম করবে?

সমাধান :

আমরা জানি,

$v = u + at$

বা, $v = 20\ ms^{-1} + 1.5\ ms^{-2} \times 6s$

$= 20\ ms^{-1} + 9ms^{-1}$

$= 29ms^{-1}$

আবার, $s = ut + \frac{1}{2}at^2$

$= 20\ ms^{-1} \times 6s + \frac{1}{2} \times 1.5ms^{-2} \times (6s)^2$

$= 120m + 27m$

$=147\ m$

উ: শেষ বেগ $29\ ms^{-1}$, দূরত্ব 147 m

এখানে,

আদি বেগ, $v = 72\ km\ h^{-1}$

$= 72\ \frac{km}{h} = \frac{72 \times 10^3 m}{3600 s}$

$= 20\ ms^{-1}$

ত্বরণ, $a = 1.5\ ms^{-2}$

সময়, $t = 6\ s$

শেষবেগ, $v = ?$

দূরত্ব $s = ?$

উদাহরণ ৩.৪। খাড়া উপরের দিকে একটি রকেট নিক্ষেপ করা হলে এর জ্বালানি উপরের দিকে $40\ ms^{-2}$ ত্বরণ সৃষ্টি করে এবং জ্বালানি শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই ত্বরণের মান একই থাকে। রকেটটিকে যদি $8\ kms^{-1}$ বেগ অর্জন করতে হয় তবে কত সময়ের জন্য জ্বালানির ব্যবহার প্রয়োজন হবে।

সমাধান :

আমরা জানি,

$v = u + at$

বা $t = \frac{v - u}{a}$

$= \frac{8x10^3\ ms^{-1} - 0ms^{-1}}{40ms^{-2}}$

$= 200\ s$

উ: 200 s

এখানে,

আদিবেদ $u = 0\ ms^{-1}$

শেষ বেগ $= v = 8\ km\ s^{-1}$

$= 8 \times 10^3 ms^{-1}$

ত্বরণ, $a = 40\ ms^{-2}$

সময় $t = ?$

উদাহরণ ৩.৫। স্থির অবস্থান থেকে সুষম ত্বরণে চলতে শুরু করে একটি গাড়ি 4 মিনিটে প্রথম কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে। এরপর গাড়িটি যদি সুষম বেগে চলতে থাকে, তাহলে দ্বিতীয় কিলোমিটার অতিক্রম করতে এর কত সময় লাগবে?

সমধান :

মোট 2 কিলোমিটার পথের মধ্যে গাড়িটি প্রথম কিলোমিটার সুষম ত্বরণে চলে এবং প্রথম কিলোমিটারের শেষে প্রাপ্ত বেগে দ্বিতীয় কিলোমিটার পথ চলে। কাজেই দ্বিতীয় কিলোমিটার চলার সময় বের করতে হলে প্রথম কিলোমিটারের শেষে গাড়িটির প্রাপ্ত বেগ আগে বের করতে হবে।

প্রথম কিলোমিটারের ক্ষেত্রে :

আমরা জানি,

$$s_1 = \left(\frac{u+v}{2}\right) t_1$$

বা, $10^3 m = \left(\frac{0ms^{-1} + v}{2}\right) \times 4 \times 60s$

$$\therefore\ v = \frac{2\times10^3 m}{4\times60s} = \frac{1}{12} \times 10^2\ ms^{-1}$$

এখানে,

দূরত্ব $s_1 = 1\ km = 10^3 m$

সময় $t_1 = 4\ min = 4 \times 60s$

আদি বেগ $u = 0\ ms^{-1}$

শেষ বেগ $v = ?$

দ্বিতীয় কিলোমিটারের ক্ষেত্রে :

সুষম বেগের ক্ষেত্রে

আমরা জানি,

$$s_2 = vt_2$$

বা, $t_2 = \frac{s_2}{v}$

$$= \frac{10^3\ m}{\frac{1}{12} \times 10^2 ms^{-1}}$$

$= 120\ s$

উ: 120 s

এখানে,

দূরত্ব $s_2 = 1\ km = 10^3 m$

সুষম বেগ $v = \frac{1}{12} \times 10^2\ ms^{-1}$

সময় $t_2 = ?$

উদাহরণ ৩.৬ । দুটি গাড়ি $4ms^{-1}$ এবং $7ms^{-1}$বেগ নিয়ে একটি প্রতিযোগিতা শুরু করে। এদের ত্বরণ যথাক্রমে $0.5ms^{-2}$ এবং $0.4ms^{-2}$ । যদি গাড়ি দুটি একই সময় শেষ প্রান্তে পৌছায়, তবে এরা কত সময় ধরে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল ?

সমাধান :

মনে করি গাড়ি দুটি t সময় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে s মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে।

প্রথম গাড়ির ক্ষেত্রে $s = u_1t + \frac{1}{2} a_1t^2$ (1)

এবং দ্বিতীয় গাড়ির ক্ষেত্রে $s = u_2t + \frac{1}{2} a_2t^2$ (2)

(1) এবং (2) সমীকরণ থেকে আমরা পাই

$$u_1t + \frac{1}{2} a_1t^2 = u_2t + \frac{1}{2} a_2t^2$$

এখানে,

প্রথম গাড়ির আদি বেগ, $u_1 = 4\ ms^{-1}$

প্রথম গাড়ির ত্বরণ, $a_1 = 0.5ms^{-2}$

দ্বিতীয় গাড়ির আদি বেগ, $u_2 = 7ms^{-1}$

দ্বিতীয় গাড়ির ত্বরণ, $a_2 = 0.4ms^{-2}$

সময়, $t = ?$

বা, $(u_1 - u_2)\ t = \frac{1}{2}\ (a_2 - a_1)t^2$

বা, $t = \frac{2(u_1 - u_2)}{a_2 - a_1}$

বা, $t = \frac{2(4ms^{-1} - 7ms^{-1})}{0.4ms^{-2} - 0.5ms^{-2}}$

$= \frac{-6ms^{-1}}{-0.1ms^{-2}}$

$= 60\ s$

উ: 60 s

উদাহরণ ৩.৭। স্থির অবস্থান থেকে একটি ট্রেন $10\ ms^{-2}$ সুষম ত্বরণে চলার সময় 125m দূরত্বে অবস্থিত একটি পোস্টকে কত বেগে অতিক্রম করবে ?

সমাধান :

আমরা জানি,

$v^2 = u^2 + 2as$

বা, $v^2 = 0 + 2 \times 10ms^{-2} \times 125m$

$=2500m^2s^{-2}$

$\therefore v = 50\ ms^{-1}$

উ: $v = 50\ ms^{-1}$

এখানে,

আদিবেগ, $u = 0ms^{-1}$

ত্বরণ, $a = 10ms^{-2}$

দূরত্ব, $s = 125m$

শেষ বেগ, $v = ?$

উদাহরণ ৩.৮। $54\ kmh^{-1}$ বেগে চলন্ত একজন গাড়ির চালক 46 m দূরে একজন পথচারীকে দেখতে পেলেন এবং সাথে সাথে ব্রেক চেপে দিলেন। এতে গাড়িটি পথচারীর 1m সামনে এসে থেমে গেল। গাড়িটির ত্বরণ এবং ব্রেক চাপার পর গাড়ি থামতে কত সময় লেগেছিল বের কর।

সমাধান :

আমরা জানি,

$v^2 = u^2 + 2as$

বা, $2as = v^2 - u^2$

বা, $a = \frac{v^2 - u^2}{2s}$

$= \frac{0 - (15ms^{-1})^2}{2x45\ m}$

$= -2.5ms^{-2}$

এখানে,

আদিবেগ, $u = 54\ kmh^{-1}$

$= 54\ \frac{km}{h} = \frac{54x10^3m}{3600s}$

$=15\ ms^{-1}$

শেষ বেগ, $v = 0ms^{-1}$

অতিক্রান্ত দূরত্ব, $s = (46 - 1)\ m = 45m$

ত্বরণ, $a = ?$

সময় $t = ?$

আবার

$$s=\left(\frac{u+v}{2}\right)t$$

$$\therefore t=\frac{2s}{u+v}$$

$$=\frac{2x45m}{15ms^{-1}}$$

$$=6s$$

উ: ত্বরণ $-2.5ms^{-2}$; সময় 6s.

৩.৭। নিউটনের গতিসূত্র

Newton's Laws of Motion

১৬৮৭ সালে স্যার আইজ্যাক নিউটন তাঁর অমর গ্রন্থ "ফিলোসোফিয়া ন্যাচারালিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা" তে বস্তুর ভর, গতি ও বলের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে তিনটি সূত্র প্রকাশ করেন। এ তিনটি সূত্র নিউটনের গতি বিষয়ক সূত্র নামে পরিচিত।

প্রথম সূত্র : বাহ্যিক কোনো বল প্রয়োগ না করলে স্থির বস্তু স্থিরই থাকবে এবং গতিশীল বস্তু সুষম দ্রুতিতে সরলপথে চলতে থাকবে।

দ্বিতীয় সূত্র : বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার এর ওপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক এবং বল যেদিকে ক্রিয়া করে বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনও সেদিকে ঘটে।

তৃতীয় : প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটা সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।

৩.৮। প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যা : জড়তা ও বল

Explanation of First law: Inertia and Force

নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে দুটি বিষয়ে ধারণা পাওয়া যায় :

(১) জড়তা এবং

(২) বল

জড়তা (Inertia)

নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে আমরা দেখতে পাই প্রত্যেক বস্তুই যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় থাকতে চায় অর্থাৎ, বস্তু স্থির থাকলে স্থির থাকতে চায় আর গতিশীল থাকলে গতিশীল থাকতে চায়। নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে দেখা যাচ্ছে বস্তুর এ স্থিতিশীল ও গতিশীল অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হলে বল প্রয়োগ করতে হবে। পদার্থের নিজস্ব অবস্থা বজায় রাখতে চাওয়ার যে ধর্ম তাই জড়তা। জড়তাকে তাই এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় : পদার্থ যে অবস্থায় আছে চিরকাল সে অবস্থায় থাকতে চাওয়ার যে প্রবণতা বা সে অবস্থা বজায় রাখতে চাওয়ার যে ধর্ম তাকে জড়তা বলে। স্থিতিশীল বস্তুর চিরকাল স্থির থাকতে চাওয়ার যে প্রবণতা বা স্থিতি বজায় রাখতে চাওয়ার যে ধর্ম তাকে স্থিতি জড়তা এবং গতিশীল বস্তুর চিরকাল সমবেগে গতিশীল থাকতে চাওয়ার যে প্রবণতা বা একই গতি অক্ষুন্ন রাখতে চাওয়ার যে ধর্ম তাকে গতি জড়তা বলা হয়।

ভর হচ্ছে পদার্থের জড়তার পরিমাপ। উদাহরণ স্বরূপ একই আকৃতির দুটি বিরাট নিরেট সিলিন্ডার বিবেচনা করা যাক।

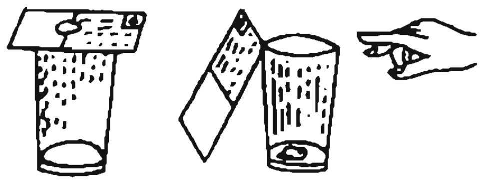
একটি কাঠের তৈরি, অপরটি ইস্পাতের । তুমি যদি সিলিন্ডার দুটিকে কোনো অনুভূমিক অমসৃন তলে ঠেলতে চেষ্টা কর, তাহলে নিশ্চিত ভাবে বলা যায় ইস্পাতের সিলিন্ডারটিকে গতিশীল করতে কাঠের সিলিন্ডারের থেকে অধিকতর প্রয়াসের প্রয়োজন হবে। আবার যদি দুটোই গতিশীল থাকে তাহলে ইস্পাতের সিলিন্ডারকে থামানোর জন্য বেশি প্রচেষ্টার দরকার হবে। সুতরাং আমরা বলি যে কাঠের সিলিন্ডারের চেয়ে ইস্পাতের সিলিন্ডারের জড়তা বেশি। ইস্পাতের সিলিন্ডারের ভর কাঠের সিলিন্ডারের ভরের চেয়ে বেশি বলেই এর জড়তা বেশি।

জড়তার উদাহরণ :

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা অহরহ জড়তার অভিজ্ঞতা লাভ করি।

(১) থেমে থাকা বাস হঠাৎ চলতে শুরু করলে বাসযাত্রী পেছনের দিকে হেলে পড়েন জড়তার কারণে। বাস যখন থেমে থাকে তখন যাত্রীর শরীরও স্থির থাকে। কিন্তু হঠাৎ বাস চলত শুরু করলে যাত্রীদের শরীরের বাস সংলগ্ন অংশ গতিশীল হয় কিন্তু শরীরের উপরের অংশ জড়তার জন্য স্থির অবস্থায় থাকতে চায় তাই শরীরের নিচের অংশ থেকে উপরের অংশ থেকে পিছিয়ে পড়ে। ফলে, যাত্রী পেছনের দিকে হেলে পড়েন।

আবার চলন্ত বাস হঠাৎ ব্রেক করলে যাত্রীরা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েন। চলন্ত অবস্থায় বাসের সাথে যাত্রীও একই গতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বাস হঠাৎ থেমে গেলে বাসের সাথে সাথে যাত্রীর শরীরের নিচের অংশ স্থির হয় কিন্তু শরীরের উপরের অংশ জড়তার জন্য সামনের দিকে এগিয়ে যায়। ঠিক একই কারণে চলন্ত বাস থেকে হঠাৎ নামার সময় যাত্রী সামনের দিকে পড়ে যেতে চান।



চিত্র : ৩.৮

(২) একটি গ্লাসের উপর একটি পোস্টকার্ড রেখে পোস্টকার্ডের উপর এক টুকরো পাথর রাখ। এখন যদি পোস্টকার্ডটিকে হঠাৎ জোরে টোকা দাও তাহলে পোস্টকার্ডটি সরে যাবে আর পাথরের টুকরো গ্লাসের মধ্যে পড়ে যাবে। হঠাৎ জোরে টোকা দেওয়ার জন্য পোস্টকার্ডটি সরে যাবে কিন্তু জড়তার জন্য পাথরের টুকরাটি তার অবস্থানে থাকার ফলে গ্লাসের মধ্যে পড়ে যাবে।

প্রথম সূত্র থেকে বলের গুণগত সংজ্ঞা :

নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে আমরা দেখতে পাই যে, কোনো বস্তু নিজের থেকে তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। বস্তু স্থির থাকলে চিরকাল স্থির থাকতে চায় আর গতিশীল থাকলে চিরকাল সুষম দ্রুতিতে সরলপথে চলতে চায়। তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর জন্য বাহির থেকে একটা কিছু প্রয়োগ করতে হয়। যা বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন করতে বাধ্য করে বা করতে চায় তাকেই আমরা বল বলে অভিহিত করি। তাই নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে আমরা বলের গুণগত সংজ্ঞা পাই। নিউটনের প্রথম সূত্রানুসারে, যা স্থির বস্তুর ওপর ক্রিয়া করে তাকে গতিশীল করে বা করতে চায় বা যা গতিশীল বস্তুর ওপর ক্রিয়া করে তার গতির পরিবর্তন করে বা করতে চায় তাকে বল বলে।

৩.৯। ভরবেগ

Momentum

আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখতে পাই একটি গতিশীল টেবিল টেনিস বলকে থামানোর চেয়ে একটি গতিশীল ট্রাককে থামানো অনেক কঠিন। কোনো গতিশীল বস্তুকে যদি আমরা থামাতে চাই তাহলে আমরা যে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হই তার একটি পরিমাপ হচ্ছে ভরবেগ। ভরবেগ হচ্ছে বস্তুর একটি ধর্ম বা বস্তুর ভর এবং গতির সাথে সম্পর্কিত । বস্তুর ভর যত বেশি হবে এবং বস্তু যত দ্রুত চলবে তার ভরবেগও তত বেশি হবে।

বস্তুর ভর ও বেগের গুণফলকে ভরবেগ বলে।

কোনো বস্তুর ভর m এবং বেগ v হলে এর ভরবেগ হবে

$p = mv$ ... ... (৩.৭)

যেহেতু বেগ ভেক্টর রাশি কাজেই ভরবেগও ভেক্টর রাশি। এর দিক বেগের দিকে।

মাত্রা : ভরবেগের মাত্রা হল ভর × বেগ এর মাত্রা

অর্থাৎ, ভরবেগ = ভর × বেগ = ভর $\frac{\text{সরণ}}{\text{সময়}}$

$\therefore [p] = \left[\frac{ML}{T}\right] = [MLT^{-1}]$

একক : ভরবেগের একক হবে ভরের একক × বেগের একক

অর্থাৎ, $kg \times ms^{-1}$ বা $kgms^{-1}$। 1 kg ভরের কোনো বস্তু 1 ms^{-1} বেগে চললে এর ভরবেগ হবে $1kgms^{-1}$।

৩.১০। গতির দ্বিতীয় সূত্র থেকে F = ma সম্পর্ক প্রতিপাদন
Deduction of **F= ma** from Second Law of Motion

ধরা যাক, m ভর বিশিষ্ট কোনো বস্তু u আদিবেগ নিয়ে চলছে। এখন F সমবল বস্তুর ওপর t সময় ধরে বেগের অভিমুখে ক্রিয়া করলে, যতক্ষণ বল ক্রিয়াশীল থাকবে ততক্ষণ বস্তুর বেগ একই হারে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ধরা যাক t সময় পর বস্তুর বেগ হলো v ।

$\therefore$ বস্তুটির আদি ভর বেগ = mu

বস্তুটির শেষ ভর বেগ = mv

$\therefore$ t সময়ে বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তন = mv − mu

সুতরাং ভরবেগের পরিবর্তনের হার,

$= \frac{m(v-u)}{t} = ma \quad \left[\because \text{ত্বরণ } a = \frac{v-u}{t}\right]$

আবার নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্রানুসারে, বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক

অর্থাৎ, $ma \propto F$

বা, $ma = KF$ ... . (1)

এখানে K একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক।

এর মান বলের এককের ওপর নির্ভর করে। এ সমীকরণ থেকে বলের এককের সংজ্ঞা দেওয়া হয়।

বলের এ একককে বলা হয় নিউটন (N)। এ এককের সংজ্ঞা এমনভাবে দেওয়া হয় যাতে K = 1 হয়।

যখন $m = 1kg$, $a = 1ms^{-2}$

তখন F = 1N ধরা হয়, ফলে 1 নং সমীকরণে

$1 \times 1 = K \times 1$

বা K = 1 হয়।

সুতরাং যে পরিমাণ বল 1kg ভরের কোনো বস্তুর ওপর প্রযুক্ত হয়ে $1ms^{-2}$ ত্বরণ সৃষ্টি করে তাকে 1 নিউটন (N) বলে।

ভর m কে kg, ত্বরণ a কে ms^{-2} এবং বল F কে N - এ প্রকাশ করলে সমীকরণ (1) দাঁড়ায়

$F = ma$

বা, বল = ভর × ত্বরণ

উদাহরণ ৩.৯। 20kg ভরের একটি বস্তুর ওপর কত বল প্রযুক্ত হলে এর ত্বরণ হবে $2ms^{-2}$

সমাধান :

আমরা জানি

$F = ma$

$= 20kg \times 2\ ms^{-2}$

$= 40\ kg\ ms^{-2}$

$= 40N$

এখানে,

বস্তুর ভর, $m = 20kg$

ত্বরণ, $a = 2ms^{-2}$

বল, $F = ?$

উ: 40N

উদাহরণ ৩.১০। $9.1 \times 10^{-31}kg$ ভরের একটি স্থির ইলেকট্রনের ওপর $1.82 \times 10^{-16}N$ বল $10^{-9}s$ ধরে কাজ করে। এ সময় শেষে ইলেকট্রনের বেগ কত হবে নির্ণয় কর।

সমাধান :

আমরা জানি

$v = u + at$

এখানে ত্বরণ a অজানা

কিন্তু $F = ma$

বা, $a = \dfrac{18.2x10^{-16}N}{9.1x10^{-31}kg}$

$= 2 \times 10^{14}\ ms^{-2}$

এখন $v = 0 + 2 \times 10^{14}\ ms^{-2} \times 10^{-9}s$

$= 2 \times 10^{5}\ ms^{-1}$

উ: $2 \times 10^{5}\ ms^{-1}$

এখানে,

ভর, $m = 9.1 \times 10^{-31}kg$

আদি বেগ, $u = 0\ ms^{-1}$

বল, $F = 1.82 \times 10^{-16}N$

সময়, $t = 10^{-9}s$

শেষ বেগ, $v = ?$

৩.১১ বলের পরিমাপ :

বস্তুর ভরের ও ত্বরণের গুণফল দ্বারা বল পরিমাপ করা যায়। অর্থাৎ, বল = ভর × ত্বরণ

m ভরের কোনো বস্তুর ওপর F বল প্রয়োগে বস্তুটির ত্বরণ a হলে F=ma

বলের মাত্রা : বলের মাত্রা হল ভর × ত্বরণ–এর মাত্রা অর্থাৎ,

বল = ভর × ত্বরণ = ভর × $\frac{\text{বেগ}}{\text{সময়}}$ = ভর × $\frac{\text{সরণ}}{\text{সময়}^2}$

$$[F] = \left[\frac{ML}{T^2}\right] = [MLT^{-2}]$$

একক : ভরের একককে ত্বরণের একক দিয়ে গুণ করলে বলের একক পাওয়া যায়। যেহেতু ভরের একক kg এবং ত্বরণের একক ms^{-2}, সুতরাং বলের একক হবে $kg \times ms^{-2}$। একে নিউটন (N) বলা হয়,

সুতরাং $1\ N = 1\ kg \times 1 ms^{-2}$

অর্থাৎ, যে পরিমাণ বল 1 kg ভরের কোনো বস্তুর ওপর ক্রিয়া করে $1ms^{-2}$ ত্বরণ সৃষ্টি করতে পারে তাকে 1 নিউটন (N) বল বলে।

10N বল বলতে বুঝায় সেই বল যা 1 kg ভরের বস্তুর ওপর ক্রিয়া করে $10ms^{-2}$ ত্বরণ সৃষ্টি করতে পারে।

[আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক ঘটনা থেকে দেখি বল প্রয়োগ করা সত্ত্বেও বস্তুর ত্বরণ হয় না। যেমন কোনো ভারী স্থির বস্তুকে ঠেলা বা টানা হলেও বস্তুটি গতিশীল হয় না অর্থাৎ, ত্বরণ হয় না। তাহলে কি এ ঠেলা বা টানায় বস্তুর ওপর বল প্রযুক্ত হচ্ছে না ? বস্তুর ওপর ক্রিয়াশীল মোট বল শূন্য না হলেই (unbalanced) ত্বরণ হয়।]

৩.১২। নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে প্রথম সূত্রের প্রতিপাদন

নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা প্রথম সূত্র প্রতিপাদন করতে পারি।

দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা জানি যে, $F = ma = m\ \frac{v - u}{t}$

বা, $m\ (v - u) = Ft$

এখন যদি বাইরে থেকে বল প্রযুক্ত না হয়, অর্থাৎ $F = 0$ হয়, তাহলে উপরিউক্ত সমীকরণ থেকে $m\ (v - u) = 0$

যেহেতু বস্তুর ভর m শূন্য হতে পারে না, $v - u = 0$

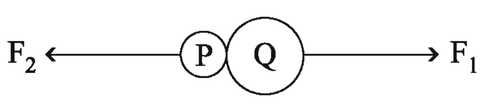
$\therefore\ v = u$

সুতরাং বাইরে থেকে বস্তুর ওপর কোনো বল প্রযুক্ত না হলে, বস্তুর বেগের কোনো পরিবর্তন হয় না।

যদি $u = 0$ হয় তাহলে $v = 0$ হবে অর্থাৎ, বস্তু স্থিরই থাকবে। আর যদি $u = 0$ না হয়, তাহলে u এর মান t সময় জুড়ে যা থাকবে v এরও সেই একই মান থাকবে অর্থাৎ, বস্তুটি সুষম বেগে চলতে থাকবে। সুতরাং বাহ্যিক বল প্রযুক্ত না হলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকবে আর গতিশীল বস্তু সুষম বেগে চলতে থাকবে। এটিই নিউটনের গতি সম্পর্কিত প্রথম সূত্র।

৩.১৩। নিউটনের তৃতীয় সূত্রের ব্যাখ্যা

নিউটনের তৃতীয় সূত্রানুসারে প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে অর্থাৎ, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সমান ও বিপরীতমুখী। ৩.৯ চিত্রে P বস্তুটি যদি Q বস্তুটির ওপর F_1 বল প্রয়োগ করে তা হলে এ সূত্রানুযায়ী Q বস্তুটিও P বস্তুর ওপর সমান ও বিপরীত F_2 বল প্রয়োগ করবে। Q বস্তুর ওপর P বস্তুর বলকে ক্রিয়া আর P বস্তুর ওপর Q বস্তুর বলকে প্রতিক্রিয়া বলে।



চিত্র : ৩.৯

নিউটনের তৃতীয় সূত্রানুসারে, $F_2 = -F_1$

ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বল সবসময়ই দুটি ভিন্ন বস্তুর ওপর ক্রিয়া করে– কখনোই একই বস্তুর ওপর ক্রিয়া করে না।

প্রতিক্রিয়া বলটি ততক্ষণই থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্রিয়া বলটি থাকবে। ক্রিয়া থেমে গেলে প্রতিক্রিয়াও থেমে যাবে। এ ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, বস্তুগুলোর সাম্যাবস্থায় বা গতিশীল অবস্থায় থাকা বা একে অপরের সংস্পর্শে থাকা বা না থাকার ওপর নির্ভরশীল নয়—সর্বত্রই বর্তমান থাকে।

উদাহরণ :

১। ভূমির উপর দাঁড়ানো : মনে করি এক ব্যক্তি ভূমির উপর দাঁড়িয়ে আছেন। লোকটির পা ভূমির উপর তার ওজনের সমান বল প্রয়োগ করে। এ বল ভূমির উপর লোকটির ওজনের ক্রিয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত লোকটি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন ততক্ষণ পর্যন্ত ভূমিও সমান বলে লোকটির পাকে খাড়া উপরের দিকে ঠেলবে। ভূমির এ বল হল প্রতিক্রিয়া। এ অবস্থায় ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াা বল পরস্পরের সমান ও বিপরীত হবে।

২। টেবিলের উপর বই এর অবস্থান : একটি বই টেবিলের উপর রাখলে বইটির উপর পৃথিবীর আকর্ষণ বল তথা বইয়ের ওজন সরাসরি নিচের দিকে কাজ করবে। এখন এ বইটির উপর যদি শুধুমাত্র এই বল কাজ করতো, কোনো প্রতিক্রিয়া বল না থাকতো তাহলে বইটি ধীরে ধীরে টেবিলের মধ্য দিয়ে চলে যেত। কিন্তু যেহেতু বই টেবিলের উপর সাম্যাবস্থায় থাকে কাজেই আমরা বলতে পারি টেবিলের প্রতিক্রিয়া বইটিকে উপরের দিকে ওজনের সমান বলে ঠেলছে।

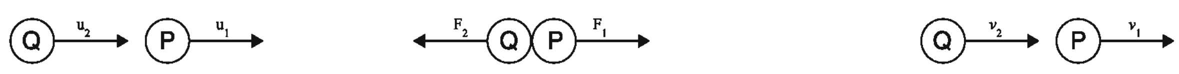
৩.১৪। ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র
Law of Conservation of Momentum

ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র পদার্থবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। একটি ব্যবস্থার মোট ভরবেগের কোনো পরিবর্তন হয় না। ভরবেগের এ সংরক্ষণ সূত্রকে কাজে লাগিয়ে রকেটের উড্ডয়ন থেকে শুরু করে উচ্চশক্তি ত্বরক যন্ত্রে উৎপাদিত অনেক নতুন মৌলিক কণার আবিষ্কারও সম্ভব হয়েছে। নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্রের সাহায্যে এ সূত্র প্রতিপাদন করা যায়।

সূত্রের বিবৃতি : একাধিক বস্তুর মধ্যে শুধু ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া ছাড়া অন্য কোনো বল কাজ না করলে কোনো নির্দিষ্ট দিকে তাদের মোট ভরবেগের কোনো পরিবর্তন হয় না।

সূত্রের প্রতিপাদন :

ধরা যাক, P ও Q দুটি বস্তু যথাক্রমে u_1 ও u_2 বেগ নিয়ে একই সরলরেখা বরাবর একই দিকে চলছে। বস্তুটির ভর যথাক্রমে m_1 ও m_2। Q এর বেগ P এর বেগের চেয়ে বেশি হলে অর্থাৎ, $u_2 > u_1$ হলে চলতে চলতে কোনো এক সময় Q বস্তুটি P বস্তুটিকে ধাক্কা দেবে। চিত্র (৩.১০)।



(ক) সংঘর্ষের আগে (খ) সংঘর্ষের সময় (গ) সংঘর্ষের পরে

চিত্র : ৩.১০

P বস্তুর ওপর Q বস্তুর এ প্রযুক্ত বল হলো ক্রিয়া F_1, এখন P বস্তুটিও Q বস্তুকে F_2 বলে ধাক্কা দেবে। Q বস্তুর ওপর P বস্তুর প্রযুক্ত এই বল হচ্ছে প্রতিক্রিয়া F_2। নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্রানুসারে

$$F_1 = -F_2 \quad \ldots \ldots \ldots \quad (৩.৮)$$

যতক্ষণ ক্রিয়া থাকে ততক্ষণই প্রতিক্রিয়া থাকে। ধরা যাক, ধাক্কাজনিত এ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার সময়কাল t। এখন এ ধাক্কার ফলে P ও Q বস্তুদ্বয় পরিবর্তিত বেগে একই সরলরেখায় চলতে থাকবে।

ধরা যাক, P ও Q এর পরিবর্তিত বেগ যথাক্রমে v_1 ও v_2 । ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে P ও Q বস্তুদ্বয়ের ত্বরণ যথাক্রমে a_1 ও a_2 হলে,

$m_1a_1 = -m_2a_2$

বা, $m_1\dfrac{(v_1-u_1)}{t} = -m_2\dfrac{(v_2-u_2)}{t}$

বা, $m_1v_1 - m_1u_1 = -m_2v_2 + m_2u_2$

বা, $m_1u_1 + m_2u_2 = m_1v_1 + m_2v_2$ ... ... (৩.৯)

অতএব, P ও Q বস্তুদ্বয়ের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সংঘটনের পূর্বের ও পরের ভরবেগের সমষ্টি সর্বদাই সমান থাকে। এটিই ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র।

উদাহরণ ৩.১১। 4kg ভর এবং $19ms^{-1}$ বেগের একটি বস্তু চলন্ত অবস্থায় বিপরীত দিকে থেকে আগত 6kg ভর এবং $4ms^{-1}$ বেগের অপর একটি বস্তুর সাথে মিশে একটি বস্তুতে পরিণত হয়। মিলিত বস্তুর বেগ কত হবে ?

সমাধান :

ধরা যাক, প্রথম বস্তু যে দিকে চলে সেদিক ধনাত্মক ।

এখানে,
প্রথম বস্তুর ভর, $m_1 = 4kg$
দ্বিতীয় বস্তুর ভর, $m_2 = 6kg$
মিলিত হওয়ার আগে প্রথম বস্তুর বেগ, $u_1 = 12ms^{-1}$
মিলিত হওয়ার আগে দ্বিতীয় বস্তুর বেগ, $u_2 = 4ms^{-1}$
মিলিত হওয়ার পর মিলিত বস্তুর বেগ, $v = ?$

ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র থেকে আমরা জানি,

$m_1u_1 + m_2u_2 = (m_1 + m_2)v$

বা, $4kg \times 12ms^{-1} + 6kg \times -4ms^{-1}$

$= (4kg + 6kg)v$

বা, $48kgms^{-1} - 24kgms^{-1} = v \times 10kg$

বা, $v \times 10kg = 24kgms^{-1}$

বা, $v = \dfrac{24kgms^{-1}}{10kg}$

$= 2.4ms^{-1}$

উ: মিলিত বস্তুর বেগ ধনাত্মক, অর্থাৎ, প্রথম বস্তু যে দিকে যাচ্ছিল মিলিত বস্তু সে দিকে $2.4ms^{-1}$ বেগে যাবে।

উদাহরণ ৩.১২। একটি রাইফেল থেকে $1kms^{-1}$ বেগে 10g ভরের একটি বুলেট ছোঁড়া হল। রাইফেলের ভর যদি 2kg হয়, এর পশ্চাৎ বেগ বের কর।

সমাধান :

ধরা যাক, গুলির বেগের দিক ধনাত্মক।

এখানে,
গুলির ভর, $m_1 = 10g = 10 \times 10^{-3}\,kg = 10^{-2}\,kg$
রাইফেলের ভর, $m_2 = 2kg$
গুলির আদি বেগ, $u_1 = 0ms^{-1}$

ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র থেকে আমরা জানি

$m_1u_1 + m_2u_2 = m_1v_1 + m_2v_2$

বা, $0 + 0 = 10^{-2}\,kg \times 10^3\,ms^{-1} + 2kg\,v_2$

$v_2 = -\dfrac{10kgms^{-1}}{2kg}$

$= -5\ ms^{-1}$

বন্দুকের আদি বেগ, $u_2 = 0\ ms^{-1}$
গুলির শেষ বেগ, $v_1 = 1kms^{-1} = 10^3\ ms^{-1}$
রাইফেলের শেষ বেগ $v_2 = ?$

রাইফেলের বেগ ঋণাত্মক, অর্থাৎ, গুলির বেগ যে দিকে, রাইফেলের বেগ তার বিপরীত দিকে
উ: পশ্চাৎ বেগ $-5\ ms^{-1}$

ভরবেগের সংরক্ষণের উদাহরণ

১। নৌকা থেকে লাফ দেওয়া : নৌকা থেকে একজন আরোহী লাফিয়ে যখন তীরে নামেন তখন নৌকা দূরে যেতে দেখা যায়। আরোহী নৌকার ওপর বল প্রয়োগ করার ফলেই নৌকা পেছনে ছুটে যায়, কারণ নৌকা ও আরোহীর ভরবেগের পরিবর্তন পরস্পরের সমান ও বিপরীতমুখী।

২। বন্দুকের পশ্চাৎ গতি : গুলি ছোঁড়ার পর বন্দুকের পেছনের দিকে সরে আসতে দেখা যায়। ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র থেকে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। গুলি ছোঁড়ার পূর্বে বন্দুক ও গুলি উভয়ের বেগ শূন্য থাকে কাজেই তখন তাদের ভরবেগের সমষ্টি শূন্য। গুলি ছোয়ার পর সামনের দিকে গুলির কিছু ভরবেগ উৎপন্ন হয়। ভরগের সংরক্ষণ সূত্রানুযায়ী গুলি ছোঁড়ার আগের ভরবেগের সমষ্টি পরের ভরবেগের সমষ্টির সমান হতে হবে। সুতরাং গুলি ছোঁড়ার পরের ভরবেগের সমষ্টি সমান হতে হলে অর্থাৎ, শূন্য হতে হলে বন্দুকেরও গুলির সমান ও বিপরীতমুখী একটা ভরবেগের সৃষ্টি হতে হবে। ফলে বন্দুককেও পেছনের দিকে আসতে দেখা যায়।

ধরা যাক, M ভরের বন্দুক থেকে গুলি ছোঁড়ার পর m ভরের গুলিটি v বেগে বেরিয়ে যাচ্ছে। ধরা যাক, বন্দুকটির বেগ V। গুলি ছোঁড়ার আগে বন্দুক ও গুলির ভরবেগের সমষ্টি শূন্য। গুলি ছোঁড়ার পরে বন্দুক ও গুলির মোট ভর বেগ হবে $MV + mv$।

ভরবেগের নিত্যতার সূত্রানুসারে $MV + mv = 0$

$\therefore MV = -mv$

$$V = -\frac{m}{M}v$$

সমীকরণ থেকে দেখা যায় যে, বন্দুক ও গুলির বেগ পরস্পর বিপরীতমুখী। অর্থাৎ, গুলি ছোঁড়া হলে বন্দুকের পশ্চাৎ বেগের মান হবে $\frac{m}{M}v$

৩। রকেট চালানো : আধুনিক জেট বিমান, রকেট ইত্যাদিও চালানো হয় নিউটনের তৃতীয় সূত্রের তত্ত্ব তথা ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র ব্যবহার করে। রকেটে জ্বালানি পুড়িয়ে প্রচুর গ্যাস উৎপন্ন করা হয়। সেই গ্যাস প্রচণ্ড বেগে রকেটের পেছনে দিয়ে নির্গত হয়। জ্বালানি নির্গত হওয়ার পূর্বে জ্বালানি ও রকেট উভয়ের বেগ শূন্য থাকে, কাজেই তখন তাদের ভরবেগের সমষ্টি শূন্য। জ্বালানি নির্গত হওয়াকালে নির্গমণের দিকে জ্বালানির কিছু ভরবেগ থাকে। ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্রানুযায়ী জ্বালানি নির্গত হওয়ার আগে তাদের ভরবেগের সমষ্টি জ্বালানি নির্গত হওয়াকালীন তাদের ভরবেগের সমষ্টির সমান হতে হবে। সুতরাং জ্বালানি নির্গত হওয়াকালীন উভয়ের ভরবেগের সমষ্টি সমান হতে হলে অর্থাৎ, শূন্য হতে হলে রকেটের ও জ্বালানির সমান ও বিপরীতমুখী একটি ভরবেগের সৃষ্টি হতে হবে। ফলে রকেটটি জ্বালানির বিপরীত দিকে এগিয়ে চলে।

৩.১৫। ঘর্ষণ
FRICTION

কোনো একটি তল অন্য একটি তলের উপর দিয়ে চলার ঠিক আগে যে ঘর্ষণবল প্রদর্শন করে তা হল স্থিতির ঘর্ষণ বল। একটি তল অন্য একটি তলের উপর দিয়ে চলার সময় যে ঘর্ষণ বল কাজ করে তা হল গতির ঘর্ষণ। স্থিতির ঘর্ষণ বল গতির

ঘর্ষণ বল অপেক্ষা কিছু প্রবলতর হয়। দুটি বস্তু পরস্পরের সংস্পর্শে থেকে যদি একের উপর দিয়ে অপরটি চলতে চেষ্টা করে অথবা চলতে থাকে তাহলে বস্তুদ্বয়ের স্পর্শ তলে এ গতির বিরূদ্ধে একটা বাধার উৎপত্তি হয়, এ বাধাকে ঘর্ষণ বলে। আর এ বাঁধার ফলে যে বল উৎপন্ন হয় তাকে ঘর্ষণ বল বলে।

ঘর্ষণের সুবিধা ও অসুবিধা

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ঘর্ষণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ঘর্ষণ না থাকলে আমরা হাঁটতে পারতাম না পিছলে যেতাম। কাঠে পেরেক বা স্ক্রু আটকে থাকতো না সম্ভব হতো না দড়িতে কোনো গিরো দেওয়া। কোনো কিছু আমরা ধরে রাখতে পারতাম না। ফলে সহজেই বুঝা যায় ঘর্ষণ না থাকলে আমাদের কতটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতো।

ঘর্ষণের জন্য আমাদেরকে অসুবিধাও কম পোহাতে হয় না। যন্ত্র চলার সময় গতিশীল অংশগুলোর মধ্যে ঘর্ষণ ক্রিয়া করার ফলে ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তাছাড়া যান্ত্রিক দক্ষতাও বেশ কমে যায় আবার ঘর্ষণের ফলে অনাবশ্যক তাপ উৎপাদনের জন্য যন্ত্রের ক্ষতি হয়।

এইসব অসুবিধা দূর করার জন্য যন্ত্রপাতির স্পর্শতলগুলোর মাঝে পিচ্ছিলকারী তেল বা গ্রাফাইট ব্যবহার করে পিচ্ছিল রাখা হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বলের মাত্রা কোনটি?

ক. MLT^{-2} খ. MLT^{-1}

গ. $ML^{-2}T^{-2}$ ঘ. $ML^{-1}T^{-1}$

২। কোন বস্তুর ওপর প্রযুক্ত বল ধ্রুব থাকলে ভর ও ত্বরণের সম্পর্ক হবে –

i. ভর যত কম হবে ত্বরণ তত বেশি হবে

ii. ভর যত কম হবে ত্বরণ তত কম হবে

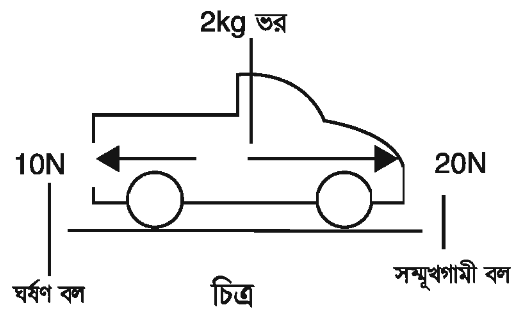
iii. ভর যত বেশি হবে ত্বরণ তত কম হবে।

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i ও iii

৩। নিচের চিত্রের গাড়িটির ত্বরণ কত?



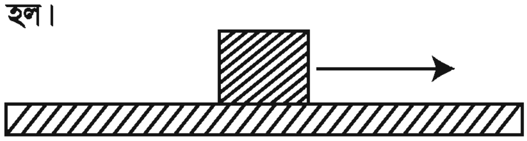
চিত্র

ক. $-5.0\ ms^{-2}$ খ. $5.0\ ms^{-2}$

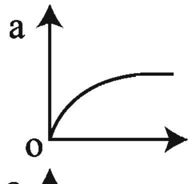
গ. $10.0\ ms^{-2}$ ঘ. $15.0\ ms^{-2}$

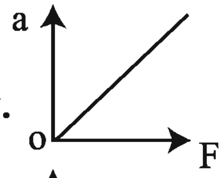
নিচের অনুচ্ছেদ পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

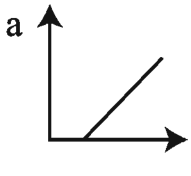
একটি অমসৃণ অনুভূমিক তলে একটি ব্লক স্থাপন করা হল। অনুভূমিক বল F ব্লকের ওপর ক্রিয়ারত। বলের মান F কে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হল।

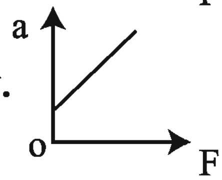


৪। কোন লেখটি ব্লকের বল এবং ত্বরণের সম্পর্ককে সঠিক ভাবে প্রকাশ করে?

ক. 

খ. 

গ. 

ঘ. 

৫। প্রাপ্ত লেখ থেকে বুঝা যায় একটি নির্দিষ্ট বল প্রয়োগের পর –

i. বল ত্বরণের সমানুপাতিক

ii. বল ত্বরণের ব্যাস্তানুপাতিক

iii. বল ত্বরণের সম্পর্ক সুচকীয়।

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i　　খ. iii

গ. i ও ii　　ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

সালাম তার খামারে উৎপাদিত ডিম বিক্রি করার জন্য একটি ট্রাক ভাড়া নেয় এবং ডিমগুলো যথাযথভাবে প্যাকেট করে ট্রাকে ওঠায়। ডিমসহ ট্রাকের ভর 1.5×10^5 kg। ট্রাকটি 72 kmh^{-1} বেগে চলছিল। পথিমধ্যে চালক ট্রাকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। দুর্ঘটনা অনিবার্য দেখে চালক ট্রাকটিকে রাস্তার পাশের একটি খড়ের গাদার উপর ওঠিয়ে দেয়। ট্রাকটি 1.0 Sec - এ থেমে যায়। এতে সালাম বড় দুর্ঘটনা হতে রক্ষা পায়। সংঘর্ষে সালাম আহত হলেও অধিকাংশ ডিম অক্ষত থাকে।

ক. বেগ কাকে বলে?

খ. দুর্ঘটনায় সালাম আহত হলেও অধিকাংশ ডিম কেন অক্ষত অবস্থায় রয়ে গেল ব্যাখ্যা কর।

গ. ট্রাকের ওপর ক্রিয়ারত বলের পরিমাণ নির্ণয় কর।

ঘ. ''চালক ট্রাকটিকে নরম খড়ের গাদার উপর ওঠিয়ে দেওয়ায় সালাম বড় ধরনের দুর্ঘটনা হতে রক্ষা পায়'' গাণিতিক বিশ্লেষণের সাহায্যে এর যথার্থতা নির্ণয় কর।

চতুর্থ অধ্যায়

মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ

GRAVITATION AND GRAVITY

এ মহাবিশ্বে প্রতিটি বস্তুকণাই একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এ আকর্ষণ বলের নাম মহাকর্ষ। এ বলের মান কত হবে সে সম্পর্কে নিউটন যে সূত্র দেন সেটি নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র নামে পরিচিত। এ অধ্যায়ে আমরা প্রথমেই এই মহাকর্ষ সূত্র নিয়ে আলোচনা করব। এ অধ্যায়ে আমরা সরল দোলক, তার সূত্রাবলি এবং সরল দোলকের সাহায্যে অভিকর্ষজ ত্বরণ নির্ণয়ের পদ্ধতি আলোচনা করব। আমাদের ওজন আছে বলেই আমরা পৃথিবীতে বসবাস করছি। ওজন না থাকলে আমরা ছিটকে পড়ে যেতাম মহাশূন্যে। এ ওজন নিয়ে অর্থাৎ, ওজনের বিভিন্নতা, ওজন নির্ণয়ের পদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে এ অধ্যায়ে। সব শেষে আছে মানুষের মহাকাশ যাত্রার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

৪.১। মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ
Gravitation and Gravity

এ মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তু কণাই একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এ মহাবিশ্বের যে কোনো দুটি বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ তাকে মহাকর্ষ বলে। দুটি বস্তুর একটি যদি পৃথিবী হয় তবে তাকে অভিকর্ষ বা মাধ্যাকর্ষণ বলে অর্থাৎ, কোনো বস্তুর ওপর পৃথিবীর আকর্ষণকে অভিকর্ষ বলে।

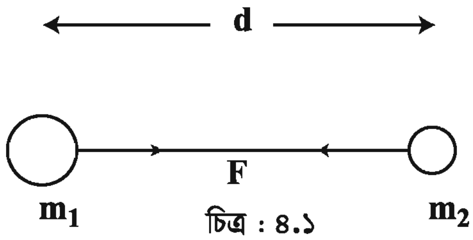
সৌর জগতে পৃথিবী ব্যতিত যে কোনো দুটি বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ, তা মহাকর্ষ কিন্তু পৃথিবী ও যে কোনো বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ তা অভিকর্ষ। সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যে যে আকর্ষণ তা মহাকর্ষ কিন্তু পৃথিবী ও একটি বস্তু এর যে আকর্ষণ তা অভিকর্ষ। অভিকর্ষও এক ধরনের মহাকর্ষ।

৪.২। নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র
Newton's Law of Gravitation

এ মহাবিশ্বের যে কোনো দুটি বস্তু কণা পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এ আকর্ষণ বলের মান শুধু বস্তুদ্বয়ের ভর এবং এদের মধ্যকার দূরত্বের ওপর নির্ভর করে-এদের আকৃতি, প্রকৃতি কিংবা মধ্যবর্তী মাধ্যমের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে না। এ আকর্ষণকে মহাকর্ষ বলে। এ আকর্ষণ সম্পর্কে নিউটনের একটি সূত্র আছে যা নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র নামে পরিচিত।

সূত্র : মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণা একে অপরকে নিজ দিকে আকর্ষণ করে এবং এ আকর্ষণ বলের মান বস্তু কণাদ্বয়ের ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং এদের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এবং এ বল বস্তুকণাদ্বয়ের সংযোগ সরলরেখা বরাবর ক্রিয়া করে।

ধরা যাক, m_1 এবং m_2 ভরের দুটি বস্তু পরস্পর থেকে d দূরত্বে অবস্থিত [চিত্র ৪.১]



চিত্র : ৪.১

এদের মধ্যকার আকর্ষণ বল F হলে, মহাকর্ষ সূত্রানুসারে

$$F \propto \frac{m_1 m_2}{d^2} \text{ বা } F = G\frac{m_1 m_2}{d^2} \quad \ldots \ldots \quad (৪.১)$$

এখানে G একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক। একে সার্বজনীন মহাকর্ষীয় ধ্রুবক বলে। মহাকর্ষ সূত্রানুসারে নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থিত দুটি বস্তুর ভরের গুণফল দ্বিগুণ হলে বল দ্বিগুণ হবে, ভরের গুণফল তিনগুণ হলে, বল তিনগুণ হবে। আর নির্দিষ্ট ভরের দুটি বস্তুর দূরত্ব দ্বিগুণ করলে বল এক – চতুর্থাংশ হবে, দূরত্ব তিনগুণ করলে বল নয় ভাগের এক ভাগ হবে।

মহাকর্ষীয় ধ্রুবক, G
Gravitational Constant

G এর সংখ্যামান: (৪.১) সমীকরণ থেকে আমরা দেখি যে,

$$G = \frac{Fd^2}{m_1 m_2}$$

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, "1 kg ভরের দুটি বস্তু 1m দূরত্বে থেকে যে বলে পরস্পরকে আকর্ষণ করে তার সংখ্যামান মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের সংখ্যামানের সমান।"

G এর মাত্রা :
৪.১ সমীকরণ থেকে দেখা যায়,

$$[G] = \frac{MLT^2 \times L^2}{M^2} = [L^3M^{-1}T^{-2}]$$

G এর একক : (৪.১) সমীকরণ থেকে পুনরায় পাওয়া যায়

$$G = \frac{Fd^2}{m_1 m_2}$$

এ সমীকরণের ডানপাশের রাশিগুলোর একক বসালে G এর একক পাওয়া যায়। সুতরাং এর একক হচ্ছে Nm^2/kg^2 অর্থাৎ, Nm^2kg^{-2}

G এর মান : G - এর মান নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন সময় বহু বিজ্ঞানী বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের প্রাপ্ত মানে সামান্য পার্থক্য হয়। G এর সর্বসম্মত মান গৃহীত হয়েছে $6.673 \times 10^{-11}Nm^2\ kg^{-2}$। এর অর্থ হচ্ছে 1kg ভরের দুটি বস্তু 1m দূরে স্থাপন করলে এরা পরস্পরকে $6.673 \times 10^{-11}N$ বলে আকর্ষণ করে।

উদাহরণ ৪.১। 10kg এবং 20kg ভরের দুটি বস্তুকে 2m দূরে রাখা হল। যদি মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের মান $6.673 \times 10^{-11}Nm^2kg^{-2}$ হয় তবে বস্তু দুটির মধ্যে বলের মান বের কর।

সমাধান :

আমরা জানি

$$F = G\frac{m_1 m_2}{d^2}$$

$$\text{বা } F = \frac{6.673 \times 10^{-11}\ Nm^2kg^{-2} \times 10kg \times 20kg}{(2m)^2}$$

$$= 3.34 \times 10^{-9}N$$

উ: $3.34 \times 10^{-9}N$

এখানে,

১ম বস্তুর ভর, $m_1 = 10kg$

২য় বস্তুর ভর, $m_2 = 20kg$

দূরত্ব, $d = 2m$

মহাকর্ষীয় ধ্রুবক, $G = 6.673 \times 10^{-11}Nm^2kg^{-2}$

বল, $F = ?$

উদাহরণ ৪.২। 39.2 kg এবং 15kg ভরের দুটি গোলকের কেন্দ্রের দূরত্ব যখন 20 cm তখন এগুলো পরস্পরকে 9.81×10^{-7}N বলে আকর্ষণ করে। মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের মান বের কর।

সমাধান :

আমরা জানি,

$$F = G\frac{m_1m_2}{d^2}$$

বা $G = \frac{Fd^2}{m_1m_2}$

বা $G = \frac{9.81 \times 10^{-11}\ N \times (20 \times 10^{-2}m)^2}{39.2kg \times 15kg}$

$= 6.673 \times 10^{-11}Nm^2kg^{-2}$

উ: $6.673 \times 10^{-11}Nm^2kg^{-2}$

এখানে,

১ম বস্তুর ভর, $m_1 = 39.2kg$

২য় বস্তুর ভর, $m_2 = 15kg$

দূরত্ব, $d = 20\ cm = 20 \times 10^{-2}m$

আকর্ষণ বল, $F = 9.81 \times 10^{-7}\ N$

মহাকর্ষীয় ধ্রুবক, $G = ?$

৪.৩। অভিকর্ষজ ত্বরণ
Acceleration Due to Gravity

নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা জানি যে বল প্রযুক্ত হলে কোনো বস্তুর ত্বরণ হয়, সুতরাং অভিকর্ষ বলের প্রভাবেও বস্তুর ত্বরণ হয়। এ ত্বরণকে অভিকর্ষজ ত্বরণ বলা হয়।

অভিকর্ষ বলের প্রভাবে ভূপৃষ্ঠে মুক্তভাবে পড়ন্ত কোনো বস্তুর বেগ বৃদ্ধির হারকে অভিকর্ষজ ত্বরণ বলে। একে g দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

মাত্রা ও একক : যেহেতু অভিকর্ষজ ত্বরণ এক প্রকার ত্বরণ, সুতরাং এর মাত্রা হবে LT^{-2} এবং একক হবে ms^{-2}।

g এর সমীকরণ

ধরা যাক, M = পৃথিবীর ভর, m = ভূপৃষ্ঠে বা এর নিকটে অবস্থিত কোনো বস্তুর ভর, d = বস্তু এবং পৃথিবীর কেন্দ্রের মধ্যবর্তী দূরত্ব।

তাহলে নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র থেকে আমরা পাই, অভিকর্ষ বল, $F = G\frac{Mm}{d^2}$ ... ... (৪.২)

কিন্তু নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা পাই, অভিকর্ষ বল = ভর × অভিকর্ষজ ত্বরণ

অর্থাৎ, $F = mg$ ... ... (৪.৩)

(৪.২) ও (৪.৩) সমীকরণ থেকে পাওয়া যায়

$$mg = \frac{GMm}{d^2}$$

বা $g = \frac{GM}{d^2}$ ... ... (৪.৪)

(৪.৪) সমীকরণের ডানপাশে বস্তুর ভর m অনুপস্থিত; সুতরাং অভিকর্ষজ ত্বরণ বস্তুর ভরের ওপর নির্ভর করে না। যেহেতু G এবং পৃথিবীর ভর M ধ্রুবক, তাই g এর মান পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে বস্তুর দূরত্ব d এর ওপর নির্ভর করে। সুতরাং g এর মান বস্তু নিরপেক্ষ হলেও স্থান নিরপেক্ষ নয়।

বিভিন্ন স্থানে g এর মানের পরিবর্তন

পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে ভূপৃষ্ঠের দূরত্ব অর্থাৎ, পৃথিবীর ব্যাসার্ধ R হলে ভূপৃষ্ঠে

$$g = \frac{GM}{R^2} \quad \ldots \quad (৪.৫)$$

যেহেতু পৃথিবী সম্পূর্ণ গোলাকার নয়, মেরু অঞ্চলে একটুখানি চাপা, তাই পৃথিবীর ব্যাসার্ধ Rও ধ্রুবক নয়। সুতরাং ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র g এর মান সমান নয়। মেরু অঞ্চলে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ R সবচেয়ে কম বলে সেখানে g এর মান সবচেয়ে বেশি 9.83217 ms^{-2}। মেরু থেকে বিষুব অঞ্চলের দিকে R এর মান বাড়তে থাকায় g এর মান কমতে থাকে। বিষুব অঞ্চলে R এর মান সবচেয়ে বেশি বলে g এর মান সবচেয়ে কম, 9.78039 ms^{-2}। ক্রান্তীয় অঞ্চলে g এর মান 9.78918 ms^{-2}।

g এর আদর্শ মান

ভূপৃষ্ঠে বিভিন্ন স্থানে g এর মান বিভিন্ন বলে 45^0 অক্ষাংশে সমুদ্র সমতলে g এর মানকে আদর্শ মান ধরা হয়। g এর এ আদর্শ মান হচ্ছে 9.80665ms^{-2}। হিসাবের সুবিধার জন্য আদর্শমান ধরা হয় 9.8ms^{-2} বা 9.81ms^{-1}।

g এর তাৎপর্য :

ভূপৃষ্ঠে g এর মান 9.81ms^{-2} এর অর্থ হচ্ছে ভূপৃষ্ঠে মুক্তভাবে পড়ন্ত কোনো বস্তুর বেগ প্রতি সেকেন্ডে 9.81ms^{-1} বৃদ্ধি পায়।

উদাহরণ ৪.৩। পৃথিবীর ভর 5.975×10^{24}kg এবং ব্যাসার্ধ 6371km ধরে ভূপৃষ্ঠে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান বের কর। $G = 6.673 \times 10^{-11}\text{Nm}^2\text{kg}^{-2}$।

সমাধান :

আমরা জানি,

$$g = \frac{GM}{R^2}$$

বা $$g = \frac{6.673 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2\text{kg}^{-2} \times 5.975 \times 10^{24}\text{kg}}{(6371 \times 10^3\text{m})^2}$$

$= 9.823 \text{ Nkg}^{-1}$

$= 9.823\text{kgms}^{-2}\text{kg}^{-1}$

$= 9.823\text{ms}^{-2}$

উ: 9.823ms^{-2}

এখানে,

পৃথিবীর ভর, $M = 5.957 \times 10^{24}$kg

পৃথিবীর ব্যাসার্ধ, R = 6371km

$= 6371 \times 10^3$ m

$G = 6.673 \times 10^{-11}\text{Nm}^2\text{kg}^{-2}$

অভিকর্ষজ ত্বরণ, g = ?

৪.৪। পড়ন্ত বস্তু

Falling Bodies

কোনো বস্তুকে উপর থেকে ছেড়ে দিলে অভিকর্ষের প্রভাবে ভূমিতে পৌঁছায়। একই উচ্চতা থেকে একই সময় একটি ভারী ও একটি হালকা বস্তু ছেড়ে দিলে এগুলো একই সময়ে ভূপৃষ্ঠে পৌঁছাবে কি?

বাস্তবে এক টুকরা পাথর ও এক টুকরা কাগজ একই উচ্চতা থেকে ছেড়ে দিলে দেখা যায় যে, পাথরটি কাগজের আগেই

মাটিতে পৌঁছায়। বাতাসে বাধার জন্য এরূপ হয়। যেহেতু বস্তুর ওপর ক্রিয়াশীল অভিকর্ষজ ত্বরণ বস্তুর ভরের ওপর নির্ভর করে না, তাই কাগজ ও পাথরের ওপর ক্রিয়াশীল অভিকর্ষজ ত্বরণ একই। বাতাসের বাধা না থাকলে এগুলো অবশ্যই একই সময়ে মাটিতে পৌঁছাত।

পড়ন্ত বস্তুর সূত্রাবলি

পড়ন্ত বস্তু সম্পর্কে গ্যালিলিও তিনটি সূত্র বের করেন। এগুলোকে পড়ন্ত বস্তুর সূত্র বলে। এ সূত্রগুলো একমাত্র স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাধায় পড়ন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

বস্তুর পড়ার সময় স্থির অবস্থান থেকে পড়বে এর কোনো আদি বেগ থাকবে না। বস্তু বিনা বাধায় মুক্তভাবে পড়বে অর্থাৎ এর ওপর অভিকর্ষজ বল ছাড়া অন্য কোনো বল ক্রিয়া করবে না। যেমন–বাতাসের বাধা এর ওপর কাজ করবে না।

সূত্রগুলো এরূপ :

প্রথম সূত্র : স্থির অবস্থান এবং একই উচ্চতা থেকে বিনা বাধায় পড়ন্ত সকল বস্তু সমান সময়ে সমান পথ অতিক্রম করে।

দ্বিতীয় সূত্র : স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাধায় পড়ন্ত বস্তুর নির্দিষ্ট সময়ে (t) প্রাপ্ত বেগ (v) ঐ সময়ের সমানুপাতিক অর্থাৎ, $v \propto t$

তৃতীয় সূত্র : স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাধায় পড়ন্ত বস্তু নির্দিষ্ট সময়ে যে দূরত্ব (h) অতিক্রম করে তা ঐ সময়ের (t) বর্গের সমানুপাতিক অর্থাৎ, $h \propto t^2$

পড়ন্ত বস্তুর সূত্রাবলির ব্যাখ্যা

প্রথম সূত্র : এ সূত্রানুসারে স্থির অবস্থান থেকে কোনো বস্তু ছেড়ে দিলে তা যদি বিনা বাধায় মাটিতে পড়ে তাহলে মাটিতে পড়তে যে সময় লাগে তা বস্তুর ভর, আকৃতি বা আয়তনের ওপর নির্ভর করে না। বিভিন্ন ভরের, আকারের ও আয়তনের বস্তুকে যদি একই উচ্চতা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং এগুলো যদি বিনাবাধায় মুক্তভাবে পড়তে থাকে তাহলে সবগুলোই একই সময়ে মাটিতে পৌঁছাবে।

দ্বিতীয় সূত্র : দ্বিতীয় সূত্র থেকে পাওয়া যায় t সেকেন্ড শেষে বস্তুর বেগ $v \propto t$

অর্থাৎ, কোনো বস্তুকে যদি স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাধায় পড়তে দেওয়া হয় তবে প্রথম সেকেন্ড পরে যদি এটি v বেগ অর্জন করে তবে দ্বিতীয় সেকেন্ড পরে এটি 2v বেগ অর্জন করবে। সুতরাং t_1, t_2, t_3……সেকেন্ড পরে যদি বস্তুর বেগ যথাক্রমে v_1, v_2, v_3…… ইত্যাদি হয় তবে এ সূত্রানুসারে,

$$\frac{v_1}{t_1} = \frac{v_2}{t_2} = \frac{v_3}{t_3} \cdots\cdots\cdots = \text{ধ্রুবক।}$$

তৃতীয় সূত্র : তৃতীয় সূত্র থেকে পাওয়া যায় t সেকেন্ডে বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্ব $h \propto t^2$

অর্থাৎ, কোনো বস্তুকে যদি স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাধায় পড়তে দেওয়া হয় তবে এক সেকেন্ডে এটি h দূরত্ব অতিক্রম করে তবে দুই সেকেন্ডে এটি $h \times 2^2$ বা 4h দূরত্ব, তিন সেকেন্ডে এটি $h \times 3^2$ বা 9h দূরত্ব অতিক্রম করবে। সুতরাং t_1, t_2, t_3 …..সেকেন্ডে যদি বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্ব যথাক্রমে h_1, h_2, h_3 ……ইত্যাদি হয় তবে

$$\frac{h_1}{t_1^2} = \frac{h_2}{t_2^2} = \frac{h_3}{t_3^2} \cdots\cdots\cdots = \text{ধ্রুবক।}$$

পড়ন্ত বস্তুর গতির সমীকরণ

কোনো পড়ন্ত বস্তুর আদি বেগ যদি u হয় t সেকেন্ড পরে বেগ v হয় এবং সে সময় যদি বস্তুটি h দূরত্ব নেমে আসে তবে গতির সমীকরণগুলো হবে :

$v = u + gt$ .... (৪.৬ক)

$h = ut + \frac{1}{2}gt^2$................. .... (৪.৬খ)

$v^2 = u^2 + 2gh$....... .... (৪.৬গ)

বস্তু যদি স্থির অবস্থান থেকে পড়ে তাহলে u = 0 এবং স্থির থেকে পড়ন্ত বস্তুর গতির সমীকরণগুলো হবে :

$v = gt$ .... (৪.৭ ক)

$h = \frac{1}{2}gt^2$ .... (৪.৭ খ)

$v^2 = 2gh$ .... (৪.৭ গ)

নিক্ষিপ্ত বস্তুর সমীকরণ

কোনো বস্তুকে যদি খাড়া উপরের দিকে u আদি বেগে নিক্ষেপ করা হয় তাহলে g ঋণাতক হবে।

তখন গতির সমীকরণগুলো হবে :

$v = u - gt$ .... (৪.৮ ক)

$h = ut - \frac{1}{2}gt^2$ .... (৪.৮ খ)

$v^2 = u^2 - 2gh$ .... (৪.৮ গ)

উদাহরণ ৪.৪। 60m উঁচু দালানের ছাদ থেকে কোনো বস্তুকে ছেড়ে দিলে এটি কত বেগে ভূপৃষ্ঠকে আঘাত করবে? $g = 9.8ms^{-2}$

সমাধান :

আমরা জানি, পড়ন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে

$v^2 = u^2 + 2gh$

বা $v^2 = 0 + 2 \times 9.8\ ms^{-2} \times 60m$

$= 1176m^2s^{-2}$

$\therefore\ v = 34.29\ ms^{-1}$

উ: $34.29\ ms^{-1}$

এখানে,

আদি বেগ, $u = 0\ ms^{-1}$

অতিক্রান্ত দূরত্ব, $h = 60\ m$

শেষ বেগ, $v = ?$

$g = 9.8\ ms^{-2}$

উদাহরণ ৪.৫। $29.4ms^{-1}$ বেগে খাড়া উপরের দিকে নিক্ষিপ্ত একটি বস্তু সর্বোচ্চ কত উচ্চতায় পৌঁছাবে? এ উচ্চতায় ওঠতে বস্তুটির কত সময় লাগবে? $g = 9.8\ ms^{-2}$

সমাধান :

সর্বোচ্চ উচ্চতার বিন্দুতে কোনো বেগ থাকবে না,

অর্থাৎ, শেষ বেগ শূন্য।

আমরা জানি, উর্ধ্বমুখী বেগের জন্য

$v^2 = u^2 - 2gh$

বা $0 = (29.4ms^{-1})^2 - 2 \times 9.8ms^{-2} \times H$

এখানে,

আদি বেগ, $u = 29.4\ ms^{-1}$

শেষ বেগ, $v = 0\ ms^{-1}$

সর্বোচ্চ উচ্চতা, $H = ?$

বা $H = 44.1 \frac{m^2s^2}{ms^2}$

$= 44.1m$

আবার, $v = u - gt$

বা, $0 = 29.4ms^{-1} - 9.8ms^{-2} \times t$

$\therefore t = 3s$

উ: 44.1 m; 3s

সময়, $t = ?$

$g = 9.8\ ms^{-2}$

৪.৫ । সরল দোলক

Simple Pendulum

সরল দোলক : একটি ভারী আয়তনহীন বস্তুকণাকে ওজনহীন, নমনীয় ও অপ্রসারণশীল সূতা দিয়ে ঝুলিয়ে দিলে এটি যদি ঘর্ষণ এড়িয়ে স্বাধীনভাবে দুলতে পারে তবে তাকে সরল দোলক বলে।

কিন্তু বাস্তবে এ রকম কোনো সরল দোলক পাওয়া সম্ভব নয়। গাণিতিক সুবিধার জন্য এরূপ প্রমাণ (standard) দোলক কল্পনা করা হয়। একটি হালকা সূতার সাহায্যে কোনো দৃঢ় অবলম্বন থেকে একটি ভারী বস্তু ঝুলিয়ে দিলে এটি স্বাভাবিক অবস্থায় সোজা হয়ে ঝুলে থাকবে। সুতা সমেত বস্তুটিকে সাধারণ দোলক বা সরল দোলক বলা হয়।

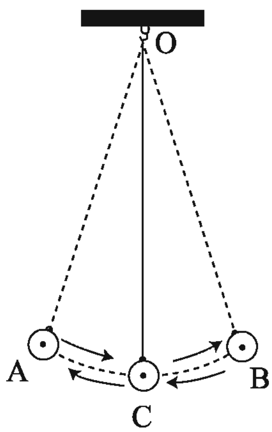
বব : যে ভারী বস্তুটিকে সুতার সাহায্যে ঝুলিয়ে সরল দোলক তৈরি করা হয় তাকে বব বা পিন্ড বলে। ৪.২ চিত্রে C হচ্ছে বব।

ঝুলন বিন্দু : যে বিন্দু থেকে সুতার সাহায্যে ববকে ঝুলানো হয় তাকে ঝুলন বিন্দু বলে। চিত্রে O ঝুলন বিন্দু।

কার্যকরী দৈর্ঘ্য : ঝুলন বিন্দু থেকে ববের ভার কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্বকে সরল দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য বা দোলক দৈর্ঘ্য বলে।

৪.২ চিত্রে OC কার্যকরী দৈর্ঘ্য L। ববটি সুষম গোলক হলে ঝুলন বিন্দু থেকে ববের পৃষ্ঠ পর্যন্ত দূরত্বের (l)সাথে ববের ব্যাসার্ধ (r) যোগ করলে কার্যকরী দৈর্ঘ্য পাওয়া যায়।

$\therefore L = l + r$



চিত্র : ৪.২

বিস্তার : একটি সরল দোলকের ববের সাম্যাবস্থান থেকে যে কোনো একদিকের সর্বোচ্চ দূরত্বকে বিস্তার বলে।

সর্বোচ্চ রৈখিক দূরত্ব দ্বারা বিস্তারকে প্রকাশ করলে তাকে রৈখিক বিস্তার বলে। চিত্রে CB বা CA রৈখিক বিস্তার। সর্বোচ্চ কৌণিক দূরত্ব দ্বারা বিস্তারকে প্রকাশ করলে তাকে কৌণিক বিস্তার বলে।

৪.২ চিত্রে $\angle COB$ বা $\angle COA$ কৌণিক বিস্তার। সাধারণত কৌণিক বিস্তারকেই সরল দোলকের বিস্তার ধরা হয়।

পূর্ণ দোলন : সরল দোলকের বব এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে গিয়ে আবার সেই প্রান্তে ফিরে এলে তাকে একটি পূর্ণ দোলন বলে। ৪.২ চিত্রে বব A থেকে B - তে গিয়ে আবার A - তে ফিরে আসলে একটি পূর্ণ দোলন হয়।

দোলন কাল : একটি পূর্ণ দোলনের জন্য সরল দোলকের যে সময় লাগে তাকে দোলন কাল বলে। একে T দিয়ে প্রকাশ

করা হয়।

কোনো সরল দোলকের N টি পূর্ণ দোলনের জন্য t সময় লাগে, তার দোলন কাল

$$T = \frac{t}{N}$$

কম্পাঙ্ক : এক সেকেন্ডে একটি সরল দোলক যতগুলো পূর্ণ দোলন সম্পন্ন করে তাকে কম্পাঙ্ক বলে। কোনো সরল দোলক t সময়ে N টি পূর্ণ দোলন সম্পন্ন করলে তার কম্পাঙ্ক

$$f = \frac{N}{t} = \frac{1}{T} \left[\because T = \frac{t}{N}\right]$$

৪.৬। সরল দোলকের সূত্রাবলি

Laws of Simple Pendulum

কৌণিক বিস্তার অল্প হলে সরল দোলকের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সূত্র চারটি প্রযোজ্য।

প্রথম সূত্র – সমকাল সূত্র : কৌণিক বিস্তার অল্প হলে এবং দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য অপরিবর্তিত থাকলে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে একটি সরল দোলকের প্রতিটি দোলনের জন্য সমান সময় লাগে। দোলনকাল কৌণিক বিস্তারের ওপর নির্ভর করে না।

দ্বিতীয় সূত্র – দৈর্ঘ্যের সূত্র : কৌণিক বিস্তার অল্প হলে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে সরল দোলকের দোলনকাল (T) - এর কার্যকরী দৈর্ঘ্য (L) - এর বর্গমূলের সমানুপাতে পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ, $T \propto \sqrt{L}$, যখন g ধ্রুব।

তৃতীয় সূত্র – ত্বরণের সূত্র : কৌণিক বিস্তার অল্প হলে এবং সরল দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য (L) অপরিবর্তিত থাকলে এর দোলনকাল (T) অভিকর্ষজ ত্বরণ (g) এর বর্গমূলের ব্যাস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়।

অর্থাৎ $T \propto \frac{1}{\sqrt{g}}$ ' যখন L ধ্রুব।

চতুর্থ সূত্র – ভরের সূত্র : কৌণিক বিস্তার অল্প হলে এবং কার্যকরী দৈর্ঘ্য অপরিবর্তিত থাকলে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে সরল দোলকের দোলনকাল ববের ভর, আয়তন, উপাদান ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে না। বিভিন্ন ভর, আয়তন বা উপাদানের ববের জন্যে দোলকের দোলনকাল একই হয়।

সরল দোলকের সূত্রাবলির ব্যাখ্যা :

প্রথম সূত্র : সূত্রানুসারে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে (অর্থাৎ, g ধ্রুব থাকলে) একটি সরল দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য অপরিবর্তিত থাকলে এবং কৌণিক বিস্তার অল্প রেখে এটিকে দুলতে দিলে এর প্রত্যেকটি দোলনের জন্য সমান সময় লাগবে। কৌণিক বিস্তার যাই হোক না কেন তার ওপর দোলনকাল নির্ভর করবে না। অর্থাৎ, $1^o, 2^o, 3^o$ বা 4^o প্রভৃতি যে কোনো বিস্তারের জন্য প্রত্যেকটি দোলনের একই সময় লাগবে।

দ্বিতীয় সূত্র : এ সূত্রানুসারে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে (অর্থাৎ, g ধ্রুব হলে আর সরল দোলকের কৌণিক বিস্তার অল্প হলে) দোলনকাল দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্যের বর্গমূলের সমানুপাতিক হবে। একটি দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য 4 গুণ করলে দোলনকাল 2 গুণ হবে, কার্যকরী দৈর্ঘ্য 9 গুণ করলে দোলনকাল 3 গুণ হবে।

[L_1, L_2, L_3, ... কার্যকরী দৈর্ঘ্যের জন্য দোলনকাল যথাক্রমে T_1, T_2, T_3 ...... হলে এ সূত্রানুসারে, $T \propto \sqrt{L}$

অর্থাৎ, $\frac{T_1}{\sqrt{L_1}} = \frac{T_2}{\sqrt{L_2}} = \frac{T_3}{\sqrt{L_3}}$ ..... = ধ্রুব

বা, $\frac{T_1^2}{L_1} = \frac{T_2^2}{L_2} = \frac{T_3^2}{L_3}$ ... = ধ্রুব]

তৃতীয় সূত্র : এ সূত্রানুসারে কোনো সরল দোলকের দৈর্ঘ্য স্থির রেখে যদি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বা ভূপৃষ্ঠ থেকে বিভিন্ন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া যায় এবং অল্প কৌণিক বিস্তারে দোলককে দুলতে দেওয়া যায় তবে দোলনকালও ভিন্ন হবে এবং তা অভিকর্ষজ ত্বরণের বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হবে।

অভিকর্ষজ ত্বরণ $\frac{1}{4}$ ভাগ হলে দোলনকাল 2 গুণ হবে,

অভিকর্ষজ ত্বরণ $\frac{1}{9}$ ভাগ হলে দোলনকাল 3 গুণ হবে।

($g_1, g_2, g_3, \ldots$ ইত্যাদি অভিকর্ষজ ত্বরণের স্থানে দোলনকাল যথাক্রমে $T_1, T_2, T_3\ldots$ ইত্যাদি হলে এই সূত্রানুসারে,

$$T \propto \frac{1}{\sqrt{g}}$$

অর্থাৎ, $T_1\sqrt{g_1} = T_2\sqrt{g_2} = T_3\sqrt{g_3} \quad \ldots = \text{ধ্রুব}$

বা, $T_1^2 g_1 = T_2^2 g_2 = T_3^2 g_3 = \quad .. = \text{ধ্রুব}$]

চতুর্থ সূত্র : এ সূত্রানুসারে সরল দোলকের দোলনকাল ববের ভর, আয়তন, ঘনত্ব ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে না। দোলকের দৈর্ঘ্য স্থির রেখে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে কৌণিক বিস্তার 4° - এর মধ্যে দুলতে দিলে তাতে বব ছোট হোক আর বড় হোক, হালকা হোক আর ভারী হোক, তামার হোক আর সোনার হোক দোলনকালের কোনো পরিবর্তন হবে না।

সরল দোলকের দোলনকালের সমীকরণ

একটি সরল দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য L, দোলনকাল T এবং কোনো স্থানের অভিকর্ষজ ত্বরণ g হলে সরল দোলকের দৈর্ঘ্যের সূত্র থেকে আমরা পাই,

$T \propto \sqrt{L}$, যখন g ধ্রুব

এবং ত্বরণের সূত্র থেকে আমরা পাই,

$T \propto \frac{1}{\sqrt{g}}$, যখন L ধ্রুব।

অনুপাতের সূত্রানুসারে,

$T \propto \sqrt{\frac{L}{g}}$, যখন L ও g উভয়ই পরিবর্তনশীল

বা, $T = K\sqrt{\frac{L}{g}}$

এখানে K একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক যার মান হিসাব করা হয়েছে 2π

$$\therefore T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \quad \ldots \quad (৪.৯)$$

৪.৭। সরল দোলকের সাহায্যে g এর মান নির্ণয়

Determination of g by Simple pendulum

সূত্র : অভিকর্ষ বলের প্রভাবে ভূপৃষ্ঠে মুক্তভাবে পড়ন্ত কোনো বস্তুর বেগ বৃদ্ধির হারকে অভিকর্ষজ ত্বরণ বলে। সরল দোলকের দোলনকালের সমীকরণ থেকে আমরা জানি,

$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$

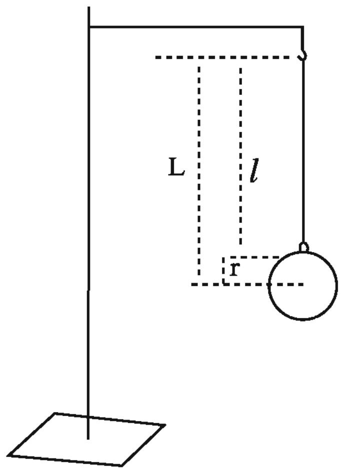
বা, $T^2 = 4\pi^2 \frac{L}{g}$

বা, $g = 4\pi^2 \frac{L}{T^2}$ ... ... (৪.১০)

এ সমীকরণ থেকে কোনো স্থানে L কার্যকরী দৈর্ঘ্যের সরল দোলকের দোলনকাল T নির্ণয় করে ঐ স্থানের অভিকর্ষজ ত্বরণ g নির্ণয় করা যায়।

সরল দোলক তৈরি :

স্ট্যান্ডের সাহায্যে একটি হুক থেকে কোনো শক্ত সুতা দ্বারা একটি ক্ষুদ্র ভারী গোলক ঝুলিয়ে সরল দোলক তৈরি করা হয় (চিত্র ৪.৩)। এ গোলককে বব বলে।



চিত্র : ৪.৩

L নির্ণয় :

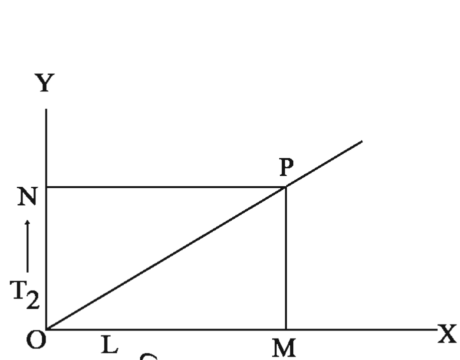
দোলকের ঝুলন বিন্দু থেকে ববের ভারকেন্দ্র পর্যন্ত দৈর্ঘ্যকে সরল দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য L বলে। প্রথমে একটি মিটার স্কেলের সাহায্যে সুতার ঝুলন বিন্দু অর্থাৎ, হুক থেকে ববের উপরিপৃষ্ঠ পর্যন্ত দূরত্ব l মেপে নেওয়া হয়। এরপর একটি স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে ববের ব্যাস নির্ণয় করে ব্যাসার্ধ r বের করা হয়। তাহলে দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য হয় $L = l + r$,

T নির্ণয় : সরল দোলকের একটি পূর্ণ দোলনের যে সময় লাগে তাকে দোলনকাল বলে। দোলকটিকে সাম্যাবস্থা থেকে একপাশে এমনভাবে একটু টেনে ছেড়ে দেওয়া হয় যাতে এটি দুলতে থাকে এবং কৌণিক বিস্তার খুব অল্প হয়। একটি (স্টপওয়াচ) থামা ঘড়ির সাহায্যে কয়েকটি দোলনের যেমন 20 বা 25 দোলনের সময় নির্ণয় করে ঐ সময়কে দোলন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে একটি দোলনের সময় অর্থাৎ, দোলনকাল T বের করা হয়।

গড় $\frac{L}{T^2}$ নির্ণয় : সুতার দৈর্ঘ্য পরিবর্তন করে দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য L পরিবর্তন করা হয় এবং বিভিন্ন কার্যকরী দৈর্ঘ্যের জন্য দোলনকাল T নির্ণয় করে প্রতি ক্ষেত্রে $\frac{L}{T^2}$ বের করে গড় $\frac{L}{T^2}$ নির্ণয় করা হয়। এ গড় মান (৪.১০) সমীকরণে বসিয়ে g এর মান হিসাব করা হয়।

লেখচিত্র থেকে L ও T^2 নির্ণয় :

একটি ছক কাগজের X অক্ষের দিকে L এর বিভিন্ন মান এবং Y অক্ষের দিকে আনুষঙ্গিক T^2 এর মান স্থাপন করে লেখচিত্র অঙ্কন করা হয়। লেখচিত্রটি মূলবিন্দুগামী একটি সরলরেখা হয়। এ সরলরেখার উপর যে কোনো একটি বিন্দু P নিয়ে P থেকে X অক্ষের উপর PM এবং Y অক্ষের উপর PN লম্ব টানা হয় [চিত্র ৪.৪]।



চিত্র : ৪.৪

তাহলে যে কোনো দৈর্ঘ্য L= OM এর জন্য দোলনকালের বর্গ T^2 = ON পাওয়া যায়।

ফলাফল : লেখচিত্র থেকে প্রাপ্ত এ L ও T^2 এর মান (৪.১০) সমীকরণে বসিয়ে g এর মান হিসাব করা হয়।

$$g = 4\pi^2 \frac{L}{T^2}$$
$$= 4\pi^2 \frac{OM}{ON}$$

উদাহরণ : ৪.৬। একটি সরল দোলকের দৈর্ঘ্য 2.45m । কোনো স্থানে অভিকর্ষজ ত্বরণ $9.8ms^{-2}$ হলে ঐ স্থানে দোলকটির দোলনকাল নির্ণয় কর।

সমাধান :

আমরা জানি,

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$
$$= 2 \times 3.14 \times \sqrt{\frac{2.45m}{9.8ms^{-2}}}$$
$$= 3.14s$$

উ: 3.14s

এখানে,

কার্যকরী দৈর্ঘ্য, L = 2.45m

অভিকর্ষজ ত্বরণ, $g = 9.8ms^{-2}$

দোলন কাল, T = ?

উদাহরণ ৪.৭। একটি সরল দোলকের ববের ব্যাস 0.58cm এবং সূতার দৈর্ঘ্য 99cm। কোনো স্থানে দোলকটির একটি পূর্ণ দোলনের জন্য 2s সময় লাগে। ঐ স্থানে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান নির্ণয় কর।

সমাধান :

আমরা জানি,

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

বা, $T^2 = 4\pi^2 \frac{L}{g}$

বা, $g = 4\pi^2 \frac{L}{T^2}$

$$= 4 \times 9.87 \times \frac{99.29 \times 10^{-2}\ m}{(2s)^2}$$
$$= 9.8\ ms^{-2}$$

উ: $9.8\ ms^{-2}$

এখানে,

ববের ব্যাস d = 0.58cm

$\therefore$ ববের ব্যাসার্ধ, $r = \frac{d}{2} = 0.29cm$

সূতার দৈর্ঘ্য, $l = 99$ cm

$\therefore$ কার্যকরী দৈর্ঘ্য, $L = l + r$

= 99cm + 0.29 cm

= 99.29 cm

$= 99.29 \times 10^{-2}m$

দোলনকাল, T = 2s

অভিকর্ষজ ত্বরণ, g = ?

৪.৮। ওজন (Weight)

ভর : প্রত্যেক বস্তু পদার্থ দ্বারা গঠিত। বস্তুর মধ্যে পদার্থের পরিমাণই হচ্ছে এর ভর। ভর কিলোগ্রাম (kg) এককে নিক্তি দ্বারা পরিমাপ করা হয়। ভর হচ্ছে একটি ভৌত রাশি যা ভূপৃষ্ঠে বা ভূপৃষ্ঠের উপরে বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তিত হয় না। 75 kg ভরের একজন মহাশূন্যচারীর ভর চাঁদে কিংবা পৃথিবীর বা চাঁদের কক্ষপথেও 75 kg-ই থাকবে। মহাশূন্যচারী কতটুকু পদার্থ দিয়ে তৈরি স্থান পরিবর্তনে তার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না বলে তার ভর সর্বত্র অপরিবর্তিত থাকে।

ওজন : কোনো বস্তুকে পৃথিবী যে বল দ্বারা তার কেন্দ্রের দিক আকর্ষণ করে তাকে বস্তুর ওজন বলে।

কোনো বস্তুর ভর m এবং পৃথিবীর কোনো স্থানে অভিকর্ষজ ত্বরণ g হলে ঐ স্থানে বস্তুর ওজন W হবে।

$$W = mg$$

যেহেতু ওজন একটি বল, সুতরাং এটি একটি ভেক্টর রাশি। এর দিক পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে। ওজনের একক হল বলের একক অর্থাৎ, নিউটন (N)।

যেহেতু বস্তুর ভর একটি ধ্রুব রাশি, সুতরাং এর ওজন অভিকর্ষজ ত্বরণ g এর ওপর নির্ভর করে। যেসব কারণে অভিকর্ষজ ত্বরণের পরিবর্তন ঘটে সেসব কারণে বস্তুর ওজনও পরিবর্তিত হয়। বস্তুর ওজন বস্তুর মৌলিক ধর্ম নয়। কোনো বস্তুর ওজন থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে, পৃথিবীর কেন্দ্রে অভিকর্ষজ ত্বরণ শূন্য, তাই সেখানে বস্তুর ওজনও শূন্য।

ওজনের বিভিন্নতা

বস্তুর ওজন অভিকর্ষজ ত্বরণ g এর ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং যে সকল কারণে অভিকর্ষজ ত্বরণের পরিবর্তন ঘটে সে সকল কারণে বস্তুর ওজনও পরিবর্তিত হয়। [বস্তুর ওজন বস্তুর মৌলিক ধর্ম নয়।] স্থান ভেদে বস্তুর ওজনের পরিবর্তন হয়। যে সকল কারণে ওজনের পরিবর্তন হয় নিচে তা বর্ণনা করা হল।

(ক) ভূ পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে :

পৃথিবীর আকৃতি ও আহ্নিক গতির জন্য বিভিন্ন স্থানে বস্তুর ওজন বিভিন্ন হয়।

(১) পৃথিবীর আকৃতির জন্য : পৃথিবীর সুষম গোলক না হওয়ায় পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে ভূপৃষ্ঠের সকল স্থান সমদূরে নয়। যেহেতু g এর মান পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে দূরত্বের ওপর নির্ভর করে, তাই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে g এর মানের পরিবর্তন হয়। বিষুবীয় অঞ্চলের পৃথিবীর ব্যাসার্ধ সবচেয়ে বেশি হওয়ায় g এর মান সবচেয়ে কম।

সুতরাং বিষুবীয় অঞ্চলে কোনো বস্তুর ওজন সবচেয়ে কম হয়। বিষুবীয় অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলের দিকে যত বেশি যাওয়া যায়, ব্যাসার্ধ তত কমতে থাকে এবং g এর মান বাড়তে থাকে। এর ফলে বস্তুর ওজনও বাড়তে থাকে। মেরু অঞ্চলে ব্যাসার্ধ সবচেয়ে কম হওয়ায় g এর মান মেরু অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি ফলে ওজনও সবচেয়ে বেশি হয়।

(২) পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্য : গাণিতিক হিসেব থেকে দেখা যায় যে, পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্য অভিকর্ষজ ত্বরণ বিষুবীয় অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলের দিকে ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে বস্তুর ওজনও বৃদ্ধি পায়।

(খ) ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতর কোনো স্থানে : গাণিতিক হিসেব থেকে দেখা যায় যে, ভূপৃষ্ঠ থেকে যত উপরে ওঠা যায় অভিকর্ষজ ত্বরণের মানও তত কমতে থাকে। এর ফলে ভূপৃষ্ঠ থেকে যত উপরে ওঠা যায় বস্তুর ওজনও তত কমতে থাকে। এই কারণে পাহাড় বা পর্বতশীর্ষে বস্তুর ওজন কম হয়।

(গ) পৃথিবীর অভ্যন্তরে কোনো স্থানে : গাণিতিক হিসাব থেকে দেখানো যায় যে, ভূপৃষ্ঠে থেকে যত নিচে যাওয়া যায় অভিকর্ষজ ত্বরণের মান ততই কমতে থাকে। এর ফলে পৃথিবীর যত অভ্যন্তরে যাওয়া যায় বস্তুর ওজন তত কমতে থাকে। এ কারণে খনিতে কোনো বস্তুর ওজন কম হয়। পৃথিবীর কেন্দ্রে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান শূন্য। সুতরাং পৃথিবীর কেন্দ্রে যদি কোনো বস্তুকে নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে বস্তুর ওপর পৃথিবীর কোনো আকর্ষণ থাকবে না, অর্থাৎ, বস্তুর ওজন শূন্য হবে।

ভর ও ওজনের পার্থক্য

Distinction between Mass and Weight

ভর	ওজন
১। বস্তুর ভর হল বস্তুতে মোট পদার্থের পরিমাণ।	১। বস্তুর ওজন হল বস্তুর ওপর পৃথিবীর আকর্ষণ বল।
২। ভর একটি স্কেলার রাশি এবং এটি একটি মৌলিক রাশি।	২। ওজন একটি ভেক্টর রাশি এবং এটি একটি লব্ধ রাশি।
৩। ভরের মাত্রা [M]।	৩। ওজনের মাত্রা $[MLT^{-2}]$।
৪। ভরের একক কিলোগ্রাম (kg)	৪। ওজনের একক নিউটন (N)
৫। বস্তুর ভরের কোনো পরিবর্তন হয় না।	৫। স্থানভেদে বস্তুর ওজন পরিবর্তিত হয়।
৬। কতগুলো নির্দিষ্ট ভরের সাথে তুলনা করে সাধারণ নিক্তির সাহায্যে বস্তুর ভর পরিমাপ করা হয়।	৬। স্প্রিং নিক্তির সাহায্যে বস্তুর ওজন পরিমাপ করা হয়

৪.৯ লিফটে ও মহাশূন্যে ওজনের তারতম্য : ওজনহীনতা

Variation of Weight in lift and space : Weightlessness

যেহেতু কোনো বস্তুর ওপর পৃথিবীর আকর্ষণ বলই বস্তুর ওজন, তাই পৃথিবীর এ আকর্ষণ বল তথা ওজন নির্ভর করে অভিকর্ষজ ত্বরণ g এর মানের ওপর। ইতোপূর্বে আমরা ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে ভূপৃষ্ঠের উপরে এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরে g এর মানের পরিবর্তনের জন্য ওজনের তারতম্যের কথা আলোচনা করেছি। কোনো বস্তুর ওপর যদি পৃথিবীর আকর্ষণ বল না থাকে তাহলেই বস্তু ওজনহীন হবে। এরূপ ঘটনা ঘটতে পারে কেবল অসীম দূরত্বে কিংবা ভূকেন্দ্রে যেখানে $g = 0$ কিংবা পৃথিবী এবং চাঁদ বা অন্য কোনো গ্রহের মাঝামাঝি স্থানে যেখানে কোনো বস্তুর ওপর পৃথিবীর আকর্ষণ বল চাঁদের বা অন্য গ্রহের আকর্ষণ বল দ্বারা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

ভূপৃষ্ঠের কোনো একটি স্থানে g এর মান নির্দিষ্ট, ফলে সেখানে কোনো ব্যক্তির ওজনও নির্দিষ্ট। তা সত্ত্বেও সেখানে কোনো ব্যক্তির ওজনের ভিন্নতা অনুভব করতে পারেন এবং নিজেকে ওজনহীনও মনে করতে পারেন। আসলে ওজন আর ওজন অনুভব করা এক কথা নয়। পৃথিবীতে কোনো ব্যক্তির ওপর পৃথিবীর আকর্ষণ বল থাকবেই ফলে তার ওজন থাকবেই কিন্তু তিনি সেই ওজন অনুভব করবেন কেবলমাত্র তখনই যখন তার ওজনের সমান ও বিপরীতমুখী কোনো প্রতিক্রিয়া বল তার ওপর প্রযুক্ত হবে। আমরা যখন কোনো কিছুর উপর দাঁড়াই যেমন ঘরের মেঝে বা কোনো টেবিলের উপর তখন ঐ মেঝে বা টেবিলের উপর আমরা নিচের দিকে আমাদের ওজনের সমান একটা বল প্রয়োগ করি। এখন এ মেঝে বা টেবিলও নিউটনের তৃতীয় সূত্রানুসারে আমাদের উপর আমাদের ওজনের সমান ও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া বল উপরের

দিকে প্রয়োগ করে। আমরা সেই বল অনুভব করি, অর্থাৎ আমরা ওজন অনুভব করি। অনুরূপভাবে আমরা যখন কোনো অবলম্বন যেমন গাছের ডাল বা ঘরের ছাদের কোনো হুক বা কার্নিশ থেকে ঝুলে থাকি, তখন আমরা ঐ অবলম্বনের ওপর নিচের দিকে আমাদের ওজনের সমান বল প্রয়োগ করি। নিউটনের তৃতীয় সূত্রানুসারে ঐ অবলম্বন ও আমাদের ওপর আমাদের ওজনের সমান ও বিপরীতমুখী বল উপরের দিকে প্রয়োগ করে। ফলে আমরা ওজন অনুভব করি। এখন যদি ঐ মেঝে বা ঐ অবলম্বন আমাদের ওপর আমাদের ওজনের চেয়ে কম বা বেশি বল প্রয়োগ করে, তাহলে আমরাও আমাদের ওজনের চেয়ে যথাক্রমে কম বা বেশি বল অনুভব করব, অর্থাৎ, আমরা নিজেদেরকে হালকা বা ভারী অনুভব করব। আর যদি আমাদের ওজনের বিপরীত দিকে কোনো বল প্রয়োগ না করে তাহলে আমরা নিজেদেরকে ওজনহীন অনুভব করব। এ ঘটনা ঘটে যখন আমরা দুর্ঘটনায় ছাদ থেকে বা গাছ থেকে মুক্তভাবে নিচে পড়ি বা ডাইভিং বোর্ড থেকে সুইমিং পুলে লাফ দেই। কেননা নিচে পড়ার সময় আমরা কোনো মেঝে বা অবলম্বনের উপর বল প্রয়োগ করি না, ফলে কোনো মেঝে বা অবলম্বন আমাদের ওপর ওজনের বিপরীত কোনো বল প্রয়োগ করে না। এতে আমরা ওজনহীনতা অনুভব করি।

আমরা যখন লিফটে চড়ে উঁচু দালানে ওঠা নামা করি তখন আমরা ওজনের তারতম্য অনুভব করি। আমরা যখন কোনো স্থির লিফটে দাঁড়াই তখন আমরা লিফটের মেঝের উপর আমাদের ওজনের সমান বল mg প্রয়োগ করি, লিফটও আমাদের ওপর ওজনের সমান ও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া বল প্রয়োগ করে– আমরা আমাদের ওজনের অস্তিত্ব টের পাই। কিন্তু লিফটি যদি উপরের দিকে ওঠতে থাকে তখন স্থির অবস্থান থেকে উপরের দিকে যাত্রা করায় লিফটির উপরের দিকে একটি ত্বরণ a সৃষ্টি হয় এবং লিফটের সাপেক্ষে আমাদের ত্বরণ হয় $(g + a)$। এ বর্ধিত ত্বরণের জন্য আমরা লিফটের উপর আমাদের ওজনের চেয়ে বেশি বল $m\,(g + a)$ প্রয়োগ করি। তখন লিফটও আমাদের ওপর বিপরীতমুখী যে প্রতিক্রিয়া বল প্রয়োগ করে তা আমাদের ওজন mg এর চেয়ে বেশি হয় এবং নিজেদেরকে ভারী অনুভব করি। কিন্তু এর পর লিফট যখন সমবেগে উপরের দিকে ওঠতে থাকে তখন তার কোনো ত্বরণ থাকে না, ফলে আমরা আর ওজনের চেয়ে অতিরিক্ত বল অনুভব করি না, কেবল ওজনই অনুভব করি। অপরপক্ষে লিফট যখন নিচে নামতে শুরু করে তখন স্থির অবস্থান থেকে একটি ত্বরণ a সৃষ্টি হয় এবং লিফটের সাপেক্ষে আমাদের ত্বরণ হয় $(g–a)$। এ কম ত্বরণ নিয়ে আমরা লিফটের উপর আমাদের ওজনের চেয়ে কম বল $m\,(g–a)$ প্রয়োগ করি এবং লিফটও আমাদের উপর বিপরীত দিকে ওজনের চেয়ে কম বল প্রয়োগ করে। ফলে, আমরা হালকা বোধ করি অর্থাৎ, আমাদের ওজন কম মনে হয়। লিফট যদি মুক্তভাবে নিচে পড়ে অর্থাৎ, লিফটেরও যদি g ত্বরণ হয়, তবে লিফটের সাপেক্ষে আমাদের ত্বরণ হবে $(g\text{-}g)$ অর্থাৎ, শূন্য। ফলে আমরা লিফটের উপর কোনো বল প্রয়োগ করব না। তখন লিফটও আমাদের ওজনের বিপরীতে আমাদের ওপর কোনো প্রতিক্রিয়া বল প্রয়োগ করবে না এবং আমরা নিজেদেরকে ওজনহীন মনে করব। কোনো লিফটের কেবল বা দড়ি ছিঁড়ে গিয়ে লিফটটি যদি অভিকর্ষের প্রভাবে নিচে পড়ে তখন এ অবস্থার উদ্ভব হবে। এ অবস্থায় যদি লিফটের ছাদ থেকে ঝুলন্ত বা লিফটে দাঁড়ানো কোনো ব্যক্তির হাতে ধরা স্প্রিং নিক্তি থেকে একটি বস্তু ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে দেখা যাবে স্প্রিং নিক্তির কাটা শূন্য দাগে অবস্থান করছে। অর্থাৎ, বস্তুটির ওজন শূন্য।

আর যদি এমন ঘটনা ঘটে যে লিফটি g এর চেয়ে বেশি ত্বরণ a সহকারে নিচে নামে সে ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থানের সাপেক্ষে লিফটের নিচের দিকে ত্বরণ হবে $(a–g)$ এবং লিফটের মেঝে আমাদের পা থেকে $(a–g)$ ত্বরণে নিচের দিকে সরে যাবে, ফলে আমরা শূন্যে ভাসতে থাকবো এবং আমাদের মাথা লিফটের ছাদে ঠেকে যাবে।

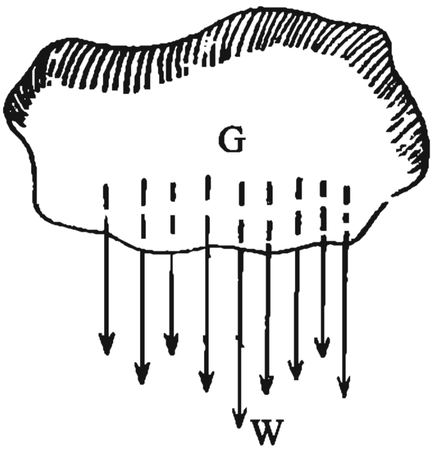
মহাশূন্যযানের পৃথিবী বা চাঁদকে প্রদক্ষিণ করার ও লিফটের মুক্তভাবে নিচে পড়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। মহাশূন্যচারীরা মহাশূন্যযানে করে পৃথিবীকে একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় বৃত্তাকার কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে থাকেন। এ বৃত্তাকার গতির জন্য মহাশূন্যযানের পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে ঐ উচ্চতায় g এর মানের সমান মানের একটি ত্বরণ হয়। এ অবস্থায় মহাশূন্যযানের দেয়ালের সাপেক্ষে মহাশূন্যচারীর ত্বরণ $(g–g) = 0$ হয় এবং মহাশূন্যচারী মহাশূন্যযানের দেয়াল বা মেঝেতে কোনো বল প্রয়োগ করেন না। ফলে তিনি তাঁর ওজনের বিপরীত কোনো প্রতিক্রিয়া বলও অনুভব করেন না। তাই তিনি ওজনহীনতা অনুভব করেন। এ অবস্থায় মহাশূন্যযান থেকে কোনো বস্তুকে ছেড়ে দিলে পড়ে না, গ্লাসের পানি উপুড় করলেও পড়বে না অর্থাৎ, সব কিছুই ওজনহীন মনে হবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কোনো কিছুই ওজনহীন হয় না,

কেননা ঐ অবস্থানেও মহাশূন্যচারীর ভর আছে, ঐ স্থানে অভিকর্ষজ ত্বরণ g আছে, ফলে পৃথিবীর আকর্ষণ তথা ওজন আছে। কেবল মহাশূন্যযান g ত্বরণে গতিশীল হওয়ার কারণে এ আপাতত ওজনহীনতার উদ্ভব হচ্ছে। যদি ঐ স্থানে মহাশূন্যযান বৃত্তাকার পথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ না করে, কিংবা পৃথিবীর দিকে মুক্তভাবে না পড়ে স্থির দাড়িয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু মহাশূন্যচারী অবশ্যই তাঁর ওজন টের পাবেন।

৪.১০ অভিকর্ষ কেন্দ্র

Centre of Gravity

বল সব সময় একটি বিন্দুতে কাজ করে, এ বিন্দুকে বলের ক্রিয়া বিন্দু বলা হয়। পদার্থের ওজন বা অভিকর্ষ বলও একটি বল। সুতরাং ওজনও একটি বিন্দুতে ক্রিয়া করে। এ নির্দিষ্ট বিন্দুকেই বস্তুর অভিকর্ষ কেন্দ্র বলা হয়। বস্তুর অভিকর্ষ কেন্দ্র বস্তুর অবস্থানের ওপর নির্ভর করে না। যেভাবেই বস্তুটিকে রাখা হোক না কেন অভিকর্ষ কেন্দ্র একটিই এবং একই জায়গায় হবে (চিত্র ৪.৫)

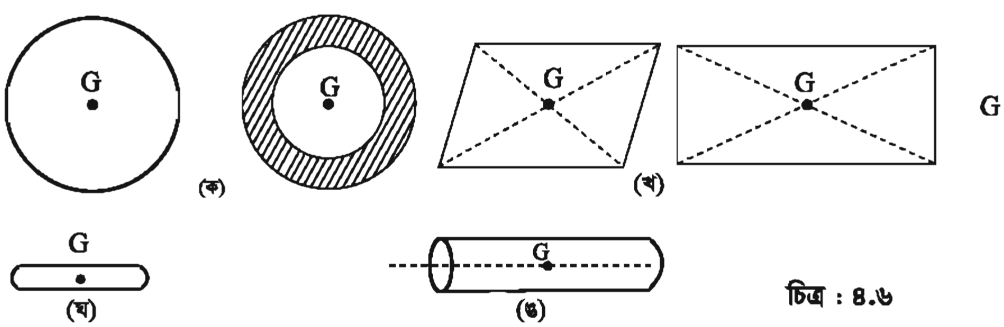


চিত্র : ৪.৫

একটি বস্তুকে যেভাবেই রাখা হোক না কেন বস্তুর ভিতরে অবস্থিত যে বিন্দুর মধ্য দিয়ে মোট ওজন বা অভিকর্ষ বল ক্রিয়া করে সেই বিন্দুকে বস্তুর অভিকর্ষ কেন্দ্র বলে। প্রত্যেক বস্তুই অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুকণার সমষ্টি। প্রত্যেকটি কণাই পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। পর পর অবস্থিত দুটি কণার মধ্যকার দূরত্বের তুলনায় কণাগুলো থেকে পৃথিবীর কেন্দ্র অনেক দূরে থাকায় কণা দুটির ওজনের অভিমুখ সমমুখী ও সমান্তরাল বলে ধরা যায় [চিত্র ৪.৫] এদের লব্ধি আর একটি সমান্তরাল রেখা বরাবর ক্রিয়াশীল হবে। এভাবে সব কয়টি কণার জন্য লব্ধি বল হিসেব করলে সেই লব্ধি বল বস্তুর মধ্যস্থিত যে বিন্দুতে ক্রিয়া করবে সেই বিন্দুকে (G) বস্তুর অভিকর্ষ কেন্দ্র বলে। কোনো বস্তুর অভিকর্ষ কেন্দ্র এর ভিতরে এবং বস্তুটিকে যেভাবেই রাখা হোক না কেন, একটি মাত্র নির্দিষ্ট বিন্দুতেই অবস্থিত হবে।

কয়েকটি বস্তুর অভিকর্ষ কেন্দ্র :

৪.৬ চিত্রে কয়েকটি সুষম জ্যামিতিক আকার বিশিষ্ট বস্তুর অভিকর্ষ কেন্দ্র G দেখানো হল :



চিত্র : ৪.৬

(i) সুষম বৃত্তের, আংটির বা গোলকের অভিকর্ষ কেন্দ্র এদের জ্যামিতিক কেন্দ্রে অবস্থিত। [চিত্র ৪.৬ (ক)]

(ii) সুষম সামান্তরিকের ক্ষেত্রের অভিকর্ষ কেন্দ্র এর কর্ণদ্বয়ের ছেদবিন্দুতে অবস্থিত [৪.৬ (খ)]

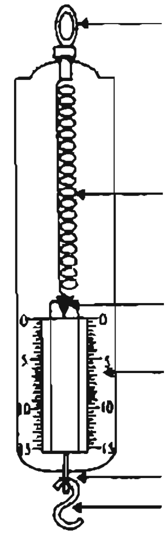
(iii) সুষম ত্রিভুজাকৃতি পাতের অভিকর্ষ কেন্দ্র এর মধ্যমাগুলোর ছেদবিন্দুতে অবস্থিত [চিত্র ৪.৬ (গ)]

(iv) সুষম দন্ডের মধ্য বিন্দুই এর অভিকর্ষ কেন্দ্র [চিত্র ৪.৬ (ঘ)]।

(v) সুষম বেলনাকৃতি বস্তুর অভিকর্ষ কেন্দ্র এর অক্ষের মধ্য বিন্দুতে অবস্থিত [চিত্র ৪.৬ (ঙ)]।

৪.১১ স্প্রিং নিক্তি
Spring Balance

গঠন : স্প্রিং নিক্তি একটি বিশেষ ধরনের নিক্তি। এ নিক্তির সাহায্যে কোনো বস্তুর ওজন সরাসরি মাপা যায়। এ নিক্তিতে একটি ইস্পাতের পেচানো স্প্রিং থাকে। এ স্প্রিং এর এক প্রান্তে একটি রিং বা আংটা লাগানো থাকে। অপর প্রান্তে একটি ধাতুর শালাকার সাহায্যে একটি হুক লাগানো থাকে। আংটার সাহায্যে স্প্রিংটি ঝুলানো হয়। যে বস্তুকে ওজন করতে হবে তা নিচের হুকে ঝুলানো হয়।



চিত্র : ৪.৭

কার্যপ্রণালি : আমরা জানি স্প্রিংকে টানলে এর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়। এ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি এর ওপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক। স্প্রিং এর হুকে বস্তু ঝুলালে স্প্রিংটির দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাবে। স্প্রিং এর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হবে হুকে ঝুলানো বস্তুর ওজনের সমানুপাতিক। বস্তুর ওজন বেশি হলে দৈর্ঘ্য বেশি বৃদ্ধি পাবে আর ওজন কম হলে দৈর্ঘ্য কম বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং স্প্রিং এর বৃদ্ধির পরিসর জেনে বস্তুর ওজনের পরিমাপ নির্ণয় করা যায়। স্প্রিং এর উপরের প্রান্তে একটি সূচক বা কাঁটা লাগান থাকে। এ কাঁটাটি স্প্রিং এর দৈর্ঘ্যের হ্রাস-বৃদ্ধির (ওজন হ্রাস ও বৃদ্ধির ফলে) অনুসারে একটি স্কেল বরাবর ওঠানামা করতে পারে। স্কেলটি নিউটনে দাগাঙ্কিত থাকে। হুকে কোনো বস্তু ঝুলানো অবস্থায় কাঁটাটি স্কেলের উপর যে পাঠ নির্দেশ করে, সেটিই বস্তুর ওজন।

কোনো কোনো স্প্রিং নিক্তিতে স্কেলটি কিলোগ্রামে দাগাঙ্কিত থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে নিউটনে ওজন পেতে হলে কিলোগ্রাম প্রাপ্ত পাঠ 9.8 দিয়ে গুণ করে নিতে হয়।

ব্যবহার : স্প্রিং নিক্তির সাহায্যে সহজে যে কোনো স্থানে কোনো বস্তুর ওজন নির্ণয় করা হয়। স্প্রিং-নিক্তির সাহায্যে কোনো বল পরিমাপ করা যায়।

৪.১২। মানুষের মহাশূন্য যাত্রার ইতিহাস
History of Man's Space Travel

আকাশের অসংখ্য উজ্জ্বল বস্তু মানুষকে যুগে যুগে অভিভূত করেছে, মানুষ তাদের চিনতে চেষ্টা করেছে, চেষ্টা করেছে জয় করতে। মর্ত্যের মানুষের আকাশ জয়ের এই অদম্য বাসনা থেকেই সম্ভব হয়েছে মানুষের মহাশূন্য যাত্রা। মহাশূন্যে আছে নক্ষত্র, গ্রহ, গ্যাস, ধূলিকণা, উল্কা, ধূমকেতু, গ্রহাণুপুঞ্জ, কৃষ্ণগহ্বর ও বিকিরণ।

মহাশূন্য যাত্রার পূর্বে বা চন্দ্রাভিযানের বহু পূর্বে মানুষ কল্পনায় চাঁদে গিয়েছে, তার অনেক দৃষ্টান্ত আমরা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীতে পাই। মানুষের বহু আকাঙ্খিত ও বহু প্রতিক্ষীত এ স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেয় মহাশূন্য অভিযান ও চাঁদে অবতরণের মাধ্যমে।

মানুষের মহাশূন্য যাত্রার ইতিহাস খুব পুরোনো নয়, একেবারেই নতুন। তোমরা জেনে অবাক হবে যে, মহাশূন্যযাত্রার প্রথম পদক্ষেপটির সূচনা হয়েছে ১৯৫৭ সালে ৪ অক্টোবর। এ যাত্রার সূচনা করে তৎকালীন সোভিয়েট ইউনিয়ন, মহাশূন্যে স্পুটনিক–1 (Sputnik-1) নামক কৃত্রিম উপগ্রহ (Satellite) উৎক্ষেপণের মাধ্যমে। স্পুটনিক শব্দের অর্থ Fellow travellers বা ভ্রমণসঙ্গী। পৃথিবীর উপগ্রহ হল চাঁদ। এটি পৃথিবীর স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক উপগ্রহ (natural satellite)। 'স্যাটেলাইট' বলতে অবশ্য এখন কৃত্রিম উপগ্রহকেই বোঝায়। উপগ্রহ পৃথিবীকে ঘিরে যে পথে আবর্তিত হয় তার নাম কক্ষপথ। স্পুটনিককে I-কে পাঠানো হয় আন্তর্জাতিক ভূগোলবর্ষে। উদ্দেশ্য ছিল ভৌগোলিক অনুসন্ধান বা গবেষণা। এর কয়েক মাস পর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র 'এক্সপ্লোরার' নামক একটি মহাশূন্যযান উৎক্ষেপণ করে। এটি ছিল খুবই ক্ষুদ্র, মাত্র কয়েক কিলোগ্রাম ভরবিশিষ্ট।

স্পুটনিক–I উৎক্ষেপণের কয়েক সপ্তাহ পর তৎকালীন সোভিয়েট ইউনিয়ন স্পুটনিক–II মহাশূন্যে প্রেরণ করে। স্পুটনিক–II এর যাত্রী ছিল 'লাইকা' (Laika) নামের একটি কুকুর। লাইকার ওপর পরীক্ষণের তথ্য মহাশূন্যে মানুষ প্রেরণে উৎসাহিত করে। পৃথিবীর প্রথম মহাশূন্যচারী মানুষ হলেন, সোভিয়েট ইউনিয়নের ইউরি গ্যাগারিন (Yuri Gagarin)। স্পুটনিক উৎক্ষেপণের প্রায় চার বৎসর পর গ্যাগারিনকে মহাশূন্যে পাঠানো হয়। ১৯৬১ সালের ১২ এপ্রিল ইউরি গ্যাগারিন পৃথিবীকে পরিক্রমণ করে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অ্যালেন শেপার্ড (Alan shepard) ১৯৬১ সালের ৫ মে মহাশূন্যে গমন করেন। এরপর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও তৎকালীন সোভিয়েট ইউনিয়ন অনেক মহাশূন্যযান পাঠায়। নিচের সারণিতে মহাশূন্যযাত্রার ইতিহাস তুলে ধরা হল :

সারণি : মহাশূন্য যাত্রার কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

ক্রমিক নং	উৎক্ষেপণ তারিখ	মহাশূন্য যানের নাম	সাফল্যের প্রকৃতি
1.	4.10.1957	স্পুটনিক – I	মহাশূন্যে পাঠানো প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ।
2.	3.11.1957	স্পুটনিক – II	জীবন্ত কুকুর বহনকারী প্রথম মহাশূন্য যান।
3.	18.12.1958	স্কোর	মহাশূন্যে পাঠানো প্রথম যোগাযোগ উপগ্রহ।
4.	4.10.1959	লুনা – 3	প্রথম উপগ্রহ যা চাঁদের অদৃশ্যমান অংশের ছবি পাঠায়।
5.	12.4.1961	ভস্টক – 1	মানুষ নিয়ে যাওয়া প্রথম মহাশূন্য যাত্রা।
6.	4.12.1963	স্টক – 6	প্রথম মহিলা মহাশূন্যচারীবাহী মহাশূন্য যান। এ মহিলা ছিলেন সোভিয়েট ইউনিয়নের ভেলেনাটনা টেরেসকোভা
7.	6.4.1965	ইনটেলসেট – I	বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের জন্য পাঠানো প্রথম যোগাযোগ উপগ্রহ।
8.	16.11.1965	ভেনেরা – 3	ভেনাস গ্রহে অবতরণকারী প্রথম মহাশূন্যযান।
9	11.11.1968	লুনা – 9	প্রথম সফলভাবে চাঁদের পৃষ্ঠে অনুচ্চ অবতরণকারী (soft landing) মহাশূন্য অনুসন্ধানী যান।
10.	14.1.1969	সয়োজ – 4	প্রথম পরীক্ষামূলক স্পেস স্টেশন।
11.	16.7.1969	অ্যাপোলো – 11	এ চন্দ্রযানের মাধ্যমে মহাশূন্যচারী নীল আর্মস্ট্রং চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রথম পা রাখেন। তাঁর আট মিনিট পর এডুইন অলড্রিন তাঁকে অনুসরণ করেন।

12.	19.5.1971	মারস – ২	মঙ্গলগ্রহে অবতরণকারী প্রথম মহাশূন্য অনুসন্ধানী যান (space probe)
13.	2.3.1972	পায়োনিয়ার	প্রথম মহাশূন্য অনুসন্ধানীযান যা বৃহস্পতি গ্রহে খুব নিকট থেকে ছবি তুলতে সক্ষম হয়।
14.	7.1972	ল্যান্ডসেট – ১	রিমোট সেনসিং বা দূর অনুধাবনের জন্য পাঠানো প্রথম উপগ্রহ।
15.	15.7. 1975	অ্যাপোলো – সায়োজ টেস্ট প্রোজেক্ট	আন্তর্জাতিক যোগসূত্র স্থাপনের জন্য মহাশূন্যে পাঠানো প্রথম উপগ্রহ।

এরপর অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে। মহাশূন্য বিজ্ঞানে আশির দশকে উল্লেখযোগ্য যেসব কাজ হয় তার মধ্যে রয়েছে, মহাশূন্যে স্থায়ী স্পেস স্টেশন স্থাপন ও স্পেস শাটল নির্মাণ। স্পেস শাটল বহুবার মহাশূন্যচারীদের নিয়ে মহাশূন্যে যায় ও ফিরে আসে। স্পেস শাটলের প্রধান সুবিধা হল এটি বার বার ব্যবহার করা যায়। ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মনুষ্যবাহী মহাশূন্যযান চ্যালেঞ্জার কয়েক বার মহাশূন্য যায় ও ফিরে আসে এবং কানাডা, ইন্দোনেশিয়া ও ভারতের যোগাযোগ উপগ্রহ স্থাপনে সাফল্য অর্জন করে। ১৯৮৪ ও ১৯৮৫ সালে মার্কিন মহাশূন্যযান ডিসকভারী কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের ২টি উপগ্রহ মহাশূন্যে উৎক্ষেপণ করে। এ ছাড়াও মহাশূন্যে প্রেরিত হয় মনুষ্যবিহীন মহাশূন্যযান মেরিনার (14.11.1971), ভাইকিং (20. 8. 1975) ও ভয়েজার (20. 8. 77)। ভয়েজার বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটোর কক্ষে প্রেরিত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একটি মহাশূন্যযান। ১৯৯২ সালে একদল আমেরিকান মহাশূন্যচারী মহাশূন্য উপগ্রহ মেরামত করতে সক্ষম হন এবং কক্ষচ্যুত উপগ্রহকে তার মূল কক্ষপথে ফিরিয়ে আনেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। দুইটি বস্তুকণার মধ্যবর্তী দূরত্ব চারগুণ বৃদ্ধি করলে তাদের মধ্যকার আকর্ষণ বলের কী পরিবর্তন হবে?

ক. $\frac{1}{4}$ গুণ আকর্ষণ বল খ. $\frac{1}{16}$ গুণ আকর্ষণ বল

গ. 4 গুণ আকর্ষণ বল ঘ. 16 গুণ আকর্ষণ বল

২। কৌণিক বিস্তার অল্প হলে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে সরল দোলকের ক্ষেত্রে –

i. অভিকর্ষজ ত্বরণ ধ্রুব হলে দোলনকাল কার্যকরী দৈর্ঘের বর্গমূলের সমানুপাতিক

ii. কার্যকরী দৈর্ঘ্য অপরিবর্তিত থাকলে দোলন কাল অভিকর্ষজ ত্বরণের সমানুপাতিক

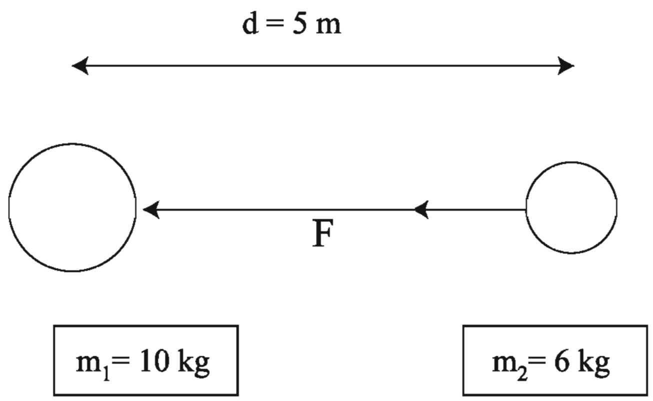
iii. কার্যকরী দৈর্ঘ্য অপরিবর্তিত থাকলে দোলনকাল অভিকর্ষজ ত্বরণের বর্গমূলের ব্যাস্তানুপাতিক।

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i ও iii

নিচের চিত্র থেকে ৩ এবং ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও



৩। চিত্র অনুসারে–

ক. $F \alpha \frac{m_1 m_2}{d^2}$ খ. $F \alpha \frac{m_1 m_2}{d}$

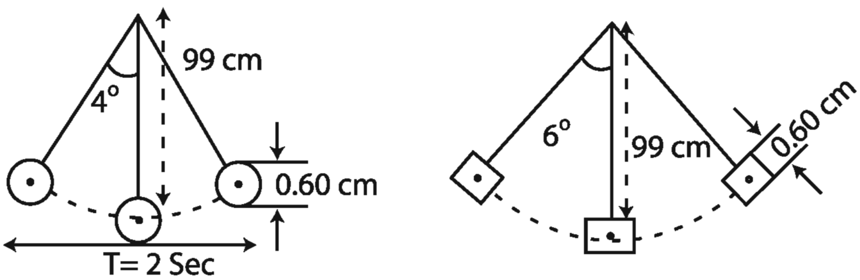
গ. $F \alpha \frac{d^2}{m_1 m_2}$ ঘ. $F \alpha \frac{d}{m_1 m_2}$

৪। F এর মান কত হবে?

ক. 1.502×10^{-10} N খ. 1.602×10^{-10} N

গ. 1.702×10^{-10} N ঘ. 1.802×10^{-10} N

সৃজনশীল প্রশ্ন



চিত্র– ১ চিত্র– ২

চিত্রে একটি নির্দিষ্ট স্থানে দুটি সরল দোলক দেখানো হয়েছে। চিত্র অনুযায়ী নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ক. সরল দোলক কাকে বলে?

খ. আদর্শ সরল দোলকের ক্ষেত্রে নমনীয় ও অপ্রসারণশীল সুতা ব্যবহার হয় কেন?

গ. ১নং চিত্র অনুযায়ী ঐ স্থানে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান কত ?

ঘ. ২নং চিত্রের শর্তসমূহ ‘g’ এর মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কী প্রভাব ফেলবে ব্যাখ্যা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি

WORK, POWER AND ENERGY

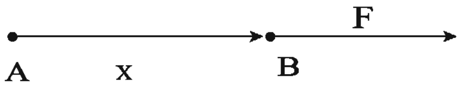
দৈনন্দিন জীবনে কোনো কিছু করাকে কাজ বলা হলেও পদার্থবিজ্ঞানে কাজ দ্বারা একটি সুনির্দিষ্ট ধারণাকে বুঝায়। কী সে ধারণা? এ অধ্যায়ের শুরুতে আমরা কাজের সে ধারণাকে উপস্থিত করব। বাস্তব জীবনে শক্তি ও ক্ষমতাকে আমরা অনেক সময় এক মনে করলেও শক্তি ও ক্ষমতা কিন্তু মোটেই এক নয়। বিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে শক্তি। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখি শক্তি ছাড়া জগৎ অচল। বিভিন্নরূপে আমরা শক্তি পাই। গতিশীল বস্তুর গতির জন্য শক্তি, ভূপৃষ্ঠের খানিক উপরে বস্তুর অবস্থানের জন্য শক্তি, একটি সংকুচিত বা প্রসারিত স্প্রিং এর শক্তি, গরম বস্তুর তাপ শক্তি, আহিত বস্তুর তড়িৎ শক্তি ইত্যাদি। শক্তি ক্রমাগত এক রূপ থেকে অন্যরূপে রূপান্তরিত হচ্ছে, যদিও এ মহাবিশ্বের মোট শক্তির পরিমাণ অপরিবর্তনীয় এবং সুনির্দিষ্ট। শক্তির এ রূপান্তরের ঘটনা এবং বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলোর একটি শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতি নিয়ে আমরা আলোচনা করব এ অধ্যায়ে। আমাদের দেশে বিদ্যুৎ শক্তির প্রধান যে উৎস কাপ্তাই এর জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র – সে সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থাকবে সবশেষে।

৫.১। কাজ

Work

দৈনন্দিন জীবনে কোনো কিছু করাকে কাজ বললেও পদার্থবিজ্ঞানে কাজ বলতে বল এবং সরণ সংক্রান্ত একটি বিশেষ অবস্থাকে বুঝায়। কোনো বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ করলে যদি বলের প্রয়োগ বিন্দুর কিছু সরণ ঘটে – তাহলেই কেবল কাজ হয়।

কোনো বস্তুর ওপর বল প্রয়োগে যদি বস্তুটির সরণ ঘটে, তাহলে বল এবং বলের দিকে বলের প্রয়োগবিন্দুর সরণের উপাংশের গুণফলকে কাজ বলে।



চিত্র : ৫.১

ধরা যাক A বিন্দুতে অবস্থিত কোনো বস্তুর ওপর AB বরাবর F বল প্রয়োগ করা হল। এতে বস্তুটি AB বরাবরই x দূরত্ব অতিক্রম করে B বিন্দুতে পৌঁছাল [চিত্র ৫.১] তাহলে F বল দ্বারা সম্পন্ন কাজ হবে–

কাজ = বল × বলের দিকে সরণের উপাংশ বা $W = Fx$ .... (৫.১)

আবার, ধরা যাক A বিন্দুতে বস্তুর ওপর AB বরাবর এ বল প্রয়োগ করা হলে AC বরাবর s দূরত্ব অতিক্রম করে C বিন্দুতে আসে। AB ও AC এর অন্তর্ভুক্ত কোণ θ [চিত্র ৫.২]। C বিন্দু থেকে AB এর ওপর CD লম্ব টানা হল। তাহলে AB বরাবর বস্তুর সরণের উপাংশ হল AD = x। এক্ষেত্রে F বল দ্বারা সম্পন্ন কাজ হবে–

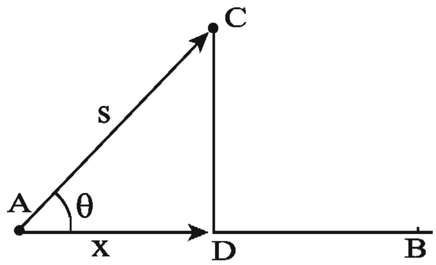
কাজ = বল × বলের দিকে সরণের উপাংশ

বা $W = Fx$

কিন্তু ADC সমকোণী ত্রিভুজে $\cos\theta = \dfrac{AD}{AC} = \dfrac{x}{s}$

বা $x = s\cos\theta$

$\therefore\ W = Fs\cos\theta$ ... ... (৫.২)



চিত্র : ৫.২

কাজের কোনো দিক নেই, সুতরাং কাজ একটি স্কেলার রাশি।

মাত্রা : কাজের মাত্রা হল, বল × সরণ এর মাত্রা।

কাজ = বল × সরণ = ভর × ত্বরণ × সরণ

$= \text{ভর} \times \frac{\text{সরণ}}{\text{সময়}^2} \times \text{সরণ}$

$= \text{ভর} \times \frac{\text{সরণ}^2}{\text{সময়}^2}$

$\therefore [W] = \left[\frac{ML^2}{T^2}\right] = [ML^2T^{-2}]$

একক : যেহেতু $W = Fx$

সুতরাং বলের একককে সরণের একক দিয়ে গুণ করলে কাজের একক পাওয়া যায়। কাজের একক জুল (J)। যদি বল F = 1N এবং বলের দিকে সরণ x = 1m হয়, তাহলে W = 1J হবে।

কোনো বস্তুর ওপর এক নিউটন **(N)** বল প্রয়োগের ফলে যদি বলের দিকে বলের প্রয়োগ বিন্দুর এক মিটার **(m)** সরণ হয় তবে সম্পন্ন কাজের পরিমাণকে এক জুল **(J)** বলে।

$\therefore 1\ J = 1Nm$

25J কাজ বলতে বুঝায় 1 N বল প্রয়োগে বলের দিকে বলের প্রয়োগ বিন্দুকে 25m সরাতে যে কাজ হয় তা।

উদাহরণ ৫.১। 500 N বল প্রয়োগে কোনো বস্তুর বলের দিকে সরণ 50 m হলে কৃত কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর।

সমাধান :

আমরা জানি,

W = Fx

বা $W = 500\ N \times 50\ m$

$= 2.5 \times 10^4\ J$

উ: $2.5 \times 10^4\ J$

এখানে,

বল, F = 500N

বলের দিকে সরণ, x = 50m.

কাজ, W = ?

উদাহরণ ৫.২। 70kg ভরের এক ব্যক্তি 2000m উঁচু পর্বতে আরোহণ করলে তিনি কত কাজ করবেন? ($g = 9.8\ ms^{-2}$)

সমাধান :

আমরা জানি

W = Fx

বা $W = 686\ N \times 2000\ m$

$= 1.372 \times 10^6\ J$

উ: $1.372 \times 10^6\ J$

এখানে,

ব্যক্তির ভর, m = 70 kg

বল, F = ব্যক্তির ওজন

$= mg = 70kg \times 9.8\ ms^{-2} = 686\ N$

বলের দিকের সরণ, x = 2000 m

কাজ, W = ?

উদাহরণ ৫.৩। 20 N বল কোনো নির্দিষ্ট ভরের বস্তুর ওপর ক্রিয়া করায় বস্তুটি বলের দিকের সাথে 60^0 কোণ উৎপন্ন করে 5m দূরে সরে গেল। কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর।

সমাধান :

আমরা জানি,

$W = Fs \cos \theta$

বা $W = 20N \times 5m \times \cos 60^0$

$= 20 \times 5 \times \frac{1}{2}$ Nm

= 50 J

উ: 50 J

এখানে,

বল, F = 20 N

সরণ, s = 5m

বল ও সরণের অন্তর্ভুক্ত কোণ, $\theta = 60^0$

কাজ, W = ?

৫.২। বিভিন্ন প্রকারের কাজ

Different Types of Work

কাজ দুই প্রকারের হতে পারে। বলের দ্বারা কাজ বা ধনাত্মক কাজ এবং বলের বিরুদ্ধে কাজ বা ঋণাত্মক কাজ।

ক. বলের দ্বারা কাজ বা ধনাত্মক কাজ :

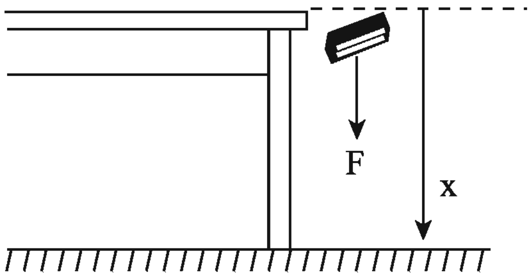
যদি বল প্রয়োগের ফলে বলের প্রয়োগ বিন্দু বলের দিকে সরে যায় বা বলের দিকে সরণের উপাংশ থাকে তাহলে সেই কাজকে ধনাত্মক কাজ বা বলের দ্বারা কাজ বলে।

একটি ডাস্টার টেবিলের উপর থেকে মাটিতে ফেলে দিলে ডাস্টারটি অভিকর্ষ বলের দিকে নিচে পড়বে। এক্ষেত্রে অভিকর্ষ বলের দ্বারা কাজ বলা হয়েছে বা অভিকর্ষ বলের জন্য ধনাত্মক কাজ হয়েছে বুঝায় [চিত্র ৫.৩ক]।

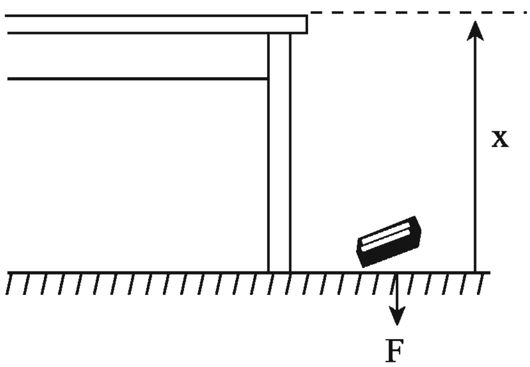
খ. বলের বিরুদ্ধে কাজ বা ঋণাত্মক কাজ :

যদি বল প্রয়োগের ফলে বলের প্রয়োগ বিন্দু বলের বিপরীত দিকে সরে যায় বা বলের বিপরীত দিকে সরণের উপাংশ থাকে তাহলে সেই কাজকে ঋণাত্মক কাজ বা বলের বিরুদ্ধে কাজ বলে।

একটি ডাস্টার যদি মেঝে থেকে টেবিলের উপর ওঠানো হয় তাহলে অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে কাজ করা হবে বা অভিকর্ষ বলের জন্য ঋণাত্মক কাজ হবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে অভিকর্ষ বল যে দিকে ক্রিয়া করে, সরণ তার বিপরীত দিকে হয়। [চিত্র ৫.৩খ]



চিত্র : ৫.৩ (ক)



চিত্র : ৫.৩ (খ)

৫.৩। ক্ষমতা

Power

কাজ সম্পাদনকারি কোনো ব্যক্তি বা উৎস (যেমন– ডায়নামো, ইঞ্জিন বা অন্য কোনো যন্ত্র) এর কাজ করার হারকে ক্ষমতা বলে। অর্থাৎ, একক সময়ে ব্যক্তি বা উৎসটি দ্বারা সম্পাদিত কাজের পরিমাণই হচ্ছে ক্ষমতা।

কোনো ব্যক্তি বা উৎস t সময়ে W পরিমাণ কাজ সম্পাদন করলে, ক্ষমতা

$$p = \frac{w}{t} \quad \ldots \quad (৫.৩)$$

ক্ষমতার দিক নেই, কাজেই ক্ষমতা একটি স্কেলার রাশি।

মাত্রা : ক্ষমতার মাত্রা $\frac{\text{কাজ}}{\text{সময়}}$ এর মাত্রা।

$$\text{ক্ষমতা} = \frac{\text{কাজ}}{\text{সময়}} = \frac{\text{বল x সরণ}}{\text{সময়}} = \frac{\text{ভর x ত্বরণ x সরণ}}{\text{সময়}}$$

$$= \frac{\text{ভর x সরণ x সরণ}}{\text{সময়}^2 \text{ x সময়}} = \frac{\text{ভর x সরণ}^2}{\text{সময়}^3}$$

$$\therefore [p] = \frac{ML^2}{T^3} = ML^2T^{-3}$$

একক : যেহেতু $p = \frac{W}{t}$

সুতরাং, কাজের একককে সময়ের একক দিয়ে ভাগ করলে ক্ষমতার একক পাওয়া যায়। ক্ষমতার একক ওয়াট (W)। যদি সময় $t = 1$ s, এবং কাজ $W = 1$ J হয় তাহলে $p = 1$ W হবে।

এক সেকেন্ডে এক জুল কাজ করার ক্ষমতাকে এক ওয়াট বলে।

$$\therefore 1W = \frac{1J}{1s} = 1Js^{-1}$$

বিভিন্ন প্রয়োজনে ওয়াটের হাজারগুণ বড় এক কিলোওয়াট (1kW) এবং দশ লক্ষ গুণ বড় একক মেগাওয়াট (1MW) ব্যবহার করা হয়।

$1kW = 10^3W$

$1MW = 10^6W$

অনেক সময় ইঞ্জিনের ক্ষমতাকে প্রকাশ করার জন্য অশ্বক্ষমতা (H.P) নামের একটি একক ব্যবহার করা হয়।

1 H.P = 746 W

কোনো বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ক্ষমতা 7 MW বলতে বুঝায় উক্ত কেন্দ্রে সরবরাহকৃত বিদ্যুৎ শক্তি দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে 7×10^6 J কাজ করা যায়।

উদাহরণ ৫.৪। 65 kg ভরের এক ব্যক্তি প্রতিটি 25cm উঁচু 20 টি সিড়ি 10s - এ ওঠতে পারেন। তাঁর ক্ষমতা কত? ($g = 9.8\ ms^{-2}$)

সমাধান :

আমরা জানি,

$$p = \frac{\text{কাজ}}{\text{সময়}} = \frac{(Fx)}{t}$$

$$\therefore p = \frac{65 \times 9.8N \times .5m}{10s}$$

$= 318.5\ Js^{-1}$

$= 318.5$ W

উ: 318.5 W

এখানে,

ব্যক্তির ভর, m = 65kg

বল, F = ব্যক্তির ওজন

$= mg = 65 \times 9.8$ N

সরণ, $x = 25 \times 20cm = 0.5$ m

সময়, t = 10s

ক্ষমতা, p = ?

উদাহরণ ৫.৫। নিচের রিজার্ভার থেকে 30m উঁচু দালানের ছাদে অবস্থিত ট্যাংকে পানি তোলার জন্য 2 kW এর একটি পাম্প ব্যবহার করা হচ্ছে। পাম্পটি 2 মিনিট চালালে কত পানি তোলা যাবে?

সমাধান :

আমরা জানি,

$$p = \frac{\text{কাজ}}{\text{সময়}} = \frac{\text{বল} \times \text{সরণ}}{\text{সময়}}$$

$$p = \frac{\text{পানির ভর} \times g \times \text{সরণ}}{\text{সময়}}$$

বা, $p = \frac{mgx}{t}$

$$\therefore m = \frac{pt}{gx}$$

$$= \frac{2 \times 10^3 W \times 2 \times 60s}{9.8ms^{-2} \times 30m}$$

$= 816.3$ kg

উ: 816.3kg

এখানে,

পাম্পের ক্ষমতা, p = 2kW

$= 2 \times 10^3$ W

সরণ, x = 30m

সময়, $t = 2min = 2 \times 60s$

পানির ভর, m = ?

৫.৪। শক্তি

Energy

কোনো বস্তুর কাজ করার সামর্থ্যকে শক্তি বলে। বস্তু সর্বমোট যতখানি কাজ করতে পারে তাই হচ্ছে বস্তুর শক্তির পরিমাপ।

যেহেতু কোনো বস্তুর শক্তির পরিমাপ করা হয় তা দ্বারা সম্পন্ন কাজের পরিমাণ থেকে, সুতরাং, শক্তি ও কাজের পরিমাণ অভিন্ন।

শক্তির কোনো দিক নেই। কাজেই শক্তি স্কেলার রাশি।

মাত্রা : শক্তির মাত্রা ও কাজের মাত্রা একই।

অর্থাৎ, $[E] = [ML^2 T^{-2}]$

একক : শক্তির একক ও কাজের একক একই অর্থাৎ, জুল (J)।

সাধারণত বিদ্যুৎ শক্তির হিসাব নিকাশের সময় কিলোওয়াট ঘণ্টা (kWh) এককটি ব্যবহৃত হয়। এক কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কোন যন্ত্র এক ঘণ্টা কাজ করলে যে শক্তি ব্যয় হয় তাকে এক কিলোওয়াট – ঘণ্টা বলে।

$$1kWh = 1000\ Wh = 1000\ Js^{-1} \times 3600\ s$$

$$= 3.6 \times 10^6 J$$

৫.৫। শক্তির রূপ

Forms of Energy

শক্তি আছে বলেই এ জগৎ গতিশীল। শক্তি না থাকলে জগৎ অচল হয়ে পড়বে। আলোক শক্তি আছে বলেই আমরা দেখতে পাই, শব্দ শক্তি আছে বলেই আমরা শুনতে পাই। যান্ত্রিক শক্তির বদৌলতে আমরা চলাফেরা করি। বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে পাখা ঘুরছে, কলকারখানা চলছে। এ মহাবিশ্বে শক্তি নানারূপে বিরাজ করছে। মোটামুটিভাবে আমরা শক্তির নয়টি রূপ পর্যবেক্ষণ করি। যথা –

১। যান্ত্রিক শক্তি ২। তাপ শক্তি ৩। শব্দ শক্তি ৪। আলোক শক্তি ৫। চৌম্বক শক্তি ৬। বিদ্যুৎ শক্তি ৭। রাসায়নিক শক্তি ৮। নিউক্লিয় শক্তি ৯। সৌর শক্তি।

এ অধ্যায়ে আমরা শুধু যান্ত্রিক শক্তি সম্পর্কে আলোচনা করব। যান্ত্রিক শক্তিকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি, যথা– বিভব শক্তি ও গতি শক্তি।

৫.৬। বিভব শক্তি

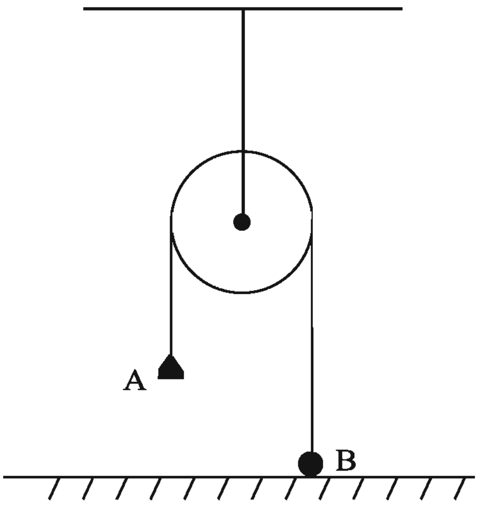
Potential Energy

স্বাভাবিক অবস্থান বা অবস্থা থেকে পরিবর্তন করে কোনো বস্তুকে অন্য কোনো অবস্থান বা অবস্থায় আনলে বস্তু কাজ করার যে সামর্থ্য অর্জন করে তাকে বিভব শক্তি বলে।

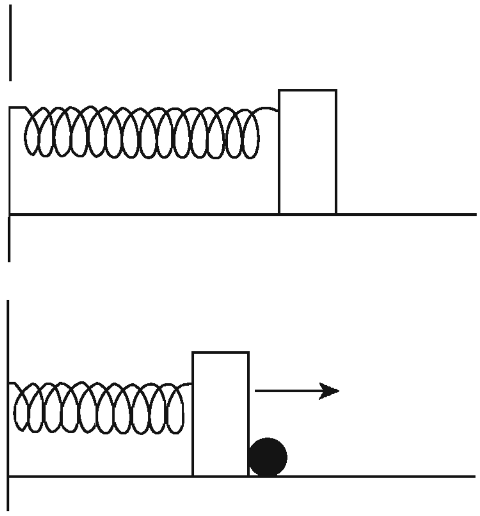
স্বাভাবিক অবস্থা বা অবস্থান থেকে পরিবর্তন করে কোনো বস্তুকে অন্য অবস্থা বা অবস্থানে আনতে যদি কোনো বলের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করা হয় তখন বস্তুটি ঐ পরিমাণ কাজ করার সামর্থ্য লাভ করে। পরবর্তীতে বস্তুটি আবার স্বাভাবিক অবস্থা বা অবস্থানে আসতে ঐ পরিমাণ কাজ করতে পারে। বস্তু এই যে কাজ করার সামর্থ্য লাভ করল তাই বস্তুর মধ্যে শক্তি হিসেবে সঞ্চিত থাকবে। শক্তির এ রূপকেই বলা হয় বিভব শক্তি।

আমরা যখন ভূপৃষ্ঠ থেকে কোনো বস্তুকে উপরে তুলি তখন অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে কাজ করি। ফলে ঐ বস্তু কিছু বিভব শক্তি লাভ করে। বস্তুটি যদি ভূপৃষ্ঠে পড়ে তখন সেটি ঐ পরিমাণ কাজ করতে পারে। কেননা বস্তুটি ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত পড়তে অন্য কোনো বস্তুকে উপরে ওঠাতে পারে।

৫.৪ চিত্রে দেখা যাচ্ছে কপি কলের উপর দিয়ে যাওয়া একটি দড়ির দুই প্রান্তে দুটি বস্তু A ও B বাঁধা আছে। ভারী বস্তু A ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরে আছে এবং হাল্কা বস্তু B ভূপৃষ্ঠে আছে। এখন A বস্তু নিচে নামতে থাকলে B বস্তুকে উপরে ওঠাবে। ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরে থাকার জন্য A বস্তুর মধ্যে কাজ করার এই যে সামর্থ্য আছে–তাই A বস্তুর বিভব শক্তি।



চিত্র : ৫.৪



চিত্র : ৫.৫

আবার একটি মসৃণ তলের উপর একটি বস্তুকে একটি স্প্রিং এর একপ্রান্তের সাথে সংযুক্ত করে স্প্রিং এর অপর প্রান্ত একটা দৃঢ় অবলম্বনের সাথে আটকানো হল। এখন বস্তুটিকে বল প্রয়োগ করে স্প্রিংটিকে সংকুচিত করে ছেড়ে দিলে স্প্রিংটি তার আগের অবস্থায় আসার সময় কাজ করতে পারবে–পথে অন্য কোনো বস্তু পড়লে তাকে সরাতে পারবে। [চিত্র ৫.৫] স্প্রিংটি তার স্বাভাবিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্য এই যে কাজ করার সামর্থ্য লাভ করল সেটি তার বিভব শক্তি।

৫.৭। অভিকর্ষজ বিভব শক্তি
Gravitational Potential Energy

অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে কাজ করে কোনো বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন করলে বস্তু কাজ করার যে সামর্থ্য লাভ করে তাকে অভিকর্ষজ বিভব শক্তি বলে।

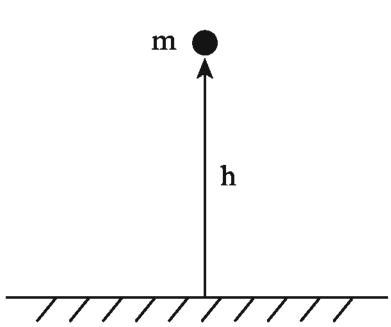
বিভব শক্তির পরিমাপ : m ভরের কোনো বস্তুকে ভূপৃষ্ঠ থেকে h উচ্চতায় ওঠাতে কৃত কাজই হচ্ছে বস্তুতে সঞ্চিত বিভব শক্তির পরিমাপ। আর এক্ষেত্রে কৃতকাজ হচ্ছে বস্তুর ওপর প্রযুক্ত অভিকর্ষ বল তথা বস্তুর ওজন এবং উচ্চতার গুণফলের সমান।

বিভব শক্তি = বস্তুর ওজন × উচ্চতা

$$= mgh$$

$$\therefore \quad E_p = mgh \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \quad (৫.৪)$$

অর্থাৎ, বিভব শক্তি = বস্তুর ভর × অভিকর্ষজ ত্বরণ × উচ্চতা। একটি ঘরের মেঝের সাপেক্ষে কোনো বস্তুর বিভব শক্তি 60 J বলতে বুঝায় বস্তুর মধ্যে সঞ্চিত শক্তি দ্বারা বস্তুটি ঘরের মেঝেতে নেমে আসতে 60 J কাজ করতে পারে।



চিত্র : ৫.৬

কোথা হতে উচ্চতা পরিমাপ করা হচ্ছে তার ওপর বস্তুটির বিভব শক্তি নির্ভর করে। অর্থাৎ, কোথায় আমরা $h = 0$ ধরেছি, বিভব শক্তি তার ওপর নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, তুমি কোনো ভবনের দোতলায় একটি ঘরে বসে কোনো টেবিল থেকে কিছু ওপরে একটি কলম ধরে আছ। ঐ কলমের বিভব শক্তি কত ? কলমের বিভব শক্তি টেবিল, ঐ ঘরের মেঝে এবং ভূপৃষ্ঠের সাপেক্ষে ভিন্ন ভিন্ন হবে। কেননা ঐ তিন অবস্থান থেকে কলমের উচ্চতা ভিন্ন এবং কলমটি টেবিল পর্যন্ত পড়তে যে কাজ করতে পারবে, ঐ ঘরের মেঝেতে পড়তে তার চেয়ে বেশি কাজ করতে পারবে এবং ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত নেমে আসতে কৃত কাজ আরো বেশি হবে। সুতরাং সমস্যা সমাধানে সমীকরণ ব্যবহারের সময় আমাদের সতর্কতার সাথে ঐ সমস্যার জন্য h কত তা বুঝতে হবে।

উদাহরণ ৫.৬। 5kg ভরের একটি বস্তুকে ভূপৃষ্ঠ থেকে 30m উচ্চতায় তুললে এর বিভব শক্তি কত হবে? $g = 9.8\ ms^{-2}$।

সমাধান :

আমরা জানি,	এখানে,
$E_p = mgh$	বস্তুর ভর, $m = 5kg$
$= 5\ kg \times 9.8 ms^{-2} \times 30m$	উচ্চতা, $h = 30\ m$
$= 1470\ J$	$g = 9.8\ ms^{-2}$
উ: 1470 J	বিভব শক্তি $E_p = ?$

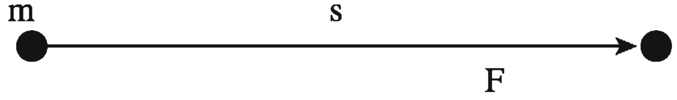
৫.৮। গতিশক্তি
Kinetic Energy

কোনো গতিশীল বস্তু তার গতির জন্য কাজ করার যে সামর্থ্য লাভ করে তাকে গতি শক্তি বলে।

কোনো স্থির বস্তুতে বেগের সঞ্চার করা বা গতিশীল বস্তুর বেগ বৃদ্ধি করার অর্থ হচ্ছে বস্তুটিতে ত্বরণ সৃষ্টি করা। আর এর জন্য বল প্রয়োগ করতে হবে। ফলে বস্তুর ওপর কাজ করা হবে। এতে বস্তুটি কাজ করার সামর্থ্য লাভ করবে এবং এ কাজ বস্তুতে গতি শক্তি হিসেবে জমা থাকবে। সে কারণে সকল সচল বস্তুই গতিশক্তির অধিকারী। বস্তু স্থিতিতে আসার পূর্বে এ পরিমাণ কাজ সম্পন্ন করতে পারবে।

ঢিল ছুঁড়ে আম বা বরই পাড়ার সময় ঢিলের গতি শক্তি আম বা বরইকে বৃন্তচ্যুত করে দূরে ফেলে দেয়।

গতি শক্তির পরিমাপ : কোনো বস্তু যখন স্থির অবস্থায় থাকে তখন কোনো গতিশক্তি থাকে না। ধরা যাক, m ভরের একটি স্থির বস্তুর ওপর F বল প্রয়োগ করায় বস্তুটি v বেগ প্রাপ্ত হল। ধরা যাক, এ সময় বস্তুটি বলের দিকে s দূরত্ব অতিক্রম করে। বস্তুটিকে এই বেগ দিতে কৃত কাজই বস্তুর গতিশক্তি।



চিত্র : ৫.৭

$\therefore$ গতিশক্তি = কৃতকাজ

= বল × সরণ

$= F \times s$

বা $E_k = mas$ [$\because F = ma$]

কিন্তু $v^2 = u^2 + 2as$

বা $as = \frac{v^2}{2}$ [$\because$ আদি বেগ $u = 0$]

$\therefore E_k = \frac{1}{2} mv^2$ ... ... (৫.৫)

অর্থাৎ, বস্তুর গতি শক্তি, $E_k = \frac{1}{2}$ × (ভর) × (বেগ)২। যেহেতু বস্তুর ভর m একটি ধ্রুব রাশি, সুতরাং, (৫.৫) সমীকরণ থেকে দেখা যায় যে, $E_k \propto v^2$

অর্থাৎ, নির্দিষ্ট ভরের কোনো বস্তুর গতি শক্তি এর বেগের বর্গের সমানুপাতিক।

বস্তুর বেগ দ্বিগুণ হলে গতি শক্তি চারগুণ হবে, বেগ তিনগুণ হলে গতিশক্তি নয়গুণ হবে।

কোনো গাড়ির গতি শক্তি 2×10^6 J বলতে বুঝায় গাড়িটি থেমে যাওয়ার আগে তার গতির জন্য 2×10^6 J কাজ করতে পারে।

উদাহরণ : ৫.৭। 1000kg ভরের একটি গাড়ি ঘণ্টায় 36km বেগে চলতে থাকলে এর গতি শক্তি কত হবে?

সমাধান :

এখানে,

বস্তুর ভর, $m = 1000kg$

বস্তুর বেগ, $v = 36 \frac{km}{h}$

$= \frac{36 \times 10^3 m}{60 \times 60 s}$

$= 10 ms^{-1}$

গতিশক্তি, $E_k = ?$

আমরা জানি,

$E_k = \frac{1}{2} mv^2$

বা $E_k = \frac{1}{2} \times 1000kg \times (10ms^{-1})^2$

$= 5 \times 10^4 \, kgm^2s^{-2}$

$= 5 \times 10^4$ J

উ: 5×10^4 J

উদাহরণ ৫.৮। 70kg ভরের একজন দৌড়বিদের গতি শক্তি 1260 J হলে তার বেগ কত?

সমাধান :

এখানে,

ভর, $m = 70$ kg

গতি শক্তি $E_k = 1260$ J

আমরা জানি,

$E_k = \frac{1}{2} mv^2$

বা $v^2 = \frac{2E_k}{m}$

$= \frac{2x1260J}{70kg}$

$= 36 \frac{kgm^2s^{-2}}{kg}$

$\therefore v = 6ms^{-1}$

বেগ, v = ?

উ: $6ms^{-1}$

উদাহরণ ৫.৯। একটি বালক শিশুদের ট্রাই সাইকেলে বসা তার ছোট বোনকে 80 N সমবলে ঠেলছে। ছোট বোনকে 400 J গতি শক্তি প্রদান করতে হলে তাকে কত দূরত্ব ঠেলতে হবে?

সমাধান :

আমরা জানি,

গতি শক্তি = কৃত কাজ

বা, $E_k = Fx$

$\therefore x = \frac{E_k}{F}$

$= \frac{400J}{80N} = 5\frac{Nm}{N}$

$= 5m$

উ: 5m

এখানে,

বল, F = 80N

গতি শক্তি, $E_k = 400J$

সরণ, x = ?

উদাহরণ ৫.১০। 1kg ভরের বস্তুকে 20m উপর থেকে ছেড়ে দেওয়া হলে ভূপৃষ্ঠকে স্পর্শ করার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে এর গতি শক্তি নির্ণয় কর। $g = 9.8 ms^{-2}$

সমাধান :

আমরা জানি,

$E_k = \frac{1}{2} mv^2$

মাটি স্পর্শ করার পূর্ব মুহূর্তে বেগ v হলে,

$v^2 = u^2 + 2gh$

বা $v^2 = 2gh$ $[\because u = 0]$

$\therefore E_k = \frac{1}{2}m \times 2gh = mgh$

$E_k = 1kg \times 9.8ms^{-2} \times 20m$

$= 196J$

উ: 196J

এখানে,

ভর, m = 1kg

উচ্চতা, h = 20m

আদি বেগ, $u = 0ms^{-1}$

$g = 9.8ms^{-2}$

গতি শক্তি $E_k = ?$

৫.৯। শক্তির রূপান্তর

Transformation of Energy

আমরা আগে যে বিভিন্ন প্রকার শক্তির কথা বলেছি সেগুলো সকলেই পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, কোনো একটা থেকে অন্যটাতে পরিবর্তন সম্ভব। এ পরিবর্তনকে শক্তির রূপান্তর বলে। আসলে প্রায় প্রত্যেক প্রাকৃতিক ঘটনাকেই শক্তির রূপান্তর হিসেবে ধরা যেতে পারে। নিচে শক্তির রূপান্তরের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল :

১। **যান্ত্রিক শক্তির রূপান্তর :** হাতে হাত ঘষলে তাপ উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে যান্ত্রিক শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। কলমের খালি মুখে ফুঁ দিলে যান্ত্রিক শক্তি শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। পানি যখন ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরে থাকে তখন তাতে বিভব শক্তি সঞ্চিত থাকে। নিচে প্রবাহিত হওয়ার সময় এ বিভব শক্তি গতি শক্তিতে পরিণত হয়। আবার এ পানি প্রবাহের সাহায্যে চাকা ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। এভাবে যান্ত্রিক শক্তি তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

২। **তাপ শক্তির রূপান্তর :** স্টীম ইঞ্জিনে তাপের সাহায্যে স্টীম উৎপন্ন করে রেলগাড়ি ইত্যাদি চালানো হয়। এখানে তাপ শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। বালবের ফিলামেন্টের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহের ফলে তাপ শক্তি আলোকে রূপান্তরিত হয়। দুটি ভিন্ন ধাতব পদার্থের সংযোগস্থলে তাপ প্রয়োগ করলে তাপ শক্তি তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

৩। **আলোক শক্তির রূপান্তর :** হ্যারিকেনের চিমনিতে হাত দিলে গরম অনুভূত হয়। এখানে আলোক শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। ফটো-ভোলটেইক সেলের ওপর আলোর ক্রিয়ার ফলে আলোক শক্তি তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। ফটোগ্রাফিক কাগজের ওপর আলোর ক্রিয়ার ফলে আলোক শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

৪। **শব্দ শক্তির রূপান্তর :** শব্দোত্তর বা শব্দেতর তরঙ্গের সাহায্যে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করা হয়। এ ক্ষেত্রে শব্দ শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। পরবশ কম্পন বা অনুনাদের সময় শব্দ শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। আবার টেলিফোন বা রেডিওর প্রেরক যন্ত্রে শব্দ শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়।

৫। **চৌম্বক শক্তির রূপান্তর :** একখণ্ড লোহাকে দ্রুত এবং বার বার চুম্বকন ও বিচুম্বকন কালে তাপ উৎপন্ন হয়। এখানে চৌম্বক শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। তড়িত চুম্বকের সাহায্যে ভারী জিনিসপত্র ওঠানোর কাজ সম্পন্ন করে চৌম্বক শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়।

৬। **বিদ্যুৎ শক্তির রূপান্তর :** তড়িৎ মোটরে তড়িৎ শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি, হিটার ইত্যাদিতে তড়িৎ শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। বৈদ্যুতিক বালবে তড়িৎ শক্তি আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। টেলিফোন ও রেডিওর গ্রাহক যন্ত্রে তড়িৎ শক্তি শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সঞ্চয়ক কোষে তড়িৎ শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। তড়িৎ চুম্বকে তড়িৎ শক্তি চৌম্বক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

৭। **রাসায়নিক শক্তির রূপান্তর :** সরল তড়িৎ কোষে রাসায়নিক শক্তি তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। কাঠ, কয়লা, পেট্রোল, কেরোসিন, গ্যাস ইত্যাদি পুড়িয়ে রাসায়নিক শক্তিকে তাপ ও আলোক শক্তিকে রূপান্তরিত করা হয়।

৮। **নিউক্লিয় শক্তির রূপান্তর :** পারমাণবিক সাবমেরিনে নিউক্লিয় শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়।

এছাড়াও পারমাণবিক **চুল্লীর** সাহায্যে নিউক্লিয় শক্তি বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

৫.১০। শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতি

Principle of Conservation of Energy

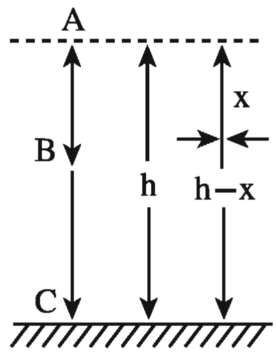
বিবৃতি : শক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ নেই, শক্তি কেবল একরূপ থেকে অপর এক বা একাধিকরূপে পরিবর্তিত হতে পারে। মহাবিশ্বের মোট শক্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়।

উপরের উদাহরণগুলো থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এক প্রকার শক্তিকে অন্য যে কোনো প্রকার শক্তিতে রূপান্তর সম্ভব। শক্তি যখন একরূপ থেকে অন্যরূপে পরিবর্তিত হয় তখন শক্তির কোনো ক্ষয় হয় না। এক বস্তু যে পরিমাণ শক্তি হারায় অপর বস্তু ঠিক সে পরিমাণ শক্তি লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে আমরা কোনো নতুন শক্তি সৃষ্টি করতে পারি না বা শক্তি ধ্বংস করতেও পারি না। অর্থাৎ, বিশ্বের সামগ্রিক শক্তি ভান্ডারের কোনো তারতম্য ঘটে না। এই বিশ্ব সৃষ্টির প্রথম মুহূর্তে যে পরিমাণ শক্তি ছিল আজও সে পরিমাণ শক্তি বর্তমান। এটাই শক্তির অবিনশ্বরতা বা শক্তির সংরক্ষণশীলতা।

৫.১১। মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতি

Principle of Conservation of Energy for Freely Falling Body

ধরা যাক, m ভরের কোনো বস্তুকে ভূমি থেকে অভিকর্ষের বিরুদ্ধে খাড়া h উচ্চতায় ওঠিয়ে A বিন্দুতে স্থির অবস্থায় রাখা হল [চিত্র ৫.৮]। A অবস্থানে বস্তুটির সমস্ত শক্তিই বিভব শক্তি। এখন বস্তুটিকে যদি অভিকর্ষের প্রভাবে মুক্তভাবে পড়তে দেওয়া হয় তাহলে বস্তুটিতে গতির সঞ্চার হবে। অভিকর্ষের প্রভাবে বস্তুটি যত ভূমির দিকে পড়বে বস্তুটির বেগ তত বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ, বিভব শক্তি গতি শক্তিতে রূপান্তরিত হবে।



চিত্র : ৫.৮

ধরা যাক,

A বিন্দুতে বস্তুর বিভব শক্তি = mgh

A বিন্দুতে বস্তুর গতি শক্তি = 0

$\therefore$ A বিন্দুতে বস্তুর মোট শক্তি = mgh + 0 = mgh। আবার ধরা যাক, বস্তুটি অভিকর্ষের প্রভাবে A বিন্দু থেকে x দূরত্ব পার হয়ে B বিন্দুতে পৌঁছল। B বিন্দুতে বস্তুর বিভব শক্তি ও গতি শক্তি উভয় থাকবে কারণ বস্তুটি ভূমি থেকে (h–x) উচ্চতায় গতিশীল রয়েছে।

এখন, B বিন্দুতে বস্তুর বিভব শক্তি = mg (h – x) = mgh – mgx

এবং B বিন্দুতে বস্তুর গতি শক্তি $= \frac{1}{2} mv^2$ আবার, পড়ন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে, $v^2 = u^2 + 2gs$ এখন বস্তুর প্রাথমিক বেগ, u = 0 এবং অতিক্রান্ত দূরত্ব, s = x সুতরাং, $v^2 = 2gx$

$\therefore$ B বিন্দুতে গতিশক্তি $= \frac{1}{2} mv^2 = \frac{1}{2} m \times 2gx = mgx$।

সুতরাং, B বিন্দুতে বস্তুর মোট শক্তি = mgh – mgx + mgx = mhg = A বিন্দুতে মোট শক্তি। অনুরূপভাবে দেখানো যায় যে ভূমি স্পর্শ করার মুহূর্তে C বিন্দুতে মোট শক্তি = mgh

সুতরাং অভিকর্ষের প্রভাবে মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে সব সময় বিভব শক্তি ও গতি শক্তির সমষ্টি সমান থাকে। অর্থাৎ, পড়ন্ত বস্তু শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতি মেনে চলে।

বস্তু যত নিচে পড়তে থাকে তার বিভব শক্তি তত কমতে থাকে এবং গতি শক্তি বাড়তে থাকে। ভূমি স্পর্শ করার পূর্ব মুহূর্তে সমস্ত বিভব শক্তিই গতি শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ, ভূপৃষ্ঠ থেকে h উচ্চতায় অবস্থানকালে বস্তুটির বিভব শক্তি যত হয় অভিকর্ষের প্রভাবে বস্তুটি মুক্তভাবে পড়লে ভূমি স্পর্শ করার মুহূর্তে তার গতি শক্তি তত হয়।

বস্তু যখন ভূমিতে পড়ে এবং স্থির হয় তখন তার সমস্ত গতি শক্তি ও বিভব শক্তি লোপ পায়। কিন্তু তা বলে শক্তি বিনষ্ট হয় না, বরং শব্দ, তাপ আলোক ইত্যাদি শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

৫.১২। শক্তি ও ক্ষমতার পার্থক্য

Distinction between Energy and Power

শক্তি	ক্ষমতা
১. কোনো বস্তুর কাজ করার সামর্থ্যকে শক্তি বলে	১. কোনো বস্তু একক সময়ে যে কাজ করতে পারে তাকে ক্ষমতা বলে।
২. মোট নিষ্পন্ন কাজ দিয়ে শক্তি নির্ধারণ করা হয়। শক্তি নির্ণয়ে তাই সময়ের প্রশ্ন আসে না।	২. ক্ষমতা নির্ধারণে মোট কাজের কোনো প্রয়োজন নেই। নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ করতে যার সময় যত কম লাগবে তার ক্ষমতা তত বেশি। ক্ষমতা নির্ণয়ে তাই সময়ের প্রশ্ন আসে।
৩. শক্তির বিভিন্ন রূপ আছে এবং শক্তি একরূপ থেকে অন্যরূপে রূপান্তরিত হয়।	৩. ক্ষমতার প্রকারভেদ নেই, তাই রূপান্তরের প্রশ্ন উঠে না।
৪. শক্তির মাত্রা : $[ML^2T^{-2}]$	৪. ক্ষমতার মাত্রা : $[ML^2T^{-3}]$
৫. শক্তির একক জুল।	৫. ক্ষমতার একক ওয়াট।

৫.১৩। জলবিদ্যুৎ

Hydroelectricity

আমরা জানি পানি শক্তির অন্যতম উৎস। পানির স্রোত ও জোয়ার-ভাঁটাকে ব্যবহার করে শক্তি উৎপাদন করা যায়। পানির প্রবাহ বা স্রোতকে কাজে লাগিয়ে যে তড়িৎ বা বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় তাকে বলা হয় জলবিদ্যুৎ। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে পানির বিভব শক্তি ব্যবহার করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বিভব শক্তি ব্যবহার করা হয়।

পানিকে বাঁধ দিয়ে আটকালে এর উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। পানির তলের উচ্চতা বৃদ্ধি বা এর গভীরতা বৃদ্ধির ফলে এর মধ্যে অধিক বিভব শক্তি জমা হয়। কোনো পাহাড়ের উপত্যকায় নিচের প্রান্তে বাঁধ দিয়ে এই কাজটি সাধারণত করা হয়ে থাকে। নদী থেকে আসা পানির প্রবাহ বাঁধে বাধা পেয়ে জমা হতে থাকে, এতে বাঁধের পেছনে কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি হয়। হ্রদ পানিতে পূর্ণ হয়ে গেলে হ্রদ থেকে পানি একটি মোটা নলের ভিতর দিয়ে নিচে অবস্থিত একটি তড়িৎ উৎপাদন কেন্দ্রে প্রবাহিত করা হয়। পানি পতনের সময় এর বিভব শক্তি গতি শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এ গতি শক্তি একটি টার্বাইনকে ঘোরায়। টার্বাইন হল ব্লেডযুক্ত একটি চাকা। টার্বাইনটি একটি তড়িৎ জেনারেটর এর সাথে সরাসরি যুক্ত থাকে। এই জেনারেটরে তড়িৎ উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন তড়িৎ বিভিন্ন স্থানে তারের মাধ্যমে পাঠানো হয়।



চিত্র ঃ ৫.৯

বাংলাদেশে ব্যবহৃত তড়িতের একটি বড় অংশ জলবিদ্যুৎ। এ বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে। পার্বত্য চট্টগ্রামের কাপ্তাইতে এ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি অবস্থিত। এখানে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে কাপ্তাই হ্রদ নামে একটি কৃত্রিম হ্রদ তৈরি করা হয়েছে। এ হ্রদ থেকে পানি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের টার্বাইন ঘোরানোর জন্য প্রবাহিত করা হয়।

৫.১৪। কর্মদক্ষতা
Efficiency

শক্তির রূপান্তরের সহায়তায় আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মেটাই। যেমন, পেট্রোলে সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তি গতি শক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে আমরা ইঞ্জিন চালাতে পারি। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পেট্রোল পুড়িয়ে আমরা যে গতি শক্তি পেতে পারি তার সবটাই কিন্তু ইঞ্জিনে দেখা যাবে না। এর কারণ শক্তির কিছু অংশ অন্যান্যভাবে ব্যয়িত হয়।

ইঞ্জিনে যতটুকু শক্তি পাওয়া যায় তাকে কার্যকর শক্তি বলে। কোনো যন্ত্রের কর্মদক্ষতা বলতে যন্ত্র থেকে মোট যে কার্যকর শক্তি পাওয়া যায় এবং মোট যে শক্তি দেওয়া হয়েছে তার অনুপাতকে বুঝায়। কর্মদক্ষতাকে সাধারণত η(গ্রিক – ইটা) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$\eta = \frac{\text{লভ্য কার্যকর শক্তি (Output)}}{\text{মোট প্রদত্ত শক্তি (Input)}} = \frac{\text{লভ্য কার্যকর ক্ষমতা (Power output)}}{\text{মোট প্রদত্ত ক্ষমতা (Power input)}}$$

কর্মদক্ষতাকে সাধারণ শতকরা হিসাবে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। কোনো যন্ত্রের কর্মদক্ষতা 90% বলতে আমরা বুঝি যে, যদি এই যন্ত্রে 100 J শক্তি দেওয়া হয়, তাহলে সে যন্ত্র থেকে লভ্য কার্যকর শক্তি 90 J হবে।

উদাহরণ ৫.১১। 20kW ক্ষমতার একটি ইঞ্জিন। অর্ধ মিনিটে 3000 kg পানি 10m উপরে তুলতে পারে। (ক) লভ্য কার্যকর শক্তি (খ) লভ্য কার্যকর ক্ষমতা এবং (গ) ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা নির্ণয় কর।

সমাধান :

আমরা জানি,

(ক) লভ্য কার্যকর শক্তি, E = ইঞ্জিন দ্বারা কৃতকাজ

= পানির বিভব শক্তি = mgh

$= 3000\text{kg} \times 9.8\text{ms}^{-2} \times 10\text{m}$

$= 294000\ \text{J} = 2.94 \times 10^5\text{J}.$

(খ) লভ্য কার্যকর ক্ষমতা, P

$$= \frac{\text{লভ্য কার্যকর শক্তি}}{\text{সময়}}$$

$$= \frac{294000J}{30s} = 9800W$$

= 9.8 kW

এখানে,

ইঞ্জিনের ক্ষমতা, p = 20kW

পানির ভর, m = 3000kg

উচ্চতা, h =10m

সময়, t =30Sec

(গ) কর্মদক্ষতা,

$$\eta = \frac{\text{লভ্য কার্যকর ক্ষমতা}}{\text{মোট প্রদত্ত ক্ষমতা}} = \frac{9.8\text{kW}}{20\text{kW}} = 0.49 = 49\%$$

উ: (ক) 2.94×10^5J (খ) 9.8kW (গ) 49%

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোনটি ভেক্টর রাশি?

ক. কাজ খ. শক্তি

গ. ক্ষমতা ঘ. বেগ

২। m ভরের একটি বস্তুকে 20m, 30m, 40m ও 50m উপরে রাখা হলে। কোন অবস্থানে তার বিভবশক্তি সবচেয়ে বেশি।

ক. 20m খ. 30m

গ. 40m ঘ. 50m

৩। 50 kg ভরের এক ব্যক্তি 20 m উঁচু একটি দালানের ছাদে ওঠলেন। তার কৃত কাজ কত?

ক. 9.8×10^2 জুল খ. 9.8×10^3 জুল

গ. 9.8×10^4 জুল ঘ. 9.8×10^5 জুল

৪। একটি সরল দোলকের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কৌণিক বিস্তারে ববের শক্তি –

i. গতি শক্তি

ii. বিভব শক্তি

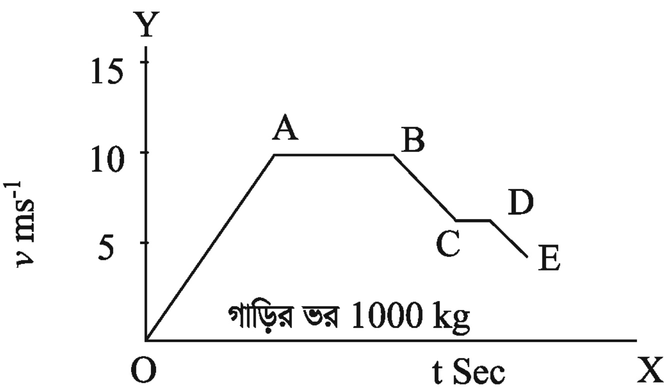
iii. গতি শক্তি ও বিভব শক্তি।

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

লেখ চিত্র অনুসরণে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও–



চিত্র

লেখ চিত্রে সময়ের সাথে গাড়ির গতিবেগ দেখানো হয়েছে।

৫। লেখ চিত্রের কোন অংশে বেগ সমানুপাতে পরিবর্তিত হয়–

ক. OA অংশে
খ. AB অংশে
গ. CD অংশে
ঘ. DE অংশে

৬। সর্বোচ্চ গতি শক্তি কত?

ক. 1.25×10^5j
খ. 5×10^4j
গ. 1.25×10^4j
ঘ. 6.2×10^3j

সৃজনশীল প্রশ্ন

বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় 100 m দৌড়ে নাজমা প্রথম হন। সে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ইতিকে 2 সেকেন্ডের ব্যবধানে পরাজিত করে। ইতি 12 সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে। নাজমা ও ইতির ভর যথাক্রমে 50 kg ও 45 kg।

ক. গতি শক্তি বলতে কী বুঝ?

খ. দৌড়ের আগে ও পরে নাজমার শক্তির রূপান্তর ব্যাখ্যা কর।

গ. দৌড় শেষ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে নাজমার গতিশক্তি কত?

ঘ. নাজমা ও ইতির গতিশক্তির তুলনা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

তরল ও বায়বীয় পদার্থ

LIQUIDS AND GASES

আমরা জানি, পদার্থের তিনটি অবস্থা আছে। কঠিন , তরল ও বায়ুবীয় । তরল ও বায়ুবীয় পদার্থ সহজে প্রবাহিত হতে পারে বলে এদের প্রবাহী বলা হয়। তরল ও বায়ুবীয় পদার্থের কোনো আকার নেই। এরা দৃঢ় নয় বলে প্রয়োগ করলে আকৃতির পরিবর্তন ঘটে। এ জন্য তরল ও বায়ুবীয় পদার্থের আলোচনায় ভর এবং বলের চেয়ে ঘনত্ব এবং চাপ ব্যবহার করা সুবিধাজনক। এ অধ্যায়ে আমরা এ সকল রাশি এবং তরল ও বায়ুবীয় পদার্থ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা যেমন প্যাসকেলের সূত্র, আর্কিমিডিসের নীতি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করব। বাস্তব জীবনে এ সকল নীতির প্রয়োগও আলোচিত হবে পর্যায়ক্রমে।

৬.১। ঘনত্ব

Density

কোনো বস্তু যে জায়গা জুড়ে থাকে তাকে এর আয়তন বলে। সমান আয়তনের এক টুকরো কর্ক আর এক টুকুরো লোহা পানিতে ছেড়ে দিলে দেখা যাবে কর্কের টুকরো ভেসে আছে আর লোহার টুকরো ডুবে গেছে। আমরা বলি কর্কের চেয়ে লোহার ঘনত্ব বেশি বলে লোহার টুকরো ডুবে গেছে। প্রকৃতপক্ষে সমান আয়তনের লোহার ভর অর্থাৎ, লোহার টুকরোয় পদার্থের পরিমাণ কর্কের ভর অর্থাৎ, কর্কের টুকরোর পদার্থের পরিমাণের চেয়ে বেশি। ঘনত্ব বলতে আমরা কোনো বস্তুর একক আয়তনে পদার্থের পরিমাণকে বুঝি অর্থাৎ, একক আয়তনের ভরই হচ্ছে বস্তুর ঘনত্ব।

বস্তুর একক আয়তনের ভরকে তার উপাদানের ঘনত্ব বলে। ঘনত্বকে ρ [রো] বা d বা D দ্বারা প্রকাশ করা হয়। V আয়তনের কোনো বস্তুর ভর m হলে, ঘনত্ব

$$\rho = \frac{m}{V} \quad \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \quad (৬.১)$$

কোনো বস্তুর ঘনত্ব এর উপাদান ও তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে। ঘনত্বের কেবল মান আছে, দিক নেই। ঘনত্ব তাই একটি স্কেলার রাশি।

মাত্রা ও একক :

মাত্রা : (৬.১) সমীকরণ থেকে দেখা যায়

ভরের মাত্রাকে আয়তনের মাত্রা দিয়ে ভাগ দিলে ঘনত্বের মাত্রা পাওয়া যায়।

$$\text{ঘনত্ব} = \frac{\text{ভর}}{\text{আয়তন}} = \frac{M}{L^3} = ML^{-3}$$

$$\therefore [\rho] = ML^{-3}$$

একক : (৬.১) সমীকরণ থেকে দেখা যায়

ভরের একককে আয়তনের একক দিয়ে ভাগ দিলে ঘনত্বের একক পাওয়া যাবে। ঘনত্বের একক হচ্ছে $\frac{\text{কিলোগ্রাম}}{\text{ঘনমিটার}}$ kgm^{-3} । আবার এস আই এককের উপগুণিতক (Submultiple) গ্রাম/ঘন সে.মি. বা gcm^{-3} ঘনত্বের একক হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

পানির ঘনত্ব 1000 kgm^{-3} বলতে বুঝায় $1m^3$ পানির ভর 1000 কিলোগ্রাম। 1 মিটার দীর্ঘ, 1 মিটার প্রস্থ এবং 1 মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট কোনো পাত্র পানি দ্বারা পূর্ণ করা হলে সেই পানির ভর হবে 1000 কিলোগ্রাম। ঠিক তেমনি আবার এক সেন্টিমিটার দীর্ঘ, এক সেন্টিমিটার প্রস্থ এবং এক সেন্টিমিটার উচ্চতা বিশিষ্ট কোনো পাত্র পানি দ্বারা পূর্ণ করা হলে পানির ভর হবে এক গ্রাম অর্থাৎ, এক্ষেত্রে পানির ঘনত্ব $1gcm^{-3}$।

উদাহরণ ৬.১। কোনো পুকুরের দৈর্ঘ্য 25m এবং প্রস্থ 15m। এতে 2m গভীর পানি থাকলে পানির ভর নির্ণয় কর ?

সমাধান :

আমরা জানি,

$\rho = \frac{m}{V}$

$\therefore m = \rho \times V$

$= 1000 \text{ kg m}^{-3} \times 750 \text{ m}^3$

$= 750000\text{kg}$

$= 7.5 \times 10^5 \text{ kg}$

উ: 7.5×10^5 kg

এখানে,

পানির আয়তন, $V = 25m \times 15m \times 2m$

$= 750 \text{ m}^3$

পানির ঘনত্ব, $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$

পানির ভর $m = ?$

৬.২। চাপ

Pressure

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা বিভিন্ন অর্থে 'চাপ' শব্দটি ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানে আমরা চাপ শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করে থাকি। কোনো বল কোনো ক্ষেত্রের উপর লম্বভাবে ক্রিয়া করলে ক্ষেত্রের প্রতি একক ক্ষেত্রফলে প্রযুক্ত বলই হচ্ছে চাপ।

কোনো পৃষ্ঠের একক ক্ষেত্রফলের উপর লম্বভাবে প্রযুক্ত বলের মানকে চাপ বলে। চাপকে P অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা হয়। A ক্ষেত্রফলের কোনো পৃষ্ঠের উপর লম্বভাবে প্রযুক্ত মোট বলের মান F হলে ঐ পৃষ্ঠে চাপের পরিমাণ,

$$P = \frac{F}{A} \quad \text{... ... ... (৬.২)}$$

চাপ স্কেলার রাশি।

মাত্রা ও একক :

বলের মাত্রাকে ক্ষেত্রফলের মাত্রা দিয়ে ভাগ করলে চাপের মাত্রা পাওয়া যাবে।

$$\text{চাপ} = \frac{\text{বল}}{\text{ক্ষেত্রফল}}$$

$$= \frac{\text{ভর} \times \text{ত্বরণ}}{\text{ক্ষেত্রফল}} = \frac{\text{ভর} \times \text{দৈর্ঘ্য}}{(\text{দৈর্ঘ্য})^2 \times (\text{সময়})^2} = \frac{ML}{L^2T^2}$$

$$\therefore [P] = [ML^{-1}T^{-2}]$$

একক : (৬.২) সমীকরণ থেকে দেখা যায় যে বলের একককে ক্ষেত্রফলের একক দিয়ে ভাগ করলে চাপের একক পাওয়া যায়। এই একক হচ্ছে নিউটন/ বর্গমিটার। ($1\ N/m^{-2}$) বা ($1\ Nm^{-2}$)। একে প্যাসকেল (Pa) বলে।

$\therefore Pa = 1\ Nm^{-2}$

$1\ m^2$ ক্ষেত্রফলের উপর $1\ N$ বল লম্বভাবে প্রযুক্ত হলে যে চাপের সৃষ্টি হয় তাকে $1\ Pa$ বলে। কোনো পৃষ্ঠে চাপ $10\ Pa$ বলতে বুঝতে ঐ পৃষ্ঠের $1\ m^2$ ক্ষেত্রফলের উপর লম্বভাবে $10\ N$ বল প্রযুক্ত হচ্ছে।

ধাক্কা (Thrust)
চাপের জন্য কোনো ক্ষেত্রে মোট যে বল প্রযুক্ত হয় তাকে ধাক্কা বলে। আমরা জানি,

চাপ $= \dfrac{\text{বল}}{\text{ক্ষেত্রফল}}$

$\therefore$ মোট বল = চাপ × ক্ষেত্রফল

$\therefore$ মোট বল বা ধাক্কা, $F = P \times A$

মোট বল বা ধাক্কা ক্ষেত্রের সাথে লম্বভাবে ক্রিয়া করে।

৬.৩। স্থির তরলের মধ্যে কোনো বিন্দুতে চাপের মান
Pressure at a Point in liquid at equilibrium

তরল পদার্থের ভিতরে কোনো বিন্দুতে চাপ বলতে ঠিক ঐ বিন্দুর চারদিকে প্রতি একক ক্ষেত্রফলের উপর লম্বভাবে অনুভূত বলকে বুঝায়। কোনো স্থানের সকল বিন্দুতে যদি চাপ সমান না হয়, তাহলে ঐ স্থানের কোনো বিন্দুতে চাপ হিসাবের সময় ঐ বিন্দুর চারদিকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র এলাকা বিবেচনা করতে হবে যাতে আমরা ধরে নিতে পারি এ ক্ষুদ্র এলাকার মধ্যে চাপের কোনো তারতম্য হচ্ছে না। তারপর সেই ক্ষুদ্র এলাকায় লম্বভাবে ক্রিয়ারত বলকে, আনুষঙ্গিক ক্ষুদ্র ক্ষেত্রফল দিয়ে ভাগ করে ঐ বিন্দুতে চাপ হিসাব করতে পারি। নিচে তরল পদার্থের মধ্যে কোনো বিন্দুতে চাপের রাশিমালা প্রতিপাদন করা হল।

৬.১ নং চিত্রে একটি পাত্রে কিছু পরিমাণ তরল পদার্থ আছে।
ধরা যাক, পাত্রের ভূমির ক্ষেত্রফল = A
তরলের ঘনত্ব = ρ
তরলের গভীরতা = h
অভিকর্ষজ ত্বরণ = g

আমরা জানি, চাপ $= \dfrac{\text{বল}}{\text{ক্ষেত্রফল}}$

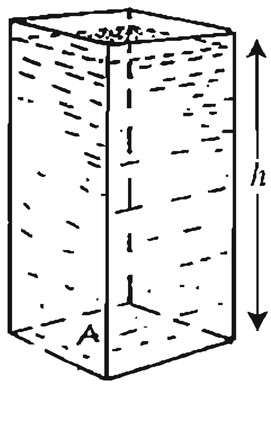
এখন A ক্ষেত্রফলে প্রযুক্ত বল = তরলের ওজন

= তরলের ভর × g

= তরলের আয়তন × ঘনত্ব × g

= ভূমির ক্ষেত্রফল × গভীরতা × ঘনত্ব × g

$= Ah\rho g$



চিত্র : ৬.১

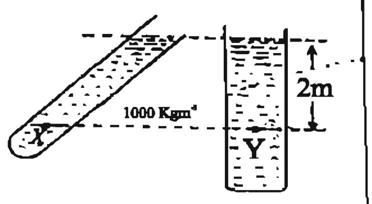
$\therefore$ চাপ, $P = \dfrac{Ah\rho g}{A}$

বা, $P = h\rho g$ ... ... (৬.৩)

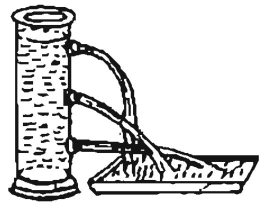
(৬.৩) সমীকরণে ভূমির ক্ষেত্রফল A অনুপস্থিত। সুতরাং চাপের মান ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভর করে না। ক্ষেত্রফল যত বড় বা যত ছোট হোক চাপের মান একই হবে।

উদাহরণ স্বরূপ ৬.২ চিত্রের X এবং Y বিন্দুতে চাপের মান = $2m \times 1000\ kg\ m^{-3} \times 9.8\ ms^{-2} = 19600\ Pa$

সমীকরণ ৬.৩ থেকে আরো দেখা যায় যে কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় তরলের মধ্যে কোনো বিন্দুতে চাপ নির্ভর করে তরলের ঘনত্ব এবং তরলের মুক্ত তল হতে বিন্দুর গভীরতার ওপর। নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট তরলের জন্য এ চাপের মান নির্ভর করে শুধুমাত্র বিন্দুর গভীরতার ওপর। গভীরতা যত বেশি হয় চাপের মানও তত বেড়ে যায়।



চিত্র : ৬.২



চিত্র : ৬.৩

তরল পদার্থের চাপ যে গভীরতার সাথে বৃদ্ধি পায় তা খুব সহজেই দেখানো যায়। একটি লম্বা পাত্র পানিপূর্ণ করে পাত্রের গায়ে বিভিন্ন উচ্চতায় পার্শ্বনল লাগিয়ে দিলে দেখা যাবে সবচেয়ে নিচের নল দিয়ে নির্গত পানির দ্রুতি সবচেয়ে বেশি (চিত্র ৬.৩) এ থেকে বোঝা যায় যে পানির চাপ গভীরতার সাথে বৃদ্ধি পায়।

উদাহরণ ৬.২। একটি পাত্রে কেরোসিন আছে। কেরোসিনের উপরিতল থেকে 75cm গভীরে কোনো বিন্দুতে চাপের মান নির্ণয় কর। কেরোসিনের ঘনত্ব $800kg\ m^{-3}$

সমাধান :

আমরা জানি

$P = h\rho g$

$= 0.75m \times 800kg.m^{-3} \times 9.8ms^{-2}$

$= 5880\ Pa$

উ: 5880 Pa

এখানে ,

তরলের গভীরতা, $h = 75\ cm$

$= 0.75\ m$

তরলের ঘনত্ব, $\rho = 800kg\ m^{-3}$

অভিকর্ষজ ত্বরণ, $g = 9.8\ ms^{-2}$

চাপ , $\rho = ?$

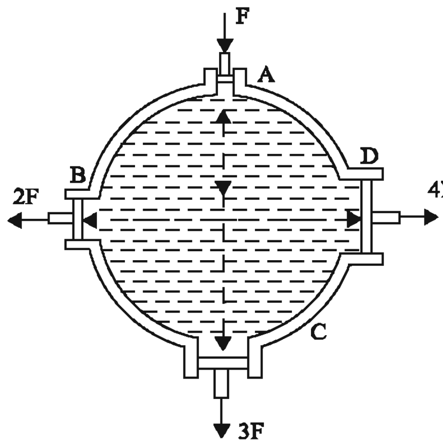
৬.৪ । প্যাসকেলের সূত্র
Pascal's Law

কোনো আবদ্ধ তরল বা বায়বীয় পদার্থের কোনো অংশে চাপ প্রয়োগ করলে সেই চাপ সবদিকে সঞ্চালিত হয়। চাপের এ সঞ্চালন সম্পর্কে প্যাসকেলের একটি সূত্র আছে।

প্যাসকেলের সূত্র : পাত্রে আবদ্ধ তরল বা বায়বীয় পদার্থের কোনো অংশের ওপর বাইরে থেকে চাপ প্রয়োগ করলে সেই

চাপ কিছুমাত্র না কমে তরল বা বায়বীয় পদার্থের সব দিকে সমানভাবে সঞ্চালিত হয় এবং তরল বা বায়বীয় পদার্থের সংলগ্ন পাত্রের গায়ে লম্বভাবে ক্রিয়া করে।

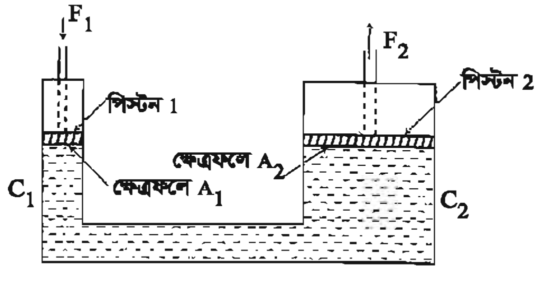
প্যাসকেলের সূত্রের পরীক্ষামূলক প্রমাণ :



চিত্র : ৬.৪

গোলাকার একটি পানিপূর্ণ আবদ্ধ পাত্র নেওয়া হল। এ পাত্রে A, B ,C, D চারটি মুখ আছে (চিত্র ৬.৪) । এই মুখগুলো নিছিদ্র পিস্টন দ্বারা আটকানো আছে। ধরা যাক, A পিস্টনের প্রস্থচ্ছেদ 1 একক এবং B, C ও D এর প্রস্থচ্ছেদ যথাক্রমে 2, 3 এবং 4 একক করে। এখন A পিস্টনের উপর যদি F বল প্রয়োগ করে ভিতরের দিকে ঠেলা হয় তাহলে B, C ও D পিস্টনগুলো বাইরের দিকে সরে যাবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে A পিস্টনের উপর প্রযুক্ত চাপ সবদিকে সঞ্চালিত হয়েছে। এখন B, C ও D পিস্টনগুলোকে যদি আমরা তাদের স্বস্থানে ধরে রাখতে চাই তাহলে পিস্টনগুলোর উপর যথাক্রমে 2F, 3F ও 4F বল প্রয়োগ করতে হবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে পিস্টনগুলোর উপর যে চাপ অর্থাৎ, প্রতি একক ক্ষেত্রফলে যে বল সঞ্চালিত হয়েছে তা A পিস্টনের উপর প্রযুক্ত বলের সমান কারণ A এর ক্ষেত্রফল একক ধরা হয়েছে। আবার পিস্টনগুলোর সরে যাওয়ার অভিমুখ লক্ষ করলে দেখা যাবে যে সঞ্চালিত চাপ পিস্টনগুলোর উপর লম্বভাবে ক্রিয়া করে। পানির পরিবর্তে বায়বীয় পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা করলেও একই ফল পাওয়া যাবে। সুতরাং বলা যায় পাত্রে আবদ্ধ কোনো তরল বা বায়বীয় পদার্থে চাপ প্রয়োগ করলে সেই চাপ কিছু মাত্র না কমে সকল দিকে সঞ্চালিত হয় এবং পাত্রের গায়ে লম্বভাবে ক্রিয়া করে।

প্যাসকেলের সূত্রের গাণিতিক ব্যাখ্যা : বল বৃদ্ধিকরণ নীতি :



চিত্র : ৬.৫

উপরের পরীক্ষায় দেখা গেছে যে প্রথম পিস্টনে F বল প্রয়োগ করে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পিস্টনে এর যথাক্রমে দ্বিগুণ, তিনগুণ ও চারগুণ বল প্রয়োগ করা যায়। এভাবে তরল পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশের উপর পিস্টন দ্বারা কোনো বল প্রয়োগ করলে এর বৃহত্তর পিস্টনগুলোতে সেই বলের বহুগুণ বল প্রযুক্ত হতে পারে। একে বল বৃদ্ধিকরণ নীতি বলা হয়।

ধরা যাক, C_1ও C_2 দুটি সিলিন্ডার (চিত্র ৬.৫) । এদের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল যথাক্রমে A_1ও A_2 । সিলিন্ডার দুটি একটি নল দ্বারা সংযুক্ত এবং প্রত্যেক সিলিন্ডারে একটি করে পিস্টন নিচ্ছিদ্রভাবে লাগানো আছে (চিত্র ৬.৫) । এখন সিলিন্ডার দুটি যে কোনো তরল পদার্থে পূর্ণ করে যদি ছোট পিস্টনে F_1 বল প্রয়োগ করা হয় তাহলে ছোট পিস্টনে অনুভূত চাপ হবে F_1/A_1। প্যাসকেলের সূত্রানুসারে এ চাপ তরল পদার্থ দ্বারা সবদিকে সঞ্চালিত হবে। সুতরাং বড় পিস্টনে প্রযুক্ত উর্ধ্ব চাপ F_1/A_1 হবে। এ চাপের জন্য বড় পিস্টনে অনুভূত উর্ধ্বমুখী বল হবে $\frac{F_1}{A_1} \times A_2$ এর সমান। বড় পিস্টনে অনুভূত উর্ধ্বমুখী বল F_2 হলে,

$$F_2 = \frac{F_1}{A_1} \times A_2$$

$$\therefore \frac{F_2}{F_1} = \frac{A_2}{A_1} \quad \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots (৬.৪)$$

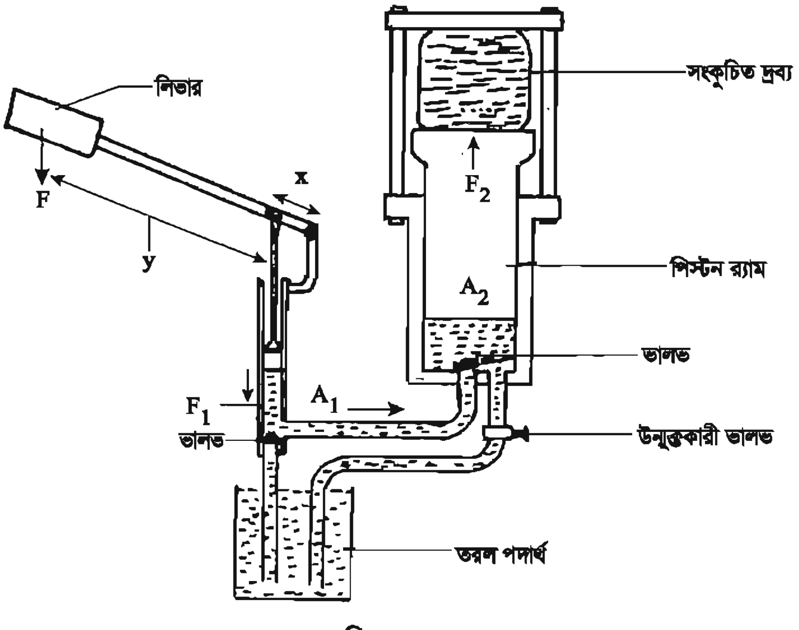
অর্থাৎ, $\frac{\text{বড় পিস্টনে বল}}{\text{ছোট পিস্টনে বল}} = \frac{\text{বড় পিস্টনের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল}}{\text{ছোট পিস্টনের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল}}$

কাজেই বড় পিস্টনের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল যত বেশি হবে বলও তত বেশি অনুভূত হবে। ছোট পিস্টনের চেয়ে বড় পিস্টন যদি ১০০ গুণ বড় হয় তাহলে ছোট পিস্টনে ১ নিউটন বল প্রয়োগ করলে বড় পিস্টনে ১০০ নিউটন ঊর্ধ্বমুখী বল অনুভূত হবে।

৬.৫। হাইড্রোলিক প্রেস বা হাইড্রোলিক জ্যাক বা ব্রামার প্রেস
Hydraulic Press or Hydraulic Jack or Brahmar Press

তরল পদার্থের চাপ সঞ্চালনের ফলে বল বৃদ্ধিকরণ নীতির ওপর ভিত্তি করে হাইড্রোলিক প্রেস তৈরি করা হয়। ব্রামা নামে জনৈক প্রকৌশলী এ যন্ত্রের উন্নতি সাধন করেন। ফলে একে ব্রামার প্রেসও বলা হয়।

যন্ত্রের বর্ণনা : এ যন্ত্রে একটি ছোট সিলিন্ডার ও একটি বড় সিলিন্ডার নলদ্বারা যুক্ত আছে (চিত্র ৬.৬)। সিলিন্ডার দুটির মুখে নিচ্ছিদ্র পিস্টন লাগানো থাকে। সংযোগকারি নলে একটি ভালভ বসানো থাকে।



চিত্র : ৬.৬

ছোট পিস্টনের তলা থেকে একটি নল তরলের ট্যাঙ্কের সাথে যুক্ত । এ নল ও ছোট পিস্টনের সংযোগস্থলে আর একটি ভালভ লাগানো থাকে। একটি লিভারের সাহায্যে ছোট পিস্টনটিকে ওঠানামা করানো যায়। বড় পিস্টন বা র‍্যামের উপর একটি পাটাতন রয়েছে। যে বস্তুকে সংকুচিত করতে হবে সেটি এ পাটাতনের উপর রাখা হয়। পাটাতনের উপর শক্ত লোহার পাত চারটি থামের সাহায্যে শক্তভাবে আটকানো আছে। ভালভ দুটি দিয়ে তরল পদার্থ শুধু উপরে যেতে পারে। বিপরীত দিক থেকে তরল আসতে চাইলে ভালভ দুটি আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যায়।

কার্যপ্রণালি : লিভারের সাহায্যে ছোট পিস্টনকে উপরে তুললে ট্যাংক থেকে তরল পদার্থ ভালভকে ঠেলে নল দিয়ে ছোট সিলিন্ডারে প্রবেশ করে। এখন ছোট পিস্টনকে নিচে নামালে ছোট সিলিন্ডারের নিচের ভালভটি বন্ধ হয়ে যায় এবং সংযোগ নলের মধ্য দিয়ে তরল পদার্থ বড় সিলিন্ডারের ভালভের উপর চাপ দেয়। ফলে তাও খুলে যায় এবং তরল পদার্থ সিলিন্ডারের মধ্যে প্রবেশ করে। এভাবে বারবার ছোট পিস্টনটিকে ওঠানামা করালে বড় সিলিন্ডারটি তরলে ভরে যায় এবং ছোট পিস্টনের প্রদত্ত চাপ তরলে সঞ্চালিত হয়ে বড় পিস্টনের উপর চাপ প্রয়োগ করে। ফলে বড় পিস্টন উপরে ওঠে আসে এবং পাটাতনের উপর রাখা নরম বস্তু চাপে ছোট হয়ে যায়। চাপ প্রয়োগের কাজ শেষ হলে বড়

সিলিন্ডারের তরল পদার্থ পাইপের সাহায্যে আবার ট্যাঙ্কে ফিরিয়ে আনা হয়। সিলিন্ডার থেকে তরল পদার্থ ট্যাঙ্কে চলে গেলে বড় পিস্টন নিচে নেমে আসে এবং যন্ত্র আবার ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত হয়।

যান্ত্রিক সুবিধা : (Mechanical Advantage M.A.) ধরা যাক , ছোট ও বড় পিস্টনের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল যথাক্রমে A_1ও A_2 এবং লিভারে F বল প্রয়োগ করলে ছোট পিস্টনে F_1 বল অনুভূত হয়।

লিভারের প্রতিবন্ধক বাহু ও ক্ষমতাশীল বাহু যথাক্রমে x ও y হলে

লিভারের যান্ত্রিক সুবিধা = $\frac{F_1}{F} = \frac{\text{লিভারের ক্ষমতাশীল বাহু}}{\text{লিভারের প্রতিবন্ধক বাহু}} = \frac{y}{x}$

$\therefore F_1 = \frac{y}{x} \times F$ ... ... (৬.৫)

ছোট পিস্টনে প্রযুক্ত F_1 বলের ক্রিয়ার ফলে বড় পিস্টনে যদি F_2 বল ক্রিয়া করে তাহলে,

বা, $\frac{F_2}{F_1} = \frac{A_2}{A_1}$ বা, $F_2 = \frac{A_2}{A_1} \times F_1$ বা, $F_2 = \frac{A_2}{A_1} \times \frac{y}{x} \times F$

সুতরাং, যান্ত্রিক সুবিধা, M.A.= $\frac{\text{লব্ধ বল}}{\text{প্রযুক্ত বল}}$

বা, M.A.= $\frac{F_2}{F} = \frac{A_2}{A_1} \times \frac{y}{x}$ ... ... (৬.৬)

ব্যবহার : অল্প বল প্রয়োগ করে এ যন্ত্রের সাহায্যে প্রচণ্ড ধাক্কার সৃষ্টি করা যায়, ফলে কাপড়, তুলা, পাটের গাঁট প্রভৃতির চাপ দিয়ে ছোট করা, বীজ থেকে তেল নিষ্কাশন, চামড়া শক্ত করা ইত্যাদি কাজে এ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

উদাহরণ ৬.৩। একটি হাইড্রোলিক প্রেসের ছোট পিস্টনের ব্যাস 4cm এবং বড় পিস্টনের ব্যাস 100 cm। 100 নিউটনের বল ছোট পিস্টনের উপর ক্রিয়া করলে বড় পিস্টনে কত বল অনুভূত হবে।

সমাধান :

ছোট ও বড় পিস্টনের ক্ষেত্রফল

যথাক্রমে A_1 ও A_2 হলে

আমরা জানি,

$$\frac{F_2}{F_1} = \frac{A_2}{A_1} = \frac{\pi\left(\frac{d_2}{2}\right)^2}{\pi\left(\frac{d_1}{2}\right)^2}$$

$$\therefore F_2 = F_1 \times \frac{d_2^2}{d_1^2}$$

$$= 100\text{ N} \times \frac{100\text{cm} \times 100\text{cm}}{5\text{cm} \times 5\text{cm}}$$

$$= 40\,000\text{ N}$$

উত্তর : 4×10^4N

এখানে,

ছোট পিস্টনের ব্যাস, $d_1 = 5$ cm

বড় পিস্টনের ব্যাস, $d_2 = 100$ cm

ছোট পিস্টনের বল, $F_1 = 100$ N

বড় পিস্টনের বল, $F_2 =$?

উদাহরণ ৬.৪। একটি হাইড্রোলিক প্রেসের 20 cm^2 ক্ষেত্রফলের পিস্টনের উপর 1000 N ওজনের একটি বস্তু রাখতে 2cm^2 ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট পিস্টনে কী পরিমাণ বল প্রয়োগ করতে হবে ?

সমাধান :

আমরা জানি

$$\frac{F_2}{F_1} = \frac{A_2}{A_1}$$

$$F_1 = F_2 \times \frac{A_1}{A_2}$$

$$= 1000N \times \frac{2cm^2}{20cm^2}$$

$$= 100\ N$$

উত্তর : 100 N

এখানে,

ছোট পিস্টনের ক্ষেত্রফল $A_1 = 2cm^2$

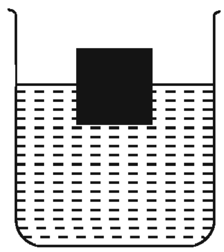
বড় পিস্টনের ক্ষেত্রফল $A_2 = 20cm^2$

বড় পিস্টনে ওজন $F_2 = 1000\ N$

ছোট পিস্টনে বল, $F_1 = ?$

৬.৬ । আর্কিমিডিসের নীতি Archimedes' Principle

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখতে পাই যে কোনো কঠিন বস্তুকে পানিতে ডুবালে হাল্কা বলে মনে হয়। তোমরা যারা সাঁতার কাটতে জানো তারা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ পানির ভিতরে নিজেদেরকে অনেক হালকা মনে হয়। শুধু পানি নয়, যে কোনো তরল বা বায়বীয় পদার্থে কোনো বস্তু ডুবালে এর ওজন কম মনে হয়। এর কারণ, তরল বা বায়বীয় পদার্থে ডুবন্ত অবস্থায় বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল ঊর্ধ্বচাপজনিত বল বস্তুর ওজনের বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে, ফলে বস্তুর ওজন কম মনে হয়। বস্তুর প্লবতার জন্য এরকম হয়।



চিত্র : ৬.৭

কোনো বস্তু সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোনো স্থির তরল বা বায়বীয় পদার্থে নিমজ্জিত করলে তরল বা বায়বীয় পদার্থের চাপের জন্য বস্তু উপরের দিকে যে লব্ধি বল অনুভব করে তাকে প্লবতা বলে।

তরল বা বায়বীয় পদার্থে নিমজ্জিত বস্তুর উপর তরল বা বায়বীয় পদার্থ যে ঊর্ধ্বমুখী বল প্রয়োগ করে গ্রিক বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস সর্বপ্রথম তা পরিমাপ করতে সক্ষম হন। তার পরীক্ষার ফলাফল বর্তমানে আর্কিমিডিসের নীতি নামে পরিচিত।

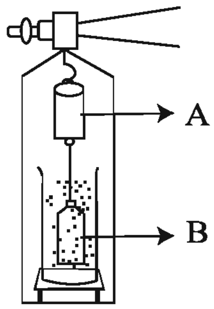
আর্কিমিডিসের নীতি : বস্তুকে কোনো স্থির তরল অথবা বায়বীয় পদার্থে আংশিক বা সম্পূর্ণ ডুবালে বস্তুটি কিছু ওজন হারায়। এই হারানো ওজন বস্তুটির দ্বারা অপসারিত তরল বা বায়বীয় পদার্থের ওজনের সমান।

কোনো কঠিন পদার্থকে তরল বা বায়বীয় পদার্থে ডুবালে ওজন কম মনে হয়। আর্কিমিডিসের নীতি থেকে আমরা এ ওজন হ্রাসের পরিমাণ জানতে পারি। ৬.৭ চিত্রে একটি বস্তু আংশিকভাবে কোনো তরলে ডুবানো আছে।

পদার্থের অভেদ্যতা ধর্ম অনুযায়ী বস্তুটি তরল পদার্থের মধ্যে যতটুকু জায়গা অধিকার করে আছে ঠিক ততটুকু জায়গা থেকে তরল পদার্থ অপসারিত হয়েছে। পরীক্ষা করলে দেখা যাবে বস্তুটির হারানো ওজন বস্তুটির দ্বারা অপসারিত তরলের ওজনের সমান।

আর্কিমিডিসের নীতির পরীক্ষামূলক প্রমাণ :

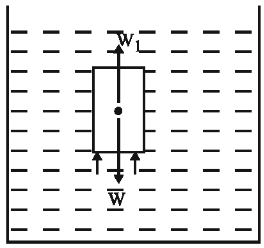
তরল বা বায়বীয় পদার্থে নিমজ্জিত বস্তুর ওজন হ্রাস যে বস্তু দ্বারা অপসারিত তরল বা বায়বীয় পদার্থের ওজনের সমান তা নিচের পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করা যায়। ধরা যাক A ও B দুটি সিলিন্ডার (চিত্র ৬.৮)। A সিলিন্ডারটির উপরের মুখ খোলা ও ফাঁকা এবং B সিলিন্ডারটি নিরেট। A সিলিন্ডারটির মাপ এমন যেন B সিলিন্ডারটি এর মাঝে বসে যায়। অর্থাৎ, A এর ভিতরের আয়তন B এর বাইরের আয়তনের সমান। একটি তরল স্থৈতিক নিক্তির বামপাশে এদের ঝুলিয়ে অপর পাশ অনুভূমিক করা হল। এরপর B সিলিন্ডারটি সম্পূর্ণ পানিতে ডুবানো হল। এর ফলে নিক্তির বাম দিক উপরে ওঠে যাবে এবং ডান দিক নিচে নেমে যাবে অর্থাৎ, বাম দিক হালকা হয়ে গেল। এ অবস্থায় যদি A সিলিন্ডারটিকে ধীরে ধীরে পানি পূর্ণ করা হয় তাহলে নিক্তির বাম দিক আবার নিচে নামতে থাকবে এবং A সিলিন্ডারটি সম্পূর্ণ ভর্তি হয়ে গেলে নিক্তি আবার অনুভূমিক হয়ে যাবে। এতে প্রমাণিত হয় যে, B সিলিন্ডারটি পানিতে ডুবানোর ফলে যে ওজন হারিয়েছিল তা A সিলিন্ডারের ভিতরের আয়তনের সমান। সুতরাং পানিতে ডুবালে বস্তুর ওজন যে পরিমাণ কমে তা পানিতে ডুবানো বস্তুর সমআয়তন পানির ওজনের সমান অর্থাৎ, আর্কিমিডিসের নীতি প্রমাণিত হল।



চিত্র : ৬.৮

বস্তুর ভাসা ও নিমজ্জনের কারণ

কোনো বস্তুকে যখন কোনো তরল পদার্থে ডুবানো হয় তখন ঐ বস্তুটির ওপর দুটি বল ক্রিয়াশীল হয়। বস্তুটির ওজন W সরাসরি নিচের দিকে ক্রিয়া করে এবং তরল পদার্থের চাপজনিত লব্ধি বল W_1 উপরের দিকে ক্রিয়া করে (চিত্র ৬.৯)। দুটি বল একই সরলরেখা বরাবর বিপরীত দিকে ক্রিয়া করায় বস্তুটি তরল পদার্থে ডুববে না ভাসবে তা এই বল দুটির ওপর নির্ভর করবে। এখানে তিন ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে :



চিত্র : ৬.৯

১. $\mathbf{W > W_1}$ হলে অর্থাৎ, বস্তুর ওজন বস্তু দ্বারা অপসারিত তরল পদার্থের ওজনের চেয়ে বেশি হলে বস্তুটি তরলে ডুবে যাবে। এক্ষেত্রে বস্তুর ঘনত্ব তরলের ঘনত্বের চেয়ে বেশি।

২. $\mathbf{W < W_1}$ হলে অর্থাৎ, বস্তুর ওজনের চেয়ে বস্তুটি দ্বারা অপসারিত তরলের ওজন বেশি হলে বস্তুটি ঐ তরলে ভেসে থাকবে। এক্ষেত্রে তরলের ঘনত্ব বস্তুর ঘনত্বের চেয়ে বেশি।

৩. $\mathbf{W = W_1}$ হলে অর্থাৎ, বস্তু দ্বারা অপসারিত তরল পদার্থের ওজন বস্তুর ওজনের সমান হলে বস্তুটি ঐ তরলে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসবে। এক্ষেত্রে বস্তুর ঘনত্ব তরলের ঘনত্বের সমান হয়।

৬.৭ আর্কিমিডিসের নীতির প্রয়োগের উদাহরণ
Examples of Archemedes' Principle

লোহার জাহাজ ভাসে :

লোহার টুকরা পানিতে ভাসে না কারণ লোহার খণ্ড দ্বারা অপসারিত পানির ওজন লোহা খণ্ডের ওজনের চেয়ে অনেক কম। কিন্তু লোহার তৈরি হলেও জাহাজ পানিতে ভাসে কারণ জাহাজের ভিতরটা ফাঁপা। ফলে জাহাজ যে আয়তনের পানি অপসারণ করে তার ওজন জাহাজের ওজনের চেয়ে বেশি হয়। এতে জাহাজ পানিতে নামালে প্রথমে ডুবতে শুরু করে। খানিকটা ডুবার পর যখন অপসারিত পানির ওজন জাহাজের ওজনের সমান হয় তখন জাহাজটি ভাসতে থাকে।

বরফ পানিতে ভাসে :

পানি বরফে পরিণত হলে এর আয়তন বেড়ে যায়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে 1 লিটার পানি বরফে পরিণত হলে এর আয়তন $\frac{12}{11}$ লিটার হয়। সুতরাং বরফের ঘনত্ব পানির ঘনত্বের চেয়ে কম আর তাই বরফ পানিতে ভাসে। পানিতে ভাসার সময় বরফের $\frac{11}{12}$ অংশ পানির নিচে থাকে এবং $\frac{1}{12}$ অংশ পানির উপরে থাকে।

৬.৮। আপেক্ষিক গুরুত্ব
Relative Density or Specific Gravity

কোনো বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব বলতে সমআয়তনের কোনো প্রমাণ বস্তুর তুলনায় সেটি কত ভারী তা বুঝানো হবে। 4°C তাপমাত্রার সমআয়তন পানিকে প্রমাণ বস্তু ধরা হয়। 4°C তাপমাত্রায় পানির ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি বলে পানিকে প্রমাণ বস্তু হিসেবে ধরা হয়।

কোনো বস্তুর ওজন ও 4°C তাপমাত্রার সমআয়তন পানির ওজনের অনুপাতকে বস্তুর উপাদানের আপেক্ষিক গুরুত্ব বলে।

কোনো বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব

$$S = \frac{\text{বস্তুর ওজন}}{4^\circ C \text{ তাপমাত্রার সমআয়তন পানির ওজন}}$$

$$= \frac{V \text{ আয়তন বস্তুর ওজন}}{4^\circ C \text{ তাপমাত্রার } V \text{ সমআয়তন পানির ওজন}}$$

$$= \frac{V \text{ আয়তন বস্তুর ভর} \times g}{4^\circ C \text{ তাপমাত্রার } V \text{ সমআয়তন পানির ভর} \times g}$$

$$= \frac{\text{বস্তুর একক আয়তনের ভর}}{4^\circ C \text{ তাপমাত্রার একক আয়তনের পানির ভর}}$$

$$= \frac{\text{বস্তুর ঘনত্ব}}{4^\circ C \text{ তাপমাত্রার পানির ঘনত্ব}}$$

যদি বস্তুর ঘনত্ব ρ এবং 4°C তাপমাত্রার পানির ঘনত্ব ρ_w হয় তাহলে

$$S = \frac{\rho}{\rho_w} \qquad (৬.৭)$$

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কোনো বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব বলতে 4° C তাপমাত্রার পানির ঘনত্বের সাপেক্ষে বস্তুর ঘনত্বকে বুঝায়। তাই আপেক্ষিক গুরুত্বকে আপেক্ষিক ঘনত্ব (Relative density) বলা হয়।

মাত্রা ও একক : একই জাতীয় দুটি রাশির অনুপাত বলে আপেক্ষিক গুরুত্বের কোনো একক বা মাত্রা নাই। সমীকরণ (৬.৭) থেকে

কোন বস্তুর ঘনত্ব $\rho = S \times \rho_w$

অর্থাৎ, কোনো বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্বকে পানির ঘনত্ব দিয়ে গুণ করলে ঐ বস্তুর ঘনত্ব পাওয়া যায়। এস. আই. এককে বস্তুর ঘনত্ব এর আপেক্ষিক গুরুত্বের 1000 গুণ।

আপেক্ষিক গুরুত্বের ওপর তাপমাত্রার প্রভাব :

আমরা জানি বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব বলতে সমআয়তন 4° C তাপমাত্রার পানি অপেক্ষা বস্তুটি কত ভারী তা বুঝায়। তাই আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করতে হলে বস্তুর ওজনকে 4° C তাপমাত্রার সমআয়তন পানির ওজন দিয়ে ভাগ করতে হয়। কিন্তু আমাদের পরীক্ষাগারে পানির তাপমাত্রা সাধারণত 4° C এ পাওয়া যায় না। প্রকৃত আপেক্ষিক গুরুত্ব পাওয়ার জন্য তাপমাত্রার সংশোধন করতে হয়।

ধরা যাক, কোনো পরীক্ষাগারে পানির উষ্ণতা θ°C তাহলে পরীক্ষালব্ধ আপেক্ষিক গুরুত্ব

$$S_\theta = \frac{\text{বস্তুর ঘনত্ব}}{\theta^\circ C \text{ তাপমাত্রার পানির ঘনত্ব}}$$

কিন্তু আপেক্ষিক গুরুত্ব

$$S = \frac{\text{বস্তুর ঘনত্ব}}{4^\circ C \text{ তাপমাত্রার পানির ঘনত্ব}}$$

$$= \frac{\text{বস্তুর ঘনত্ব}}{\theta^\circ C \text{ তাপমাত্রার পানির ঘনত্ব}} \times \frac{\theta^\circ C \text{ তাপমাত্রার পানির ঘনত্ব}}{4^\circ C \text{ তাপমাত্রার পানির ঘনত্ব}}$$

$= S_\theta \times \theta^\circ C$ তাপমাত্রার পানির আপেক্ষিক গুরুত্ব

$$\therefore S = S_\theta \times \rho_\theta \qquad \text{(৬.৮)}$$

অর্থাৎ, প্রকৃত আপেক্ষিক গুরুত্ব = পরীক্ষালব্ধ আপেক্ষিক গুরুত্ব $\times\ \theta^\circ C$ তাপমাত্রার পানির আপেক্ষিক গুরুত্ব।

আপেক্ষিক গুরুত্ব জানার প্রয়োজনীয়তা :

কোনো বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব জানা থাকলে বস্তুটি পানিতে ডুববে না ভাসবে তা সহজে বুঝা যায়। যদি বস্তুটি পানির চেয়ে হালকা হয়। তাহলে ভাসমান অবস্থায় এর কত অংশ পানিতে নিমজ্জিত হবে তাও জানা যায়।

যেহেতু প্রতিটি পদার্থের একটা সুনির্দিষ্ট আপেক্ষিক গুরুত্ব আছে তাই কোনো বিশেষ বস্তু কোন পদার্থ দিয়ে তৈরি আপেক্ষিক গুরুত্ব থেকে তা জানা যায়। কোনো বস্তু বিশুদ্ধ না ভেজাল মিশ্রিত আপেক্ষিক গুরুত্ব জেনে তা নির্ণয় করা যায়।

আপেক্ষিক গুরুত্ব ও ঘনত্বের মধ্যে পার্থক্য

ঘনত্ব	আপেক্ষিক গুরুত্ব
১. বস্তুর একক আয়তনের ভরকে ঘনত্ব বলে।	১. কোনো বস্তুর একক আয়তনের ভর ও $4^\circ C$ তাপমাত্রার সমআয়তন পানির ভরের অনুপাতকে আপেক্ষিক গুরুত্ব বলে।
২. ঘনত্বের একক আছে। এর একক $kg\ m^{-3}$।	২. আপেক্ষিক গুরুত্বের কোনো একক নাই।
৩. বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্বকে পানির ঘনত্ব দিয়ে গুণ করলে বস্তুর ঘনত্ব পাওয়া যায়।	৩. বস্তুর ঘনত্বকে পানির ঘনত্ব দিয়ে ভাগ দিলে এর আপেক্ষিক গুরুত্বের মান পাওয়া যায়।

কয়েকটি পদার্থের আপেকি গুরুত্ব ও ঘনত্ব

পদার্থ	আপেক্ষিক গুরুত্ব	ঘনত্ব ($kg\ m^{-3}$)
অ্যালুমিনিয়াম	2.7	2700
তামা	8.92	8920
কাচ	2.4-2.8	2400-2800
সোনা	19.3	19300
রুপা	10.5	10500
সীসা	11.3	11300
লোহা	7.86	7860
বরফ	0.917	917
প্লাটিনাম	21.4	21400

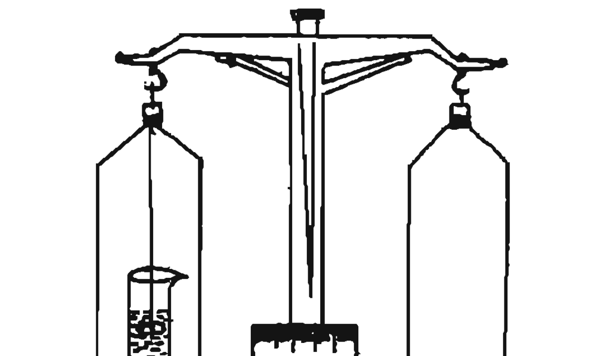
মোম	0.87-0.96	870-960
কাঠ	0.7-0.9	700-900
কর্ক	0.2-0.26	200-260
ফিটকিরি	1.75	1750
কেরোসিন তেল	0.8	800
তার্পিন তেল	0.87	870
গ্লিসারিন	1.26	1260
পানি (4°C তাপ মাত্রায়)	1.00	1000
পারদ	13.6	13600
বাতাস	1.293×10^{-3}	1.29
হাইড্রোজেন*	0.090×10^{-3}	0.090
হিলিয়াম*	0.178×10^{-3}	0.178
অক্সিজেন *	1.43×10^{-3}	1.43

* 0°C তাপমাত্রা এবং 1 বায়ুমন্ডলীয় চাপে

৬.৯। আর্কিমিডিসের সূত্র প্রয়োগ করে আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়
Determination of Specific Gravity Using Archimedes` Principle

১. পানিতে অদ্রবণীয় ও পানির চেয়ে ভারী কঠিন পদার্থ :

একটি তরল সৈথেতিক নিক্তির সাহায্যে প্রথমে বাতাসে বস্তুর ওজন নেওয়া হয়। এরপর বস্তুটিকে একটি হালকা সুতার সাহায্যে নিক্তির বাম প্রান্তের আংটা থেকে ঝুলানো হয় এবং কাঠের পিঁড়ির উপর স্থাপিত বিকারের মধ্যে রাখা পানিতে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে ওজন নেওয়া হয় (চিত্র : ৬.১০)। লক্ষ রাখতে হবে যেন নিক্তির পাল্লা পিঁড়ির গায়ে এবং বস্তুটি বিকারের দেয়ালে লেগে না থাকে।



চিত্র : ৬.১০

ধরা যাক, বস্তুটির বাতাসে ওজন = W

বস্তুটির পানিতে ওজন $= W_1$

$\therefore$ আর্কিমিডিসের সূত্রানুসারে, বস্তুর সমআয়তন পানির ওজন = বস্তুর পানিতে আপাত হারানো ওজন

= বস্তুর বাতাসে ওজন – বস্তুর পানিতে ওজন

$= W - W_1$

সুতরাং, আপাত আপেক্ষিক গুরুত্ব, $S_\theta = \dfrac{\text{বস্তুর ওজন}}{\text{বস্তুর সমআয়তন পানির ওজন}}$

বা $S_\theta = \dfrac{W}{W-W_1}$

এখন পরীক্ষাগারের তাপমাত্রা $\theta°C$ এবং ঐ তাপমাত্রার পানির আপেক্ষিক গুরুত্ব ρ_θ হলে, প্রকৃত আপেক্ষিক গুরুত্ব,

$$S = S_\theta \times \rho_\theta = \frac{W}{W-W_1} \times \rho_\theta \quad \ldots \ldots \quad (৬.৯)$$

২. পানিতে অদ্রবণীয় ও পানির চেয়ে হালকা কঠিন পদার্থ :

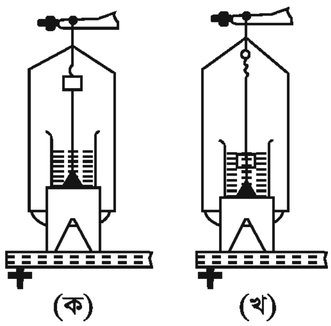
পানির চেয়ে হালকা বস্তুকে (মোম, কাঠ, কর্ক ইত্যাদি) স্বাভাবিকভাবে পানিতে ডুবিয়ে ওজন নেওয়া সম্ভব নয় বলে হালকা বস্তুটিকে একটি ভারী বস্তুর সাথে বেঁধে পানিতে ডুবাতে হয়। এ ভারী বস্তুটিকে নিমজ্জক বলে। প্রথমে বস্তুটিকে সুতার সাহায্যে নিক্তির বাম প্রান্তের হুক থেকে ঝুলিয়ে ওজন নেওয়া হয়। এর পর সুতার সাহায্যে বস্তু এবং নিমজ্জককে এমনভাবে ওজন নেওয়া হয় যেন বস্তু বাতাসে এবং নিমজ্জকটি কাঠের পিঁড়ির উপর স্থাপিত বিকারের মধ্যে রাখা পানিতে সম্পূর্ণ ডুবে থাকে [চিত্র ৬.১১ (ক)]। খেয়াল রাখতে হবে যেন নিক্তির পাল্লা পিঁড়ির গায়ে এবং নিমজ্জকটি বিকারের গায়ে না লাগে। এখন বস্তুটি নিমজ্জকের সাথে বেঁধে উভয়ের একত্রে পানিতে ওজন নেওয়া হয় (চিত্র ৬.১১ খ]।

ধরা যাক, বস্তুর বাতাসে ওজন = W

বস্তু বাতাসে + নিমজ্জক পানিতে ওজন = W_1

বস্তু পানিতে + নিমজ্জক পানিতে ওজন = W_2

$\therefore$ বস্তুর বাতাসে ওজন – বস্তুর পানিতে ওজন = $(W_1 - W_2)$



চিত্র : ৬.১১

আর্কিমিডিসের সূত্রানুসারে,

বস্তুর সমআয়তন পানির ওজন = বস্তুর আপাত হারানো ওজন

= বস্তুর বাতাসে ওজন – বস্তুর পানিতে ওজন = $(W_1 - W_2)$

বস্তুর আপাত আপেক্ষিক গুরুত্ব,

$$S_\theta = \frac{\text{বস্তুর ওজন}}{\text{বস্তুর সমআয়তন পানির ওজন}}$$

$$\therefore S_\theta = \frac{W}{W_1-W_2} \quad \ldots \ldots \quad (৬.১০)$$

পরীক্ষাগারের তাপমাত্রায় পানির আপেক্ষিক গুরুত্ব হলে ρ_θ হলে প্রকৃত আপেক্ষিক গুরুত্ব

$$S = S_\theta \times \rho_\theta = \frac{W}{W_1 - W_2} \times \rho_\theta \qquad \text{.... .....} \qquad \text{.... ....} \quad (৬.১১)$$

উদাহরণ ৬.৫। সোনার তৈরি একটি মুকুটের বাতাসে ওজন 41.94 N এবং পানিতে 39.20 N। মুকুটের উপাদানের আপেক্ষিক গুরুত্ব ও ঘনত্ব নির্ণয় কর। পানির ঘনত্ব 1000 kg m^{-3}।

সমাধান

আমরা জানি,

$$S = \frac{W}{W - W_1}$$

$$= \frac{41.94\text{N}}{(41.94 - 39.20)\text{N}}$$

$$= \frac{41.94}{2.74}$$

$$= 15.3065$$

আবার, ঘনত্ব $\rho = S \times \rho_w$

$= 15.3065 \times 1000$ kg m^{-3}

$= 15306.5$ kgm^{-3}

উত্তর : আপেক্ষিক গুরুত্ব 15.3 এবং ঘনত্ব
15306.5 kg m^{-3}

এখানে,
মুকুটের বাতাসে ওজন, $W = 41.94$ N
মুকুটের পানিতে ওজন, $W_1 = 39.20$ N
মুকুটের উপাদানের আ. গু., $S =$?

পানির ঘনত্ব $\rho_w = 1000$ kg m^{-3}
মুকুটের ঘনত্ব $\rho =$?

অনুশীলনী

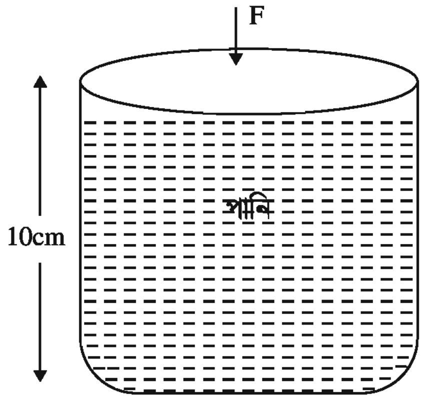
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। তরল পদার্থের চাপের একক কোনটি?

ক. Nm^2 খ. Ncm^2
গ. Nm^{-2} ঘ. Ncm^{-2}

২। একটি বস্তুকে তরলে ছেড়ে দেওয়া হল। তরলের ঘনত্ব 800 kgm^{-3} এবং বস্তুর ঘনত্ব 2700 kgm^{-3} হলে বস্তুটি পানিতে–

(ক) ভাসবে
(খ) ডুবে যাবে
(গ) আংশিক নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসবে
(ঘ) সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসবে



চিত্র থেকে নিচের ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

৩। পাত্রের তলে কী পরিমাণ চাপ অনুভূত হবে?

ক. 98 Pa
খ. 9800 Pa
গ. 980 Pa
ঘ. 98000 Pa

৪। যদি পাত্রের মুখে F বল প্রয়োগ করা হয় তাহলে এ বল–

i. পাত্রের শুধুমাত্র তলে চাপ প্রয়োগ করবে

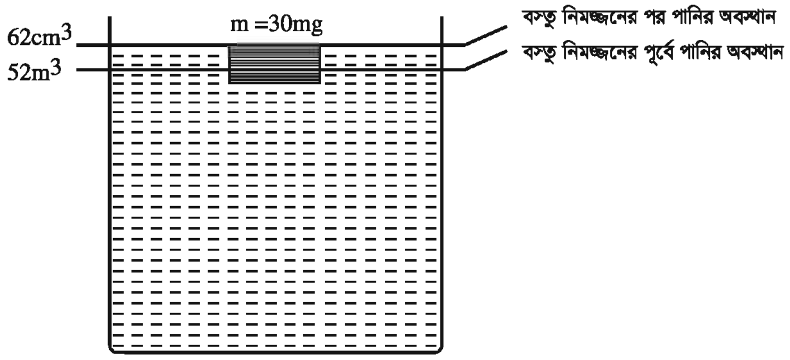
ii. পাত্রের শুধুমাত্র দেওয়ালে চাপ প্রয়োগ করবে

iii. পাত্রের সর্বত্র সমান ভাবে চাপ প্রয়োগ করবে

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন



চিত্র

ক. বস্তুর ওপর ক্রিয়াশীল উর্ধ্বমুখী বলকে কী বলে?

খ. নিমজ্জিত অবস্থায় বস্তুটি ভাসনের কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. বস্তুটির ঘনত্ব নির্ণয় কর।

ঘ. তরলের তাপমাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলাফল ব্যাখ্যা কর।

সপ্তম অধ্যায়

তরঙ্গ

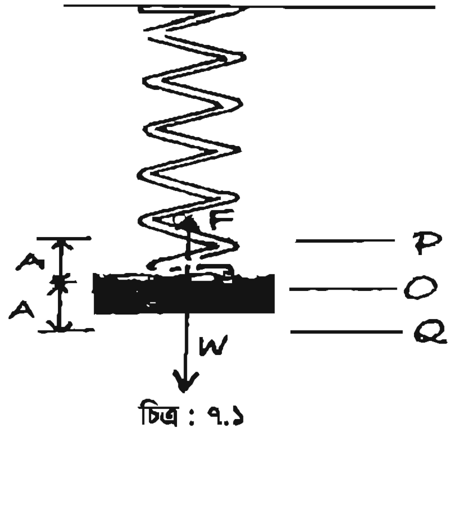
WAVES

পুকুরের পানিতে, নদীতে বা সমুদ্রে, ধানের খেতে কিংবা বাদ্যযন্ত্রের টানটান তারে আমরা ঢেউ বা তরঙ্গ দেখেছি। তরঙ্গ ছাড়া আমরা আমাদের অস্তিত্ব কল্পনাই করতে পারি না। তরঙ্গ শক্তি সঞ্চালন করে, তরঙ্গের মাধ্যমে তথ্যের আদান প্রদান ঘটে। আমাদের দেখা ও শোনা নির্ভর করে যথাক্রমে আলোক তরঙ্গ এবং শব্দ তরঙ্গের ওপর। চিকিৎসাবিজ্ঞানে ব্যবহৃত এক্স-রে এক প্রকার তরঙ্গ। যোগাযোগের ক্ষেত্রে রেডিও তরঙ্গের ভূমিকার কথা সবার জানা। পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব টিকে থাকার জন্য কোটি কোটি কিলোমিটার দূরবর্তী সূর্য থেকে আসা শক্তির (আলো ও তাপ) ওপর নির্ভর করতে হয়। সূর্য থেকে পৃথিবীতে শক্তির এই সঞ্চালন তরঙ্গের আকারে হয়।

যদি প্রশ্ন করা হয় তরঙ্গ বা ঢেউ কী? তাহলে চট করে তার জবাব দেওয়া যাবে না। তরঙ্গ কী সে আলোচনায় যাওয়ার আগে কম্পন বা স্পন্দন সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা গড়ে তোলা প্রয়োজন। কম্পন বা স্পন্দন ব্যতিরেকে তরঙ্গ সৃষ্টি, এর অস্তিত্ব অনুভব, এমনকি তরঙ্গ সঞ্চালন সম্ভব নয়। এ অধ্যায়ে আমরা তাই প্রথমে স্পন্দন সম্পর্কে আলোচনা করব এবং এরপর তরঙ্গের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করব।

৭.১ পর্যাবৃত্তগতি ও স্পন্দন
Periodic Motion and Oscillation

কোনো গতিশীল বস্তুকণার গতি যদি এমন হয় যে, এটি এর গতিপথের কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুকে নির্দিষ্ট সময় পর পর একই দিক থেকে অতিক্রম করে তবে সেই গতিকে পর্যাবৃত্ত গতি (Periodic motion) বলে। পর্যাবৃত্ত গতিসম্পন্ন কোনো বস্তুর একটা পর্যায় সম্পূর্ণ করতে যে সময় লাগে তাকে পর্যায়কাল বলে। এ গতি বৃত্তাকার, উপবৃত্তাকার বা সরলরৈখিক হতে পারে। ঘড়ির কাঁটার গতি, বৈদ্যুতিক পাখার গতি ইত্যাদি এ ধরনের গতির উদাহরণ। কম্পন বা স্পন্দন গতিও এক ধরনের পর্যাবৃত্ত গতি। যদি কোনো পর্যাবৃত্ত গতিসম্পন্ন বস্তু পর্যায়কালের অর্ধেক সময় কোনো নির্দিষ্ট দিকে এবং বাকি অর্ধেক সময় পূর্বগতির বিপরীত দিকে চলে তবে এর গতিকে স্পন্দন গতি বলে। ৭.১ চিত্রে কয়েকটি স্পন্দন গতি দেখানো হয়েছে। আমরা যত শব্দ শুনি, লক্ষ করলে দেখা যাবে, প্রত্যেক শব্দের উদ্ভব কোনো না কোনো স্পন্দন গতি থেকে। সংগীতে স্পন্দন গতির গুরুত্বের কারণে স্পন্দন গতি বোঝাতে ছন্দিত স্পন্দন শব্দটিও ব্যবহার করা হয়। তরঙ্গ গতি সম্পর্কে আলোচনায়ও সরল ছন্দিত স্পন্দনের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।



চিত্র : ৭.১

৭.২। সরল ছন্দিত স্পন্দন
Simple Harmonic Oscillation

যদি কোনো পর্যাবৃত্ত গতিসম্পন্ন কণার গতিপথ সরলরৈখিক হয় এবং এর ত্বরণ সাম্য অবস্থান থেকে এর সরণের সমানুপাতিক হয় এবং এর দিক সব সময় সাম্যাবস্থান অভিমুখী হয়, তাহলে বস্তুকণার ঐ গতিকে সরল ছন্দিত স্পন্দন বলে।

কম্পমান সরু শলাকার গতি, অল্প বিস্তারে দোলায়মান কোনো সরলদোলকের গতি, কোনো স্প্রিং এর একপ্রান্তে একটি ভারী বস্তু ঝুলিয়ে অপর প্রান্ত দৃঢ় অবস্থানে আটকে টেনে ছেড়ে দিলে তার গতি, তাপ ইঞ্জিনের সিলিন্ডারের মধ্যে পিস্টনের গতি প্রভৃতি সরল ছন্দিত স্পন্দনের উদাহরণ।

সরল ছন্দিত স্পন্দনের বৈশিষ্ট্য :

১. এটি একটি পর্যাবৃত্ত গতি

২. এটি একটি স্পন্দন গতি

৩. এটি সরলরৈখিক গতি

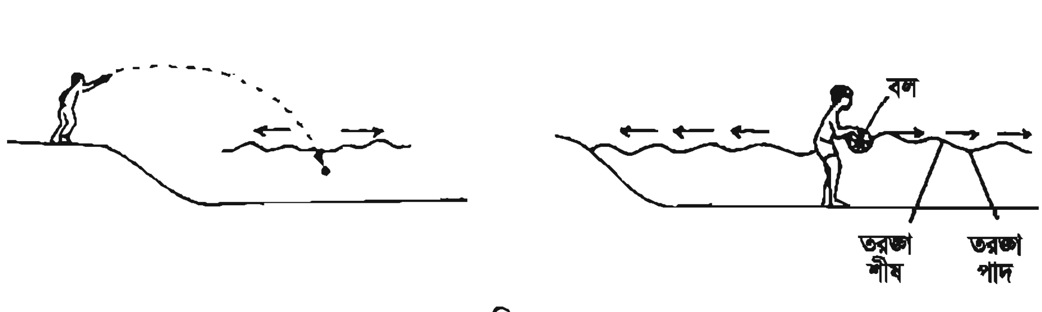
৪. যে কোনো সময় ত্বরণের মান সাম্যাবস্থান থেকে সরণের মানের সমানুপাতিক

৫. ত্বরণ সর্বদা একটি নির্দিষ্ট বিন্দু অভিমুখী।

৭.৩। তরঙ্গ
Wave

তরঙ্গ বলতে প্রথমেই আমাদের মনে যে চিত্রটি ভেসে ওঠে তা হচ্ছে পানির তরঙ্গ। পুকুরের স্থির পানিতে যদি একটি ঢিল ফেলা হয় (চিত্র ৭.২ ক) বা একটা বল হাতে ধরে পানিতে একই জায়গায় বারবার ওঠানামা করানো হয় (চিত্র ৭.২ খ) তাহলে ঢিলটি ফেলার জায়গায় বা বলটি ওঠানামা করানোর জায়গায় যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় তা ঐ জায়গায় আবদ্ধ না থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং কালক্রমে পুকুরের সমগ্র অংশে বিস্তৃত হয়। যখন ঢিলটি পানি স্পর্শ করে বা বলটি উপর নিচ করা হয় তখন ঐ স্থানের পানির কণাগুলো আন্দোলিত হয়। এ কণাগুলো আবার পার্শ্ববর্তী স্থির পানির কণাগুলোকে আন্দোলিত করে। এভাবে কণা থেকে কণাতে স্থানান্তরিত আন্দোলন অবশেষে পুকুরের পাড়ে পৌঁছে। কিন্তু এই আন্দোলনের ফলে পানির কোনো কণাই তার সাম্যাবস্থান থেকে খুব বেশি দূরে সরে যায় না, বরং সাম্য অবস্থানকে মধ্যে রেখে শুধু উপর-নিচে পর্যাবৃত্ত গতিতে দুলতে থাকে। প্রতিটি কণার এ ধরনের গতির ফলে যে আন্দোলন পানির পৃষ্ঠ দিয়ে সঞ্চারিত হয় তাকে তরঙ্গ বলে।

সুতরাং যে পর্যাবৃত্ত আন্দোলন কোনো জড় মাধ্যমের একস্থান থেকে অন্যস্থানে শক্তি সঞ্চারিত করে কিন্তু মাধ্যমের কণাগুলোকে স্থানান্তরিত করে না তাকে তরঙ্গ বলে।



চিত্র : ৭.২

ধানের খেতে বাতাস বয়ে গেলে যে ঢেউ খেলে যায় তা তোমরা অনেকেই দেখেছ। ধানের শীষ একই জায়গায় থেকে শুধু শীষের পর্যাবৃত্ত গতির মাধ্যমে তরঙ্গ আকারে বাতাসের গতিশক্তিকে এক শীষ থেকে অন্য শীষে সঞ্চারিত করে।

উপরে যে দুটি তরঙ্গের কথা বলা হয় তা আমরা চোখে দেখতে পারি। কিন্তু চোখে দেখা যায় না এমন অনেক তরঙ্গ আছে যেমন শব্দ তরঙ্গ, আলোক তরঙ্গ, ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট ভূতরঙ্গ (earth wave) ইত্যাদি।

পৃথিবীর শক্তির মূল উৎস সূর্য থেকে পৃথিবীতে শক্তির আগমন তরঙ্গ আকারে ঘটে। আমাদের একের সাথে অপরের যোগাযোগের জন্য তথ্য সংবাদ বা তথ্য আদান-প্রদানের জন্য তরঙ্গের সহায়তা নিতে হয় যেমন, কথাবার্তার জন্য শব্দ তরঙ্গ, রেডিও-টেলিভিশন, ফোন, ফ্যাক্স এর জন্য তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়।

জড় মাধ্যমের কণার আন্দোলনের ফলে যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয় তাকে যান্ত্রিক তরঙ্গ (mechanical wave) বলে। শব্দতরঙ্গ এক ধরনের যান্ত্রিক তরঙ্গ-মাধ্যম ছাড়া এ তরঙ্গ সৃষ্টি করা যায় না। আবার আলো, তাপ ইত্যাদি যে তরঙ্গাকারে সঞ্চারিত হয়, তাকে তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ (electromagnetic wave) বলে। এ তরঙ্গ উৎপন্ন বা সঞ্চারণের জন্য কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ সম্পর্কে আমরা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। এখানে আমরা শুধু যান্ত্রিক তরঙ্গের মধ্যে আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য :

তরঙ্গের মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো পরিলক্ষিত হয় :

১. মাধ্যমের কণার স্পন্দন গতির ফলে তরঙ্গ সৃষ্টি হয় কিন্তু মাধ্যমের কণা স্থানান্তরিত হয় না শুধুমাত্র আন্দোলন মাধ্যমের ভিতর দিয়ে তরঙ্গাকারে সঞ্চালিত হয়।

২. তরঙ্গ বেগ মাধ্যমের কণাগুলোর স্পন্দনের বেগের থেকে আলাদা। মাধ্যমের সব জায়গায় তরঙ্গ বেগ একই থাকে কিন্তু মাধ্যমের কণাগুলো বিভিন্ন বেগে স্পন্দিত হয়। সাম্যাবস্থানে কণাগুলোর বেগ সবচেয়ে বেশি।

৩. সব তরঙ্গই শক্তি ও তথ্য সঞ্চারণ করে।

৭.৪। তরঙ্গ সংক্রান্ত কয়েকটি সংজ্ঞা
A Few Definitions Related to wave

১. পূর্ণ স্পন্দন (Complete vibration) : তরঙ্গ সঞ্চারণকারী কোনো কণা কোনো বিন্দু থেকে যাত্রা আরম্ভ করে আবার একই দিক থেকে সেই বিন্দুতে ফিরে এলে তাকে পূর্ণ স্পন্দন বলে।

২. পর্যায়কাল বা দোলন কাল (Time period) :
তরঙ্গ সঞ্চারণকারী কোনো কণার একটি পূর্ণ স্পন্দন সম্পন্ন করতে যে সময় লাগে তাকে ঐ তরঙ্গের পর্যায়কাল বলে। পর্যায়কালকে T দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

৩. কম্পাঙ্ক (Ferquency) :
তরঙ্গ সঞ্চারণকারী কোনো কণা এক সেকেন্ডে যতগুলো স্পন্দন সম্পন্ন করে তাকে কম্পাঙ্ক বলে। কোনো বস্তু t সেকেন্ডে N সংখ্যক স্পন্দন সম্পন্ন করলে কম্পাঙ্ক $f = \frac{N}{t}$। কম্পাঙ্ককে সাধারণত f দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

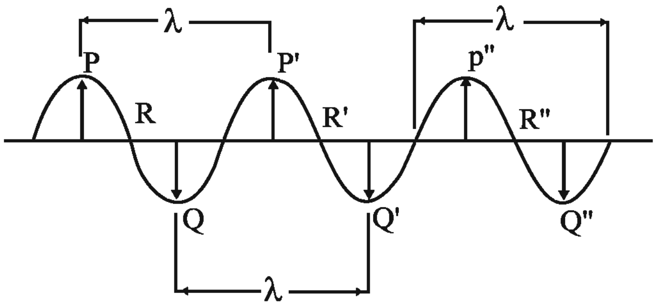
কম্পাঙ্কের এস.আই. একক হার্জ (Hertz বা Hz)।

$$1\text{ Hz} = 1\frac{\text{vib}}{\text{s}} = 1\frac{\text{cycle}}{\text{s}} = 1\ \frac{\text{স্পন্দন}}{\text{সেকেন্ড}}$$

অর্থাৎ কম্পনশীল কোনো বস্তু প্রতি সেকেন্ডে একটি পূর্ণ স্পন্দন সম্পন্ন করলে তার কম্পাঙ্ককে এক হার্জ বলে। স্পন্দন বা সাইকেল বলতে শুধুমাত্র সংখ্যা বুঝায়। এর কোনো একক নেই বলে কম্পাঙ্কের একক অনেক সময় $\frac{1}{s}$ বা s^{-1} লেখা হয়।

$\therefore\ 1\text{ Hz} = 1\text{s}^{-1}$।

৪. বিস্তার (Amplitude) :
তরঙ্গ সঞ্চারণকারী কোনো কণা সাম্যাবস্থান থেকে যে কোনো একদিকে সর্বাধিক যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে তরঙ্গের বিস্তার বলে (চিত্র ৭.৩)।



চিত্র : ৭.৩

৫. দশা (Phase) :

তরঙ্গ সঞ্চারণকারী কোনো কণার যে কোনো মুহূর্তের গতির সম্যক অবস্থানকে তার দশা বলে। কোনো একটি মুহূর্তে গতির অবস্থা বলতে ঐ বিশেষ মুহূর্তে কণাটির সরণ, বেগ, ত্বরণ ইত্যাদি বুঝায়।

দুটি কণার সরণ যদি একই হয় এবং তারা যদি একইদিকে একই বেগে গতিশীল থাকে তাহলে আমরা বলি কণা একই দশায় স্পন্দিত হচ্ছে। ৭.৩ চিত্রে P এবং P' অবস্থানে বা P এবং P'' অবস্থানের কণা দুটি একই দশায় স্পন্দিত হচ্ছে। আবার Q এবং Q' বা Q এবং Q'' একই দশায় আছে। ঠিক তেমনি R এবং R' বা R এবং R'' কণাগুলো একই দশাসম্পন্ন।

৬. তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (Wave Length) :

তরঙ্গ সঞ্চারণকারী কোনো কণার একটি পূর্ণ স্পন্দন সম্পন্ন হতে যে সময় লাগে, সেই সময়ে তরঙ্গ যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বলে। তরঙ্গের ওপর অবস্থিত পর পর দুটি একই দশাসম্পন্ন কণার মধ্যবর্তী দূরত্বই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (চিত্র ৭.৩)। পর পর দুটি তরঙ্গ শীর্ষ বা তরঙ্গ পাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকে λ (ল্যামডা) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

৭. তরঙ্গ বেগ (Wave Velocity) :

তরঙ্গ নির্দিষ্ট দিকে একক সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে তরঙ্গ বেগ বলে।

৭.৫ কম্পাঙ্ক ও পর্যায়কালের মধ্যে সম্পর্ক :
Relationship Between Frequency and Time Period

কোনো কম্পনশীল বস্তু এক সেকেন্ডে যে কয়টি পূর্ণ স্পন্দন সম্পন্ন করে তাকে কম্পাঙ্ক বলে। আবার একটি পূর্ণ স্পন্দন সম্পন্ন করতে যে সময় লাগে তাকে পর্যায়কাল বলে। কম্পাঙ্ক ও পর্যায়কাল যথাক্রমে f ও T হলে

T সেকেন্ডে সম্পন্ন হয় 1 টি স্পন্দন

$\therefore$ 1 সেকেন্ডে স্পন্দন হয় $\frac{1}{T}$ টি স্পন্দন

$\therefore$ সংজ্ঞানুসারে $f = \frac{1}{T}$

বা $fT=1$

৭.৬। তরঙ্গ দ্রুতি, কম্পাঙ্ক ও তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মধ্যে সম্পর্ক
Relationship between Wave Speed, Frequency and Wave Length

তরঙ্গ সৃষ্টিকারী কোনো স্পন্দনশীল বস্তুর একটি পূর্ণ স্পন্দন সম্পন্ন হতে যে সময় লাগে, সেই সময়ে তরঙ্গ যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (λ) বলে।

যেহেতু একটি পূর্ণ স্পন্দনের সময়কে পর্যায়কাল বলে, সুতরাং পর্যায়কাল T হলে

T সেকেন্ডে তরঙ্গ অতিক্রম করে λ দূরত্ব

$\therefore$ 1 সেকেন্ডে তরঙ্গ অতিক্রম করে $\frac{\lambda}{T}$

কিন্তু তরঙ্গ একক সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে তরঙ্গ দ্রুতি v বলে।

$v = \frac{\lambda}{T}$

আবার স্পন্দনশীল বস্তু প্রতি সেকেন্ডে যতগুলো পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন করে তাকে কম্পাঙ্ক f বলে।

$\therefore f = \frac{1}{T}$

সুতরাং $v = \frac{\lambda}{T} = f\lambda$

$\therefore v = f\lambda$ ... ... (৭.১)

অর্থাৎ, তরঙ্গবেগ = কম্পাঙ্ক × তরঙ্গ দৈর্ঘ্য

উদাহরণ ৭.১ : 300Hz কম্পাঙ্কে স্পন্দিত কোনো রেডিও স্পিকার থেকে উৎপন্ন শব্দ তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বায়ুতে 1.15m হলে বায়ুতে শব্দ তরঙ্গের দ্রুতি কত ?

সমাধান :

আমারা জানি,

$v = f\lambda$

$= (300 s^{-1})(1.15\ m)$

$= 345\ ms^{-1}$

এখানে,

কম্পাঙ্ক, $f = 300$ Hz

$= 300 s^{-1}$

তরঙ্গদৈর্ঘ্য, $\lambda = 1.15$m

তরঙ্গ দ্রুতি, v = ?

উত্তর : $345 ms^{-1}$

উদাহরণ ৭.২ : পানিতে সৃষ্ট একটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 8.75cm। যদি বায়ু ও পানিতে শব্দ তরঙ্গের দ্রুতি যথাক্রমে $322 ms^{-1}$ এবং $1452.5\ ms^{-1}$ হয়, তবে বাতাসে শব্দ তরঙ্গের দৈর্ঘ্য এবং কম্পাঙ্ক নির্ণয় কর।

সমাধান :

এখানে,

পানিতে শব্দ তরঙ্গের দ্রুতি $v_w = 1452.5\ ms^{-1}$

বায়ুতে শব্দ তরঙ্গের দ্রুতি $v_a = 332\ ms^{-1}$

পানিতে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য $\lambda_w = 8.75$ cm

$= 0.0875$m

বাতাসে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য $\lambda_a = \ ?$

কম্পাঙ্ক $f = \ ?$

আমরা জানি,

কম্পাঙ্ক f হলে

$V_a = f\lambda_a$ এবং $V_w = f\lambda_w$

$\therefore \frac{v_a}{v_w} = \frac{\lambda_a}{\lambda_w}$

$\therefore \lambda_a = \frac{v_a}{v_w} \times \lambda_w$

$= \frac{332\ ms^{-1}}{1452.5 ms^{-1}} \times 0.0875m$

$= 0.02m$

আবার $v_a = f\lambda_a$

$\therefore f = \frac{v}{\lambda_a} = \frac{332\ ms^{-1}}{0.02m} = 16600\ s^{-1}$

$= 16600$ Hz

উ: তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 0.02 m. কম্পাঙ্ক 16600Hz

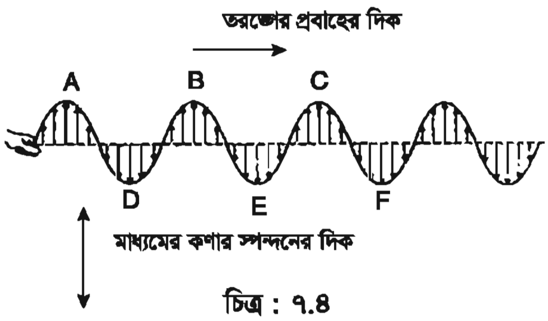
৭.৭। তরঙ্গের প্রকারভেদ
Types of Waves

মাধ্যমের কণাগুলো যদি সরল ছন্দিত স্পন্দন সম্পন্ন হয় তাহলে যে তরঙ্গের উদ্ভব হয় তাকে সরল ছন্দিত তরঙ্গ বলে। সরল ছন্দিত তরঙ্গ সাধারণত দুই রকমের হয় যথা– (১) অনুপ্রস্থ তরঙ্গ (Transverse Wave) ও (২) অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ (Longitudinal Wave)।

১. অনুপ্রস্থ তরঙ্গ :

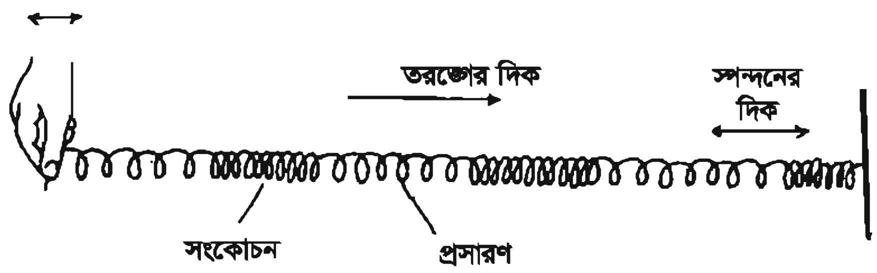
যে তরঙ্গ মাধ্যমের কণাগুলোর স্পন্দনের দিকের সাথে সমকোণে অগ্রসর হয়, তাকে অনুপ্রস্থ তরঙ্গ বলে। পানির তরঙ্গ, আলোক তরঙ্গ, বেতার তরঙ্গ ইত্যাদি অনুপ্রস্থ বা আড় তরঙ্গের উদাহরণ।

৭.৪ নং চিত্রে একটি অনুপ্রস্থ তরঙ্গ দেখানো হয়েছে যেখানে একটি সুতা তরঙ্গ প্রবাহের দিকের সাথে সমকোণে উপর – নিচে স্পন্দিত হচ্ছে। এখানে তরঙ্গ প্রবাহের মাধ্যম হচ্ছে সুতা। সুতার প্রত্যেকটি কণার স্পন্দনের অভিমুখ তরঙ্গের গতির অভিমুখের সাথে সমকোণে আছে। উপরের দিকে সর্বাধিক সরণযুক্ত A, B, C বিন্দুগুলোকে তরঙ্গশীর্ষ (crest) বলে এবং নিচের দিকে D, E, F বিন্দুগুলোকে তরঙ্গ পাদ (trough) বলে। একটি তরঙ্গশীর্ষ ও একটি তরঙ্গ পাদ নিয়ে একটি পূর্ণ তরঙ্গ তৈরি হয়। পর পর দুটি তরঙ্গশীর্ষ বা পরপর দুটি তরঙ্গপাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য λ।



চিত্র : ৭.৪

২. অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ : যে তরঙ্গ মাধ্যমের কণাগুলোর স্পন্দনের দিকের সাথে সমান্তরালে অগ্রসর হয়, সেই তরঙ্গকে অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ বলে। ৭.৫ চিত্রে একটি স্প্রিং –এ সৃষ্ট অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ দেখানো হয়েছে। স্প্রিংটির একপ্রান্ত হাতে ধরে হাতটিকে ধীরে ধীরে সামনে পেছনে দোলাতে থাকলে হাতের সামনে স্প্রিং–এর কুন্ডলীগুলোতে পর্যায়ক্রমে সংকোচন ও প্রসারণ হবে অর্থাৎ, একবার মাধ্যমের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাবে একবার মাধ্যমের ঘনত্ব হ্রাস পাবে। সংকোচন ও প্রসারণগুলো ক্রমান্বয়ে ডান দিকে সরে যাবে। লক্ষ করলে দেখা যাবে প্রত্যেক কুন্ডলী তার অবস্থানে থেকেই সামনে পিছে দুলছে, জায়গা থেকে সরছে না শুধুমাত্র আন্দোলন স্প্রিং বরাবর এগিয়ে যাচ্ছে। যেহেতু স্প্রিং এর কুন্ডলীগুলোর স্পন্দন তরঙ্গ প্রবাহের দিকের সাথে সমান্তরালে হচ্ছে, তাই এ তরঙ্গ অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ।



চিত্র : ৭.৫

৭.৮। অনুপ্রস্থ তরঙ্গ ও অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গের পার্থক্য :

অনুপ্রস্থ তরঙ্গ	অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ
১. যে তরঙ্গ মাধ্যমের কণাগুলোর স্পন্দনের দিকের সাথে সমকোণে অগ্রসর হয়, তাই অনুপ্রস্থ তরঙ্গ।	১. যে তরঙ্গ মাধ্যমের কণাগুলোর স্পন্দনের দিকের সাথে সমান্তরালে অগ্রসর হয়, তাই অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ।
২. মাধ্যমে তরঙ্গশীর্ষ ও তরঙ্গপাদ উৎপন্ন করে সঞ্চালিত হয়।	২. সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে তরঙ্গ সঞ্চালিত হয়।
৩. একটি তরঙ্গশীর্ষ ও একটি তরঙ্গপাদ নিয়ে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য গঠিত।	৩. একটি সংকোচন ও একটি প্রসারণ নিয়ে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য গঠিত।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। তরঙ্গ প্রবাহের ক্ষেত্রে –

i. শক্তি ও তথ্য সঞ্চারিত হয়

ii. তরঙ্গ বেগ এবং মাধ্যমের কণাগুলোর স্পন্দনের বেগ একই থাকে

iii. সাম্যবস্থানে মাধ্যমের কণাগুলোর বেগ সবচেয়ে বেশি।

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i   খ. iii

গ. i ও iii   ঘ. ii ও iii

নিচের তথ্য থেকে ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

ঢাকা বেতার কেন্দ্র মিডিয়াম ওয়েভে 630 KHz– এ অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে।

২। 630 KHz হচ্ছে

ক. $6.3 \times 10^3 S^{-1}$ খ. $6.3 \times 10^4 S^{-1}$

গ. $6.3 \times 10^5 S^{-1}$ ঘ. $6.3 \times 10^6 S^{-1}$

৩। ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত সংকেতের তরঙ্গার দৈর্ঘ্য কত?

ক. 475.19 m   খ. 476.19 m

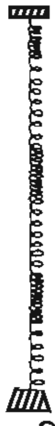
গ. 480.19 m   ঘ. 481.19 m

৪। নিচের কোনটি লম্বিক তরঙ্গা?

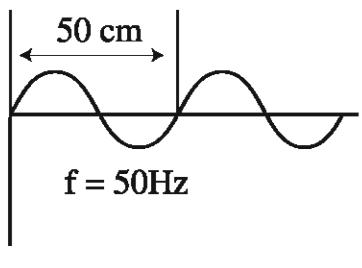
ক. সূর্য রশ্মি   খ. সমুদ্রের ঢেউ

গ. গিটার হতে নিঃসৃত শব্দ   ঘ. বেতার তরঙ্গা

সৃজনশীল প্রশ্ন



১নং চিত্র
স্প্রিং এর আন্দোলন



২নং চিত্র
সূতার আন্দোলন

চিত্রানুসারে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ক. ১ নং চিত্রের তরঙ্গা কী ধরনের?

খ. ২ নং তরঙ্গোর সঞ্চালন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

গ. দ্বিতীয় তরঙ্গাটির বেগ নির্ণয় কর।

ঘ. ১ এবং ২ নং তরঙ্গোর বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ কর।

অষ্টম অধ্যায়

শব্দ

SOUND

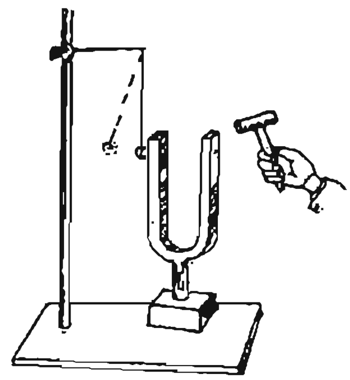
আগের অধ্যায়ে আমরা তরঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছি, সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে তরঙ্গ দুই প্রকার অনুপ্রস্থ তরঙ্গ ও অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ। অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হল শব্দ তরঙ্গ। এ অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব শব্দ কী, কীভাবে শব্দের উৎপত্তি হয় এবং শব্দ কীভাবে একস্থান থেকে অন্যস্থানে সঞ্চারিত হয়। শব্দের সাহায্যে আমরা ভাবের আদান প্রদান করে থাকি। কিন্তু এ ছাড়াও শব্দ তরঙ্গের প্রতিফলনের তথা প্রতিধ্বনি আমরা কীভাবে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করি এবং শব্দ দূষণ আমাদের জীবনে কী মারাত্মক পরিণতি বয়ে আনতে পারে তা আলোচিত হবে এ অধ্যায়ে।

৮.১। শব্দ
Sound

আমরা যা শুনি তাই শব্দ। সুতরাং বলা যেতে পারে, যা আমাদের কানে শ্রবণের অনুভূতি জাগায় তাই শব্দ। বাতাসের মধ্যে সৃষ্ট এক ধরনের যান্ত্রিক তরঙ্গ কানের ভিতর দিয়ে মস্তিষ্কে গিয়ে এক বিশেষ অনুভূতি সৃষ্টি করে। এ বিশেষ অনুভূতিকে আমরা শব্দ বলে জানি। যে বাহ্যিক কারণে শব্দের উদ্ভব হয় তা শক্তির একটি বিশেষ রূপ। সুতরাং, শব্দ শক্তির একটি বিশেষ তরঙ্গরূপ যা আমাদের কানে শ্রবণের অনুভূতি জাগায়।

৮.২। শব্দের উৎপত্তি
Production of Sound

শব্দের উৎস লক্ষ করলে দেখা যাবে যে বস্তুর কম্পনের ফলেই শব্দের উৎপত্তি হয়। আবার কম্পন থেমে গেলে শব্দও থেমে যায়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এ সম্পর্কে ধারণা করতে পারি। হাত থেকে কোন ধাতব পাত্র মেঝেতে পড়ে গেলে শব্দের সৃষ্টি হয়। সাথে সাথে যদি পাত্রটিকে হাত দিয়ে চেপে ধরা হয় তাহলে পাত্রটির কম্পন এবং শব্দ দুই-ই থেমে যায়। এ থেকে আমরা বলতে পারি বস্তুর কম্পন থেকেই শব্দের উদ্ভব হয়।



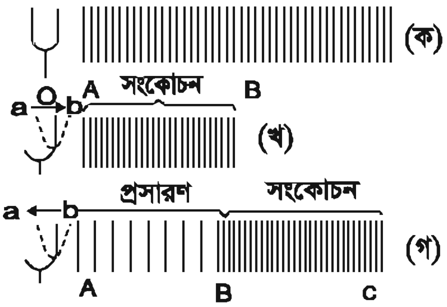
চিত্র : ৮.১

পুকুরে একটি ঢিল ফেললে যেমন পানিতে আন্দোলন সৃষ্টি হয়ে তরঙ্গের উদ্ভব হয় তেমনি বাতাসের মধ্যে বা যে কোনো জড় মাধ্যমে কোনো কিছুকে স্পন্দিত করলে সেই স্পন্দন জড় মাধ্যমকে আন্দোলিত করে তরঙ্গের সৃষ্টি করে যা আমাদের কানে শব্দের অনুভূতি বয়ে আনে। সুতরাং বলা যায়, কম্পনশীল বস্তু থেকেই শব্দের উৎপত্তি। কম্পনশীল বস্তু থেকে যে শব্দের উৎপত্তি হয় তা ৮.১ চিত্রের সহজ পরীক্ষাটি থেকেও বোঝা যায়।

এ পরীক্ষায় একটি সুরশলাকাকে খাড়াভাবে রাখা হয় এবং একটি অবলম্বন থেকে ছোট শোলার বলকে সুতার সাহায্যে এমনভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয় যে বলটি সুরশলাকার একটি বাহু স্পর্শ করে থাকে [চিত্র ৮.১]। এখন একটি রাবার প্যাড বা কাপড় জড়ানো হাতুড়ি দিয়ে সুরশলাকাটিকে আঘাত করলে শলাকা থেকে শব্দ নির্গত হবে এবং সাথে শোলার বলটিও এদিকে ওদিকে করতে থাকবে। শলাকার কম্পনের জন্যই বলটি ধাক্কা খেয়ে দূরে ছিটকে যায়। এখন শলাকাটিকে হাত দিয়ে স্পর্শ করলে শব্দ থেমে যাবে এবং শোলার বলটিও স্থির হয়ে যাবে। সুতরাং বলা যায় কম্পনের ফলেই শব্দের উৎপত্তি হয়।

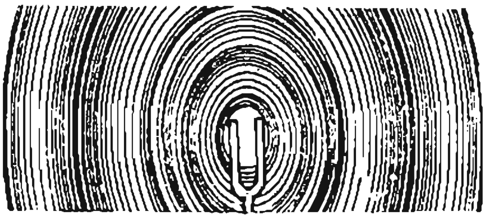
৮.৩। বায়ুর মধ্য দিয়ে শব্দ সঞ্চারণের কৌশল
Mechanism of Propagation of Sound Through Air

উৎস থেকে শব্দ সৃষ্টি হলে তা অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গের আকারে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ শব্দ বায়ুর মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত হয়ে আমাদের কানে প্রবেশ করলেই আমরা তা শুনতে পাই। নিচে আমরা বায়ুর মধ্য দিয়ে শব্দ সঞ্চারণের কৌশল আলোচনা করব। ধরা যাক, একটি কম্পমান সুরশলাকা থেকে নিঃসৃত শব্দ কানে এসে প্রবেশ করেছে। সুরশালাকার বাহুর কম্পনের ফলে বাতাসে আলোড়নের সৃষ্টি হয়। সুর শলাকার সামনে যে বায়ুমণ্ডল আছে তাকে সুরশলাকার বাহুর সমান্তরাল ও সমঘনত্বের কতকগুলো স্তরে ভাগ করা আছে কল্পনা করা যাক [চিত্র ৮.২ (ক)]। আন্দোলিত হয়ে বাহুটি যখন a বিন্দু থেকে b বিন্দুর দিকে যেতে থাকে তখন এর সামনের বায়ুস্তর চাপ পেয়ে সংকুচিত হয়। এ বায়ুস্তর আবার তার সামনের বায়ুস্তরকে চাপ দেয়। এভাবে যতক্ষণ বাহুটি a বিন্দু থেকে b বিন্দুতে পৌঁছে ততক্ষণ



চিত্র : ৮.২

একস্তর থেকে চাপ অন্য স্তরে সঞ্চারিত হয়। ফলে AB বায়ুস্তর সংকুচিত হয়। একে সংকোচন বলে। সুরশলাকার বাহুটি এবার b বিন্দু থেকে a বিন্দুর দিকে অগ্রসর হয়, ফলে এর পিছনে আংশিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এতে বায়ুস্তরের ওপরে চাপ কমে যাওয়ায় স্তরগুলো বাহুর দিকে সরে আসে। এভাবে বাহুটি যতক্ষণে b থেকে a বিন্দুতে পৌঁছে ততক্ষণে AB স্তরগুলো আরও বেশি প্রসারিত হয়। একে প্রসারণ বলে। এই সময়ে পূর্বেকার সংকোচন B থেকে C তে পৌঁছায়। এভাবে সুরশলাকার একটি পূর্ণ স্পন্দন কালে তরঙ্গ AC দূরত্ব অতিক্রম করে। এরূপ সংকোচন ও প্রসারণ দ্বারা সৃষ্ট অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ বায়ু মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়।



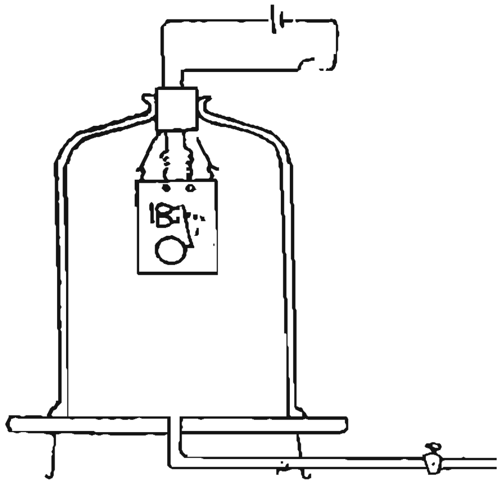
চিত্র : ৮.৩

বায়ু মাধ্যমে শব্দ সৃষ্টি করলে ৮.৩ চিত্রে প্রদর্শিতভাবে শব্দ তরঙ্গ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে– শুধু একদিকে যায় না। এটি বোঝার জন্য একটি ফাঁপা গোলক কল্পনা করা যেতে পারে যার পৃষ্ঠ যেন শব্দের বেগ নিয়ে সর্বদাই সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। শব্দের বেগ অগ্রসর হওয়ার ফলে গোলকটির ব্যাসও বেড়ে যাচ্ছে। এর অর্থ হল শব্দ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

৮.৪। শব্দ সঞ্চারণের জন্য জড় মাধ্যমের প্রয়োজন
Material Medium is Necessary for Propagation of Sound

আমরা আগেই দেখেছি যে, শব্দের উৎপত্তি হয় বস্তুর কম্পনের ফলে। এখন বস্তুর এ কম্পন যদি আমাদের কানে এসে কানের পর্দাকে কম্পিত না করে তাহলে শব্দ শুনতে পাব না। শব্দ শোনার জন্য বস্তুর কম্পনকে আমাদের কানে পৌঁছতে হবে। সুতরাং শব্দের উৎস ও আমাদের কানের মাঝে এমন একটা কিছু থাকতে হবে যা কম্পনকে বহন করে নিয়ে আসতে পারে, অর্থাৎ, শব্দের উৎস এবং আমাদের কানের মাঝে একটা জড় মাধ্যমের প্রয়োজন হয়, যার কণাগুলো পর্যায়ক্রমে কম্পিত হয়ে উৎসের কম্পনের সামনের দিকে এগিয়ে দেয়। তাই বলা চলে শব্দ সঞ্চারণের জন্য অবিচ্ছিন্ন স্থিতিস্থাপক মাধ্যমের প্রয়োজন। অটোভন গেরিক সর্বপ্রথম পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করলেন যে শব্দের উৎস এবং আমাদের কানের মধ্যবর্তী স্থানে যদি কোনো জড় মাধ্যম না থাকে তাহলে শব্দ আমাদের কানে পৌঁছতে পারে না। চাঁদে কোনো বাতাস নেই তাই চন্দ্রপৃষ্ঠে মহাশূন্যচারীদের পরস্পরের সাথে কথা বলার জন্য

বেতার যন্ত্র ব্যবহার করতে হয়েছিল। নিচের সহজ পরীক্ষা দ্বারা শব্দ সঞ্চারণে জড় মাধ্যমের প্রয়োজনীয়তা বুঝানো হয়েছে।



চিত্র : ৮.৪

পরীক্ষা : একটি বায়ু নিষ্কাশন যন্ত্রের রিসিভারের মধ্যে একটি বৈদ্যুতিক ঘণ্টাকে ঝুলিয়ে রাখা হয় [চিত্র ৮.৪]। বাইরে থেকে বর্তনী সম্পূর্ণ করে বৈদ্যুতিক ঘণ্টাটিকে বাজানো যায়। এখন ঘণ্টাটিকে বাজালে বাইরে থেকে ঘণ্টার শব্দ শোনা যাবে। এবার পাম্পের সাহায্যে যদি ভিতরের বায়ু ধীরে ধীরে বের করে নেওয়া যায় তাহলে ঘণ্টার শব্দ ক্রমশ কমতে থাকে যদিও ঘণ্টার হাতুড়িটিকে ঘণ্টার উপর সমান তালে পড়তে দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত রিসিভার যখন প্রায় সম্পর্ণূ বায়ু শূন্য হয়ে যায় তখন আর ঘণ্টার শব্দ শোনা যায় না। রিসিভারে আবার বায়ু প্রবেশ করিয়ে দিলে ঘণ্টার শব্দ ক্রমশ বাড়তে বাড়তে আবার আগের মত হয়ে যায়। রিসিভারের মধ্যে যতক্ষণ বায়ু থাকে ততক্ষণ শব্দ শোনা যায়, রিসিভার বায়ুহীন হলে শব্দ শোনা যায় না। সুতরাং বলা যায় শব্দ সঞ্চারণের জন্য অবিচ্ছিন্ন জড় মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। ভ্যাকিউয়ামের বা শূন্যের মধ্য দিয়ে শব্দ সঞ্চারিত হতে পারে না।

৮.৫। শব্দের দ্রুতি
Speed of Sound

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে শব্দ সঞ্চারণের জন্য কিছু সময়ের প্রয়োজন। বজ্রপাতের সময় আলোর ঝলক দেখার বেশ কিছু সময় পরে মেঘের গর্জন শোনা যায়, যদিও গর্জন এবং আলোর ঝলক একই সাথে ঘটে। মেঘ ও পৃথিবীর মধ্যকার দূরত্ব অতিক্রম করতে শব্দের কিছু বেশি সময় লাগে বলেই মেঘের গর্জন পরে শোনা যায়। আলোর ক্ষেত্রে এ দূরত্ব অতিক্রম করতে কোনো সময় লাগে না বলে ধরা যায়, কারণ আলো সেকেন্ডে প্রায় তিন লক্ষ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে। দূরে যদি বন্দুক ছোঁড়া হয় তাহলে নলের মুখের আলোর ঝলক দেখার বেশ পরে গুলির আওয়াজ পাওয়া যায়। আবার দূরে কোথাও ক্রিকেট খেলা দেখার সময় ব্যাট ও বলের সংঘাত দেখার বেশ কিছু সময় পরে আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে দূরত্ব অতিক্রম করার জন্য শব্দ তরঙ্গের কিছুটা সময়ের প্রয়োজন। শব্দ নির্দিষ্ট মাধ্যমে একটা নির্দিষ্ট বেগে দূরত্ব অতিক্রম করে।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে $0°C$ বা $273\ K$ তাপমাত্রায় এবং স্বাভাবিক চাপে শুষ্ক বায়ুতে শব্দের দ্রুতি $332\ ms^{-1}$। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে শব্দের দ্রুতি বেড়ে যায়। হিসাব করে দেখা গেছে $1°C$ বা $1\ K$ তাপমাত্রা বাড়লে বাতাসে শব্দের দ্রুতি প্রায় $0.6\ ms^{-1}$ বৃদ্ধি পায়। বাতাসের আর্দ্রতা বেড়ে গেলেও শব্দের দ্রুতি বেড়ে যায়।

শুধু বাতাস নয়, যে কোনো বায়বীয়, তরল বা কঠিন পদার্থের মাধ্যমেও শব্দ সঞ্চারিত হতে পারে। মাটিতে কান পেতে থাকলে আমরা বহু দূরের শব্দ শুনতে পাই। পানির ভিতর ডুব দিলেও শব্দ অনেক দূর পর্যন্ত শোনা যায়। বিভিন্ন মাধ্যমে শব্দ বিভিন্ন দ্রুতিতে সঞ্চারিত হয়। কঠিন মাধ্যমে শব্দ সবচেয়ে দ্রুত চলে, তরল মাধ্যমে তার চেয়ে ধীরে চলে। বায়বীয় মাধ্যমে শব্দের দ্রুতি সবচেয়ে কম আর ভ্যাকিউয়ামে তো শব্দের দ্রুতি শূন্য।

প্রায় এক কিলোমিটার লম্বা লোহার একটি ফাঁপা নলের এক প্রান্তে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে অপর প্রান্তে কান পাতলে শ্রোতা পরপর দুটি শব্দ শুনতে পায়। বায়ু মাধ্যমের চেয়ে কঠিন মাধ্যমে শব্দ জোরে চলে বলে এরকম হয়। পাইপের এক প্রান্তে সৃষ্ট শব্দ লোহার মধ্য দিয়ে অন্যপ্রান্তে পৌঁছার কিছুক্ষণ পরে বায়ুর মধ্য দিয়ে পুনরায় পৌঁছে, তাই শব্দ দুবার শোনা যায়। হিসাব করে দেখা গেছে লোহার মধ্যে শব্দ বাতাসের চেয়ে প্রায় 15 গুণ দ্রুত চলে। লোহাতে শব্দের দ্রুতি প্রায় $5221\ ms^{-1}$।

পানিতে ডুব দিয়ে কেউ যদি হাততালি দেয়, তাহলে ডুবন্ত অবস্থায় অন্য কেউ তালির শব্দ জোরে শুনতে পারে কিন্তু পানির উপরে কান থাকলে শব্দ তেমন স্পষ্ট শোনা যাবে না। এক্ষেত্রে শব্দ পানি অর্থাৎ, তরল মাধ্যমের মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত হচ্ছে। পুকুরের পানিতে বৃষ্টির ফোঁটা পড়লে বাইরে থেকে যে শব্দ খুব আস্তে শোনা যায় পানিতে ডুব দিয়ে শুনলে ঐ শব্দ বেশ জোরে শোনা যায়। এ থেকে বোঝা যায় শব্দ বায়বীয় মাধ্যমের চেয়ে তরল মাধ্যমে দ্রুত চলে। হিসাব করে দেখা গেছে পানির মধ্যে শব্দ বাতাসের চেয়ে প্রায় চারগুণ দ্রুত চলে। পানিতে শব্দের দ্রুতি প্রায় $1450ms^{-1}$।

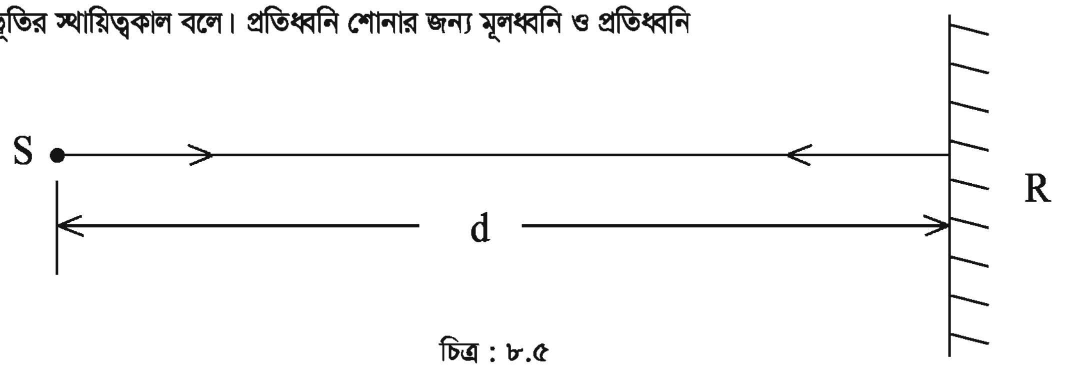
৮.৬। শব্দের প্রতিফলন
Reflection of sound

কোনো তরঙ্গ একটি সুষম মাধ্যমের মধ্য দিয়ে চলার সময় যদি ভিন্ন একটি মাধ্যমে বাধা পায় তাহলে তরঙ্গটি পূর্বের মাধ্যমে ফিরে আসে। এ ঘটনাকে প্রতিফলন বলে। শব্দ একটি অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ, সুতরাং শব্দ তরঙ্গ যদি চলার পথে বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহলে তাও পূর্বের মাধ্যমে ফিরে আসে– একে শব্দের প্রতিফলন বলে। শব্দ তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশ বড় বলে শব্দ তরঙ্গ প্রতিফলনের জন্য প্রতিফলক তলও বেশ বড় হওয়া প্রয়োজন।

৮.৭। প্রতিধ্বনি
Echo

শব্দের প্রতিফলনের বাস্তব উদাহরণ প্রতিধ্বনি। রাতে ফাঁকা মাঠের মধ্যে বা নদীর পাড়ে পাহাড় বা সারিবদ্ধ দালানের নিকটে দাঁড়িয়ে জোরে শব্দ করলে সেই শব্দ একটু পরে পুনরায় শোনা যায়। একে প্রতিধ্বনি বলে। কোনো উৎস থেকে সৃষ্ট শব্দ যদি দূরবর্তী কোনো মাধ্যমে বাধা পেয়ে উৎসের কাছে ফিরে আসে তখন মূল ধ্বনির যে পুনরাবৃত্তি হয় তাকে শব্দের প্রতিধ্বনি বলে।

প্রতিফলকে প্রতিফলিত হয়ে কোনো শব্দ উৎসের কাছে দাঁড়ানো শ্রোতার কাছে ফিরে এলেই যে সে প্রতিধ্বনি স্পষ্ট করে শোনা যাবে তেমন কোনো কথা নেই। প্রতিধ্বনি শুনতে হলে শ্রোতা এবং প্রতিফলকের মধ্যে একটা ন্যূনতম দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। কোনো শব্দ শোনার পর প্রায় 0.1 সেকেন্ড পর্যন্ত এর রেশ আমাদের মস্তিষ্কে থাকে। এ সময়কে শব্দানুভূতির স্থায়িত্বকাল বলে। প্রতিধ্বনি শোনার জন্য মূলধ্বনি ও প্রতিধ্বনি



চিত্র : ৮.৫

শোনার মধ্যবর্তী সময়ের পার্থক্য অন্তত 0.1 সেকেন্ড হওয়া প্রয়োজন। এর কম হলে মূলধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনিকে আলাদা করা যাবে না। সুতরাং প্রতিধ্বনি শোনার জন্য উৎস ও প্রতিফলকের মধ্যবর্তী দূরত্ব এমন হতে হবে যেন প্রতিফলন শব্দ 0.1 সেকেন্ডের আগে ফিরে আসতে না পারে। ধরা যাক S অবস্থানে উৎস এবং R অবস্থানে প্রতিফলক রাখা আছে [চিত্র ৮.৫] S ও R এর মধ্যবর্তী দূরত্ব d। এখন S অবস্থান থেকে শব্দ উৎপন্ন করলে সে শব্দ R প্রতিফলকে বাধা পেয়ে আবার S অবস্থানে ফিরে আসবে।

অর্থাৎ, শব্দকে S থেকে উৎপন্ন হয়ে আবার S অবস্থানে ফিরে আসার জন্য 2d দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে। এখন S অবস্থানে যদি আমরা প্রতিধ্বনি শুনতে চাই তাহলে 2d দূরত্ব অতিক্রম করার জন্য শব্দকে অন্তত 0.1 সেকেন্ড সময় ব্যয় বা অতিবাহিত করতে হবে।

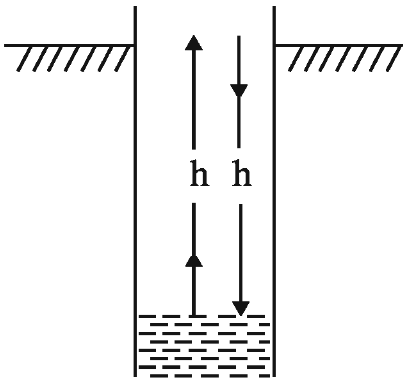
আমরা জানি, দ্রুতি = $\frac{\text{দূরত্ব}}{\text{সময়}}$ বা $v = \frac{2d}{t}$

এখানে শব্দের দ্রুতি v, তা হলে লেখা যায়,

$$d = \frac{vt}{2}$$

বাতাসে শব্দের দ্রুতি 0°C তাপমাত্রায় 332ms^{-1} হলে $d = \frac{332 \times 0.1}{2}$ m = 16.6m অর্থাৎ, প্রতিফলিত শব্দ বা প্রতিধ্বনি শোনার জন্য উৎস ও প্রতিফলকের মধ্যবর্তী ন্যূনতম দূরত্ব 16.6 মিটার হওয়া প্রয়োজন।

প্রতিধ্বনির ব্যবহারিক প্রয়োগ : কূপের গভীরতা নির্ণয়। প্রতিধ্বনির সাহায্যে খুব সহজে কূপের পানি পৃষ্ঠের গভীরতা নির্ণয় করা যায়। কূপের উপরের কোনো শব্দ উৎপন্ন করলে সেই শব্দ পানি পৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এলে প্রতিধ্বনি শোনা যায়। এখন শব্দ উৎপন্ন করা ও সেই শব্দের প্রতিধ্বনি শোনার মধ্যবর্তী সময় থামা ঘড়ির সাহায্যে নির্ণয় করা হয়। ধরা যাক, কূপের গভীরতা = h; শব্দ উৎপন্ন করা ও প্রতিধ্বনি শোনার মধ্যবর্তী সময় =t শব্দের দ্রুতি v; এখন শব্দ উৎপন্ন হওয়ার পর পানি পৃষ্ঠে প্রতিফলিত হয়ে শ্রোতার কাছে ফিরে আসতে যেহেতু 2h দূরত্ব অতিক্রম করে অতএব $2h = v \times t$ বা $h = \frac{v \times t}{2}$। কূপের গভীরতা 16.6 মিটারের কম হলে, প্রতিধ্বনিভিত্তিক এই পরীক্ষাটি করা সম্ভব হবে না। আবার সমুদ্রের লোনা পানিতে শব্দের দ্রুতি জানা থাকলে, এ উপায়ে সমুদ্রের গভীরতা মাপা যায়।



চিত্র : ৮.৬

৮.৮। শ্রাব্যতার পাল্লা এবং শব্দোত্তর ও শব্দেতর তরঙ্গ
Audibility range and Ultrasonic & infrasonic waves

আমরা দেখেছি যে শব্দের উৎপত্তির জন্য মাধ্যমে কম্পন সৃষ্টি করতে হয়। কিন্তু কম্পন হলেই যে শব্দ শোনা যাবে এমন নয়। উৎসের কম্পাঙ্ক যদি 20 Hz এর চেয়ে কম বা 20,000 Hz-এর বেশি হয়, তাহলে যে শব্দ উৎপন্ন হবে তা আমরা শুনতে পাব না। উৎসের কম্পাঙ্ক 20 Hz থেকে 20,000 Hz এর মধ্যে সীমিত থাকলেই কেবল আমরা শব্দ শুনতে পাই। একে শ্রাব্যতার পাল্লা বলে। যে তরঙ্গের কম্পাঙ্ক 20,000 Hz এর চেয়ে বেশি তাকে শব্দোত্তর (Ultrasonic) তরঙ্গ বলে। আর কম্পাঙ্ক 20 Hz এর কম হলে তাকে শব্দেতর (Infrasonic) তরঙ্গ বলে। অবশ্য শ্রাব্যতার পাল্লা ব্যক্তিবিশেষের ওপর নির্ভর করে সামান্য কম বেশি হতে পারে। কুকুরের শ্রাব্যতার ঊর্ধ্ব সীমা প্রায় 35,000 Hz এবং বাদুড়ের প্রায় 1,00,000 Hz।

শব্দোত্তর তরঙ্গের ব্যবহার

শব্দোত্তর তরঙ্গ আমাদের অনেক প্রয়োজনে লাগে। নিচে এর কয়েকটি ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হল :

১. সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয়, হিমশৈল, ডুবোজাহাজ ইত্যাদির অবস্থান নির্ণয়।
২. পোতাশ্রয়ের মুখ থেকে জাহাজকে পথ প্রদর্শন।
৩. ধাতবপিণ্ড বা পাতে সূক্ষ্মতম ফাটল অনুসন্ধান।
৪. সাধারণভাবে মিশে যায় না এমন তরলসমূহের (যেমন পানি ও পারদ) মিশ্রণ তৈরি।
৫. সূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করা।
৬. ক্ষতিকারক ব্যাক্টেরিয়া ধ্বংস করা।
৭. রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা।

বাদুড়ের পথ চলা

বাদুড় চোখে দেখতে পারে না। তাহলে বাদুড় কীভাবে পথ চলে বা খাদ্য সংগ্রহ করে? পথে কোনো প্রতিবন্ধকের উপস্থিতি কিংবা খাদ্যবস্তুর অবস্থান নির্ণয়ে বাদুড় শব্দোত্তর তরঙ্গ ব্যবহার করে। বাদুড় চলার সময় ক্রমাগত বিভিন্ন কম্পাঙ্কের শব্দোত্তর তরঙ্গ সৃষ্টি করে। এ তরঙ্গ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সামনে যদি কোনো প্রতিবন্ধক থাকে, তাহলে তাতে বাধা পেয়ে এ তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে বাদুড়ের কানে ফিরে আসে [চিত্র ৮.৮]। বাদুড় তার সৃষ্ট শব্দোত্তর তরঙ্গ এবং প্রতিধ্বনি শোনার মধ্যকার সময়ের ব্যবধান ও প্রতিফলিত শব্দের প্রকৃতি থেকে প্রতিবন্ধকের অবস্থান এবং আকৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করে এবং পথ চলার সময় সেই প্রতিবন্ধক পরিহার করে। যে দিকে শব্দোত্তর তরঙ্গের প্রতিধ্বনি শুনতে পারে না, সে দিকে কোনো প্রতিবন্ধক নেই বিবেচনা করে বাদুড় সে দিকে চলে।



চিত্র : ৮.৭

অনেক সময় বৈদ্যুতিক লাইনে মৃত বাদুড় ঝুলে থাকতে দেখা যায়। বৈদ্যুতিক লাইনের তারগুলো সরু এবং সমান্তরাল হওয়ায় এদের অবস্থান এবং মধ্যবর্তী দূরত্ব সম্পর্কে তাৎক্ষণিক ভাবে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে না। ফলে চলার পথে অনেক সময় একসাথে বৈদ্যুতিক লাইনের ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তার স্পর্শ করে ফেলে, এতে বৈদ্যুতিক বর্তনী পূর্ণ হয় এবং বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে বাদুড় মারা যায়।

জীবজন্তু যে কেবল শব্দোত্তর তরঙ্গ ব্যবহার করে তাই নয়। এক ধরনের মাকড়সা আছে, যেগুলো শব্দোত্তর তরঙ্গ ব্যবহার করে শিকার ধরে ফেলে। এ জাতীয় মাকড়সা 45000 Hz কম্পাঙ্ক পর্যন্ত শব্দোত্তর তরঙ্গও অনুধাবন করতে পারে।

৮.৯। শব্দ দূষণ
Sound pollution

শব্দ ছাড়া আমাদের জীবন অচল। শব্দের সাহায্যেই আমরা পরস্পরের সাথে তথ্যের আদান প্রদান করে থাকি। পাখির কলতান বা পাতার মর্মরধ্বনি কিংবা সংগীতের মধুর আওয়াজ যেমন আমাদের মনের ক্লান্তি দূর করে তেমনি গোলমাল বা হট্টগোল কিংবা তীব্র শব্দ বা শব্দের আধিক্য আমাদের দেহমনকে শ্রান্ত করে এবং অনেক সময় আমাদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। শব্দের আধিক্য আমাদের দেহ ও মনের ওপর যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাকেই পরিবেশের শব্দ দূষণ বলা হয়। সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে শহর, বন্দর, নগর, কলকারখানা যত বাড়ছে আমাদের জীবনে শব্দের প্রভাবও তত বেড়ে চলেছে। বিজ্ঞানীরা নানা পরীক্ষার মাধ্যমে জানতে পেরেছেন, যেখানে মানুষকে সার্বক্ষণিক উচ্চ শব্দের পরিবেশে থাকতে হয় সেখানকার মানুষের স্বাভাবিক স্নায়ু – সংযোগ ব্যাহত হয়, কাজে মনোযোগ কমে আসে, মেজাজ

খিটখিটে হয়, পরিপাক যন্ত্রের কাজে বিশৃংখলা দেখা দেয়, ফলে আলসার ও অন্যান্য আন্ত্রিক পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। আজকাল তরুণদেরকে প্রায় সর্বক্ষণ ওয়াকম্যানের মাইক্রোফোন কানে লাগিয়ে উচ্চগ্রামে সংগীত শুনতে দেখা যায়। এর এক সুদূরপ্রসারী মারাত্মক প্রতিক্রিয়া রয়েছে। এর ফলে তাদের শ্রবণশক্তি ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে উচ্চ শব্দযুক্ত শিল্পকারখানায় যে সকল শ্রমিক কাজ করে তাদের শ্রবণ শক্তি দশ বছরের মধ্যে প্রায় অর্ধেক হ্রাস পায়।

শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য সকল পেশায় নিযুক্ত লোকের সমন্বিত উদ্যোগের সাথে সাথে প্রয়োজন সারা দেশের মানুষের মধ্যে এর বিপদ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি। আমরা যখন আমাদের আনন্দ অপরের সাথে ভাগ করে নেওয়ার জন্য উচ্চগ্রামে রেডিও বা লাউড স্পিকারে গান ইত্যাদি বাজাই কিংবা তারস্বরে মাইকে নির্বাচনী প্রচার, বক্তৃতা অথবা লটারির টিকেট ক্রয়ের আহ্বান জানানো হয়, তখন পরীক্ষার্থী তথা ছাত্র-ছাত্রী অসুস্থ ব্যক্তির অসুবিধার কথা চিন্তা করি কি?

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বাদুর রাতে কীভাবে চলাফেরা করে?

ক. শব্দোত্তর তরঙ্গ সৃষ্টি করে তার প্রতিধ্বনি শুনে চলার পথ সম্পর্কে ধারণা পেয়ে,

খ. শব্দেতর তরঙ্গ সৃষ্টি করে তার প্রতিধ্বনি শুনে চলার পথ সম্পর্কে ধারণা পেয়ে

গ. কোনো উৎস হতে সরাসরি আলো এসে চোখে পড়লে

ঘ. আলো কোনো প্রতিফলক তলে প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত হয়ে বাদুরের চক্ষু লেন্সে পড়লে

২। বৈদ্যুতিক লাইনে মৃত বাদুড় ঝুলে থাকতে দেখা যায় কারণ–

i. বৈদ্যুতিক তারগুলোর অবস্থান এবং মধ্যবর্তী দূরত্ব সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে সুষপস্ট ধারণা লাভ না থাকায়

ii. সামনের দিকের শব্দোত্তর তরঙ্গের প্রতিধ্বনি শুনতে না পাওয়ায়

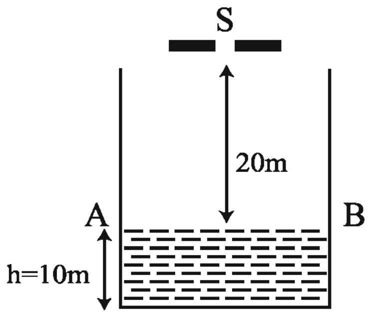
iii. বাদুড় একটি তারে ঝুলে অপর তারটি স্পর্শ করায়

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i ও ii   খ. i ও iii

গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

চিত্রে S একটি শব্দ উৎস এবং AB পানির পৃষ্ঠতল।



চিত্র

উপরের তথ্য ও চিত্রের আলোকে নিচের ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

৩। পানির উচ্চতা h সর্বোচ্চ কত পর্যন্ত প্রতিধ্বনি শোনা যাবে?

ক. 13.41 cm খ. 13.41 m

গ. 3.4 m ঘ. 3.4 cm

৪। প্রদত্ত চিত্রের ক্ষেত্রে প্রতিধ্বনি শুনতে কত সময় প্রয়োজন হবে?

ক. প্রায় 0.10 S খ. প্রায় 0.12 S

গ. প্রায় 0.14 S ঘ. প্রায় 0.18 S

সৃজনশীল প্রশ্ন

বাস স্ট্যান্ড হতে বেলাল সাহেবের বাসা ৪০০ m দূরে অবস্থিত। বাসের হর্ন হতে নির্গত শব্দ তার কানে পৌঁছতে প্রায় 2.5s সময় লাগে। বেলাল সাহেব হঠাৎ পেটে ব্যাথা অনুভব করলে নিকটস্থ হাসপাতালে যান। ডাক্তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বললেন দীর্ঘদিন উচ্চ শব্দ শ্রবণের ফলে তার আলসার হয়েছে। ডাক্তার বললেন শব্দ দূষণ স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

ক. শব্দ কী ধরনের তরঙ্গ?

খ. বাসের হর্ন হতে নির্গত শব্দ কীভাবে বেলাল সাহেবের কানে পৌঁছায় ব্যাখ্যা কর।

গ. হর্ন হতে নির্গত শব্দের গতিবেগ নির্ণয় কর।

ঘ. শব্দ দূষণ রোধে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন যুক্তিসহকারে তোমার মতামত লিখ।

নবম অধ্যায়

বস্তুর ওপর তাপের প্রভাব

Effect of Heat on Substance

পদার্থের অণু পরমাণুর গতির সাথে সম্পর্কিত শক্তির যে রূপ তাই তাপ শক্তি। আর তাপমাত্রা হচ্ছে তাপ শক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। এ অধ্যায়ে আমরা তাপমাত্রাকে সংজ্ঞায়িত করব এবং পরিমাপের একক আলোচনা করব। তাপ প্রয়োগে বা অপসারণে কঠিন পদার্থের আকারের পরিবর্তন ঘটে, তরল পদার্থের আয়তন পরিবর্তিত হয়, বায়বীয় পদার্থের আয়তন ও চাপের পরিবর্তন ঘটে। কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থ এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। বস্তুর ওপর তাপের এ সকল প্রভাব আলোচনা করা হবে এ অধ্যায়ে।

৯.১। তাপ ও তাপমাত্রা
Heat and Temperature

তাপ

আগুনের কাছে একটি ধাতব বস্তু ধরলে দেখা যায় কিছুক্ষণ পরেই সেটি বেশ গরম হয়ে ওঠেছে। আমাদের কাছে মনে হয় আগুন থেকে 'একটা কিছু' বস্তুতে এসে একে উত্তপ্ত করে তুলেছে। এই 'একটা কিছু'ই হচ্ছে তাপ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল তাপ ক্যালরিক (caloric) নামে এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম তরল বা বায়বীয় পদার্থ। গরম বস্তুতে ক্যালরিক বেশি থাকে এবং শীতল বস্তুতে তা কম থাকে। কোনো বস্তুতে ক্যালরিক প্রবেশ করলে তা গরম হয় আর চলে গেলে তা শীতল হয়।

১৭৭৮ সালে কাউন্ট রামফোর্ড প্রমাণ করেন ক্যালরিক বলে বাস্তবে কিছু নেই। তাপের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে গতির। তিনি কামানের নল তৈরির সময় ধাতুর টুকরাকে ড্রিলমেশিন দিয়ে ফুটো করার সময় লক্ষ করেন, যে ছোট ছোট ধাতুর টুকরা ছিটকে আসছিল সেগুলো অত্যন্ত উত্তপ্ত। তিনি চিন্তা করেন ড্রিল চালাতে যে যান্ত্রিক শক্তি ব্যয় হয়েছে তার থেকেই তাপের উদ্ভব হয়। এই যান্ত্রিক শক্তিই ধাতব টুকরাগুলোর অণুগুলোতে গতিশক্তির সঞ্চার করে টুকরোগুলোকে উত্তপ্ত করে।

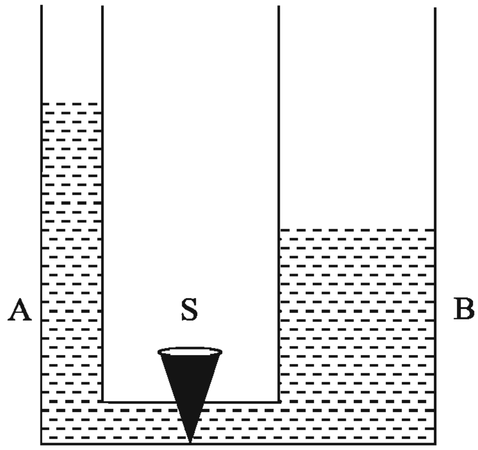
প্রকৃতপক্ষে তাপ পদার্থের অণুগুলোর এলোমেলো গতির ফল। পদার্থের অণুগুলো সবসময় গতিশীল অবস্থায় থাকে। কোনো পদার্থের মোট তাপের পরিমাণ এর মধ্যস্থিত অণুগুলোর মোট গতিশক্তির সমানুপাতিক। এখন কোনো বস্তুতে তাপ প্রদান করা হলে এর অণুগুলোর ছুটাছুটি বৃদ্ধি পায়, ফলে এর গতিশক্তিও বেড়ে যায়। তাপ পদার্থের আণবিক গতির সাথে সম্পর্কিত এক প্রকার শক্তি যা ঠান্ডা বা গরমের অনুভূতি জন্মায়। তাপ এক প্রকার শক্তি কেননা তাপ কাজ সম্পাদন করতে পারে। তাপশক্তি অন্য রকম শক্তি থেকে পাওয়া যায়, আবার তাপকে অন্য শক্তিতেও রূপান্তরিত করা যায়। যেমন পেট্রোল বা ডিজেল ইঞ্জিনে জ্বালানি তেল দহনের ফলে রাসায়নিক শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। আর এ তাপ শক্তি বয়লারের পানিকে বাষ্পে রূপান্তরিত করে ইঞ্জিন চালায়। অর্থাৎ, তাপশক্তি এখানে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। দুই হাতের তালু পরস্পরের সাথে ঘষলে গরম অনুভব হয়– এখানে যান্ত্রিক শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তর হয়।

তাপের একক : তাপ যেহেতু শক্তির একটি রূপ, তাই তাপের একক হবে শক্তির তথা কাজের একক অর্থাৎ, জুল (J)। বিশ্বব্যাপী এককের আন্তর্জাতিক পদ্ধতি চালুর পূর্বে তাপের সবচেয়ে প্রচলিত একক ছিল ক্যালরি।

এক ক্যালরি তাপ উৎপন্ন করতে 4.2 জুল যান্ত্রিক বা তড়িৎশক্তি ব্যয় করতে হয় বা এক ক্যালরি তাপ দিয়ে 4.2 জুল কাজ পাওয়া যায়। সুতরাং 1 ক্যালরি = 4.2 জুল।

তাপমাত্রা : দুটি বস্তুকে তাপীয় সংস্পর্শে আনা হলে এদের মধ্যে তাপের আদান-প্রদান ঘটতে পারে। তাপের এই আদান-প্রদান বস্তু দুটির তাপের পরিমাণের ওপর নির্ভর করেনা– নির্ভর করে বস্তুদ্বয়ের তাপীয় অবস্থা বা উত্তপ্ততার ওপর।

আমরা জানি তরলের প্রবাহ তরলের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে না– নির্ভর করে তরলের উচ্চতার ওপর। ৯.১ চিত্রে A পাত্রের তরলের পরিমাণ B পাত্রের তরলের পরিমাণের চেয়ে অনেক কম। কিন্তু স্টপ কর্ক S খুলে দিলে A পাত্র থেকে B পাত্রে তরল প্রবাহিত হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না উভয় পাত্রের তরল স্তম্ভের উচ্চতা সমান হয়। তেমনিভাবে উত্তপ্ততর বস্তু থেকে শীতলতর বস্তুতে তাপ প্রবাহিত হয়। বস্তুর উত্তপ্ততার পরিমাপ করা হয় তাপমাত্রা বা উষ্ণতা দ্বারা। যে বস্তুর তাপমাত্রা বেশি সে বস্তু তাপ হারায় আর যে বস্তুর তাপমাত্রা কম সে বস্তু তাপ গ্রহণ করে। তাপ গ্রহণ করলে বস্তুর তাপমাত্রা বাড়ে আর তাপ অপসারিত হলে তাপমাত্রা কমে।



চিত্র : ৯.১

তাপমাত্রা হচ্ছে কোনো বস্তুর তাপীয় অবস্থা যা নির্ধারণ করে ঐ বস্তুটি অন্য বস্তুর তাপীয় সংস্পর্শে এসে বস্তুটি তাপ গ্রহণ করবে না বর্জন করবে।

তাপমাত্রার একক : আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে তাপমাত্রার একক কেলভিন। এ একক চালুর পূর্বে তাপমাত্রার প্রচলিত একক ছিল ডিগ্রি সেলসিয়াস– যা কেলভিনের পাশাপাশি এখনও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে চলে। স্বাভাবিক চাপে গলন্ত বরফের এবং ফুটন্ত পানির তাপমাত্রার ব্যবধানের একশত ভাগের এক ভাগকে এক ডিগ্রি সেলসিয়াস ধরা হয়। বরফের গলনাঙ্ককে ধরা হয় 0°C এবং পানির স্ফুটনাঙ্ককে ধরা হয় 100°C। পানির ত্রৈধ বিন্দুর ওপর ভিত্তি করে কেলভিনের সংজ্ঞা দেওয়া হয়।

কেলভিন : পানির ত্রৈধ বিন্দুর তাপমাত্রার $\frac{1}{273}$ ভাগকে এক কেলভিন (K) বলে। যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ও চাপে পানি তিনটি অবস্থাতেই অর্থাৎ, বরফ, পানি এবং জলীয়বাষ্পরূপে সহঅবস্থান করে তাকে ত্রৈধ বিন্দু (Triple Point) বলে। এ ত্রৈধ বিন্দুর তাপমাত্রাকে ধরা হয় 273 K। এ হিসাবে বরফের গলনাঙ্ক 273 K এবং পানির স্ফুটনাঙ্ক 373 K। সুতরাং বরফের গলনাঙ্ক এবং পানির স্ফুটনাঙ্কের মধ্যে তাপমাত্রার পার্থক্য হচ্ছে 100K।

সেলসিয়াস স্কেলের সাথে কেলভিনের সম্পর্ক :

যেহেতু বরফের গলনাঙ্ক সেলসিয়াস স্কেলে 0°C এবং কেলভিনে 273K এবং পানির স্ফুটনাঙ্ক সেলসিয়াস স্কেলে 100°C আর কেলভিনে 373 K, সুতরাং দেখা যাচ্ছে তাপমাত্রার পার্থক্য সেলসিয়াস স্কেলে এবং কেলভিন স্কেলে একই।

1°C তাপমাত্রার পার্থক্য = 1 K তাপমাত্রার পার্থক্য।

$\therefore \Delta\theta$°C তাপমাত্রার পার্থক্য = $\Delta\theta$ K তাপমাত্রার পার্থক্য।

কিন্তু কোনো কিছুর তাপমাত্রা সেলসিয়াস স্কেলে যত কেলভিনে তার চেয়ে 273 বেশি।

অর্থাৎ, কোনো কিছুর তাপমাত্রা $0°C = 273 K$

কোনো কিছুর তাপমাত্রা $10°C = (10 + 273) K = 283 K$

কোনো কিছুর তাপমাত্রা $-20°C = (-20 + 273) K = 253 K$

কোনো কিছুর তাপমাত্রা $\theta°C = (\theta + 273) K$

সুতরাং একটি বস্তুর কোনো এক সময় তাপমাত্রা $\theta_1°C$ হলে তা হবে $(\theta_1 + 273) K$ এবং অন্য কোনো সময় ঐ বস্তুর তাপমাত্রা $\theta_2°C$ হলে তা হবে $(\theta_2 + 273) K$।

$\therefore$ তাপমাত্রার পার্থক্য $\Delta\theta = (\theta_2 - \theta_1)°C$

$= (\theta_2 + 273 - \theta_1 - 273) K$

$= (\theta_2 - \theta_1) K$

এ অধ্যায়ে বা পরবর্তী অধ্যায়সমূহে তাই বিভিন্ন হিসাব নিকাশের সময় তাপমাত্রার পার্থক্য থাকলে সেখানে °C এবং K সমার্থক ধরা হয়েছে। যেমন 'কোনো বস্তুর তাপমাত্রা 1°C বৃদ্ধি করলে' আর 'কোনো বস্তুর তাপমাত্রা 1K বৃদ্ধি করলে' একই অর্থ বহন করে। কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রা °C–এ দেওয়া থাকলে তাকে 273 যোগ করে K-এ নেওয়া হয়েছে বা তাপমাত্রা K–এ থাকলে প্রয়োজনবোধে 273 বিয়োগ করে °C –এ আনা হয়েছে।

তাপমাত্রার প্রতীক :

তাপমাত্রার প্রতীক হচ্ছে θ এবং T। সাধারণত তাপমাত্রা °C–এ পরিমাপ করা হলে একে θ দিয়ে আর কেলভিনে পরিমাপ করলে T দিয়ে প্রকাশ করা হয়। যেহেতু তাপমাত্রা পরিমাপের যন্ত্র থার্মোমিটারগুলো ডিগ্রি সেলসিয়াসে দাগাঙ্কিত থাকে এবং দুটি তাপমাত্রার পার্থক্য সেলসিয়াস স্কেল এবং কেলভিনে একই হয় তাই এই বই–এ তাপমাত্রার জন্য প্রধানত θ–ই ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু যে সকল সমীকরণ বা সূত্র কেবল তাপমাত্রার কেলভিন এককের জন্য প্রযোজ্য সে সকল স্থানে (যেমন, গ্যাসের সূত্রাবলি) সেখানে তাপমাত্রার জন্য T ব্যবহার করা হয়েছে।

তাপ ও তাপমাত্রার পার্থক্য

তাপ	তাপমাত্রা
১. তাপ হচ্ছে এক প্রকার শক্তি যা ঠান্ডা বা গরমের অনুভূতি জন্মায়।	১. তাপমাত্রা হচ্ছে বস্তুর তাপীয় অবস্থা যা অন্য বস্তুর তাপীয় সংস্পর্শে আনলে তাপ গ্রহণ করবে না বর্জন করবে তা নির্ধারণ করে।
২. তাপের প্রবাহ তাপের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে না।	২. তাপের প্রবাহ তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে।
৩. তাপ পরিমাপের একক জুল।	৩. তাপমাত্রা পরিমাপের একক কেলভিন।
৪. দুটি বস্তুর তাপমাত্রা এক হলেও এদের তাপের পরিমাণ ভিন্ন হতে পারে।	৪. দুটি বস্তুতে তাপের পরিমাণ এক হলেও এদের তাপমাত্রা ভিন্ন হতে পারে।

তাপের প্রভাব :

কোনো বস্তুতে তাপ প্রয়োগ করলে বা তাপ অপসারণ করলে সাধারণত তাপমাত্রার পরিবর্তন বা অবস্থার পরিবর্তন, আয়তনের পরিবর্তন, বায়ুমন্ডলের চাপের পরিবর্তন, চুম্বকের চুম্বকত্ব লোপ বা তড়িৎ পরিবাহকের রোধের পরিবর্তন ইত্যাদি প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

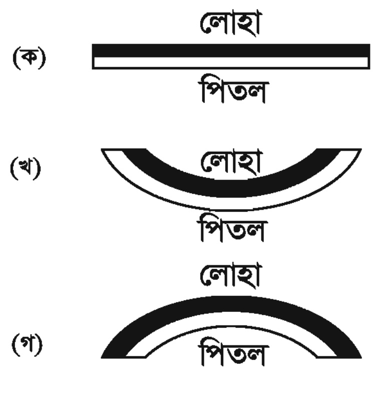
৯.২। পদার্থের তাপজনিত প্রসারণ
Thermal Expansion of Material

সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সকল পদার্থই তাপ প্রয়োগে প্রসারিত হয় এবং তাপ অপসারণে সংকুচিত হয়। যখন কোনো বস্তু উত্তপ্ত হয়, তখন বস্তুটির প্রত্যেক অণুর তাপশক্তি তথা গতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। কঠিন ও তরল পদার্থের বেলায় আন্তঃআণবিক বলের বিপরীতে অণুগুলো আরো বর্ধিত শক্তিতে স্পন্দিত হতে থাকে ফলে সাম্যাবস্থা থেকে অণুগুলোর সরণ বেড়ে যায়। কিন্তু কোনো অণু এর সাম্যাবস্থা থেকে সরে যাবার সময় টান অনুভব করে। অর্থাৎ, অণুটি যখন পার্শ্ববর্তী অণুর কাছাকাছি যেতে চায় তখন বিকর্ষণ অণুভব করে। আবার আন্তঃআণবিক দূরত্ব যখন বৃদ্ধি পায় তখন আকর্ষণ অনুভব করে। বস্তুত কোনো বস্তু যখন স্থিতিস্থাপকতা ও স্থিতিশীলতা লাভ করে তা এই যুগপৎ আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বলের উপস্থিতির জন্য। তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে কঠিন বস্তুর অণুগুলো যে স্পন্দিত হতে থাকে তা সরল ছন্দিত স্পন্দন নয়। এর কারণ, দুই অণুর মধ্যে দূরত্ব সাম্যাবস্থার তুলনায় যদি কমে যায় তাহলে বিকর্ষণ বল দ্রুত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এদের মধ্যে দূরত্ব সাম্যাবস্থার তুলনায় বৃদ্ধি পেলে আকর্ষণ বল তত দ্রুত বৃদ্ধি পায় না। ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবার ফলে জমাট বস্তুর মধ্যে অণুগুলো যখন ছুটাছুটি করে তখন একই শক্তি নিয়ে ভিতর দিকে যতটা সরে আসতে পারে, বাইরের দিকে তার চেয়ে বেশি সরে যেতে পারে। এর ফলে প্রত্যেক অণুর গড় সাম্যাবস্থান বাইরের দিকে সরে যায় এবং বস্তুটি তাপে প্রসারণ লাভ করে। তরল পদার্থের বেলায় আন্তঃআণবিক বলের প্রভাব কম বলে তাপের কারণে এ প্রসারণ বেশি হয়। গ্যাসীয় পদার্থের বেলায় তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বহুমুখী চাপ বৃদ্ধি পায় বলে অণুগুলোর ছুটাছুটি বৃদ্ধি পায়। জমাট পদার্থের বেলায় আন্তঃআণবিক বলের প্রকৃতি তাপজনিত প্রসারণ নির্ধারণ করে, কিন্তু গ্যাসের বেলায় চাপ তাপের সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে চাপকে অপরিবর্তিত রাখার জন্য গ্যাসের আয়তন বৃদ্ধি পায়। গ্যাসীয় পদার্থের চেয়ে তরল পদার্থের প্রসারণ অপেক্ষাকৃত কম এবং কঠিন পদার্থের প্রসারণ হয় সবচেয়ে কম।

৯.৩। কঠিন পদার্থের প্রসারণ
Expansion of Solids

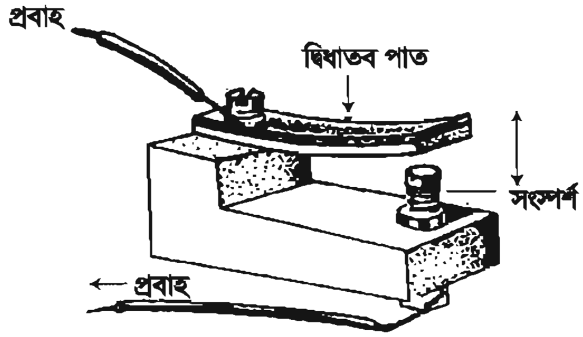
তাপ প্রয়োগে কঠিন পদার্থ প্রসারিত হয় এবং তাপ অপসারণে তা সংকুচিত হয়। পদার্থের এই প্রসারণ সবদিকেই হয়। তবে সব কঠিন পদার্থের প্রসারণ সমান হয় না। বিভিন্ন প্রকার কঠিন পদার্থের প্রসারণ বা সংকোচন যে বিভিন্ন তা একটি সহজ পরীক্ষার সাহায্যে দেখানো হয়।

একটি লোহার ও একটি পিতলের সদৃশ পাতকে পাশাপাশি একসাথে জোড়া দিয়ে একটি দ্বি-ধাতব পাত তৈরি করা হয়। কক্ষ তাপমাত্রার পাতটি সোজা থাকে (চিত্র ৯.২ক)। তাপ প্রয়োগ করলে পাতটি বেঁকে যায়– পিতলের পাতটি বাইরের দিকে থাকে (চিত্র ৯.২খ)। তাপ প্রয়োগে লোহার চেয়ে পিতলের প্রসারণ বেশি হয় বলে এরূপ হয়। আবার দণ্ডটিকে বরফের মধ্যে রাখলেও দণ্ডটি বেঁকে যাবে তবে এবার পিতলের পাতটি থাকে ভিতরের দিকে (চিত্র ৯.২গ)। তাপ অপসারণে লোহার চেয়ে পিতল বেশি সংকুচিত হয় বলে এরকমটি হয়। ধাতুর এ ধর্ম ব্যবহার করে থার্মোস্টাট তৈরি করা হয়।



চিত্র : ৯.২

৯.৩ চিত্রে দুটি ভিন্ন ধাতু দিয়ে তৈরী একটি থার্মোস্টাট সুইচ দেখানো হয়েছে। তাপের প্রভাবে একটি ধাতু অন্যটির চেয়ে বেশি প্রসারিত হলে পাতটি বেঁকে যায় ফলে তড়িৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। শীতল হয়ে পাতটি সোজা হলে পুনরায় তড়িৎ সংযোগ স্থাপিত হয়। দ্বিধাতব পাতের তৈরী থার্মোস্টাট ফ্রিজ, এয়ারকুলার, ইস্ত্রি, ওভেন ইত্যাদি যন্ত্রে স্থির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের কাজে ব্যবহার করা হয়। তাপ প্রয়োগে কঠিন পদার্থের সকল দিক প্রসারণ হয়। কঠিন পদার্থের যে কোনো এক দিক বৃদ্ধিকে বলে দৈর্ঘ্য প্রসারণ, ক্ষেত্রফলের বৃদ্ধিকে বলে ক্ষেত্র প্রসারণ এবং আয়তনের বৃদ্ধিকে বলে আয়তন প্রসারণ।



চিত্র : ৯.৩

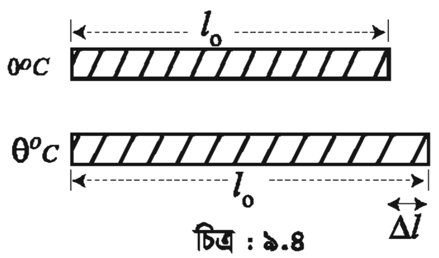
ক. দৈর্ঘ্য প্রসারণ :

তাপ প্রয়োগে বিভিন্ন কঠিন পদার্থের প্রসারণ বিভিন্ন হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে তাপ প্রয়োগে একই কঠিন পদার্থের প্রসারণ বেশ সুষম হয় এবং ব্যবহারিক কাজ কর্মের জন্য একটি ধাতব দণ্ডের দৈর্ঘ্য প্রসারণ এর আদি দৈর্ঘ্য এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির সমানুপাতিক হয়।

ধরা যাক একটি ধাতব দণ্ডের আদি দৈর্ঘ্য l_o (চিত্র ৯.৪) $\Delta\theta$ তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য এর দৈর্ঘ্য প্রসারণ Δl হলে

$$\Delta l \propto l_o \Delta\theta$$

বা, $\Delta l = \alpha\, l_o \Delta\theta$ ... ... (৯.১)



চিত্র : ৯.৪

এখানে α একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক। এর মান দণ্ডটির উপাদানের ওপর নির্ভর করে। একে কঠিন পদার্থের দৈর্ঘ্য প্রসারণ-সহগ বলা হয়।

দৈর্ঘ্য প্রসারণ–সহগ (Coefficient of Linear expansion), α

(৯.১) সমীকরণ থেকে দেখা যায় যে

$$\alpha = \frac{\Delta l}{l_o \Delta\theta} = \frac{\text{দৈর্ঘ্য প্রসারণ}}{\text{আদি দৈর্ঘ্য} \times \text{তাপমাত্রা বৃদ্ধি}} \quad \text{... ... ...} \quad (৯.২)$$

এ সমীকরণে $l_o = 1\text{m}$ এবং $\Delta\theta = 1\text{ K}$ হলে

$\alpha = \Delta l$ হয়। এর থেকে দৈর্ঘ্য প্রসারণ-সহগের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা দেওয়া হয়।

1 m দৈর্ঘ্যের কোনো কঠিন পদার্থের একটি দণ্ডের তাপমাত্রা 1 K বৃদ্ধি করলে ঐ দণ্ডের দৈর্ঘ্য যতটুকু বৃদ্ধি পায় তাকে ঐ দণ্ডের উপাদানের দৈর্ঘ্য প্রসারণ-সহগ বলে।

একক : (৯.২) সমীকরণের ডান পাশের রাশিগুলোর একক বসিয়ে দৈর্ঘ্য প্রসারণ-সহগ এর একক পাওয়া যায়। এই সমীকরণ থেকে দেখা যায় এর একক প্রতি কেলভিন (K^{-1})। কোনো পদার্থের দৈর্ঘ্য প্রসারণ-সহগের মান দৈর্ঘ্যের এককের ওপর নির্ভর করে না।

লোহার দৈর্ঘ্য প্রসারণ–সহগ 11.6×10^{-6} K^{-1} বলতে বুঝায় 1 m দৈর্ঘ্যের লোহার কোনো দণ্ডের তাপমাত্রা 1K বৃদ্ধি করলে এর দৈর্ঘ্য 11.6×10^{-6}m বৃদ্ধি পায়।

l_1 আদি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট কোনো ধাতব দণ্ডের উপাদানের দৈর্ঘ্য প্রসারণ-সহগ α হলে $\Delta\theta$ তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য এর প্রসারণ হবে $l_1\alpha\,\Delta\theta$।

$\therefore$ দণ্ডটির নতুন দৈর্ঘ্য l_2 = আদি দৈর্ঘ্য + দৈর্ঘ্য প্রসারণ

অর্থাৎ, $l_2 = l_1 + l_1\,\alpha\,\Delta\theta$

বা, $l_2 = l_1\,(1 + \alpha\,\Delta\theta)$ .. .. (৯.৩)

উদাহরণ ৯.১। 20°C তাপমাত্রায় একটি ইস্পাতের তারের দৈর্ঘ্য 100 m । 50°C তাপমাত্রায় এর দৈর্ঘ্য 100.033 m হলে ইস্পাতের দৈর্ঘ্য প্রসারণ-সহগ নির্ণয় কর।

সমাধান :

আমরা জানি,

$$\alpha = \frac{\Delta l}{l_1\Delta\theta}$$

$$= \frac{0.033\text{m}}{100\text{m}\times 30\text{K}}$$

$$= 11\times10^{-6}\,\text{K}^{-1}$$

উত্তর : $11\times10^{-6}\,\text{K}^{-1}$

এখানে,
আদি তাপমাত্রা, θ_1 = 20°C
শেষ তাপমাত্রা, θ_2 = 50°C
তাপমাত্রা বৃদ্ধি, $\Delta\theta$ = (50 – 20)°C = 30K
আদি দৈর্ঘ্য l_1 = 100 m
শেষ দৈর্ঘ্য, l_2 = 100.033 m
দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি, Δl = (100.033 – 100) m = 0.033 m
দৈর্ঘ্য প্রসারণ-সহগ α = ?

উদাহরণ ৯.২। 30°C তাপমাত্রায় একটি ইস্পাতের বিমের দৈর্ঘ্য 20 m হলে 100°C তাপমাত্রায় এর দৈর্ঘ্য কত হবে? ইস্পাতের দৈর্ঘ্য প্রসারণ-সহগ 11×10^{-6} K^{-1}।

সমাধান :

আমরা জানি,

$$l_2 = l_1\,(1 + \alpha\,\Delta\theta)$$

$$= 20\text{ m}\times(1+11\times10^{-6}\,\text{K}^{-1}\times 70\text{ K})$$

$$= 20.0154\text{ m}$$

উ: 20.0154 m

এখানে,
আদি দৈর্ঘ্য, l_1 = 20 m
তাপমাত্রার পরিবর্তন, $\Delta\theta$ = (100 – 30)°C = 70 K
দৈর্ঘ্য প্রসারণ – সহগ, $\alpha = 11\times10^{-6}\,\text{K}^{-1}$
চূড়ান্ত দৈর্ঘ্য, l_2 = ?

খ. ক্ষেত্র প্রসারণ :

কোনো কঠিন পদার্থে তাপ প্রদান করলে এর পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পায়। একে ক্ষেত্র প্রসারণ বলে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে কোনো কঠিন পদার্থের ক্ষেত্র প্রসারণ এর পৃষ্ঠের আদি ক্ষেত্রফল এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির সমানুপাতিক। ধরা যাক, কোনো একটি কঠিন পদার্থের পৃষ্ঠের আদি ক্ষেত্রফল A_o (চিত্র ৯.৫) এবং $\Delta\theta$ তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য এর ক্ষেত্র প্রসারণ ΔA হলে

$\Delta A \propto A_o \Delta\theta$

বা $\Delta A = \beta A_o \Delta\theta$ ... ... (৯.৪).

এখানে β একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক। এর মান বস্তুটির উপাদানের ওপর নির্ভর করে। একে কঠিন পদার্থের ক্ষেত্র প্রসারণ-সহগ বলা হয়।

ক্ষেত্র প্রসারণ-সহগ (Coefficient of surface expansion), β

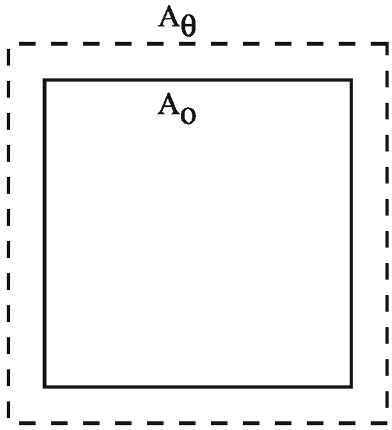
(৯.৪) সমীকরণ থেকে দেখা যায় যে

$$\beta = \frac{\Delta A}{A_0 \Delta\theta} = \frac{\text{ক্ষেত্র প্রসারণ}}{\text{আদি ক্ষেত্রফল} \times \text{তাপমাত্রা বৃদ্ধি}} \quad \text{... ... (৯.৫)}$$

এই সমীকরণ $A_o = 1\ m^2$ এবং $\Delta\theta = 1$ K হলে

$\beta = \Delta A$ হয়। এর থেকে ক্ষেত্র প্রসারণ-সহগের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা দেওয়া হয়।

$1m^2$ ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট কোনো কঠিন বস্তুর তাপমাত্রা **1K** বৃদ্ধি করলে ঐ বস্তুর ক্ষেত্রফল যতটুকু বৃদ্ধি পায় তাকে ঐ বস্তুর উপাদানের ক্ষেত্র প্রসারণ-সহগ বলে।



চিত্র : ৯.৫

একক : (৯.৫) সমীকরণের ডান পাশের রাশিগুলোর একক বসিয়ে ক্ষেত্র প্রসারণ-সহগ এর একক পাওয়া যায়। এ সমীকরণ থেকে দেখা যায় এর একক প্রতি কেলভিন ((K^{-1})। কোনো পদার্থের ক্ষেত্র প্রসারণ–সহগের মান ক্ষেত্রফলের এককের ওপর নির্ভর করে না।

ইস্পাতের ক্ষেত্র প্রসারণ–সহগ $22 \times 10^{-6} K^{-1}$ বলতে বুঝায় $1m^2$ ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি ইস্পাতের বস্তুর তাপমাত্রা 1K বৃদ্ধি করলে এর ক্ষেত্রফল $22 \times 10^{-6}\ m^2$ বৃদ্ধি পায়।

A_1 আদি ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট কোন কঠিন পদার্থের তাপমাত্রা $\Delta\theta$ বৃদ্ধি করলে এর চূড়ান্ত ক্ষেত্রফল হবে

$A_2 = A_1 + A_1\beta\,\Delta\theta = A_1(1 + \beta\,\Delta\theta)$ ... ... (৯.৬)

উদাহরণ ৯.৩। 25° C তাপমাত্রায় একটি সীসার পাতের ক্ষেত্রফল $4m^2$। একে 175°C পর্যন্ত উত্তপ্ত করলে ক্ষেত্রফল হয় $4.033m^2$ । সীসার ক্ষেত্র প্রসারণ-সহগ কত?

এখানে,

প্রাথমিক তাপমাত্রা, $\theta_1 = 25°C$

শেষ তাপমাত্রা, $\theta_2 = 175°C$

$\therefore$ তাপমাত্রা বৃদ্ধি, $\Delta\theta = (\theta_2 - \theta_1)$

$= (175 - 25)°C$

$= 150°C$

$= 150K$

আদি ক্ষেত্রফল, $A_o = 4m^2$

সীসার পাতের ক্ষেত্র প্রসারণ,

$\Delta A = (4.033 - 4)m^2 = 0.033m^2$

সীসার ক্ষেত্র প্রসারণ-সহগ $\beta =$?

সমাধান :

আমরা জানি,

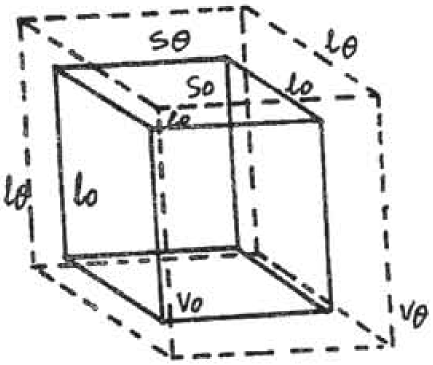
$$\beta = \frac{\Delta A}{A_0 \Delta\theta}$$

$$= \frac{0.033m^2}{4m^2 \times 150K}$$

$$= 55 \times 10^{-6}\ K^{-1}$$

উত্তর : $55 \times 10^{-6}\ K^{-1}$

গ. আয়তন প্রসারণ :



চিত্র : ৯.৬

কোনো কঠিন পদার্থে তাপ প্রয়োগ করলে এর আয়তন বৃদ্ধি পায় যাকে এর আয়তন প্রসারণ বলে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে কোনো নির্দিষ্ট কঠিন পদার্থের আয়তন প্রসারণ এর আদি আয়তন এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির সমানুপাতিক। $\Delta\theta$ তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে V_o (চিত্র ৯.৬) আয়তনের কোনো কঠিন পদার্থের ΔV পরিমাণ আয়তন প্রসারিত হলে,

$$\Delta V \propto V_o \Delta\theta$$

বা $\Delta V = \gamma V_o \Delta\theta$ ... ... (৯.৭)

এখানে γ একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক। এর মান বস্তুটির উপাদানের ওপর নির্ভর করে। একে কঠিন পদার্থের আয়তন প্রসারণ-সহগ বলা হয়।

আয়তন প্রসারণ-সহগ (Co-efficient of volume expansion), γ

(৯.৭) সমীকরণ থেকে দেখা যায় যে

$$\gamma = \frac{\Delta A}{V_o \Delta\theta} = \frac{\text{আয়তন প্রসারণ}}{\text{আদি আয়তন} \times \text{তাপমাত্রা বৃদ্ধি}} \quad \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots (৯.৮)$$

এই সমীকরণে $V_o = 1m^3$ এবং $\Delta\theta = 1K$ হলে $\gamma = \Delta V$ হয়। এর থেকে আয়তন প্রসারণ-সহগের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা দেওয়া যায়।

$1m^3$ আয়তন বিশিষ্ট কোনো কঠিন বস্তুর তাপমাত্রা 1K বৃদ্ধি করলে ঐ বস্তুর আয়তন যতটুকু বৃদ্ধি পায় তাকে ঐ বস্তুর উপাদানের আয়তন প্রসারণ-সহগ বলে।

একক : (৯.৮) সমীকরণের ডান পাশের রাশিগুলোর একক বসিয়ে আয়তন প্রসারণ-সহগের একক পাওয়া যায়। এই সমীকরণ থেকে দেখা যায় এর একক প্রতি কেলভিন (K^{-1})। কোনো পদার্থের আয়তন প্রসারণ-সহগের মান আয়তনের এককের ওপর নির্ভর করে না। কাচের আয়তন প্রসারণ সহগ $27 \times 10^{-6}\ K^{-1}$ বলতে বুঝায় $1m^3$ আয়তন বিশিষ্ট কাচের কোনো বস্তুর তাপমাত্রা 1K বৃদ্ধি করলে এর আয়তন $27 \times 10^{-6}\ m^3$ বৃদ্ধি পায়। V_1 আদি আয়তনবিশিষ্ট কোনো কঠিন পদার্থের তাপমাত্রা $\Delta\theta$ পরিমাণ বৃদ্ধি করলে এর চূড়ান্ত আয়তন হবে,

$V_2 = V_1 + V_1\gamma\Delta\theta = V_1(1 + \gamma\Delta\theta)$ ... ... (৯.৯)

উদাহরণ ৯.৪। 0°C তাপমাত্রায় 1000 cm^3 আয়তনের একখণ্ড ইস্পাতকে 100°C তাপমাত্রা পর্যন্ত উত্তপ্ত করলে এর আয়তন $1003.3cm^3$ হয়। ইস্পাতের আয়তন প্রসারণ–সহগ কত?

সমাধান :

আমরা জানি,

$$\gamma = \frac{\Delta V}{V_o \Delta\theta}$$

$$= \frac{3.3cm^3}{1000cm^3 \times 100K}$$

$$= 33 \times 10^{-6}\ K^{-1}$$

উত্তর : $33 \times 10^{-6}\ K^{-1}$

এখানে,

ইস্পাতের আদি আয়তন, $V_o = 1000\ cm^3$

আয়তন প্রসারণ, $\Delta V = (1003.3 - 1000)\ cm^3 = 3.3cm^3$

তাপমাত্রা বৃদ্ধি, $\Delta\theta = 100°C = 100\ K$

ইস্পাতের আয়তন প্রসারণ–সহগ, γ = ?

হিসাব করে দেখা গেছে, কোনো পদার্থের ক্ষেত্র প্রসারণ-সহগ এর দৈর্ঘ্য প্রসারণ-সহগের দ্বিগুণ এবং কোনো পদার্থের আয়তন প্রসারণ–সহগ এর দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগের তিনগুণ।

অর্থাৎ $\beta = 2\ \alpha$ এবং $\gamma = 3\ \alpha$

সুতরাং, কোনো পদার্থের দৈর্ঘ্য প্রসারণ-সহগ জানা থাকলে এর ক্ষেত্র প্রসারণ-সহগ এবং আয়তন প্রসারণ-সহগ উপরিউক্ত সম্পর্ক থেকে সহজে নির্ণয় করা যায়।

কয়েকটি পদার্থের দৈর্ঘ্য প্রসারণ-সহগ

(273 K এবং 373 K এর মধ্যে গড় প্রসারণ-সহগ, K^{-1})

পদার্থ	দৈর্ঘ্য প্রসারণ-সহগ, α K^{-1}	পদার্থ	দৈর্ঘ্য প্রসারণ-সহগ, α K^{-1}
কাচ	8.9×10^{-6}	নিকেল	13.0×10^{-6}
প্লাটিনাম	8.9×10^{-6}	তামা	16.7×10^{-6}
ইস্পাত	11.0×10^{-6}	পিতল	18.7×10^{-6}
লোহা	11.6×10^{-6}	অ্যালুমিনিয়াম	23.8×10^{-6}
কংক্রিট	$7.0 - 12.0 \times 10^{-6}$	সীসা	27.6×10^{-6}
		দস্তা	29.8×10^{-6}

৯.৪। কঠিন পদার্থের প্রসারণের কয়েকটি প্রয়োগ
A Few Applications of Expansion of Solids

১. রেললাইনে দুটি রেলের সংযোগস্থলে ফাঁক থাকে :

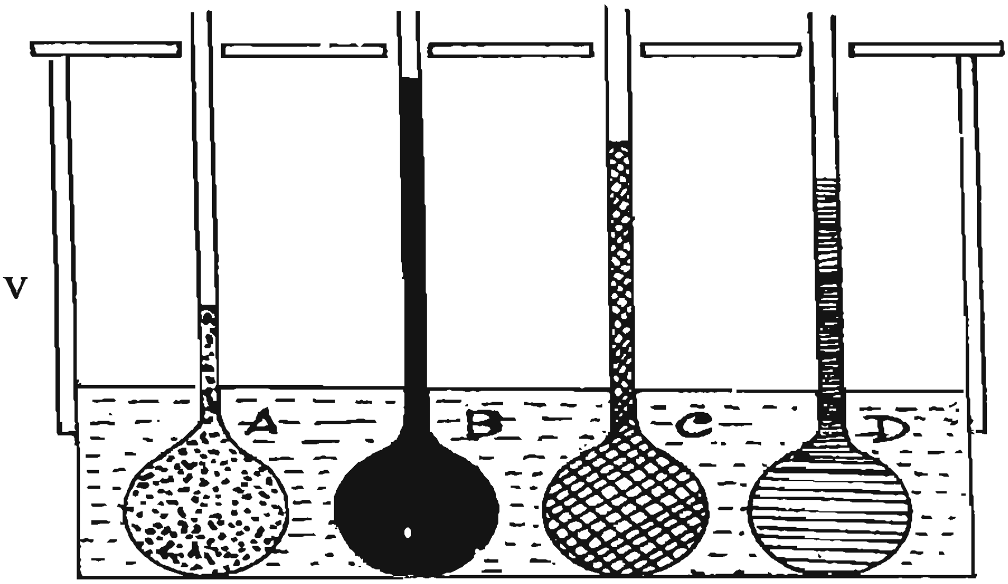
সূর্যের তাপে কিংবা যখন ট্রেন চলে তখন চাকার ঘর্ষণের ফলে উৎপন্ন তাপে রেললাইন প্রসারিত হয়। রেল লাইনের দুটি রেলের সংযোগস্থলে তাই ফাঁকা রাখা হয়, যাতে রেললাইন প্রসারণের জন্য যথেষ্ট জায়গা পায়। এরূপ ফাঁক না রাখলে এ প্রসারণের ফলে লাইন বেঁকে গিয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

২. চাকায় লোহার বেড় পরানো :

সাধারণত গরুর গাড়ির চাকায় লোহার বেড় লাগানো থাকে। এই বেড় কাঠের সাথে দৃঢ়ভাবে আটকানো থাকে। সাধারণ তাপমাত্রায় এই বেড় চাকা থেকে ছোট হয়, তাই একে চাকার সাথে লাগানো যায় না। লোহার বেড়টিকে গরম করলে এটি প্রসারিত হয়, ফলে এর ব্যাস বৃদ্ধি পায়। উত্তপ্ত অবস্থায় বেড়টিকে চাকার সাথে লাগিয়ে ঠান্ডা করা হয়। বেড়টি ঠান্ডায় সংকুচিত হয়ে চাকার গায়ে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকে।

৯.৫। তরল পদার্থের প্রসারণ
Expansion of Liquids

আমরা জানি তাপ প্রয়োগে প্রায় বস্তুরই প্রসারণ হয় এবং তাপ অপসারণে বস্তু সংকুচিত হয়। কঠিন পদার্থের মত তরল পদার্থে তাপ প্রয়োগ করলেও তা প্রসারিত হয়। কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন থাকার ফলে এর প্রসারণ তিন প্রকার হয়; যথা– দৈর্ঘ্য প্রসারণ, ক্ষেত্র প্রসারণ এবং আয়তন প্রসারণ। কিন্তু তরল পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তন থাকলেও এর নির্দিষ্ট আকার নেই, যখন যে পাত্রে রাখা হয় সেই পাত্রের আকার ধারণ করে, ফলে এর দৈর্ঘ্য প্রসারণ বা ক্ষেত্র প্রসারণ নেই। সুতরাং তরল পদার্থে তাপ প্রয়োগ করলে শুধু এর আয়তনের প্রসারণ হয়। অতএব তরল পদার্থের প্রসারণ বলতেই এর আয়তন প্রসারণ বুঝায়। একই তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য সম-আয়তনের বিভিন্ন তরল পদার্থের প্রসারণ বিভিন্ন হয়।



চিত্র : ৯.৭

পরীক্ষা : সম-আয়তনের কয়েকটি কাচের বালব A, B, C, D প্রভৃতি নেওয়া হয় [চিত্র ৯.৭]। প্রতিটি বালবের সাথে একটি করে সরু নল সংযুক্ত, বালবগুলো একটি উপযোগী কাঠামো V তে উল্লম্বভাবে দাঁড় করানো এবং যন্ত্রের নিম্নাংশে একটি পাত্রের মধ্যে বালবগুলো আছে। বালবগুলোকে কক্ষ তাপমাত্রায় বিভিন্ন তরল পদার্থ দিয়ে একই উচ্চতা পর্যন্ত পূর্ণ করা হয়। সুতরাং কক্ষ তাপমাত্রায় সকল তরল পদার্থই সমান আয়তন দখল করে। এখন পাত্রে গরম পানি ঢালা হয়। এর ফলে প্রতিটি তরলের তাপমাত্রা সম-পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে তরল পদার্থগুলো প্রসারিত হয়ে নলের ভিতর প্রবেশ করে। কিন্তু বিভিন্ন নলে তরলের উপরিতলের উচ্চতা বিভিন্ন হয়। এর থেকে বুঝা যায় যে বিভিন্ন তরলের প্রসারণ বিভিন্ন হয়।

সাধারণত একই তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য কঠিন পদার্থের চেয়ে সম-আয়তন তরলের প্রসারণ বেশি হয়।

৯.৬। তরল পদার্থের প্রকৃত ও আপাত প্রসারণ
Real and Apparent Expansion of Liquids

তরল পদার্থকে কোনো না কোনো পাত্রে রেখে উত্তপ্ত করতে হয়। ফলে তরল পদার্থে তাপ প্রয়োগ করলে তরলের সাথে সাথে পাত্র প্রসারিত হয়। এই পাত্রের প্রসারণ বিবেচনার ওপর তরলের প্রসারণের মান নির্ভর করে। পাত্রের প্রসারণের ওপর ভিত্তি করে তরলের দুই প্রকার প্রসারণ পাওয়া যায়; যথা—

১. প্রকৃত প্রসারণ
২. আপাত প্রসারণ

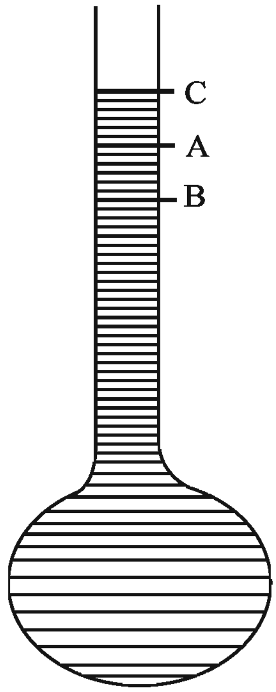
প্রকৃত প্রসারণ : তরল পদার্থকে পাত্রে না রেখে উত্তপ্ত করা সম্ভব হলে তরলের প্রকৃত যে প্রসারণ পাওয়া যেত তাকে তরলের প্রকৃত প্রসারণ বলে। তরল পদার্থ পাত্রে রেখে উত্তপ্ত করা হয় বলে পাত্রের প্রসারণ বিবেচনা করে তরলের যে প্রসারণ পাওয়া যায় তাই প্রকৃত প্রসারণ।

আপাত প্রসারণ : পাত্রের প্রসারণ বিবেচনা না করে তরলের আপাতভাবে যে প্রসারণ দেখা যায় অর্থাৎ, পাত্রের সাপেক্ষে তরলের যে প্রসারণ হয় তাকে তরলের আপাত প্রসারণ বলে।

প্রকৃত প্রসারণ ও আপাত প্রসারণের সম্পর্ক :

নিচের পরীক্ষার সাহায্যে তরল পদার্থের প্রকৃত প্রসারণ ও আপাত প্রসারণের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা যায়।

পরীক্ষা : একটি দাগকাটা ফ্লাস্ক নেওয়া যাক যার A দাগ পর্যন্ত তরল পূর্ণ আছে [চিত্র ৯.৮]। এখন ফ্লাস্কে তাপ প্রয়োগ করা হলে প্রথমে ফ্লাস্কটি তাপ গ্রহণ করে এবং পরে তরলে তাপ সঞ্চারিত হয়। প্রথমে পাত্র তাপ গ্রহণ করে প্রসারিত হয়, ফলে পাত্রের আয়তন বাড়ে কিন্তু তরলের আয়তন একই থাকার ফলে তরলের উপরিতলে B দাগ পর্যন্ত নেমে আসে। ফলে তাপের জন্য পাত্রের BA পরিমাণ প্রসারণ হয়। এরপর তরল তাপ গ্রহণ করে প্রসারিত হয় এবং তরলের প্রসারণ কঠিনের চেয়ে বেশি হওয়ায় তরল প্রসারিত হয়ে A দাগ অতিক্রম করে C দাগ পযন্ত পৌঁছে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় তরলের প্রসারণের ফলে তরলের উপরিতল A দাগ থেকে C দাগে পৌঁছেছে, অর্থাৎ, তরলের প্রসারণ হয়েছে AC। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তরলের উপরিতল B দাগ থেকে C দাগে পৌঁছায়;



চিত্র : ৯.৮

সুতরাং

$BC = \Delta V_r$ = তরলের প্রকৃত প্রসারণ

$AC = \Delta V_a$ = তরলের আপাত প্রসারণ

$BA = \Delta V_g$ = পাত্রের প্রসারণ

(৯.৮) চিত্র থেকে আমরা পাই

$BC = AC + BA$ বা, $\Delta V_r = \Delta V_a + \Delta V_g$ ... ... (৯.১০)

বা, প্রকৃত প্রসারণ = আপাত প্রসারণ + পাত্রের প্রসারণ।

তরল পদার্থটি পাত্রের চেয়ে বেশি প্রসারণশীল হলে মোটের ওপর তরলের আপাত প্রসারণ হবে। কিন্তু তরল পদার্থের চেয়ে পাত্রটি বেশি প্রসারণশীল হলে তরলটি আপাতভাবে সংকুচিত হয়েছে বলে মনে হবে। যদি তরল ও পাত্র সমান প্রসারণশীল হয় তবে তরলের আয়তন স্থির থাকে বলে মনে হয়। সাধারণত তরল পদার্থ কঠিন পদার্থের চেয়ে বেশি প্রসারিত হয়। তাই কোনো পাত্রে তরল উত্তপ্ত করলে সাধারণভাবে আপাত প্রসারণ ঘটে।

যেহেতু তরল পদার্থের প্রসারণ দুই প্রকারের, তাই তরল পদার্থের প্রসারণ সহগও দুই প্রকারের হবে, যথা : প্রকৃত প্রসারণ সহগ এবং আপাত প্রসারণ সহগ।

ক. তরল পদার্থের প্রকৃত প্রসারণ-সহগ, γ_r (Co-efficient of real expansion)

পরীক্ষা করে দেখা গেছে কোনো নির্দিষ্ট তরল পদার্থের প্রকৃত প্রসারণ, তরল পদার্থের আদি আয়তন এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির সমানুপাতিক। $\Delta\theta$ তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য V_0 আয়তনের তরলের প্রকৃত প্রসারণ ΔV_r হলে,

$\Delta V_r \propto V_0 \Delta\theta$

বা $V_r = \gamma_r V_0 \Delta\theta$ .... (৯.১১)

এখানে γ_r একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক। এর মান তরল পদার্থের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। একে তরল পদার্থের প্রকৃত প্রসারণ-সহগ বলা হয়।

(৯.১১) সমীকরণ থেকে দেখা যায় যে,

$$\gamma_r = \frac{\Delta V_r}{V_0 \Delta\theta} = \frac{\text{প্রকৃত প্রসারণ}}{\text{আদি আয়তন} \times \text{তাপমাত্রা বৃদ্ধি}} \quad \ldots\ldots \quad (৯.১২)$$

এই সমীকরণে $V_0 = 1m^3$ এবং $\Delta\theta = 1$ K হলে $\gamma_r = \Delta V_r$ হয়। এর থেকে প্রকৃত প্রসারণ-সহগের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা দেওয়া যায়।

$1m^3$ আয়তনের কোনো তরল পদার্থের তাপমাত্রা **1K** বৃদ্ধি করলে তরল পদার্থের যে প্রকৃত প্রসারণ ঘটে তাকে ঐ তরল পদার্থের প্রকৃত প্রসারণ-সহগ বলে।

একক : (৯.১২) সমীকরণের ডান পাশের রাশিগুলোর একক বসিয়ে প্রকৃত প্রসারণ-সহগের একক পাওয়া যায়। এই সমীকরণ থেকে দেখা যায় এর একক প্রতি কেলভিন (K^{-1})। কোনো তরল পদার্থের প্রকৃত প্রসারণ-সহগের মান আয়তনের এককের উপর নির্ভর করে না।

তাৎপর্য : পারদের প্রকৃত প্রসারণ-সহগ 18×10^{-5} K^{-1} বলতে বুঝায় 1 m^3 আয়তনের পারদের তাপমাত্রা 1K বৃদ্ধি করলে এর আয়তন প্রকৃতপক্ষে 18×10^{-5} m^3 বৃদ্ধি পায়।

কোনো তরল পদার্থের প্রকৃত প্রসারণ-সহগ যদি γ_r হয়, তাহলে V_1 আয়তনের এই তরল পদার্থের তাপমাত্রা $\Delta\theta$ পরিমাণ বৃদ্ধি করলে এর চূড়ান্ত আয়তন হবে,

$$V_2 = V_1 + V_1 \gamma_r \Delta\theta = V_1 (1+\gamma_r \Delta\theta) \quad \ldots\ldots \quad (৯.১৩)$$

তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে যেমন তরল পদার্থের প্রসারণ হয় তেমনি তাপমাত্রা হ্রাস করলে এর আয়তন হ্রাস পায়। অর্থাৎ, $\Delta\theta$ পরিমাণ তাপমাত্রা হ্রাস পেলে তরলের চূড়ান্ত আয়তন হবে,

$$V_2 = V_1 - V_1 \gamma_r \Delta\theta = V_1 (1 - \gamma_r \Delta\theta) \quad \ldots\ldots \quad (৯.১৪)$$

খ. আপাত প্রসারণ-সহগ, γ_a (Co - efficient of apparent expansion)

একইভাবে দেখা গেছে কোনো নির্দিষ্ট তরল পদার্থের আপাত প্রসারণ তরল পদার্থের আদি আয়তন এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির সমানুপাতিক। $\Delta\theta$ তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য V_0 আয়তনের তরলের আপাত প্রসারণ ΔV_a হলে,

$$\Delta V_a \propto V_0 \Delta\theta$$

$$\text{বা } \Delta V_a = \gamma_a V_0 \Delta\theta \quad \ldots\ldots \quad (৯.১৫)$$

এখানে γ_a একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক। এর মান তরল পদার্থের প্রকৃতি এবং পাত্রের উপাদানের ওপর নির্ভর করে। একে পাত্রের উপাদানের সাপেক্ষে তরল পদার্থের আপাত প্রসারণ-সহগ বলা হয়।

(৯.১৫) সমীকরণ থেকে দেখা যায় যে

$$\gamma_a = \frac{\Delta Va}{V_0 \Delta\theta} = \frac{\text{প্রকৃত প্রসারণ}}{\text{আদি আয়তন} \times \text{তাপমাত্রা বৃদ্ধি}} \quad \ldots\ldots \quad (৯.১৬)$$

এই সমীকরণে $V_0 = 1m^3$ এবং $\Delta\theta = 1$ K হলে $\gamma_a = \Delta V_a$ হয়। এর থেকে আপাত প্রসারণ-সহগের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা দেওয়া যায়।

কোনো পাত্রে রাখা $1m^3$ আয়তনের কোনো তরল পদার্থের তাপমাত্রা 1 K বৃদ্ধি করলে তরল পদার্থের যে আপাত প্রসারণ ঘটে তাকে ঐ পাত্রের উপাদানের সাপেক্ষে ঐ তরল পদার্থের আপাত প্রসারণ-সহগ বলে।

একক : (৯.১৬) সমীকরণের ডানপাশের রাশিগুলোর একক বসিয়ে আপাত প্রসারণ-সহগের একক পাওয়া যায়। এই সমীকরণ থেকে দেখা যায় যে এর একক প্রতি কেলভিন (K^{-1})। কোনো তরল পদার্থের আপাত প্রসারণ-সহগের মান আয়তনের এককের ওপর নির্ভর করে না।

তাৎপর্য : কাচের সাপেক্ষে পারদের আপাত প্রসারণ-সহগ 15×10^{-5} K^{-1} বলতে বুঝায় কাচের পাত্রে রাখা $1m^3$ আয়তনের পারদের তাপমাত্রা 1 K বৃদ্ধি করলে এর আয়তন আপাত দৃষ্টিতে 15×10^{-5} m^3 বৃদ্ধি পায় বলে মনে হয়।

প্রকৃত প্রসারণ–সহগ ও আপাত প্রসারণ–সহগের সম্পর্ক

হিসাব করে দেখানো যায় যে কোনো তরলের আপাত প্রসারণ-সহগের সাথে পাত্রের উপাদানের আয়তন প্রসারণ-সহগ যোগ করলেই প্রকৃত প্রসারণ সহগ পাওয়া যায়।

সুতরাং, প্রকৃত প্রসারণ–সহগ = আপাত প্রসারণ-সহগ + পাত্রের উপাদানের আয়তন প্রসারণ–সহগ

বা $\gamma_r = \gamma_a + \gamma_g$ ... ... (৯.১৭)

এখানে γ_g = পাত্রের উপাদানের আয়তন প্রসারণ–সহগ

উদাহরণ ৯.৫। 0°C তাপমাত্রার 100 cm^3 গ্লিসারিনের তাপমাত্রা 20°C বাড়ালে এর প্রসারণ হয় 1.06 cm^3। গ্লিসারিনের প্রকৃত প্রসারণ-সহগ নির্ণয় কর।

সমাধান :

আমরা জানি,

$$\gamma_r = \frac{\Delta Vr}{V_0 \Delta\theta}$$

$$= \frac{1.06cm^3}{100cm^3 \times 20K}$$

$$= 53 \times 10^{-5} K^{-1}$$

উত্তর : $53 \times 10^{-5} K^{-1}$

এখানে,

গ্লিসারিনের আদি আয়তন, V_O = 100 Cm^3

গ্লিসারিনের প্রকৃত প্রসারণ, ΔV_r =1.06 cm^3

তাপমাত্রা বৃদ্ধি, $\Delta\theta$ = 20°C = 20 K

গ্লিসারিনের প্রকৃত প্রসারণ–সহগ, γ_r = ?

উদাহরণ ৯.৬। 298 K তাপমাত্রার 200 cm^3 তার্পিন তেলের তাপমাত্রা 313 K–এ উন্নীত করলে এর আয়তন কত হবে? তার্পিন তেলের প্রকৃত প্রসারণ-সহগ $94 \times 10^{-5} K^{-1}$।

সমাধান :

আমরা জানি,

$$V_2 = V_1 (1 + \gamma_r \Delta\theta)$$

$$= 200\ cm^3 (1 + 94 \times 10^{-5} K^{-1} \times 15K)$$

$$= 202.82\ cm^3$$

উত্তর : 202.82 cm^3

এখানে,

তার্পিন তেলের আদি আয়তন, V_1= 200 cm^3

তার্পিন তেলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি, $\Delta\theta$ = (313–298) K = 15 K

তার্পিন তেলের শেষ আয়তন V_2 = ?

তার্পিন তেলের প্রকৃত প্রসারণ–সহগ, $\gamma_r = 94 \times 10^{-5} K^{-1}$

উদাহরণ ৯.৭। কাচপাত্রে রাখা পারদের আপাত প্রসারণ-সহগ $14.66 \times 10^{-5} K^{-1}$। এবং কাচের দৈর্ঘ্য প্রসারণ-সহগ 0.00001 K^{-1} হলে পারদের প্রকৃত প্রসারণ-সহগ কত?

সমাধান :

আমরা জানি,

পত্রের আয়তন প্রসারণ-সহগ γ_g হলে

$$\gamma_r = + \gamma_a + \gamma_g$$

$$= \gamma_a + 3\alpha_g$$

$$= 14.66 \times 10^{-5} K^{-1} + 3 \times 10^{-5} K^{-1}$$

$$= 17.66 \times 10^{-5} K^{-1}$$

উত্তর : $17.66 \times 10^{-5} K^{-1}$

এখানে,

পারদের আপাত প্রসারণ-সহগ, $\gamma_a = 14.66 \times 10^{-5}K^{-1}$

পাত্রের দৈর্ঘ্য প্রসারণ–সহগ,

$\alpha_g = 0.00001K^{-1} = 10^{-5}K^{-1}$

পারদের প্রকৃত প্রসারণ–সহগ γ_r = ?

৯.৭ বায়বীয় পদার্থের প্রসারণ
Expansion of Gases

তাপ প্রদানে বায়বীয় পদার্থের আয়তন ও চাপ উভয়ই বৃদ্ধি পায় তাপ অপসারণে তা হ্রাস পায়। বায়বীয় পদার্থের নির্দিষ্ট কোনো আকার ও আয়তন নেই। যখন যে পাত্রে রাখা হয়, সেই পাত্রের আকার ও আয়তন লাভ করে। বায়বীয় পদার্থের অণুগুলো সর্বদা গতিশীল অবস্থায় আবদ্ধ পাত্রের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরে বেড়ায়। এ সময় এগুলো পরস্পরের সাথে ধাক্কা খায় এবং পাত্রের গায়েও ধাক্কা দেয়। তাপমাত্রা বাড়লে অণুগুলোর গড় গতিশক্তি বেড়ে যায়। এসময় চাপ যদি স্থির রাখা হয়, তাহলে অণুগুলোর পরস্পরের সাথে ধাক্কা খাওয়ার আগে পূর্বের চেয়ে বেশি পথ অতিক্রম করতে হয় ফলে অণুগুলো কর্তৃক দখলকৃত জায়গা অর্থাৎ, বায়বীয় পদার্থের আয়তন বেড়ে যায়। পক্ষান্তরে বায়বীয় পদার্থকে প্রসারিত হতে না দিলে বর্ধিত গতিশক্তির প্রভাবে অণুগুলো পাত্রের দেয়ালে আরো বেশি বল প্রয়োগ করতে থাকে অর্থাৎ, বায়বীয় পদার্থের চাপ বেড়ে যায়। যেহেতু তাপ প্রয়োগে বায়বীয় পদার্থের আয়তন ও চাপ উভয়ই বৃদ্ধি পায় তাই বায়বীয় পদার্থের প্রসারণ আমাদের সঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্য পৃথকভাবে

(ক) স্থির চাপে গ্যাসের আয়তন প্রসারণ এবং

(খ) স্থির আয়তনে গ্যাসের চাপ প্রসারণ বিবেচনা করতে হবে।

তরলের ন্যায় বায়বীয় পদার্থকে কোনো না কোনো পাত্রে রেখে তাপ দিতে হয়। কিন্তু তাপমাত্রার এ পরিবর্তনের জন্য বায়বীয় পদার্থের প্রসারণ, পাত্রের প্রসারণের চেয়ে অনেক বেশি হওয়ায় পাত্রের প্রসারণকে উপেক্ষা করা যায়। ফলে বায়বীয় পদার্থের ক্ষেত্রে প্রকৃত ও আপাত প্রসারণের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। বায়বীয় পদার্থের প্রসারণ সহগ নির্ণয়ের সময় সকল ক্ষেত্রেই প্রাথমিক আয়তন বা চাপ 0°C বা 273 K তাপমাত্রায় নিতে হয়। কঠিন বা তরল পদার্থের ক্ষেত্রে 0°C এর পরিবর্তে কক্ষ তাপমাত্রা বা অন্য কোনো নিম্ন তাপমাত্রায় নেওয়া চলে। কারণ তাপমাত্রার অল্প পরিবর্তনের জন্য কঠিন ও তরল পদার্থের অল্প প্রসারণের তুলনায় বায়বীয় পদার্থের প্রসারণ অনেক বেশি হয়।

ক. স্থির চাপে গ্যাসের আয়তন প্রসারণ–সহগ, γ_p

পরীক্ষা করে দেখা গেছে, স্থির চাপে নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে এর আয়তন প্রসারণ ঐ গ্যাসের 0°C তাপমাত্রায় আদি আয়তন এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির সমানুপাতিক। 0°C তাপমাত্রার নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের আয়তন V_0 এবং চাপ স্থির রেখে এর তাপমাত্রা $\Delta\theta$ বৃদ্ধি করলে এর আয়তন প্রসারণ ΔV হলে

$$\Delta V \propto V_0 \Delta\theta$$

বা $\Delta V = \gamma_p V_0 \Delta\theta$ ... ... (৯.১৮)

এখানে γ_p একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক। একে স্থির চাপে গ্যাসের আয়তন প্রসারণ-সহগ বলা হয়। (৯.১৮) সমীকরণ থেকে দেখা যায়,

$$\gamma_p = \frac{\Delta V}{V_0 \Delta\theta} = \frac{\text{আয়তন প্রসারণ}}{\text{আদি আয়তন} \times \text{তাপমাত্রা বৃদ্ধি}} \quad \ldots \quad (৯.১৯)$$

এই সমীকরণে $V_0 = 1m^3$ এবং $\Delta\theta = 1K$ হলে $\gamma_p = \Delta V$ হয়। এর থেকে স্থির চাপে গ্যাসের আয়তন প্রসারণ-সহগের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা দেওয়া যায়।

স্থির চাপে 0°C তাপমাত্রার নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের $1m^3$ আয়তনের তাপমাত্রা 1K বৃদ্ধি করলে ঐ গ্যাসের আয়তন যতটুকু বৃদ্ধি পায় তাকে স্থির চাপে গ্যাসের আয়তন প্রসারণ-সহগ বলে।

একক : (৯.১৯) সমীকরণের ডান পাশের রাশিগুলোর একক বসিয়ে স্থির চাপের গ্যাসের আয়তন প্রসারণ-সহগের একক পাওয়া যায়। এই সমীকরণ থেকে দেখা যায় এর একক প্রতি কেলভিন (K^{-1})। স্থির চাপে গ্যাসের আয়তন প্রসারণ-সহগের মান আয়তনের এককের ওপর নির্ভর করে না।

স্থির চাপে গ্যাসের আয়তন প্রসারণ-সহগের মান $0.00366\ K^{-1}$ বলতে বুঝায় চাপ স্থির রেখে $0°C$ তাপমাত্রার $1m^3$ আয়তন গ্যাসের তাপমাত্রা 1K বাড়লে এর আয়তন $0.00366\ m^3$ বৃদ্ধি পায়।

স্থির চাপে গ্যাসের আয়তন প্রসারণ-সহগের মান একটি ধ্রুব সংখ্যা এবং সকল গ্যাসের জন্য প্রায় একই, বিভিন্ন গ্যাসের জন্য বিভিন্ন নয়। কঠিন ও তরলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদার্থের জন্য আয়তন প্রসারণ-সহগের মান বিভিন্ন হয়। $0°C$ তাপমাত্রায় কোনো গ্যাসের আয়তন যদি V_0 হয়, তাহলে চাপ স্থির রেখে এর তাপমাত্রা $\Delta\theta$ বৃদ্ধি করলে নতুন আয়তন V_θ হবে।

$$V_\theta = V_0\,(1+\gamma_p\Delta\theta) \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad (৯.২০)$$

খ. স্থির আয়তনে গ্যাসের চাপ প্রসাণর–সহগ, γ_v

পরীক্ষা করে দেখা গেছে, আয়তন স্থির রেখে নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে এর চাপের প্রসারণ ঐ গ্যাসের $0°C$ তাপমাত্রার আদি চাপ এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির সমানুপাতিক। $0°C$ তাপমাত্রার নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের চাপ P_0 এবং আয়তন স্থির রেখে এর তাপমাত্রা $\Delta\theta$ বৃদ্ধি করলে এর চাপের প্রসারণ

ΔP হলে,

$$\Delta P \propto P_0\,\Delta\theta$$

বা $\Delta P = \gamma_v P_0\,\Delta\theta \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad (৯.২১)$

এখানে γ_v একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক। একে স্থির আয়তনে গ্যাসের চাপ প্রসারণ-সহগ বলা হয় (৯.২১) সমীকরণ থেকে দেখা যায়,

$$\gamma_v = \frac{\Delta P}{P_0\Delta\theta} = \frac{\text{চাপের প্রসারণ}}{\text{আদি চাপ} \times \text{তাপমাত্রা বৃদ্ধি}} \quad \ldots \quad \ldots \quad (৯.২২)$$

এই সমীকরণের $P_0 = 1Pa$ এবং $\Delta\theta = 1K$ হলে $\gamma_v = \Delta P$ হয়। এর থেকে স্থির আয়তনের গ্যাসের চাপ প্রসারণ-সহগের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা দেওয়া যায়।

$0°C$ তাপমাত্রার নির্দিষ্ট ভরের **1Pa** চাপের কোনো গ্যাসের আয়তন স্থির রেখে এর তাপমাত্রা **1K** বৃদ্ধি করলে ঐ গ্যাসের চাপ যতটুকু বৃদ্ধি পায় তাকে স্থির আয়তনে গ্যাসের চাপ প্রসারণ–সহগ বলে।

একক : (৯.২২) সমীকরণের ডান পাশের রাশিগুলোর একক বসিয়ে স্থির আয়তনে গ্যাসের চাপ প্রসারণ-সহগের একক পাওয়া যায়। এই সমীকরণ থেকে দেখা যায় এর একক প্রতি কেলভিন (K^{-1})। স্থির আয়তনে গ্যাসের চাপ প্রসারণ-সহগের মান চাপের এককের ওপর নির্ভর করে না।

স্থির আয়তনের গ্যাসের চাপ প্রসারণ-সহগের মান $0.00366\ K^{-1}$ বলতে বুঝায় আয়তন স্থির রেখে $0°C$ তাপমাত্রার 1 Pa চাপের গ্যাসের তাপমাত্রা 1K বাড়লে এর চাপ 0.00366 Pa বৃদ্ধি পায়।

স্থির আয়তনে গ্যাসের চাপ প্রসারণ-সহগ একটি ধ্রুব সংখ্যা এবং সকল গ্যাসের জন্য এই মান প্রায় একই থাকে, বিভিন্ন গ্যাসের জন্য বিভিন্ন নয়।

$0°C$ তাপমাত্রায় কোনো গ্যাসের চাপ যদি P_0 হয় তাহলে আয়তন স্থির রেখে এর তাপমাত্রা $\Delta\,\theta$ বৃদ্ধি করলে নতুন চাপ P_θ হবে।

$$P_\theta = P_0\,(1+\gamma_v\Delta\theta)$$

উদাহরণ : ৯.৮। $0°C$ তাপমাত্রায় কোনো গ্যাসের আয়তন $500cm^3$ হলে $100°C$ তাপমাত্রায় এর আয়তন কত হবে? দেওয়া আছে $\gamma_P = \frac{1}{273}\ K^{-1}$

সমাধান :

এখানে,
0°C তাপমাত্রায় আয়তন, $V_0 = 500\ cm^3$
তাপমাত্রা বৃদ্ধি, $\Delta\theta = (100—0)^\circ C = 100\ K$
চূড়ান্ত আয়তন, $V_0 = ?$
স্থিরচাপে গ্যাসের আয়তন প্রসারণ-সহগ,
$\gamma_p = \frac{1}{273}\ K^{-1}$

আমরা জানি,
$V_\theta = V_0\ (1 + \gamma_p \Delta\theta)$
$= 500\ cm^3\ (1 + \frac{1}{273}\ K^{-1} \times 100K)$
$= 683.15\ cm^3$
উত্তর : $683.15\ cm^3$

৯.৮। দৈনন্দিন জীবনে পদার্থের প্রসারণজনিত কতিপয় ঘটনা
Some incidents of expansion of substances in daily life

১। পুরু কাচের গ্লাসে গরম পানীয় ঢাললে গ্লাসটি ফেটে যায় : পুরু কাচের গ্লাসে গরম পানীয় ঢালা হলে অনেক সময় গ্লাসটি ফেটে যায়। গ্লাসে গরম পানীয় ঢালার ফলে ঐ গ্লাসের ভিতরের অংশ গরম পানির সংস্পর্শে প্রসারিত হয়, কিন্তু কাচ তাপের কুপরিবাহক বলে ঐ তাপ বাইরের অংশে সঞ্চারিত হতে পারে না, তাই ভিতরের অংশ প্রসারিত হলেও বাইরের অংশ প্রসারিত হতে পারে না, ফলে প্রসারণ বলের জন্য কাচ ফেটে যায়। কিন্তু কাচ পাতলা হলে ভিতরের তাপ দ্রুত বাইরে যেতে পারে এবং কাচের প্রসারণ সব জায়গায় সমান হয়।

ফ্লিন্ট, ক্রাউন ও পাইরেক্স এই তিন রকমের কাচের মধ্যে পাইরেক্সের প্রসারণ সহগ কম বলে পাইরেক্সের তৈরী পরীক্ষা নল, বিকার প্রভৃতির ভিতরের অংশও বেশি প্রসারিত হতে পারে না, ফলে পাইরেক্সের তৈরী জিনিসপত্র সহজে ফাটে না। এ কারণে পরীক্ষাগারে পাইরেক্সের তৈরী জিনিসপত্র ব্যবহৃত হয়।

২। পানির ব্যতিক্রমী প্রসারণ : তরল পদার্থে তাপ প্রয়োগ করলে তার আয়তন বাড়ে, তাপ অপসারণ করলে আয়তন কমে। কিন্তু 0°C তাপমাত্রার পানিকে উত্তপ্ত করলে এর আয়তন বাড়ে না বরং আয়তন কমে। 4°C তাপমাত্রা পর্যন্ত এরূপ ঘটে। 4°C তাপমাত্রার পানিকে গরম বা ঠান্ডা যাই করা হোক না কেন তা প্রসারিত হয়। এটি তরল পদার্থের প্রসারণের সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। তাই পানির এই প্রসারণকে ব্যতিক্রমী প্রসারণ বলে। এই তাপমাত্রায় অর্থাৎ, 4°C তাপমাত্রায় পানির ঘনত্ব তাই সবচেয়ে বেশি।

পানির এই ব্যতিক্রমী প্রসারণের জন্যই শীতপ্রধান দেশে পুকুর, নদী বা সাগরে জলজ জীবেরা বেঁচে থাকতে পারে। পানির ব্যতিক্রম প্রসারণের জন্য ঐ সকল নদ-নদী, পুকুর বা সাগরের সমস্ত পানিই জমে বরফ হয়ে যায় না। উপরে বরফ জমে গেলেও নিচে 4°C তাপমাত্রার পানি থেকে যায় ফলে জলজ জীবের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়।

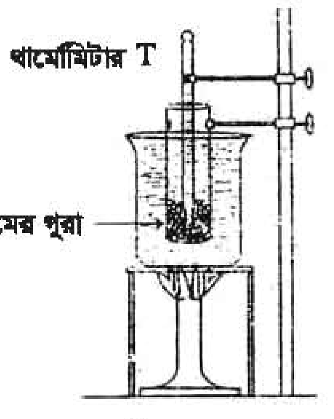
৯.৯। অবস্থার পরিবর্তন
Change of State

পদার্থ সাধারণত তিন অবস্থায় থাকে যথা– কঠিন, তরল ও বায়বীয়। কোনো পদার্থের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়াকে অবস্থার পরিবর্তন বলে। যেমন তাপ দিলে বরফ গলে পানিতে পরিণত হয়ে কঠিন অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় আসে বা পানি থেকে জলীয় বাষ্প হয়ে তরল অবস্থা থেকে বায়বীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। পদার্থের অবস্থান্তরের সময় তাপ প্রয়োগ বা তাপ অপসারণ করতে হয়।

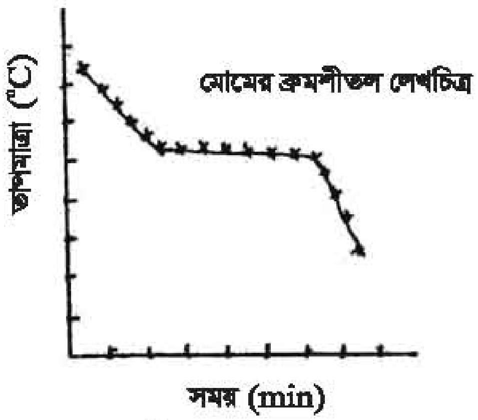
৯.১০। গলন
Fusion

কোনো পদার্থের কঠিন অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়াকে গলন বলে। একটি পরীক্ষা নলে কিছু মোম নিয়ে এর মধ্যে একটা থার্মোমিটার রাখা হল [চিত্র ৯.৯]। থার্মোমিটারে দেখা যাবে মোমের তাপমাত্রা কক্ষ তাপমাত্রার সমান। এবার একটা বিকারে কিছু পানি নিয়ে থার্মোমিটারসহ টেস্টটিউবটি বিকারের পানিতে ডুবিয়ে বার্নারের সাহায্যে বিকারে

তাপ প্রয়োগ করলে দেখা যাবে যে থার্মোমিটারে তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করেছে। তাপমাত্রা বাড়তে বাড়তে একটা নির্দিষ্ট মানে পৌঁছার পর দেখা যাবে মোম গলতে শুরু করেছে। মোম গলতে শুরু করার পর আমরা যতই তাপ দেই না কেন থার্মোমিটারে তাপমাত্রা আর বাড়বে না। টেস্টটিউবের সমস্ত মোম গলে না যাওয়া পর্যন্ত তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকবে। সমস্ত মোম গলে যাওয়া মাত্র তরল মোম তাপমাত্রা আবার ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে। এখন তাপ প্রয়োগ বন্ধ করে তরল মোম ধীরে ধীর শীতল হতে দেওয়া হয় এবং আধ মিনিট পরপর থার্মোমিটারে তাপমাত্রার পাঠ নেওয়া হয়। তরল মোম জমাট বাধা শুরু না হওয়া পর্যন্ত এ তাপমাত্রা হ্রাস পেতে থাকবে। মোম জমাট বাধতে শুরু হলে তাপমাত্রা আবার স্থির হয়ে যাবে এবং সমুদয় তরল মোম জমাট না বাধা পর্যন্ত তাপমাত্রা স্থির থাকবে। সমস্ত মোম জমাট বেধে গেলে তাপমাত্রা আবার ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়ে কক্ষ তাপমাত্রায় নেমে আসবে। উপরের পরীক্ষা থেকে দেখা যায় যে তাপ প্রয়োগে কঠিন মোম এক সময় তরলে রূপান্তরিত হচ্ছে এবং এই তরল মোমকে ঠাণ্ডা করলে অর্থাৎ, এর থেকে তাপ অপসারণ করলে এটি আবার কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হচ্ছে। সুতরাং তাপ প্রয়োগ কিংবা তাপ অপসারণে পদার্থের অবস্থান্তর ঘটে। এখন একটি ছক কাগজে অনুভূমিক অক্ষ বরাবর সময় এবং উল্লম্ব অক্ষ বরাবর তাপমাত্রা নিয়ে লেখ আঁকলে (চিত্র ৯.১০) লেখের যে অংশ সময় অক্ষের সমান্তরাল হয় সেই অংশের তাপমাত্রা ঐ মোমের হিমাঙ্ক নির্দেশ করে। মোম কেলাসী হওয়ায় এই তাপমাত্রাই এর গলনাঙ্ক।



চিত্র : ৯.৯



চিত্র : ৯.১০

গলনের আপেক্ষিক সুপ্ততাপ (Specific Latent Heat of Fusion)

উপরের পরীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে যে মোমের তাপমাত্রা গলনাঙ্কে পৌঁছে যাওয়ার পর যতই তাপ দেওয়া হোক না কেন এর তাপমাত্রা আর বাড়ছে না। এই যে তাপ দেওয়া হচ্ছে কিন্তু তাপমাত্রা বাড়ছে না এ তাপ যাচ্ছে কোথায়? এ তাপ আসলে বস্তুর অবস্থান্তর ঘটাতে কাজে লাগছে অর্থাৎ, অণুগুলোর বন্ধন ছিন্ন করতে যে শক্তি প্রয়োজন তাপ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করছে। ঠিক একইভাবে শীতলীকরণের সময় তাপমাত্রা হিমাঙ্কে নেমে আসার পর যতই শীতল করা হোক না কেন তাপমাত্রা কমে না। এখানেও যে তাপ অপসারণ করা হচ্ছে– তা মোমের অবস্থান্তর অর্থাৎ, তরল থেকে কঠিনে রূপান্তরিত করতে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই তাপ যা বস্তুর তাপমাত্রার পরিবর্তন না ঘটিয়ে অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় তাকে সুপ্ততাপ (latent heat) বলে।

অণুগুলোর মধ্যকার প্রবল আকর্ষণের জন্য অণুগুলো নিয়মিতভাবে সাজানো থাকে। আকর্ষণ প্রবল হওয়ায় অণুগুলো স্থান ত্যাগ করতে পারে না, কিন্তু নিজ নিজ অবস্থানে থেকে দ্রুত কাঁপতে থাকে। ফলে, অণুগুলোর গতিশক্তি বেড়ে যায়। যখন কঠিন পদার্থটি তরলে পরিণত হয়, তখন আর এদের নিয়মিত সজ্জা থাকে না অণুগুলোর জ্যামিতিক সজ্জা ভেঙে ফেলতে শক্তির প্রয়োজন হয়। সুপ্ততাপই এ শক্তি সরবরাহ করে, তাই সুপ্ততাপ পদার্থের তাপমাত্রা বাড়াতে পারে না।

পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে প্রয়োজনীয় তাপশক্তির পরিমাণ পদার্থের ভরের ওপর নির্ভরশীল। যেমন 0°C তাপমাত্রার 1 kg বরফকে 0°C তাপমাত্রার পানিতে পরিণত করতে 336000 J তাপশক্তি প্রয়োজন। আবার 0°C তাপমাত্রার 2 kg বরফকে 0°C তাপমাত্রার পানিতে পরিণত করতে 672000 J তাপশক্তি প্রয়োজন। উভয় ক্ষেত্রে তাপশক্তিকে বস্তুর ভর দিয়ে ভাগ করলে সবসময় একই মান অর্থাৎ, 336000 Jkg^{-1} পাওয়া যায়। এবং বলা হয় বরফ গলনের আপেক্ষিক সুপ্ততাপ (Specific Latent Heat of Fusion) : 336000 J kg^{-1}। কোনো কঠিন পদার্থের গলনের আপেক্ষিক সুপ্ততাপ নিচের সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করা যায়। :

$$\text{গলনের আপেক্ষিক সুপ্ততাপ} = \frac{\text{যে কোনো ভরের কঠিন পদার্থের তাপমাত্রা পরিবর্তন না করে তরলে পরিণত করতে প্রয়োজনীয় তাপশক্তি}}{\text{কঠিন পদার্থের ভর}}$$

উপরের আলোচনা থেকে গলনের আপেক্ষিক সুপ্ততাপকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় :

গলনাঙ্কে তাপমাত্রা স্থির রেখে 1kg ভরের কোনো কঠিন পদার্থকে কঠিন অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় রূপান্তরিত করতে যে তাপের প্রয়োজন হয় তাকে ঐ পদার্থের গলনের আপেক্ষিক সুপ্ততাপ বলে। গলনের আপেক্ষিক সুপ্ততাপকে l_f দ্বারা সূচিত করা হয়। তাপমাত্রার পরিবর্তন না ঘটিয়ে m kg ভরের কোনো কঠিন পদার্থকে তরলে রূপান্তরিত করতে যদি ΔQ পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় তাহলে, 1 kg ভরের কঠিন পদার্থকে তরলে পরিণত করতে $\frac{\Delta Q}{m}$ পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়।

সুতরাং গলনের আপেক্ষিক সুপ্ততাপ $l_f = \frac{\Delta Q}{m}$

একক : তাপের একককে ভরের একক দিয়ে ভাগ করলে গলনের আপেক্ষিক সুপ্ততাপের একক পাওয়া যায়। গলনের আপেক্ষিক সুপ্ততাপের একক জুল/কিলোগ্রাম বা J kg^{-1}।

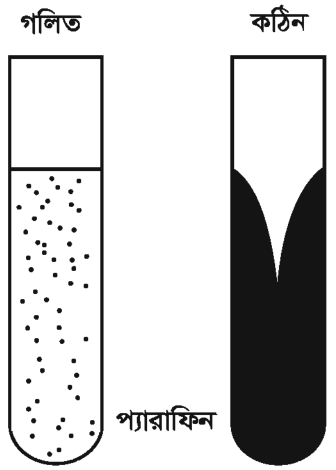
বরফ গলনের আপেক্ষিক সুপ্ততাপ 336000 J kg^{-1} এর অর্থ হচ্ছে 0°C তাপমাত্রার 1 kg বরফকে 0°C তাপমাত্রার পানিতে পরিণত করতে 336000 J তাপের প্রয়োজন হয়। পক্ষান্তরে 0°C তাপমাত্রার 1 kg পানি 0°C তাপমাত্রার বরফে পরিণত হওয়ার জন্য 336000 জুল তাপ বর্জন করে।

৯.১১। গলনে বা কঠিনীভবনে আয়তনের পরিবর্তন
Change of Volume in fusion or solidification

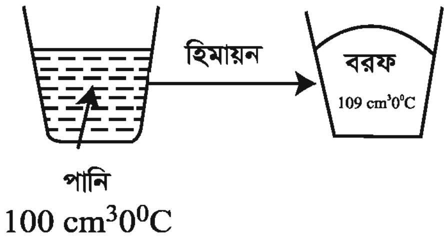
সাধারণত দেখা যায় পদার্থ তরল থেকে কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হলে আয়তন কমে যায়। যেমন প্যারাফিন মোম গলিয়ে একটি টেস্ট টিউবে রেখে দিলে কিছুক্ষণ পর জমে যায় এবং এর আয়তন কমে যাওয়ার জন্য এর মাঝে একটি গভীর খাদের সৃষ্টি হয় (চিত্র ৯.১১)। কিছু কিছু পদার্থ আবার এ নিয়ম মেনে চলে না। বরফ, ঢালাই লোহা, পিতল, বিসমাথ,অ্যান্টিমনি ইত্যাদি তরল হলে আয়তন কমে যায় এবং তরল থেকে কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হলে আয়তন বেড়ে যায়।

উদাহরণ : 0°C উষ্ণতায় 100 cc পানি জমে 109 cc বরফে পরিণত হয় (চিত্র ৯.১২)। ঢালাই লোহার আয়তন প্রায় শতকরা সাত ভাগ বৃদ্ধি পায়।

কোন পাতলা লোহার পাত্রে ফুটানো পানি রেখে পাত্রের মুখে প্যাঁচওয়ালা ছিপি দিয়ে আটকে পাত্রটিকে লবণ মেশানো বরফের মধ্যে রেখে দিলে কিছু সময় পরে দেখা যাবে যে পাত্রটি ফেটে গেছে। পানি জমে বরফ হওয়ার সময় এর আয়তন বেড়ে যায়। প্রসারিত আয়তন পাত্রের গায়ে যে প্রচণ্ড চাপ দেয় তার ফলে পাত্রটি ফেটে যায়।



চিত্র : ৯.১১



চিত্র : ৯.১২

আয়তন পরিবর্তনের সুবিধা ও অসুবিধা : অবস্থার পরিবর্তনের জন্য পদার্থের আয়তনের প্রসারণ আমাদের ব্যবহারিক জীবনে সুবিধা ও অসুবিধা দুই–ই বয়ে আনে।

লোহা বা পিতল যখন তরল থেকে কঠিনে পরিণত হয় তখন এদের আয়তন প্রসারণ অনেক কাজের অসুবিধা করে দেয়। ঢালাই করার সময় ধাতু গলিয়ে ছাঁচের মধ্যে ঢেলে দিয়ে ঠান্ডা করা হয়। ঠান্ডা হলে কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় এর আয়তন বেড়ে যায় এবং ছাঁচের প্রত্যেকটা জায়গা ভরাতে চেষ্টা করে, ফলে ঢালাইয়ের ধারগুলো খুব সূক্ষ্ম এবং অবিকল ঢালাইয়ের মত হয়।

ছাপার হরফ সীসা, অ্যান্টিমনি ও তামা মিশ্রিত একটি সংকর ধাতু। তরল থেকে কঠিন অবস্থায় রূপান্তরের সময় এরও আয়তন বাড়ে। ফলে হরফের ধারগুলো তীক্ষ্ম ও সুস্পষ্ট হয়।

শীতপ্রধান দেশে পানির পাইপ ফেটে যায় :

আবার শীতপ্রধান দেশে যখন পানি জমে বরফ হয় তখন এর আয়তন বৃদ্ধির জন্য নানারকম অসুবিধা দেখা দেয়। পানির পাইপের ভিতরের পানি ঠান্ডায় বরফ হয়ে গেলে আয়তন বেড়ে যায়। ফলে পাইপের ওপর যে প্রচণ্ড চাপ পড়ে তাতে পাইপ ফেটে যায়। সাধারণত দেখা যায় ঠান্ডা পানির পাইপের চেয়ে গরম পানির পাইপ বেশি ফাটে; কারণ, গরম পানিতে ঠান্ডা পানির চেয়ে দ্রবীভূত বাতাসের পরিমাণ কম থাকে। ঠান্ডা পানির পাইপে পানি জমে গেলে দ্রবীভূত বাতাস বেরিয়ে যেয়ে জমাট বাধা পানির অতিরিক্ত আয়তনের জন্যে জায়গা করে দেয়, কিন্তু গরম পানিতে বাতাসের পরিমাণ কম থাকায় জমাট বাঁধা পানির অতিরিক্ত আয়তনের জন্য আর জায়গা থাকে না। ফলে পাইপের গায়ে যে প্রচণ্ড চাপ পড়ে তাতে পাইপ ফেটে যায়। তাই গরম পানির পাইপ বেশি ফাটতে দেখা যায়। শীতের দেশে পাহাড়ের পাথরে এই একই কারণে ফাটল সৃষ্টি হয়।

৯.১২। গলনাঙ্কের ওপর চাপের প্রভাব
Effect of pressure on Melting point

পদার্থের ওপর চাপের হ্রাস-বৃদ্ধির জন্য গলনাঙ্ক পরিবর্তিত হয়। চাপের জন্য গলনাঙ্ক পরিবর্তন দুইভাবে হতে পারে।

(১) কঠিন অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় রূপান্তরের সময় যেসব পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি পায়, যেমন, মোম, তামা ইত্যাদি; চাপ বাড়লে ঐ সব পদার্থের গলনাঙ্ক বেড়ে যায় অর্থাৎ, বেশি তাপমাত্রায় গলে। বর্ধিত চাপ পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি অসুবিধা করে দেয় ফলে গলনাঙ্ক বেড়ে যায়।

(২) আবার যেসব পদার্থের আয়তন গলনের ফলে হ্রাস পায়, যেমন ঢালাই লোহা, বরফ, অ্যান্টিমনি, বিসমাথ ইত্যাদি ;

এদের ক্ষেত্রে চাপ বাড়লে গলনাঙ্ক কমে যায় অর্থাৎ, এরা কম তাপমাত্রায় গলে। বর্ধিত চাপ পদার্থের আয়তন সংকোচনে সুবিধা করে দেয়। ফলে এদের গলনাঙ্ক কমে যায়।

স্বাভাবিক চাপে বরফের গলনাঙ্ক 0°C। কিন্তু বায়ু শূন্যস্থানে বরফের গলনাঙ্ক 0.0078°C। সুতরাং এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপে অর্থাৎ, 76cm পারদ চাপের পরিবর্তনের জন্য বরফের গলনাঙ্ক 0.0078°C পরিবর্তিত হয়।

পুনঃশিলীভবন
Regelation

দুই টুকরো বরফকে একত্রে ধীরে চাপ দিলে ওরা জোড়া লেগে যায়। এরূপ হওয়ার কারণ কী? যখন বরফ টুকরো দুটির ওপর চাপ দেওয়া হয় তখন ওদের সংযোগস্থলে গলনাঙ্ক 0°C এর নিচে নেমে আসে। কিন্তু সংযোগস্থলের তাপমাত্রা 0°C থাকায় ঐ জায়গায় বরফ গলে যায়। এখন যেই চাপ অপসারণ করা হয় তখন গলনাঙ্ক আবার 0°C–এ চলে আসে ফলে সংযোগস্থলের বরফগলা পানি জমাট বেধে টুকরো দুটিকে জুড়ে দেয়। এভাবে চাপ দিয়ে কঠিন বস্তুকে তরলে পরিণত করে ও চাপ হ্রাস করে আবার কঠিন অবস্থায় আনাকে পুনঃশিলীভবন বলে।

চাপ প্রয়োগের ফলে কঠিন বস্তু গলে যাওয়া এবং চাপ প্রত্যাহারে আবার এক কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হওয়াকে পুনঃশিলীভবন বলে।

বটমিলের পরীক্ষা (Bottomley`s Experiment)

বরফের একটি বড় টুকরোকে দুটি স্ট্যান্ডের উপর রাখা হয়। একটি সরু তামার তারের দুই প্রান্তে দুটি ওজন বেঁধে টুকরোটির উপর মাঝ বরাবর রাখা হয় [চিত্র ৯.১৩]। কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় যে, ওজন দুটির ভারে তামার তারটি বরফের টুকরোটিকে কেটে নিচে নেমে আসে কিন্তু বরফের টুকরো একই রকম থাকে। এর কারণ তামার তার বরফের যে অংশে থাকে সেই অংশে প্রচণ্ড চাপ দেয় ফলে গলনাঙ্ক কমে গিয়ে বরফ পানি হয়ে যায়। এর জন্য যে সুপ্ততাপের প্রয়োজন তা তামার তার ও বায়ুমণ্ডল সরবরাহ করে এ কারণে চারপাশের তাপমাত্রা 0°C অপেক্ষা খুব কম থাকলে এ পরীক্ষা করা যাবে না। এখন ঐ পানি ভেদ করে তার যেই একটু নিচে নামে সাথে সাথে পানির চাপ কমে যায়, ফলে এর গলনাঙ্ক আবার বেড়ে যাওয়ায় পানি জমাট বেঁধে যায়। জমে বরফ হওয়ার সময় পানি কিছুটা সুপ্ততাপ পরিত্যাগ করে। এই তাপ তামার তার বেয়ে নিচে নেমে যায় এবং নিচের বরফকে গলিয়ে ফেলে। এবারে তারটি আস্তে আস্তে বরফ কেটে বের হবে কিন্তু বরফ দুভাগ হবে না, কারণ নিচে নামার সাথে উপরের পানি বরফ হয়ে আবার জোড়া লাগিয়ে দেয়।



চিত্র : ৯.১৩

৯.১৩। বাষ্পীভবন
Vaporisation

কোনো পদার্থের তরল অবস্থা থেকে বায়বীয় অবস্থায় পরিবর্তনকে বাষ্পীভবন বলে। বিপরীতক্রমে কোনো পদার্থের বায়বীয় অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় রূপান্তরকে ঘনীভবন বা তরলীকরণ (liquefaction) বলে। সাধারণত দুভাবে বাষ্পীভবন সংঘটিত হয়। যথা– (১) স্বতঃবাষ্পীভবন (Evaporation) ও (২) স্ফুটন (Boiling or Ebullition)

স্বতঃবাষ্পীভবন (Evaporation) : একটি বড় মুখবিশিষ্ট পাত্রে অল্প পরিমাণ পানি নিয়ে খোলা জায়গায় রেখে

দিলে ধীরে ধীরে পাত্রের পানির পরিমাণ কমে যেতে দেখা যায় এবং ক্রমে পাত্রটি শুকিয়ে যায়। এভাবে যে কোনো তাপমাত্রায় তরল পদার্থ ধীরে ধীরে বাষ্পে পরিণত হওয়ার পদ্ধতিকে স্বতঃবাষ্পীভবন বলে। স্বতঃবাষ্পীভবন একটা খুব ধীর পদ্ধতি। স্বতঃবাষ্পীভবন তরলের উপরিতল থেকে সংঘঠিত হয়। স্বতঃবাষ্পীভবন যে কোনো তাপমাত্রায় হতে পারে তবে তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে স্বতঃবাষ্পীভবনের হার বাড়তে থাকে। গরমকালে নদী ও পুকুরের পানি কমে যাওয়া, ভিজা কাপড় রোদে দিলে শুকিয়ে যাওয়া ইত্যাদি স্বতঃবাষ্পীভবনের জন্য হয়।

যেকোনো তাপমাত্রায় তরল পদার্থের উপরিতল থেকে ধীরে ধীরে বাষ্পে পরিণত হওয়ার পদ্ধতিকে স্বতঃবাষ্পীভবন বলে।

স্বতঃবাষ্পীভবনের হার তরলের প্রকৃতির ওপরও নির্ভর করে। একই তাপমাত্রায় যে সকল তরল তুলনামূলকভাবে তাড়াতাড়ি বাষ্পে পরিণত হয় তাদেরকে উদ্বায়ী তরল পদার্থ বলে। পেট্রোল, বেনজিন, অ্যালকোহল, ইথার ইত্যাদি উদ্বায়ী তরল পদার্থ।

স্ফুটন (Boiling or Ebullition) : কোনো তরল পদার্থে তাপ প্রয়োগ করলে এর তাপমাত্রা বাড়ে। তাপমাত্রা বাড়তে বাড়তে একটা নির্দিষ্ট মানে পৌঁছলে তরল ফুটতে শুরু করে। এ অবস্থায় তাপ প্রয়োগ অব্যাহত থাকলে তরল দ্রুত বাষ্পে পরিণত হতে থাকবে।

তাপ প্রয়োগ করে কোনো তরলের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দ্রুত বাষ্পে পরিণত করার পদ্ধতিকে স্ফুটন বলে।

স্ফুটনাঙ্ক : যে তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট চাপে কোনো তরল পদার্থে স্ফুটন সংঘটিত হয় অর্থাৎ, তরল ফুটতে থাকে তাকে স্ফুটনাঙ্ক বলে। সাধারণত স্বাভাবিক চাপে কোনো তরলের স্ফুটনাঙ্ক উল্লেখ করা হয়। কোনো তরলের স্ফুটনাঙ্ক বলতে আমরা সেই তাপমাত্রাকে বুঝি যে তাপমাত্রায় তরলের সম্পৃক্ত বাষ্প চাপ বায়ুমণ্ডলীয় চাপের সমান হয়।

৯.১৪। স্ফুটন প্রভাবান্বিত হওয়ার কারণ
Factors influencing the boiling

তরল পদার্থের স্ফুটন সাধারণত নিম্নোক্ত বিষয়গুলো দ্বারা প্রভাবিত হয় :

(১) **তরল পদার্থের প্রকৃতি :** এক এক রকম পদার্থ এক এক রকম তাপমাত্রায় ফুটে থাকে। সুতরাং স্ফুটন তরলের প্রকৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়।

(২) **তরলের উপরস্থ চাপ :** তরলের উপরস্থ চাপ বাড়লে স্ফুটনাঙ্ক বেড়ে যায় এবং চাপ কমলে স্ফুটনাঙ্কও কমে যায়। অর্থাৎ স্ফুটনের হার তরল পদার্থের উপরস্থ চাপের ওপর নির্ভর করে।

(৩) **তরলের বিশুদ্ধতা :** তরল বিশুদ্ধ না হলে এর স্ফুটনাঙ্ক বিশুদ্ধ তরলের স্ফুটনাঙ্কের সমান হয় না। আবার, তরল পদার্থে কোনো বস্তু দ্রবীভূত থাকলে স্ফুটনাঙ্ক বেড়ে যায়। যে তাপমাত্রায় পানি ফুটবে, চিনির পানি সে তাপমাত্রায় ফুটবে না, তার চেয়ে বেশি তাপমাত্রায় ফুটবে।

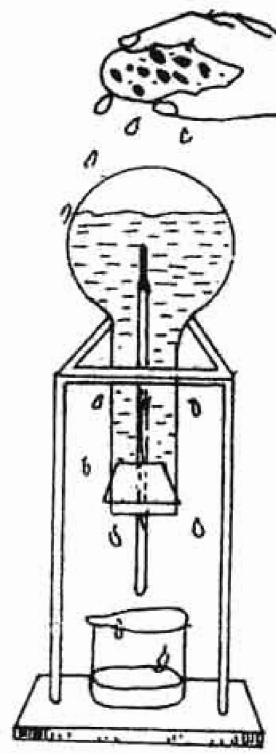
৯.১৫। স্ফুটনাঙ্কের ওপর চাপের প্রভাব
Effect of Pressure on Boiling Point

চাপ বাড়লে তরলের স্ফুটনাঙ্ক বেড়ে যায় এবং চাপ কমলে স্ফুটনাঙ্ক কমে। স্বাভাবিক চাপে পানির স্ফুটনাঙ্ক $100°C$। কিন্তু চাপ যদি 76 cm পারদ চাপ না হয়ে কম হয় তাহলে পানি $100°C$ এর কম তাপমাত্রায় ফুটে। প্রতি 2.7 cm পারদ চাপের পরিবর্তনের স্ফুটনাঙ্ক $1°C$–এ পরিবর্তিত হয়। নিচের পরীক্ষাগুলো দ্বারা স্ফুটনাঙ্কের ওপর চাপের প্রভাব বুঝানো হয়েছে।

ফ্র্যাঙ্কলিন–এর পরীক্ষা : একটি কাচের ফ্লাস্কে অর্ধেক পানি নিয়ে বার্নারের সাহায্যে ফুটানো হয়। এতে ফ্লাস্কের ভিতরের সমস্ত বায়ু বের হয়ে যায়। অতঃপর বার্নার সরিয়ে ফ্লাস্কটিকে একটি ছিপির সাহায্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ছিপির মধ্য দিয়ে একটি থার্মোমিটার ফ্লাস্কের মধ্যে প্রবেশ করানো হয়।

এবার ফ্লাস্কটি উল্টিয়ে চিত্রানুযায়ী রাখা হয় [চিত্র ৯.১৪]। বার্নার সরিয়ে নেওয়ার ফলে পানির স্ফুটন বন্ধ হয়ে যায়। এখন ফ্লাস্কটির উপর ঠান্ডা পানি ঢাললে দেখা যাবে যে ফ্লাস্কের পানি আবার ফুটাতে শুরু করেছে যদিও থার্মোমিটারে উষ্ণতা 100°C থেকে কয়েক ডিগ্রি কম।

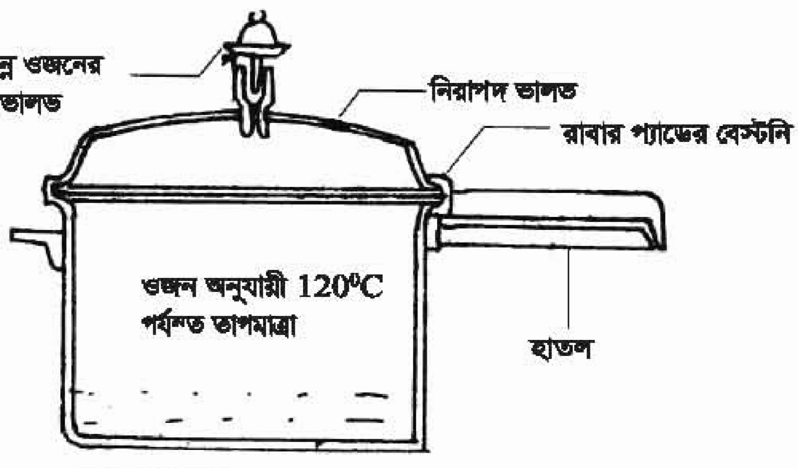
এরূপ হওয়ার কারণ, ঠান্ডা পানি ঢালার জন্য ফ্লাস্কের ভিতরের জলীয় বাষ্পের কিছু অংশ ঠান্ডা হয়ে তরলে পরিণত হয় এবং এর উপরের বাষ্পচাপ কমলে স্ফুটনাঙ্ক কমে যায়।



চিত্র : ৯.১৪

৯.১৬। পেপিন – এর ডাইজেস্টার বা প্রেসার কুকার Pepin's Digester or Pressure Cooker

পানির স্ফুটনাঙ্ক বৃদ্ধি করে রান্না করার সময় কমিয়ে ফেলা সম্ভব হয়। প্রেসার কুকারে পানির উপরস্থ চাপ বাড়িয়ে এর স্ফুটনাঙ্ক বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ফলে অতি অল্প সময়ে রান্না করা সম্ভব হয়। 1681 সালে ফরাসি বিজ্ঞানী ডেনিস পেপিন এ কুকার প্রথম ব্যবহার করেন বলে একে পেপিনের ডাইজেস্টারও বলা হয়।



প্রেসার কুকার
চিত্র : ৯.১৫

৯.১৫ চিত্রে এরূপ একটি কুকার দেখানো হয়েছে। এটি একটি অ্যালুমিনিয়ামের তৈরী মোটা দেয়ালের পাত্র। রাবার

প্যাডের বেস্টনি দ্বারা ঢাকনিকে পাত্রের মুখে বায়ু নিরুদ্ধভাবে আটকানো যায়। ঢাকনিতে ছিদ্র আছে এবং ঐ ছিদ্রের মুখ একটি পিন ভালভ বন্ধ করে রাখে। কোনো ওজনের সাহায্যে ভালভকে ছিদ্রমুখে আটকে রাখা হয়। বিভিন্ন ওজন ব্যবহার করলে পিন ভালভটি বিভিন্ন চাপে ছিদ্র বন্ধ করবে এবং তার ফলে কুকারের ভিতরস্থ বাষ্পের চাপ বিভিন্ন হবে। এভাবে পানি 120°C বা আরো বেশি উষ্ণতায় ফুটানো যায়। এতে জ্বালানি এবং সময় কম লাগে। যদি বাষ্পের চাপ হঠাৎ বেশি হয়ে পড়ে তাহলে নিরাপদ ভালভটি খুলে যায় এবং অতিরিক্ত চাপ কমে যায়। এতে পাত্র ভাঙার ভয় থাকে না। এ ধরনের কুকারে দশ মিনিটে মাংস সিদ্ধ করা যায়।

৯.১৭। সুউচ্চ পাহাড় বা পর্বতের উপর রান্না করা দুরূহ
Cooking is difficult on the top of the hill or mountain

পাহাড় বা পর্বতের উপর বায়ুর চাপ কম থাকায় পানির স্ফুটনাঙ্ক কমে যায় অর্থাৎ, কম তাপমাত্রায় পানি ফুটতে পারে। হিসাব করে দেখা গেছে এভারেস্ট পর্বত শৃঙ্গে মাত্র 70°C তাপমাত্রায় পানি ফুটতে শুরু করবে। পাহাড়ের উপর পানির স্ফুটনাঙ্ক কম বলে কম তাপমাত্রায় পানি ফুটতে শুরু করে, কিন্তু মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি দ্রুত সিদ্ধ হয় না। মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি সুসিদ্ধ হওয়ার জন্য যে তাপের প্রয়োজন হয়, পানি কম তাপমাত্রায় ফুটে বাষ্পীভূত হতে বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপ গ্রহণ করে বলে মাছ, মাংস সেই পর্যাপ্ত তাপ পায় না, ফলে সুউচ্চ পাহাড় বা পর্বতের উপর রান্না করা দুরূহ হয়ে পড়ে।

প্রেসার কুকার ব্যবহার করে এ অসুবিধা কাটানো যায়।

৯.১৮। বাষ্পীভবনের আপেক্ষিক সুপ্ততাপ
Specific Latent Heat of Vaporization

কঠিন পদার্থের ন্যায় তরল পদার্থের অবস্থান্তর ঘটাতেও সুপ্ততাপের প্রয়োজন হয়। একটা বিকারে কিছু পানি নিয়ে এর মধ্যে একটা থার্মোমিটার রেখে তাপ দিলে দেখা যাবে যে পানির তাপমাত্রা 100°C এসে স্থির হয়ে গেছে। এ তাপমাত্রায় পানি বাষ্পে পরিণত হতে শুরু করে। এ তাপমাত্রাই পানির স্ফুটনাঙ্ক। তাপ প্রয়োগ অব্যাহত থাকলে দেখা যাবে যে সমস্ত পানি বাষ্পে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত তাপমাত্রা স্ফুটনাঙ্কেই স্থির রয়েছে। অর্থাৎ, পানি সুপ্ততাপ গ্রহণ করে জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়। ঠিক একইভাবে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে পানিতে পরিণত হওয়ার সময় সুপ্ততাপ বর্জন করে। পানির তাপমাত্রা স্ফুটনাঙ্কে পৌঁছে যাওয়ার পর যদি তাপ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে পানির অবস্থান্তরও বন্ধ হয়ে যাবে অর্থাৎ, পানি আর বাষ্পে পরিণত হবে না।

তরল পদার্থের কোনো নির্দিষ্ট জ্যামিতিক আকৃতি না থাকলেও এর অণুগুলোর মধ্যে কিছুটা আকর্ষণ বর্তমান থাকে, যা তরল পদার্থের অণুগুলোকে এক জায়গায় ধরে রাখে। বায়বীয় পদার্থের অণুগুলোর মধ্যে কোনো আকর্ষণ বল থাকে না। তরল থেকে বায়বীয় অবস্থায় রূপান্তরের সময় সুপ্ততাপ তরলের অণুগলোর মধ্যকার আকর্ষণী বলের বিরুদ্ধে কাজ করে।

তরল পদার্থের অবস্থান্তরের জন্যে প্রয়োজনীয় সুপ্ততাপ তরল পদার্থের ভরের ওপর নির্ভর করে। তাই বাষ্পীভবনের আপেক্ষিক সুপ্ততাপের (Specific latent heat of Vaporization) সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া হয় :

তাপমাত্রা স্ফুটনাঙ্কে স্থির রেখে 1kg ভরের কোনো পদার্থকে শুধুমাত্র তরল অবস্থা থেকে বায়বীয় অবস্থায় রূপান্তরিত করতে যে তাপের প্রয়োজন হয় তাকে বাষ্পীভবনের আপেক্ষিক সুপ্ততাপ বলে।

বাষ্পীভবনের আপেক্ষিক সুপ্ততাপকে l_v দ্বারা সূচিত করা হয়। তাপমাত্রার পরিবর্তন না ঘটিয়ে m kg ভরের কোনো তরল পদার্থকে বায়বীয় অবস্থায় রূপান্তরিত করতে ΔQ তাপের প্রয়োজন হলে, $l_v = \frac{\Delta Q}{m}$

একক : তাপের একককে ভরের একক দিয়ে ভাগ করলে বাষ্পীভবনের আপেক্ষিক সুপ্ততাপের একক পাওয়া যায়। বাষ্পীভবনের আপেক্ষিক সুপ্ততাপের একক $J\ kg^{-1}$ । 1 kg পানির তাপমাত্রা স্ফুটনাঙ্কে স্থির রেখে শুধুমাত্র বাষ্পে পরিণত করতে যত জুল তাপ শক্তির প্রয়োজন হয় তাকে পানির বাষ্পীভবনের আপেক্ষিক সুপ্ততাপ বলে। পানির বাষ্পীভবনের আপেক্ষিক সুপ্ততাপ 2268000 $J\ kg^{-1}$ বলতে বুঝায় 100°C তাপমাত্রার 1kg পানিকে 100°C

তাপমাত্রার জলীয় বাষ্পে পরিণত করতে 2268000 J তাপের প্রয়োজন হয়। পক্ষান্তরে, 100°C তাপমাত্রার 1kg জলীয় বাষ্প 100°C তাপমাত্রার পানিতে পরিণত হওয়ার জন্য 2268000 J তাপ বর্জন করে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। তাপের একক কী?

ক. ক্যালরি খ. ওয়াট

গ. জুল ঘ. কেলভিন

২। ট্রেন যাওয়ার ফলে রেল লাইন গরম হয় কারণ–

i. যান্ত্রিক শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়

ii. গতিশক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়

iii. রেলের অণুসমূহের গতি বৃদ্ধি পায়

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i খ. ii

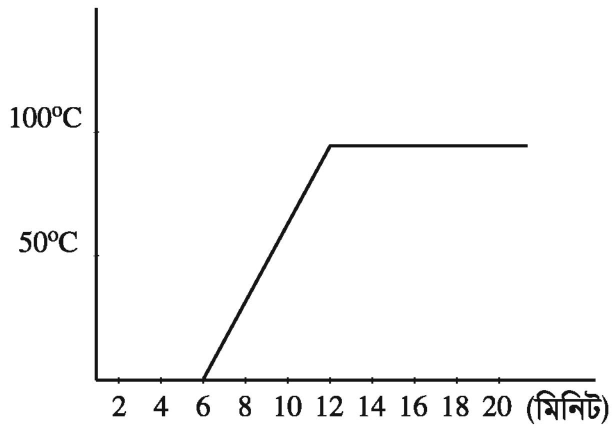
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

৩। 30^0C তাপমাত্রায় একটি ইস্পাত বিমের দৈর্ঘ্য 40 m হলে 100^0c তাপমাত্রায় এর দৈর্ঘ্য কত হবে? ইস্পাতের দৈর্ঘ্য প্রসারণ–সহগ $11 \times 10^{-6} K^{-1}$

ক. 20.0154 m খ. 30.0154 m

গ. 40.0308 m ঘ. 35.0309 m

চিত্রের সাহায্যে ৪ এবং ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও



বরফ গলনের লেখ চিত্র

৪। সম্পূর্ণ বরফ গলতে কত সময় লেগেছিল?

ক. 2 মিনিট
খ. 4 মিনিট
গ. 6 মিনিট
ঘ. 8 মিনিট

৫। গলিত পানির তাপমাত্রা স্ফুটনাংকে পৌঁছাতে প্রয়োজনীয় সময় কত মিনিট

ক. 6
খ. 8
গ. 12
ঘ. 18

সৃজনশীল প্রশ্ন

শিমি গ্রামে বাস করে। তাদের গ্রামে বিদ্যুৎ না থাকায় সে হ্যারিকেনের আলোতে লেখাপড়া করে। একদিন পড়ার সময় সে পানি পান করছিল। হঠাৎ অসতর্কতাবশত কিছু পানি হ্যারিকেনের কাচের চিমনিতে লাগে এবং চিমনিটি ফেটে যায়। অতি উৎসাহী হয়ে সে একটি গরম লোহায় পানি ঢাললেন। দেখা গেল লোহা ফেটে যায়নি। শিমি তার বিজ্ঞান শিক্ষক বাবার কাছে এর কারণ জানতে চাইলে তিনি শিমিকে পদার্থের প্রসারণ সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ধারণা দিলেন। তিনি তাকে পানির ব্যতিক্রমী প্রসারণ সম্পর্কেও বোঝালেন।

ক. পদার্থের দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগের সংজ্ঞা দাও?

খ. চিমনি ফেটে যাওয়ার কারণ কী?

গ. চিমনি ফেটে গেলেও লোহার কিছু হয়নি কারণটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. পানির ব্রতিক্রমী প্রসারণ কীভাবে শীত প্রধান দেশগুলোতে জলজ জীব বৈচিত্র রক্ষায় ভূমিকা রাখে আলোচনা কর।

দশম অধ্যায়

ক্যালরিমিতি

CALORIMETRY

আমরা জানি তাপ একপ্রকার শক্তি। তাপের একক জুল। কিন্তু এককের আন্তর্জাতিক পদ্ধতি চালুর পূর্বে তাপের সবচেয়ে প্রচলিত একক ছিল ক্যালরি। তাই তাপ বিজ্ঞানের যে শাখায় তাপ পরিমাপ করা হয়, সেই শাখাকে ক্যালরিমিতি বলে। এ অধ্যায়ে আমরা কীভাবে তাপ পরিমাপ করা হয় এবং তাপের পরিমাপের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন রাশি সম্পর্কে ধারণা লাভ করব।

১০.১। তাপধারণ ক্ষমতা ও আপেক্ষিক তাপ
Heat Capacity and Specific Heat

কোনো বস্তুতে অন্তর্নিহিত তাপশক্তির পরিমাণ বস্তুটির ভর, উপাদান এবং তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে।

বস্তুর ভর : একই পদার্থের বিভিন্ন ভরের বস্তুর তাপমাত্রা সমপরিমাণ বৃদ্ধি করতে বিভিন্ন পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়। এক কাপ পানি গরম করতে যে তাপশক্তির প্রয়োজন হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি তাপশক্তির প্রয়োজন হয় এক কেতলি পানি গরম করতে।

বস্তুর উপাদান : সমভরের বিভিন্ন উপাদানের বস্তুর সমপরিমাণ তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় তাপের পরিমাণ ভিন্ন হয়। এক কিলোগ্রাম অ্যালুমিনিয়ামের তাপমাত্রা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি করতে যে তাপের প্রয়োজন হয়, এক কিলোগ্রাম পানির তাপমাত্রা ঐ একই পরিমাণ বাড়াতে প্রায় পাঁচগুণ বেশি তাপের দরকার হয়।

তাপমাত্রা বৃদ্ধি : একই বস্তুর (ভর ও উপাদান একই) বিভিন্ন পরিমাণ তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়। কোনো একটি বস্তুর তাপমাত্রা 1 K (1°C) বাড়াতে যে তাপ লাগে, তার তাপমাত্রা 10 K (10°C) বাড়াতে দশগুণ বেশি তাপের প্রয়োজন হয়।

এ থেকে দেখা যায় যে কোনো বস্তুর তাপ ধারণ করার ক্ষমতা বস্তুর ভর, উপাদান এবং তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে। বিভিন্ন বস্তুর তাপ ধারণ ক্ষমতা তাই বিভিন্ন।

ক. তাপ ধারণ ক্ষমতা (Heat Capacity) :

কোনো বস্তুর তাপমাত্রা 1 K বাড়াতে যে তাপের প্রয়োজন হয় তাকে ঐ বস্তুর তাপধারণ ক্ষমতা বলে। একে C দিয়ে প্রকাশ করা হয়। কোনো বস্তুর তাপমাত্রা $\Delta\theta$ K বাড়াতে যদি Q পরিমাণ তাপ লাগে, তবে তাপমাত্রা 1 K বাড়াতে $\frac{Q}{\Delta\theta}$ পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়। সুতরাং, তাপধারণ ক্ষমতা

$$C = \frac{Q}{\Delta\theta}$$

একক : তাপের একককে তাপমাত্রার একক দিয়ে ভাগ করলে তাপধারণ ক্ষমতার একক পাওয়া যায়। সুতরাং, তাপধারণ ক্ষমতার একক জুল/কেলভিন (J/K) বা JK^{-1}

কোনো বস্তুর তাপধারণ ক্ষমতা 5000 JK^{-1} বলতে বুঝায় ঐ বস্তুর তাপমাত্রা 1K বাড়াতে 5000 জুল তাপের প্রয়োজন হয়।

খ. আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতা বা আপেক্ষিক তাপ (Specific Heat Capacity or Specific Heat) :

কোনো বস্তুর 1kg ভরের তাপমাত্রা 1 K বাড়াতে যে তাপের প্রয়োজন হয় তাকে ঐ বস্তুর উপাদানের আপেক্ষিক তাপ বলে। আপেক্ষিক তাপকে C বা S দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

m kg ভরের কোনো বস্তুর তাপমাত্রা $\Delta\theta$ K বাড়াতে যদি Q পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়, তবে 1kg ভরের বস্তুর তাপমাত্রা 1K পরিমাণ বাড়াতে $Q/m\,\Delta\theta$ তাপের প্রয়োজন হয়। সুতরাং আপেক্ষিক তাপ

$$S = \frac{Q}{m\,\Delta\theta}$$

একক : তাপের একককে ভরের একক এবং তাপমাত্রার একক দিয়ে ভাগ করলে আপেক্ষিক তাপের একক পাওয়া যায়। সুতরাং আপেক্ষিক তাপের একক জুল/কিলোগ্রাম – কেলভিন (J/kg-K) বা $J\ kg^{-1}K^{-1}$। লোহার আপেক্ষিক তাপ 460 $Jkg^{-1}K^{-1}$ বলতে বুঝায় 1kg লোহার তাপমাত্রা 1K বাড়াতে 460 J তাপের প্রয়োজন হয়।

কয়েকটি পদার্থের আপেক্ষিক তাপ

পদার্থ	আঃ তাপ $J\ kg^{-1}K^{-1}$	পদার্থ	আঃ তাপ $Jkg^{-1}K^{-1}$
কঠিন পদার্থ		**তরল পদার্থ**	
অ্যালুমিনিয়াম	900	পানি	4200
টিন	210	পারদ	140
তামা	400	গ্লিসারিন	2350
রুপা	230	তারপিন তেল	1800
লোহা	460	বেনজিন	1700
সীসা	130	**বায়বীয় পদার্থ**	
পিতল	380	জলীয় বাষপ	2000
কাচ	670	অক্সিজেন	910
বরফ	2100	বাতাস	1050
দস্তা	380		
মানব দেহ	3470		

পানির উচ্চ আপেক্ষিক তাপের গুরুত্ব :

অন্যান্য পদার্থের তুলনায় পানির আপেক্ষিক তাপ 4200 $Jkg^{-1}K^{-1}$ অনেক বেশি । মাটির আপেক্ষিক তাপ প্রায় 800 $Jkg^{-1}K^{-1}$। নির্দিষ্ট পরিমাণ মাটির তাপমাত্রা 1K বাড়াতে যে তাপের প্রয়োজন হয়, সমপরিমাণ পানির তাপমাত্রা 1K বাড়াতে তার পাঁচগুণের চেয়েও বেশি তাপের প্রয়োজন হয়। আবার 1K তাপমাত্রা কমানোর জন্য মাটির চেয়ে পানিকে অনেক বেশি তাপ বর্জন করতে হয়। এর ফলে স্থলভাগের চেয়ে সামুদ্রিক অঞ্চলের তাপমাত্রা অনেক ধীরে ধীরে বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়। যেহেতু দ্বীপগুলো পানি দ্বারা বেষ্টিত থাকে, তাই ঋতু পরিবর্তনে স্থলভাগের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের তাপমাত্রার পরিবর্তনের তুলনায় দ্বীপ অঞ্চলের তাপমাত্রার পরিবর্তন অনেক কম হয়। এই কারণে শীত ও গ্রীষ্মে মধ্য এশিয়ায় তাপমাত্রার যত পার্থক্য হয়, দ্বীপ অঞ্চলে তাপমাত্রার পার্থক্য তত হয় না।

পানির উচ্চ আপেক্ষিক তাপের কারণেই গাড়ির ইঞ্জিন ঠান্ডা রাখার জন্য পানি ব্যবহৃত হয়।

আপেক্ষিক তাপ ও তাপধারণ ক্ষমতার সম্পর্ক :

কোনো বস্তুর তাপমাত্রা 1K বাড়াতে যে তাপের প্রয়োজন হয় তাকে ঐ বস্তুর তাপধারণ ক্ষমতা বলে। কোনো বস্তুর ভর m kg এবং তার উপাদানের আপেক্ষিক তাপ S হলে, আপেক্ষিক তাপের সংজ্ঞানুসারে 1kg ভরের বস্তুর তাপমাত্রা 1K বাড়াতে S জুল তাপের প্রয়োজন।

$\therefore$ m kg বস্তুর তাপমাত্রা 1K বাড়াতে mS জুল তাপ প্রয়োজন। কিন্তু সংজ্ঞানুসারে এটিই তাপধারণ ক্ষমতা, C

$\therefore C = mS$ জুল

বা তাপধারণ ক্ষমতা=ভর × আপেক্ষিক তাপ

বা আপেক্ষিক তাপ= $\frac{\text{তাপধারণ ক্ষমতা}}{\text{ভর}}$

সুতরাং, বস্তুর প্রতি একক ভরের তাপধারণ ক্ষমতাকে বস্তুর উপাদানের আপেক্ষিক তাপ বলে।

তাপধারণ ক্ষমতা ও আপেক্ষিক তাপের পার্থক্য

তাপধারণ ক্ষমতা	আপেক্ষিক তাপ
১. কোনো বস্তুর তাপমাত্রা 1K বাড়াতে যে তাপ লাগে তাকে ঐ বস্তুর তাপধারণ ক্ষমতা বলে।	১. কোনো বস্তুর 1 kg ভরের তাপমাত্রা 1K পরিমাণ বাড়াতে যে তাপ লাগে তাকে ঐ বস্তুর উপাদানের আপেক্ষিক তাপ বলে।
২. তাপধারণ ক্ষমতার একক $J\,K^{-1}$	২. আপেক্ষিক তাপের একক $J\,kg^{-1}K^{-1}$
৩. তাপধারণ ক্ষমতা হল বস্তুর একটি বৈশিষ্ট্য। একই উপাদানে তৈরি বিভিন্ন ভরের বস্তুর তাপধারণ ক্ষমতা বিভিন্ন।	৩. আপেক্ষিক তাপ হল বস্তুর উপাদানের বৈশিষ্ট্য। একই উপাদানের সকল বস্তুর আপেক্ষিক তাপ একই।

১০.২। ক্যালরিমিতির মূলনীতি
Fundamental Principle of Calorimetry

আমরা জানি ভিন্ন তাপমাত্রার একাধিক বস্তুকে তাপীয় সংস্পর্শে আনা হলে তাদের মধ্যে তাপের আদান-প্রদান ঘটে। বেশি তাপমাত্রার বস্তুগুলো তাপ হারায় এবং কম তাপমাত্রার বস্তুগুলো তাপ গ্রহণ করে। তাপের এ গ্রহণ বা বর্জন কিন্তু বস্তুগুলোর তাপের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে না, এদের তুলনামূলক তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে। বস্তুগুলোর তাপমাত্রা সমান না হওয়া পর্যন্ত তাপ উচ্চ তাপমাত্রার বস্তু থেকে নিম্ন তাপমাত্রার বস্তুতে প্রবাহিত হয়। শক্তির সংরক্ষণশীলতা সূত্র অনুসারে বেশি তাপমাত্রার বস্তুগুলো যে তাপ হারায় কম তাপমাত্রার বস্তুগুলো সেই তাপ গ্রহণ করে। এ থেকে আমরা তাপ পরিমাপের তথা ক্যালরিমিতির মূলনীতি পাই– যদি একাধিক বস্তুর মধ্যে তাদের বাইরের অন্য কোথাও থেকে তাপ এদের ভিতর না আসে কিংবা এদের ভিতর থেকে কোনো তাপ বাইরে না যায়, কিংবা তাদের মধ্যে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া না ঘটে, তাহলে শক্তির সংরক্ষণশীলতা সূত্র থেকে আমরা পাই, গৃহীত তাপ = বর্জিত তাপ।

১০.৩। তাপের পরিমাণ
Quantity of Heat

আমরা জানি, কোনো বস্তুতে যদি তাপ প্রয়োগ করা হয়, তবে তার তাপমাত্রা বাড়ে আর যদি তাপ অপসারণ করা হয়, তবে এর তাপমাত্রা কমে। বস্তু কর্তৃক গৃহীত বা বর্জিত তাপের পরিমাণ নির্ভর করে বস্তুর ভর, এর উপাদানের আপেক্ষিক তাপ এবং তাপমাত্রার পার্থক্যের ওপর।

কোনো বস্তুর ভর যদি m kg, এর উপাদানের আপেক্ষিক তাপ $S\ Jkg^{-1}\ K^{-1}$, তাপমাত্রার পার্থক্য $\Delta\theta K$ $(\Delta\theta°C)$ হয়, তাহলে গৃহীত বা বর্জিত তাপের পরিমাণ Q হিসাব করা হয় এইভাবে,

1 kg ভরের বস্তুর তাপমাত্রা 1 K বাড়াতে বা কমাতে গৃহীত বা বর্জিত তাপ S জুল

m kg ভরের বস্তুর তাপমাত্রা 1 K বাড়াতে বা কমাতে গৃহীত বা বর্জিত তাপ mS জুল

m kg ভরের বস্তুর তাপমাত্রা $\Delta\theta$ K বাড়াতে বা কমাতে গৃহীত তাপ বা বর্জিত তাপ $mS\Delta\theta$ জুল।

সুতরাং $Q=mS\Delta\theta$ জুল।

অর্থাৎ, গৃহীত বা বর্জিত তাপ = ভর × আপেক্ষিক তাপ × তাপমাত্রার পার্থক্য।

উদাহরণ ১০.১। একটি তামার ক্যালরিমিটারে ভর 200g এবং এর উপাদানের আপেক্ষিক তাপ $400\ J\ kg^{-1}K^{-1}$। এর তাপমাত্রা 20°C থেকে 70°C–এ ওঠাতে কত তাপের প্রয়োজন হবে?

সমাধান :

আমরা জানি

$Q = mS\Delta\theta$

$= 0.2\ kg \times 400\ J\ kg^{-1}K^{-1} \times 50K$

$= 4000\ J$

উ: 4000 J

এখানে,

ক্যালরিমিটারের ভর, $m = 200g = 0.2kg$

আপেক্ষিক তাপ, $S = 400\ J\ kg^{-1}K^{-1}$

তাপমাত্রা বৃদ্ধি, $\Delta\theta = (70 - 20)°C = 50°C = 50K$

প্রয়োজনীয় তাপ, $Q = ?$

উদাহরণ ১০.২। 100 g ভর বিশিষ্ট অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রের তাপমাত্রা 20°C বাড়াতে 1800 J তাপ লাগে। অ্যালুমিনিয়ামের আপেক্ষিক তাপ বের করে।

সমাধান,

আমরা জানি,

$Q = mS\ \Delta\theta$

$S = \frac{Q}{m\Delta\theta}$

$= \frac{1800J}{0.1kg \times 20K}$

$= 900\ J\ kg^{-1}K^{-1}$

উ: $900\ J\ kg^{-1}K^{-1}$

এখানে,

ভর, $m = 100g = 0.1kg$

তাপমাত্রা বৃদ্ধি $\Delta\theta = 20°C = 20K$

গৃহীত তাপ, $Q = 1800\ J$

অ্যালুমিনিয়ামের আপেক্ষিক তাপ, $S = ?$

উদাহরণ ১০.৩। 120°C তাপমাত্রার 50g ভরের একটি বস্তুকে 50g ভরের একটি অ্যালুমিনিয়ামের ক্যালরিমিটারে 20°C তাপমাত্রার 150g পানির মধ্যে নিক্ষেপ করা হলে মিশ্রনের তাপমাত্রা 30°C পাওয়া গেল। বস্তুটির উপাদানের আপেক্ষিক তাপ নির্ণয় কর। অ্যালুমিনিয়ামের আপেক্ষিক তাপ $900\ J\ kg^{-1}K^{-1}$

সমাধান :

ধরা যাক, বস্তুর উপাদানের

আপেক্ষিক তাপ, S

এখানে বস্তু তাপ বর্জন করে আর ক্যালরিমিটার ও এর মধ্যস্থিত পানি তাপ গ্রহণ করে।

যেহেতু গৃহীত বা বর্জিত তাপ

= ভর × আঃ তাপ × তাপমাত্রার পার্থক্য

∴ বস্তুর বর্জিত তাপ,

$Q_1 = 0.05 \times S \times 90\ J$

ক্যালরিমিটারের গৃহীত তাপ $Q_2 = 0.05 \times 900 \times 10\ J$

পানির গৃহীত তাপ, $Q_3 = 0.15 \times 4200 \times 10\ J$

আমরা জানি, বর্জিত তাপ=গৃহীত তাপ

এখানে

বস্তুর ভর = $50g = 0.05kg$

বস্তুর তাপমাত্রা হ্রাস = $(120 - 30)°C = 90°C = 90K$

ক্যালরিমিটারের ভর $= 50g = 0.05kg$

ক্যালরিমিটারের তাপমাত্রা বৃদ্ধি $= (30 - 20)^0C$
$= 10°C = 10K$

পানির ভর $= 150g = 0.15kg$

পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি = $(30 - 20)^0C = 10^0C = 10K$

ক্যালরিমিটারের আঃ তাপ = $900\ J\ kg^{-1}K^{-1}$

পানির আঃ তাপ = $4200\ J\ kg^{-1}K^{-1}$

$Q_1 = Q_2 + Q_3$

$0.05 \times S \times 90 = 0.05 \times 900 \times 10 + 0.15 \times 4200 \times 10$

বা $4.5S = 6750$

$S = 1500\ J\ kg^{-1}K^{-1}$

উ: $1500\ J\ kg^{-1}K^{-1}$

উদাহরণ ১০.৪। 70°C তাপমাত্রার 100g পানিকে 10°C তাপমাত্রার 200g পানির সাথে ভালভাবে মিশ্রিত করলে চূড়ান্ত তাপমাত্রা কত হবে?

সমাধান :

ধরা যাক, চূড়ান্ত তাপমাত্রা θ^0C

এখানে গরম পানি তাপ বর্জন করে আর ঠান্ডা পানি তাপ গ্রহণ করে।

যেহেতু গৃহীত বা বর্জিত তাপ = ভর × আঃ তাপ × তাপমাত্রার পার্থক্য

গরম পানির বর্জিত তাপ, $Q_1 = 0.1 \times 4200 \times (70 - \theta)$

ঠান্ডা পানির গৃহীত তাপ, $Q_2 = 0.2 \times 4200 \times (\theta - 10)$ J

এখানে,

গরম পানির ভর = 100g = 0.1kg

ঠান্ডা পানির ভর=200g = 0.2 kg

গরম পানির তাপমাত্রা হ্রাস = $(70 - \theta°C) = (70 - \theta)K$

ঠান্ডা পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি = $(\theta - 10)^0C = (\theta - 10)K$

পানির আঃ তাপ = $4200\ J\ kg^{-1}K^{-1}$

আমরা জানি, বর্জিত তাপ=গৃহীত তাপ

বা, $Q_1 = Q_2$

বা, $0.1 \times 4200 \times (70 - \theta) = 0.2 \times 4200 \times (\theta - 10)$

বা, $7 - 0.1\theta = 0.2\theta - 2$

বা, $0.3\theta = 9$

$\theta = 30°C$

উ: 30°C

উদাহরণ ১০.৫। 30°C তাপমাত্রার এবং $840\ J\ kg^{-1}K^{-1}$ আপেক্ষিক তাপ বিশিষ্ট 1kg ভরের একটি বস্তুকে 100°C তাপমাত্রার 2kg ভরের পানির মধ্যে রাখা হল। মিশ্রনের তাপমাত্রা নির্ণয় কর।

সমাধান :

ধরা যাক, মিশ্রণের তাপমাত্রা θ^0C

এখানে বস্তু তাপ গ্রহণ করে আর পানি তাপ বর্জন করে।

যেহেতু গৃহীত বা বর্জিত তাপ=ভর × আ: তাপ × তাপমাত্রার পার্থক্য

$\therefore$ বস্তুর গৃহীত তাপ, $Q_1 = 1 \times 840 \times (\theta - 30)$ J

পানির বর্জিত তাপ, $Q_2 = 2 \times 4200 \times (100 - \theta)$ J

আমরা জানি, গৃহীত তাপ = বর্জিত তাপ

$1 \times 840 \times (\theta - 30) = 2 \times 4200 \times (100 - \theta)$

বা $840\theta - 25200 = 840000 - 8400\theta$

বা $9240\theta = 865200$

$\therefore \theta = 93.64°C$

এখানে,

বস্তুর ভর = 1kg

বস্তুর তাপমাত্রা বৃদ্ধি = $(\theta - 30)°C = (\theta - 30)K$

বস্তুর আঃ তাপ, = $840\ J\ kg^{-1}K^{-1}$

পানির ভর = 2 kg

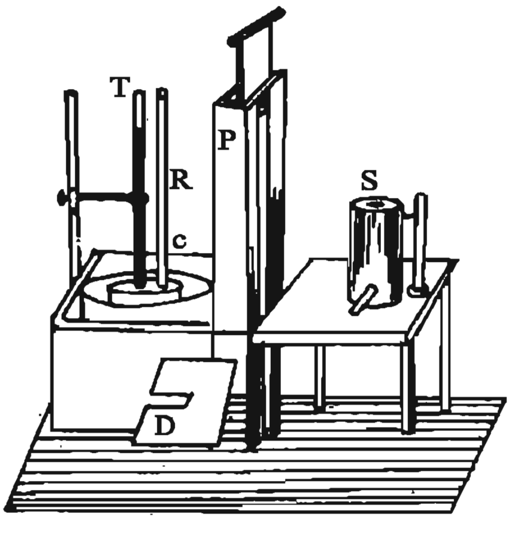
পানির তাপমাত্রা হ্রাস = $(100 - \theta)°C = (100 - \theta)K$

পানির আঃ তাপ = $4200\ J\ kg^{-1}K^{-1}$

উ: 93.64°C

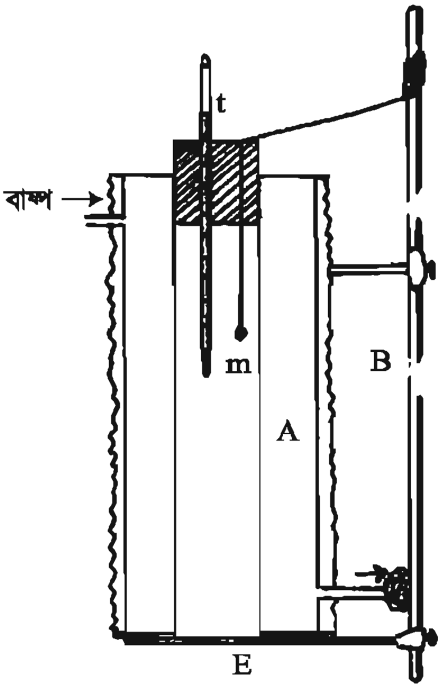
১০.৪। ক্যালরিমিটার
Calorimeter

যে যন্ত্রের সাহায্যে তাপ পরিমাপ করা হয়, তাকে ক্যালরিমিটার বলে। বিজ্ঞানী রেনো একটি উন্নত ধরনের ক্যালরিমিটার উদ্ভাবন করেন। একে রেনোর ক্যালরিমিটার বলা হয়। এর তিনটি প্রধান অংশ থাকে, ক্যালরিমিটার, গেট ও বাষ্প উত্তাপক। নিচে এর বিভিন্ন অংশগুলো বর্ণনা করা হল।



চিত্র : ১০.১

ক্যালরিমিটার : এ যন্ত্রের প্রধান অংশ হচ্ছে একটি চোঙাকৃতি পাত্র C, যাকে ক্যালরিমিটার বলে। সাধারণত পাত্রটি তামা দিয়ে তৈরি করা হয়। একটি বড় কাঠের বাক্সে অপরিবাহী বস্তুর উপর এটি বসানো হয়। ক্যালরিমিটারে একই পদার্থের তৈরি একটি নাড়ানি বা আলোড়ক R থাকে। স্ট্যান্ডের সাহায্যে একটি থার্মোমিটার T ঝুলানো হয় যা ক্যালরিমিটারে রাখা তরলের তাপমাত্রা মাপার জন্য এর মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। ক্যালরিমিটারের ঢাকনি D - এর মধ্যে থার্মোমিটার ও আলোড়ক প্রবেশ করানোর জন্য একটি ছিদ্র থাকে। ক্যালরিমিটারকে চারদিক বন্ধ একটি প্রকোষ্ঠে রাখা হয়।



চিত্র : ১০.২

গেট : ক্যালরিমিটার C এবং বাষ্প উত্তাপক S-এর মাঝে একটি গেট P থাকে। এটি ক্যালরিমিটার ও বাষ্প উত্তাপক–এর মাঝে দেয়াল হিসেবে কাজ করে। প্রয়োজনমত গেটটিকে উপরে তুলে ক্যালরিমিটারটিকে বাষ্প উত্তাপকের নিচে আনা হয়।

বাষ্প উত্তাপক : বাষ্প উত্তাপক S-এ কোনো ক্ষুদ্র বস্তুকে বাষ্পের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ ছাড়াই উত্তপ্ত করা যায়। ১০.২ চিত্রে এর একটি লম্বচ্ছেদ দেখানো হল। বাষ্প উত্তাপকে একই অক্ষবিশিষ্ট দুটি তামার ফাঁপা চোঙ A ও B থাকে। চোঙ দুটির মধ্যবর্তী বায়ুপূর্ণ স্থানের দুই মুখ বন্ধ এবং B চোঙের উপরের দিকে একটি আগম নল এবং নিচের দিকে একটি নির্গম নল লাগনো আছে। রাবার নল দিয়ে আগম নলটি একটি বয়লারের সাথে যুক্ত করা হয়।
বয়লার থেকে বাষ্প আগম নল দিয়ে চোঙ দুটির মধ্যবর্তী স্থানে প্রবেশ করে এবং নির্গম নল দিয়ে বের হয়ে যায়। A নলটির উপরের মুখ কর্ক দিয়ে বন্ধ করা থাকে এবং নিচের মুখে একটি ঢাকনি E থাকে যা ইচ্ছামত সরানো যায়। কর্কের মধ্যে একটি ছিদ্র দিয়ে সুতার সাহায্যে কঠিন বস্তু m–কে ঝুলিয়ে রাখা হয় এবং অন্য একটি ছিদ্র দিয়ে থার্মোমিটার t-কে প্রবেশ করানো হয়। ফলে বস্তুটি বাষ্পের সংস্পর্শে না এসেও পরোক্ষভাবে উত্তপ্ত হয়।

১০.৫। কঠিন পদার্থের আপেক্ষিক তাপ নির্ণয়
Determination of Specific Heat of Solid

কার্যপ্রণালি : প্রথমে রেনোর ক্যালরিমিটারটিকে পরিষ্কার ও শুষ্ক করে ওজন করে ভর নির্ণয় করা হয়। তারপর ক্যালরিমিটারের মধ্যে কিছু পরিমাণ তরল পদার্থ নেওয়া হয় যার আপেক্ষিক তাপ জানা এবং যাতে কঠিন পদার্থটি অদ্রবণীয় এবং রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয়। পুনরায় ক্যালরিমিটারকে ওজন করা হয়। এই দুই ওজনের পার্থক্য থেকে তরল পদার্থের ভর নির্ণয় করা হয়। এখন ক্যালরিমিটারকে কাঠের বাক্সে রেখে থার্মোমিটারের সাহায্যে তরল তথা ক্যালরিমিটারের তাপমাত্রা নির্ণয় করা হয়।

এখন যে পদার্থের আপেক্ষিক তাপ নির্ণয় করতে হবে তার সুবিধাজনক আকৃতির একটি খণ্ড নিয়ে ওজন করে ভর নির্ণয় করা হয়। তারপর এ খণ্ডটিকে একটি সুতার সাহায্যে বাষ্প উত্তাপকের মধ্যে ঝুলিয়ে গরম করা হয়। কঠিন পদার্থটির তাপমাত্রা সর্বাধিক হয়ে স্থির হলে থার্মোমিটারের সাহায্যে তা নির্ণয় করা হয়। এবার ক্যালরিমিটারটিকে বাষ্প উত্তাপকের নিচে এনে সুতা কেটে গরম কঠিন পদার্থটিকে তরলের মধ্যে ফেলা হয়। গরম কঠিন পদার্থ তাপ হারাবে এবং ক্যালরিমিটার ও তরল পদার্থ তাপ গ্রহণ করবে। ক্যালরিমিটারটিকে নাড়ানি দিয়ে ভালভাবে নেড়ে মিশ্রণের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থার্মোমিটারের সাহায্যে নির্ণয় করা হয়।

হিসাব : ধরা যাক,
ক্যালরিমিটারের ভর = m_c kg
তরল পদার্থের ভর = m_1 kg
কঠিন পদার্থের ভর = m_s kg
ক্যালরিমিটারের উপাদানের আপেক্ষিক তাপ = $S_C J\ kg^{-1}K^{-1}$
তরল পদার্থের আপেক্ষিক তাপ = $S_1\ Jkg^{-1}K^{-1}$
কঠিন পদার্থের আপেক্ষিক তাপ $S_s = ?$
ক্যালরিমিটার ও তরল পদার্থের প্রাথমিক তাপমাত্রা = θ_1°C
গরম কঠিন পদার্থের তাপমাত্রা = θ_2°C
মিশ্রণের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা = θ_m°C
এ পরীক্ষায় ক্যালরিমিটার ও তরল পদার্থের তাপমাত্রা θ_1°C থেকে θ_m°C–এ ওঠতে তাপ গ্রহণ করে।
ক্যালরিমিটারের তাপমাত্রা $(\theta_m-\theta_1)$°C = $(\theta_m - \theta_1)$K বৃদ্ধিতে এর গৃহীত তাপ $Q_1 = m_cS_c(\theta_m - \theta_1)$ J
তরল পদার্থের তাপমাত্রা $(\theta_m - \theta_1)$°C = $(\theta_m - \theta_1)$K বৃদ্ধিতে এর গৃহীত তাপ $Q_2 = m_1s_1(\theta_m-\theta_1)$ J
কঠিন পদার্থটির তাপমাত্রা θ_2°C থেকে θ_m°C এ নেমে আসতে অর্থাৎ, $(\theta_2 - \theta_m)$°C= $(\theta_2 - \theta_m)$K তাপমাত্রা হ্রাসের জন্য বর্জিত তাপ

$$Q_3 = m_s s_s(\theta_2 - \theta_m)J$$

অন্য উপায়ে তাপের আদান প্রদান না হওয়ায় ক্যালরিমিতির মূলনীতি থেকে আমরা পাই, বর্জিত তাপ=গৃহীত তাপ

$$Q_3 = Q_1 + Q_2$$

$$m_s s_s(\theta_2 - \theta_m) = m_cS_c(\theta_m-\theta_1) + m_1s_1(\theta_m-\theta_1)$$

বা, $m_s s_s(\theta_2 - \theta_m) = (m_cS_c + m_1S_1)(\theta_m-\theta_1)$

বা, $S_s = \dfrac{(m_cS_c + m_1S_1)(\theta_m-\theta_1)}{m_s(\theta_2-\theta_m)}\ J\ kg^{-1}K^{-1}$

১০.৬। বরফ গলনের আপেক্ষিক সুপ্ত তাপ নির্ণয়
Determination of Specific Latent Heat of Ice

কার্যপ্রণালি : একটি শুষ্ক ও পরিষ্কার ক্যালরিমিটার নিয়ে নাড়ানির সাথে সরু তারের জাল সংযুক্ত করা হয়। এরপর একে ওজন করে এর ভর নির্ণয় করা হয়। ক্যালরিমিটারের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সামান্য গরম পানি দিয়ে পূর্ণ করে

আবার ওজন নেওয়া হয়। এই দুই ওজনের পার্থক্য থেকে গরম পানির ভর পাওয়া যায়। একটি সুবেদী থার্মোমিটারের সহায্যে গরম পানির তাপমাত্রা নির্ণয় করা হয়। এখন কয়েক টুকরা বরফকে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে চোষ কাগজ দিয়ে শুকিয়ে নিয়ে চোষ কাগজ দিয়ে ধরে পানিতে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়া হয়। নাড়ানির জালের নিচে বরফ টুকরোগুলোকে রেখে আস্তে আস্তে নাড়ানো হয়। এই অবস্থায় বরফ গলতে থাকে এবং পানির তাপমাত্রা ক্রমশ কমতে থাকে। সম্পূর্ণ বরফ গলে যাওয়ার পর মিশ্রণের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সুবেদি থার্মোমিটারের সাহায্যে মাপা হয়। এরপর পানির তাপমাত্রা কক্ষ তাপমাত্রায় পৌঁছলে পুনরায় ক্যালরিমিটারের ওজন নেওয়া হয়। তৃতীয় ওজন থেকে দ্বিতীয় ওজন বাদ দিয়ে বরফের ভর নির্ণয় করা হয়।

হিসাব : ধরা যাক,
ক্যালরিমিটারের ভর = $m_c$kg
গরম পানির ভর = $m_w$kg
বরফের ভর = $m_i$kg
ক্যালরিমিটারের উপাদানের আপেক্ষিক তাপ = S_cJ $kg^{-1}K^{-1}$
পানির আপেক্ষিক তাপ =S_wJ $kg^{-1}K^{-1}$
ক্যালরিমিটার ও গরম পানির তাপমাত্রা = θ_1°C
মিশ্রণের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা =θ_m°C
বরফ গলনের সুপ্ত তাপ = l_f
এখানে ক্যালরিমিটার ও গরম পানি তাপ বর্জন করে আর বরফ তাপ গ্রহণ করে।

ক্যালরিমিটারের তাপমাত্রা θ_1°C থেকে θ_m°C এ নেমে আসতে অর্থাৎ, $(\theta_1 - \theta_m)^0C = (\theta_1 - \theta_m)K$ তাপমাত্রা হ্রাসের জন্য বর্জিত তাপ $Q_1= m_cS_c(\theta_1 - \theta_m)$। গরম পানির তাপমাত্রা θ_1°C থেকে θ_m°C-এ নেমে আসতে অর্থাৎ, $(\theta_1 - \theta_m)$°C = $(\theta_1 - \theta_m)$K তাপমাত্রার হ্রাসের জন্য বর্জিত তাপ

$Q_2 = m_wS_w(\theta_1 - \theta_m)$ J।

তাপ গ্রহণ দুই পর্যায়ে সম্পন্ন হয় : (ক) প্রথমত, 0°C তাপমাত্রার বরফ গলে 0°C তাপমাত্রার পানিতে পরিণত হতে সুপ্ততাপ গ্রহণ করে, (খ) দ্বিতীয়ত, বরফ গলা পানির তাপমাত্রা 0°C থেকে θ_m°C–এ পৌঁছতে তাপ গ্রহণ করে। 0°C তাপমাত্রার $m_i$kg বরফ 0°C তাপমাত্রার পানিতে পরিণত হতে, বরফ কর্তৃক গৃহীত তাপ $Q_3= m_il_f$

0°C তাপমাত্রার $m_i$kg বরফ গলা পানির তাপমাত্রা θ_m°C এ পৌঁছতে অর্থাৎ, এর তাপমাত্রা $(\theta_m - 0)^0C = \theta_mK$ বৃদ্ধিতে গৃহীত তাপ

$Q_4 = m_iS_w\theta_m$

অন্য কোনো উপায়ে তাপের আদান প্রদান না হওয়ায়

গৃহীত তাপ = বর্জিত তাপ

অর্থাৎ, $Q_3 + Q_4 = Q_1 + Q_2$

$m_il_f + m_is_w\theta_m = m_cs_c(\theta_1 - \theta_m) + m_ws_w(\theta_1 - \theta_m)$

$m_il_f = (m_cs_c + m_ws_w)(\theta_1 - \theta_m) - m_is_w\theta_m$

$$l_f=\left\{ \frac{(m_cs_c + m_ws_w)(\theta_1 - \theta_m)}{m_i} - s_w\theta_m \right\} Jkg^{-1}$$

উদাহরণ ১০–৬। 20°C তাপমাত্রার 0.1kg টিনকে গলাতে প্রয়োজনীয় তাপ নির্ণয় কর। টিনের আঃ তাপ 210 $Jkg^{-1}K^{-1}$ টিনের গলনের আপেক্ষিক সুপ্ততাপ 58800 Jkg^{-1} এবং গলনাঙ্ক 232°C।

সমাধান :

এখানে, টিনকে গলাতে দুই পর্যায়ে তাপ প্রয়োগ করতে হবে; (১) টিনকে গলনাঙ্ক পর্যন্ত উত্তপ্ত করতে(২) গলনাঙ্ক টিনকে গলাতে।

(1) $20^\circ C$ তাপমাত্রার 0.1kg টিনকে $232^\circ C$ তাপমাত্রায় উন্নীত করতে প্রয়োজনীয় তাপ,

Q_1 = ভর × আঃ তাপ × তাপমাত্রার পার্থক্য

$= 0.1 kg \times 210\ Jkg^{-1}K^{-1}(232 - 20)K$

$= 4452\ J$

(2) $232^\circ C$ তাপমাত্রায় 0.1kg টিনকে গলাতে প্রয়োজনীয় তাপ,

Q_2 = ভর × আপেক্ষিক সুপ্ত তাপ

$= 0.1kg \times 58800\ Jkg^{-1}$

$= 5880\ J$

∴ মোট তাপ, $Q = Q_1 + Q_2$

$= 4452\ J + 5880\ J$

$= 10332\ J$

উ: 10332 J

উদাহরণ ১০.৭। 5kg বরফ গলিয়ে $50^\circ C$ তাপমাত্রার পানিতে পরিণত করতে প্রয়োজনীয় তাপ নির্ণয় কর। বরফ গলনের আপেক্ষিক সুপ্ত তাপ $336000\ Jkg^{-1}$।

সমাধান :

এখানে দুই পর্যায়ে তাপ প্রযুক্ত হয়। (১) গলনাঙ্কে বরফকে গলাতে (২) বরফ গলা পানির তাপমাত্রা 50^0C - এ উন্নীত করতে।

(1) $0^\circ C$ তাপমাত্রার 5kg বরফকে $0^\circ C$ পানিতে পরিণত করতে প্রয়োজনীয় তাপ, Q_1 = ভর × গলনের আপেক্ষিক সুপ্ত তাপ = $5kg \times 336000\ Jkg^{-1} = 1680000\ J$

(2) $0^\circ C$ তাপমাত্রার 5kg পানিকে $50^\circ C$ তাপমাত্রার পানিতে পরিণত করতে প্রয়োজনীয় তাপ,

Q_2 = ভর × আঃ তাপ × তাপমাত্রার পার্থক্য

$= 5kg \times 4200\ Jkg^{-1}K^{-1}(50 - 0)K$

$= 1050000\ J$

∴ মোট তাপ, $Q = Q_1 + Q_2$

$= 1680000\ J + 1050000\ J = 2730000\ J$

উ: 2730000 J

উদাহরণ ১০.৮। $-20^\circ C$ তাপমাত্রা 0.1kg বরফকে $100^\circ C$ তাপমাত্রার জলীয় বাষ্পে পরিণত করতে প্রয়োজনীয় তাপের পরিমাণ নির্ণয় কর। বরফের আপেক্ষিক তাপ $2100\ J\ kg^{-1}K^{-1}$ বরফ গলনের আপেক্ষিক সুপ্ত তাপ $336000 J\ kg^{-1}$ এবং পানির বাষ্পীভবনের আপেক্ষিক সুপ্ততাপ $2268000\ Jkg^{-1}$

সমাধান :

এখানে তাপ গ্রহণ চার পর্যায়ে সম্পন্ন হয়

(1) $-20^\circ C$ - এর 0.1kg বরফকে $0^\circ C$ এর বরফে পরিণত করতে প্রয়োজনীয় তাপ,

Q_1 = ভর × আঃ তাপ × তাপমাত্রার পার্থক্য

$= 0.1kg \times 2100\ Jkg^{-1}K^{-1}[0 - (-20)]K$

$= 4200\ J$

(2) $0^{\circ}C$ –এর 0.1kg বরফকে $0^{\circ}C$–এর পানিতে পরিণত করতে প্রয়োজনীয় তাপ

Q_2 = ভর × গলনের আপেক্ষিক সুপ্ত তাপ

= 0.1kg × 336000 Jkg^{-1}

=33600J

(3) $0^{\circ}C$ –এর বরফ গলা 0.1kg পানিকে $100^{\circ}C$–এর পানিতে পরিণত করতে প্রয়োজনীয় তাপ,

Q_3 = ভর × আ. তাপ × তাপমাত্রার পার্থক্য

= 0.1kg × 4200 J $kg^{-1}K^{-1}$(100 – 0)K

= 42000 J

(4) $100^{\circ}C$ এর 0.1kg পানিকে $100^{0}C$-এর জলীয় বাষ্পে পরিণত করতে প্রয়োজনীয় তাপ,

Q_4 = ভর × বাষ্পীভবনের আপেক্ষিক সুপ্ত তাপ

= 0.1kg × 2268000 Jkg^{-1}

= 226800 J

সুতরাং, মোট তাপ, $Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4$

= 4200 J + 33600 J + 42000 J + 226800 J

= 306600 J

উ : 306600 J

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। তাপ Q এবং আপেক্ষিক তাপ S হলে তাপ এবং আপেক্ষিক তাপের সম্পর্ক কোনটি?

ক. $S = \frac{Qm}{\Delta\theta}$ খ. $Q = \frac{Sm}{\Delta\theta}$

গ. $S = \frac{Q}{m\Delta\theta}$ ঘ. $S = \frac{Q\Delta\theta}{m}$

২। দেওয়া আছে

i. 1kg অ্যালুমিনিয়ামের তাপমাত্রা 1K বৃদ্ধি করতে যে তাপ লাগে সমপরিমাণ তারপিন তেলের তাপমাত্রা 1K বৃদ্ধি করতে তার দ্বিগুণ তাপ লাগে

ii. কোনো বস্তুর তাপ ধারণ ক্ষমতা বস্তুর ভর, উপাদান এবং তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে

iii. তাপ ধারণ ক্ষমতার একক $Jkg^{-1}K^{-1}$

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

50 gm বস্তুর তাপমাত্রা 20^0C থেকে 100^0C এ উন্নীত করতে 1520 J তাপ প্রয়োগ করতে হয়।

উপরের তথ্য থেকে নিচের ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

৩। বস্তুর ভরের আন্তর্জাতিক এককে প্রকাশিত মান কত?

ক. 0.5 kg খ. 5×10^4 kg

গ. 5×10^{-2} kg ঘ. 0.005 kg

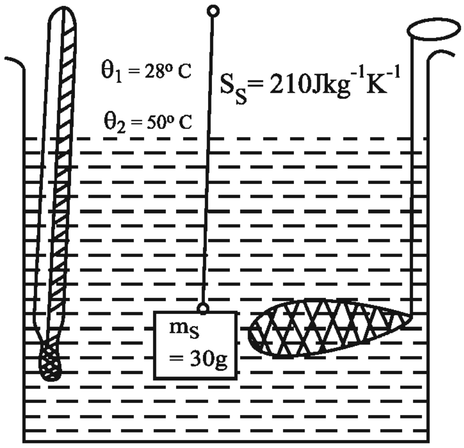
৪। বস্তুর আপেক্ষিক তাপ কত ?

ক. 308 J $kg^{-1}K^{-1}$ খ. 380 J $kg^{-1}K^{-1}$

গ. 308 J kg^{-1} ঘ. 380 J kg

সৃজনশীল প্রশ্ন

চিত্রে একটি কঠিন বস্তুর আপেক্ষিক তাপ S নির্ণয়ের একটি পরীক্ষা দেখানো হল। উত্তপ্ত অবস্থায় কঠিন বস্তুর তাপমাত্রা 50^0C এবং মিশ্রণের তাপমাত্রা 32^0C। চিত্র অনুসরণে নিচের প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও।



চিত্র

ক. আপেক্ষিক তাপ কাকে বলে?

খ. উপরের পরীক্ষাটির মূলনীতি ব্যাখ্যা কর।

গ. কঠিন বস্তুটি কী পরিমাণ তাপ হারাবে হিসাব কর।

ঘ. মূলনীতি অনুসরণ করে উপরের পরীক্ষার সাহায্যে কঠিন বস্তুটির আপেক্ষিক তাপ নির্ণয়ে কী কী সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন বলে তুমি মনে কর লেখ।

একাদশ অধ্যায়

তাপ সঞ্চালন

TRANSMISSION OF HEAT

তাপ বেশি তাপমাত্রা বিশিষ্ট স্থান থেকে কম তাপমাত্রা বিশিষ্ট স্থানের দিকে প্রবাহিত হয়। এই তাপ কীভাবে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সঞ্চালিত হয় আমরা এখন তা আলোচনা করব। তাপ তিন পদ্ধতিতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সঞ্চালিত হতে পারে; যথা পরিবহণ, পরিচলন ও বিকিরণ। এ অধ্যায়ে পদার্থের তাপ পরিবহণ ক্ষমতা তথা তাপধারকত্ব নিয়ে বিশদ আলোচনার পর আমরা তাপ সঞ্চালনের ঘটনার কয়েকটি উদাহরণ বিবেচনা করব। সবশেষে দৈনন্দিন জীবনে আমরা তাপ সঞ্চালনের নিয়ম কীভাবে প্রয়োগ করি তার কয়েকটি উদাহরণ দেব।

১১.১। পরিবহন
Conduction

একটি লোহার বা অন্য কোনো ধাতব দণ্ডের একপ্রান্ত আগুনে ধরলে একটু পরেই অপরপ্রান্ত গরম অনুভূত হয়। এখানে তাপ দণ্ডটির একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে কীভাবে এল? দণ্ডটির অণুগুলোই নিজ নিজ স্থানে থেকে তাপকে একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে সঞ্চালিত করেছে। এই পদ্ধতির নাম পরিবহণ।

যে পদ্ধতিতে পদার্থের অণুগুলো তাদের নিজস্ব স্থান পরিবর্তন না করে শুধু স্পন্দনের মাধ্যমে এক অণু তার পার্শ্ববর্তী অণুকে তাপ প্রদান করে পদার্থের উষ্ণতর অংশ থেকে শীতলতর অংশে তাপ সঞ্চালিত করে সেই পদ্ধতিকে পরিবহণ বলে।

তাপ পরিবহণের জন্য জড় মাধ্যমের প্রয়োজন। এ পদ্ধতিতে পদার্থের উষ্ণতর অণুগুলো তাপ গ্রহণ করে নিজের অবস্থানে থেকে স্পন্দিত হতে থাকে। এ স্পন্দনের মাধ্যমে উত্তপ্ত অণুগুলো পার্শ্ববর্তী শীতল অণুগুলোকে তাপ প্রদান করে, সেগুলো উত্তপ্ত হয়ে আবার তাদের পার্শ্ববর্তী অণুগুলোতে তাপ সঞ্চালিত করে। যে মাধ্যমের অণুগুলো যত বেশি সুদৃঢ় সেখানে পরিবহণ তত বেশি হয়ে থাকে। কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপের পরিবহণ সবচেয়ে বেশি হয়, তরলে তার চেয়ে কম, বায়বীয় পদার্থে অত্যন্ত কম এবং শূন্যস্থানের কোনো পরিবহণ হয় না।

একটি ধাতব দণ্ডের এক প্রান্ত আগুনে রেখে অন্য প্রান্ত হাতে ধরে রাখলে কিছুক্ষণ পরেই হাতে বেশ গরম বোধ হয়। দণ্ডের যে প্রান্ত আগুনের মধ্যে আছে সেই অংশের অণুগুলো আগুন থেকে তাপ গ্রহণ করে নিজের অবস্থানে থেকে স্পন্দিত হতে থাকে। এই স্পন্দনের মাধ্যমে উত্তপ্ত অণুগুলো পার্শ্ববর্তী শীতল অণুগুলোকে তাপ প্রদান করে। সেগুলো উত্তপ্ত হয়ে আবার পার্শ্ববর্তী অণুগুলোতে তাপ সঞ্চালিত করে। এভাবে তাপ দণ্ডের উষ্ণতর অংশ থেকে শীতলতর অংশে সঞ্চালিত হওয়ার পদ্ধতিই পরিবহণ।

১১.২। পরিচলন
Convection

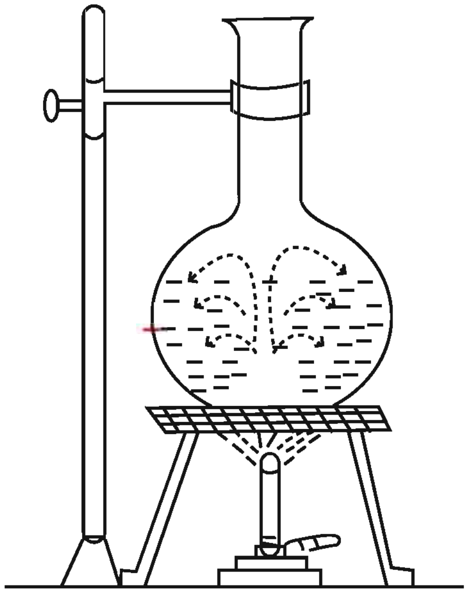
একটি পাত্রে পানি রেখে তার নিচে তাপ প্রয়োগ করলে কিছুক্ষণ পর উপরের পানি গরম হয়। এখানে পাত্রের নিচের পানির তাপ উপরে এল কীভাবে? একটু গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে পানির মধ্যে উপরে নিচে একটি স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে পানির অণুগুলোর চলাচল দ্বারা পানির এক অংশ থেকে অন্য অংশে তাপ সঞ্চালিত হচ্ছে। এই পদ্ধতির নাম পরিচলন।

যে পদ্ধতিতে তাপ কোনো পদার্থের অণুগুলোর চলাচল দ্বারা উষ্ণতর অংশ থেকে শীতলতর অংশে সঞ্চালিত হয় তাকে পরিচলন বলে।

তাপের পরিচলনের জন্যও জড় মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। তরল ও বায়বীয় পদার্থের তাপ এ পদ্ধতিতে সঞ্চালিত হয়। তাপ গ্রহণ করে পদার্থের উষ্ণতর অংশের অণুগুলো শীতলতর অংশে চলে যায়, এভাবে অন্য অণুগুলো স্থান পরিবর্তন করে

নিজের গতির সাহায্যে তাপ সঞ্চালিত করে। কঠিন পদার্থের অণুগুলোর মধ্যে বন্ধন খুবই প্রবল হওয়ায় এরা স্থান পরিবর্তন করতে পারে না, ফলে কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপের পরিচলন সম্ভব নয়।

একটি কাচের পাত্রে পানি নিয়ে এর সাথে কিছু রং মিশানো হয়। এরপর নিচে তাপ প্রয়োগ করলে দেখা যায় যে, পাত্রের তলা থেকে একটি রঙিন পানির স্রোত উপরের দিকে ওঠে যায় এবং পাত্রের দেয়াল বেয়ে আর একটি স্রোত নিচে নেমে আসে। [চিত্র ১১.১]। পাত্রের তলার পানি প্রথমে তাপ গ্রহণ করে ফলে এটি উত্তপ্ত হয়ে হালকা হয় এবং উপরে ওঠে যায়। উপরের ঠান্ডা পানি নিচে নেমে আসে। এভাবে ক্রমাগত উষ্ণ পানির উপরে যাওয়া এবং শীতল পানির নিচে আসার ফলে সমস্ত পানি উত্তপ্ত হয়। সুতরাং এ পদ্ধতিতে পদার্থের অণুগুলো স্থান পরিবর্তন করে তাপ সঞ্চালন করে বলে এ পদ্ধতিকে পরিচলন বলে।



চিত্র ১১.১

১১.৩। বিকিরণ
Radiation

পরিবহণ ও পরিচলনে তাপ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সঞ্চালিত হওয়ার জন্য মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। কিন্তু তাপ সঞ্চালনের তৃতীয় একটি পদ্ধতি আছে– যাতে মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। এ পদ্ধতিতে শূন্যস্থানের এর মধ্য দিয়ে তাপ সঞ্চালিত হতে পারে। এক্ষেত্রে তাপ তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গের আকারে উষ্ণ বস্তু হতে শীতল বস্তুতে সঞ্চালিত হয়। সুইচ টিপে একটি বৈদ্যুতিক বাতির অল্প দূর হাত ধরলে গরম অনুভূত হয়। বৈদ্যুতিক বাতিটি শূন্যস্থানে হওয়া সত্ত্বেও তাপ হাতে আসে। এ পদ্ধতির নাম বিকিরণ।

যে পদ্ধতিতে তাপ জড় মাধ্যমের সাহায্য ছাড়াই তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গের আকারে উষ্ণ বস্তু থেকে শীতল বস্তুতে সঞ্চালিত হয় তাকে বিকিরণ বলে।

এ পদ্ধতিতে তাপ সঞ্চালিত হওয়ার জন্য কোনো জড় মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। স্বচ্ছ বস্তুর মধ্য দিয়েও তাপের বিকিরণ হতে পারে; যেমন – কাচ, কোয়ার্টজ ইত্যাদি। কিন্তু অস্বচ্ছ বস্তুর মধ্য দিয়ে তাপের বিকিরণ হয় না; যেমন – কাঠ, লোহা, পাথর ইত্যাদি। কয়েকটি তরলের মধ্য দিয়ে বিকিরণ সম্ভব; যেমন – কার্বন ডাইসালফাইড (CS_2)। কিন্তু সাধারণত তরলের মধ্য দিয়ে বিকিরণ সম্ভব হয় না। পানির মধ্য দিয়ে তাপের আংশিক বিকিরণ ঘটে।

আমরা পৃথিবীতে সূর্য থেকে তাপ পাই। পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে কয়েকশ কিলোমিটার বায়ুমণ্ডল ব্যতিত আর কোনো জড় মাধ্যম নেই। সূর্য থেকে তাপ তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গের আকারে বিকিরণ পদ্ধতিতে পৃথিবীতে আসে।

তাপ সঞ্চালনের বিভিন্ন পদ্ধতির পার্থক্য

পরিবহণ	পরিচলন	বিকিরণ
১. মাধ্যমের প্রয়োজন হয়।	১. মাধ্যমের প্রয়োজন হয়।	১. মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না।
২. মাধ্যম উত্তপ্ত হয়।	২. মাধ্যম উত্তপ্ত হয়।	২. মাধ্যমের দরকার হয় না।
৩. মাধ্যমের কণাগুলোর স্থানচ্যুতি ঘটে না।	৩. মাধ্যমের কণাগুলোর স্থানচ্যুতি ঘটে।	৩. তাপ তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ আকারে সঞ্চালিত হয়।

৪. সকল সম্ভাব্য পথে তাপ সঞ্চালিত হয়।	৪. মাধ্যমের উত্তপ্ত অণুগুলোর প্রবাহ রেখা অনুযায়ী তাপ সঞ্চালিত হয়	৪. তাপ সরলরেখায় সঞ্চালিত হয়।
৫. এটি ধীর পদ্ধতি।	৫. এটি পরিবহণের চেয়ে অপেক্ষাকৃত দ্রুত পদ্ধতি।	৫. তাপ আলোর বেগে সঞ্চালিত হয়।
৬. সাধারণত কঠিন পদার্থে এ পদ্ধতিতে তাপ সঞ্চালিত হয়।	৬. তরল ও বায়বীয় পদার্থে তাপ সঞ্চালিত হয়।	৬. বায়বীয় ও শূন্য মাধ্যমে তাপ সঞ্চালিত হয়।

১১.৪। তাপ পরিবাহকত্ব
Thermal Conductivity

সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ একইভাবে পরিবাহিত হয় না। একটি লোহার দণ্ডকে এক প্রান্ত আগুনে রেখে অন্য প্রান্ত স্পর্শ করলে কিছুক্ষণের মধ্যেই হাতে গরম লাগে, কিন্তু একটি কাঠের দণ্ডের এক মাথা আগুনে রেখে অন্য মাথা স্পর্শ করলে হাতে গরম লাগে না। কারণ লোহা ও কাঠ সমানভাবে তাপ পরিবহণ করে না। কাজেই বিভিন্ন পদার্থের তাপ পরিবহণ ক্ষমতা বিভিন্ন।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে, কোনো পরিবাহক পাতের বিপরীত সমান্তরাল পৃষ্ঠে তাপমাত্রার পার্থক্য থাকলে এর উষ্ণ পৃষ্ঠ থেকে শীতল পৃষ্ঠে লম্বভাবে যে পরিমাণ তাপ পরিবহণ পদ্ধতিতে সঞ্চালিত হয় তার মান Q, পরিবাহকের দুই পৃষ্ঠের তাপমাত্রার পার্থক্য $\Delta\theta$ এর সমানুপাতিক, পরিবাহকের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল A এর সমানুপাতিক, তাপ পরিবহণের সময় t এর সমানুপাতিক এবং পরিবাহকের দুই পৃষ্ঠের পুরুত্ব d এর ব্যস্তানুপাতিক। অর্থাৎ,

$$Q \propto \frac{A\Delta\theta t}{d}$$

বা $$Q = K\frac{A\Delta\theta t}{d} \quad \ldots \quad (১১.১)$$

এখানে K একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক। এর মান পরিবাহকের উপাদানের ওপর নির্ভর করে। একে পরিবাহকের উপাদানের তাপ পরিবাহকত্ব বলে। (১১.১) সমীকরণ থেকে পাওয়া যায়।

$$K = \frac{Qd}{A\Delta\theta t} \quad \ldots \quad (১১.২)$$

এ সমীকরণ যখন $A = 1$ একক, $d = 1$ একক, $\Delta\theta = 1K$ এবং $t = 1s$ হয় তখন $K = Q$ হয়। এর থেকে তাপ পরিবাহকত্বের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা দেওয়া হয় :

কোনো পদার্থের একক পুরুত্ব এবং একক প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট কোনো খণ্ডের দুই বিপরীত সমান্তরাল পৃষ্ঠের তাপমাত্রার পার্থক্য 1K হলে, প্রতি সেকেন্ডে এর উষ্ণ পৃষ্ঠ থেকে শীতল পৃষ্ঠে লম্বভাবে যে পরিমাণ তাপ পরিবহণ পদ্ধতিতে সঞ্চালিত হয় তার মানকে ঐ পদার্থের তাপ পরিবাহকত্ব বলে।

একক : (১১.২) সমীকরণ থেকে দেখা যায়

K এর একক হবে $\dfrac{\text{তাপ} \times \text{দৈর্ঘ্য}}{\text{ক্ষেত্রফল} \times \text{তাপমাত্রা} \times \text{সময়}}$

বা $\dfrac{\text{তাপ}}{\text{দৈর্ঘ্য} \times \text{তাপমাত্রা} \times \text{সময়}}$ এর একক

K এর একক হবে $\dfrac{\text{জুল}}{\text{মিটার} \times \text{কেলভিন} \times \text{সেকেন্ড}} \quad \left(\dfrac{J}{mKs}\right)$

$= Jm^{-1}K^{-1}s^{-1} = Wm^{-1}K^{-1}$ ($\because 1\ W = 1Js^{-1}$)

সুতরাং তাপ পরিবাহকত্বের একক হল $\frac{\text{ওয়াট}}{\text{মিটার} \times \text{কেলভিন}}$

তামার তাপ পরিবাহকত্ব 385 $Wm^{-1}K^{-1}$ বলতে বুঝায় 1m পুরুত্ব এবং 1 m^2 প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের তামার কোনো খন্ডের দুই বিপরীত সমান্তরাল পৃষ্ঠের তাপমাত্রার পার্থক্য 1K হলে এর উষ্ণপৃষ্ঠ থেকে শীতল পৃষ্ঠে লম্বভাবে 385 W হারে (অর্থাৎ, 1s-এ 385J) তাপশক্তি পরিবহণ পদ্ধতিতে সঞ্চালিত হবে।

কয়েকটি পদার্থের তাপ পরিবাহকত্ব, K

পদার্থ	$K(Wm^{-1}K^{-1})$	পদার্থ	$K(Wm^{-1}K^{-1})$
অ্যালুমিনিয়াম	205	ইট	0.6
লোহা	80	কংক্রিট	0.84
তামা	385	কাচ	0.8
পিতল	110	বরফ	1.6
রুপা	406	কাঠ	0.04
টিন	63	বাতাস	0.024
সীসা	35	পানি	0.6

উদাহরণ ১১.১। একজন লোক তার শরীরে 6mm পুরু ফ্লানেলে জড়িয়ে রাখেন। বায়ুর তাপমাত্রা 27^0C হলে তার শরীরের প্রতিবর্গ সে মি স্থান থেকে প্রতি ঘণ্টায় কী পরিমাণ তাপ বায়ুতে পরিবাহিত হবে? ফ্লানেলের তাপ পরিবাহকত্ব $0.05Wm^{-1}K^{-1}$ এবং ঐ লোকের শরীরের তাপমাত্রা 37^0C।

সমাধান :

আমরা জানি,

$$Q = \frac{KA\Delta\theta t}{d}$$

$$= \frac{0.05wm^{-1}K^{-1}\times10^{-4}m^2 \times 10K \times 3600s}{6 \times 10^{-3}m}$$

$= 30\ Ws = 30\ J$

উ : 30 J

এখানে,

ফ্লানেলের পুরুত্ব, $d = 6mm = 6 \times 10^{-3}m$

ফ্লানেলের ক্ষেত্রফল, $A = 1cm^2 = 10^{-4}m^2$

তাপমাত্রার পার্থক্য $\Delta\theta = (37 - 27)^\circ C = 10^\circ C = 10K$

তাপ পরিবহণের সময় = $1h = 3600\ s$

পরিবাহিত তাপ, Q = ?

তাপ পরিবাহকত্ব $K = 0.05Wm^{-1}K^{-1}$

উদাহরণ ১১.২। কোনো ঘরের বাইরের তাপমাত্রা 30^0C। $1m^2$ ক্ষেত্রফল এবং 2mm পুরু একটি কাচের জানালার মধ্য দিয়ে 4000 W হারে তাপ ভিতরে প্রবেশ করে। কাচের তাপ পরিবাহকত্ব 0.8 $Wm^{-1}K^{-1}$ হলে ঘরের ভিতরের তাপমাত্রা নির্ণয় কর।

সমাধান :

তাপমাত্রার পার্থক্য $\Delta\theta = (\theta_2 - \theta_1)$ আমরা জানি,

$$Q = \frac{KA\Delta\theta t}{d}$$

বা $\Delta\theta = \frac{Qd}{tKA}$

$$= \frac{4000W \times 2 \times 10^{-3}m}{0.8Wm^{-1}K^{-1} \times 1m_2}$$

$= 10K = 10^0C$

এখানে,

জানালার ক্ষেত্রফল $A = 1\ m^2$

জানালার পুরুত্ব, $d = 2\ mm = 2\times10^{-3}m$

তাপ পরিবহণের হার, $\frac{Q}{t} = 4000\ W$

তাপ পরিবাহকত্ব, $K = 0.8\ Wm^{-1}K^{-1}$

বাইরের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা, $\theta_2 = 30^0C$

ভিতরের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা, $\theta_1 = ?$

এখন $\Delta\theta = (\theta_2 - \theta_1) = 10°C$

$\therefore \theta_1 = \theta_2 - 10°C$

$= 30°C - 10^0C$

$= 20°C$

উ: $20°C$

উদাহরণ ১১.৩। একটি ঘরের কোনো দেয়ালের ক্ষেত্রফল $30\ m^2$। দেয়ালটি ইটের তৈরী এবং এর পুরুত্ব 25cm। ঘরের বাইরের তাপমাত্রা 30^0C এবং ভিতরের তাপমাত্রা 26^0C হলে দেয়াল দিয়ে কী হারে তাপ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করছে নির্ণয় কর। ইটের তাপ পরিবাহকত্ব $0.6\ Wm^{-1}K^{-1}$

সমাধান:

আমরা জানি,

$$Q = \frac{KA\Delta\theta t}{d}$$

বা $\frac{Q}{t} = \frac{KA\Delta\theta}{d}$

$$= \frac{0.6Wm^{-1}K^{-1} \times 30m^2 \times 4K}{25 \times 10^{-2}m}$$

$=288W$

উ: 288W

এখানে,

দেয়ালের ক্ষেত্রফল, $A = 30\ m^2$

দেয়ালের পুরুত্ব, $d = 25\ cm = \times 10^{-2}m$

তাপমাত্রার পার্থক্য, $\Delta\theta = (30 - 26)^0C = 4°C = 4K$

তাপ পরিবাহকত্ব, $K = 0.6Wm^{-1}K^{-1}$

তাপ পরিবহণের হার $\frac{Q}{t} =$?

উদাহরণ ১১.৪। 1.2m দীর্ঘ এবং $3cm^2$ প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি তামার দণ্ডের একপ্রান্ত 0^0C তাপমাত্রার বরফ এবং অপর প্রান্ত 100^0C তাপমাত্রার ফুটন্ত পানির সংস্পর্শে রাখা আছে। 10g বরফ গলতে কত সময় লাগবে ?

তামার তাপ পরিবাহকত্ব $385Wm^{-1}K^{-1}$ এবং বরফ গলনের আপেক্ষিক সুপ্ততাপ $336000\ Jkg^{-1}$।

সমাধান :

আমরা জানি, তামার দণ্ডের মধ্য দিয়ে পরিবাহিত তাপ

$$Q_1 = \frac{KA\Delta\theta t}{d}$$

আবার, বরফ কর্তৃক শোষিত তাপ,

$Q_2 = ml_f$

যেহেতু পরিবাহিত তাপ=শোষিত তাপ

$\therefore Q_1 = Q_2$

বা, $\frac{KA\Delta\theta t}{d} = ml_f$

বা, $t = \frac{ml_f d}{KA\Delta\theta}$

$$= \frac{10 \times 10^{-3}kg \times 336000Jkg^{-1} \times 1.2m}{385Wm^{-1}K^{-1} \times 3 \times 10^{-4}m^2 \times 100K}$$

এখানে,

দণ্ডের দুই তলের দূরত্ব $d = 1.2m$

প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল, $A = 3cm^2 = 3 \times 10^{-4}m^2$

তাপমাত্রার পার্থক্য, $\Delta\theta = (100 - 0)^0C = 100K$

তাপ পরিবাহকত্ব, $K = 385\ Wm^{-1}K^{-1}$

বরফ গলনের আপেক্ষিক সুপ্ত তাপ, $l_f = 336000Jkg^{-1}$

বরফের ভর, $m = 10g = 10 \times 10^{-3}kg$

পরিবহণের সময়, $t =$?

$= 349 \dfrac{J}{W}$

$= 349 \dfrac{J}{Js^{-1}}$

$\therefore\ t = 349s$

উ : 349 s

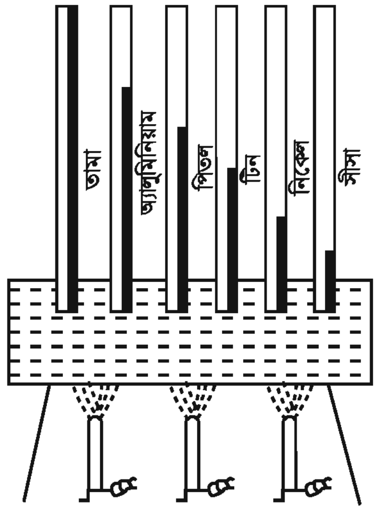
১১.৫। বিভিন্ন ধাতব পদার্থের তাপ পরিবাহকত্বের তুলনা : ইনজেনহাউজের পরীক্ষা

Comparison Of Thermal Conductivities Of Different Metals : Ingenhausz's Experiment

যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ সহজেই পরিবাহিত হয় সেগুলোকে সুপরিবাহক এবং যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ সহজে পরিবাহিত হয় না সেগুলোকে কুপরিবাহক আর যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ একেবারেই পরিবাহিত হয় না তাদেরকে অপরিবাহক বলে।

লোহা, তামা, রুপা, পারদ ইত্যাদি সুপরিবাহী পদার্থ। কাঠ, কর্ক, কাচ, রবার, পশম এবং প্রায় সকল তরল ও বায়বীয় পদার্থ তাপ কুপরিবাহক। ফেল্ট তাপ অপরিবাহক।

সকল পদার্থের তাপ পরিবাহকত্ব যে সমান নয় তা ইনজেনহাউজের পরীক্ষা দিয়ে সহজে প্রমাণ করা যায়।



চিত্র : ১১.২

পরীক্ষা :

একটি ধাতব পাত্র নেওয়া হয়। সমান দৈর্ঘ্যে এবং সমান প্রস্থচ্ছেদ বিশিষ্ট বিভিন্ন ধাতব পদার্থের কয়েকটি দণ্ড নিয়ে প্রত্যেকটি দণ্ডের গায়ে মোম লাগানো হয়। এই দণ্ডগুলোর এক প্রান্ত ধাতব পাত্রের ভেতর ঢুকানো থাকে (চিত্র ১১.২)।

এখন পাত্রের মধ্যে পানি রেখে নিচে থেকে তাপ প্রয়োগ করলে $100^{\circ}C$ তাপমাত্রায় পানি ফুটতে থাকবে এবং সকল দণ্ডের নিচের প্রান্তের তাপমাত্রা একই হবে। কিন্তু উপরের অংশ শীতল থাকায় বিভিন্ন দণ্ডের মধ্য দিয়ে তাপ পরিবাহিত হবে এবং দণ্ডগুলোর যে স্থানের তাপমাত্রা মোমের গলনাঙ্কের বেশি হবে সেই স্থানের মোম গলে যাবে।

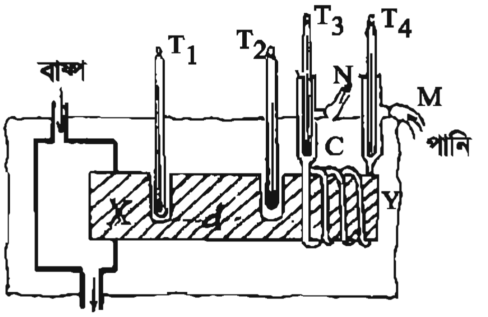
দেখা যায় যে, নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন দৈর্ঘ্য পর্যন্ত মোম গলে গেছে। যে দণ্ডের তাপ পরিবাহকত্ব বেশি সেই দণ্ডের বেশি মোম গলে যায়।

প্রকৃতপক্ষে কোনো পদার্থের তাপ পরিবাহকত্ব মোম যে দূরত্ব পর্যন্ত গলেছে সেই দূরত্বের বর্গের সমানুপাতিক। কয়েকটি বিভিন্ন ধাতব দণ্ডের তাপ পরিবাহকত্ব K_1, K_2, K_3 এবং মোম যে দূরত্ব পর্যন্ত গলেছে তার দৈর্ঘ্য যথাক্রমে l_1, l_2, l_3 হলে দেখা যায়

$$\frac{K_1}{l_1^2} = \frac{K_2}{l_2^2} = \frac{K_3}{l_3^2} \quad \ldots \ldots \ldots \quad (১১.৩)$$

সুতরাং কোনো ধাতুর তাপ পরিবাহকত্ব জানা থাকলে ইনজেনহাউজের পরীক্ষার সাহায্যে অন্যান্য ধাতুর তাপ পরিবাহকত্ব নির্ণয় করা যায়।

১১.৬। তাপ পরিবাহকত্ব নির্ণয় : সার্লির পদ্ধতি
Determination of Thermal Conductivity : Searle's Method



চিত্র ১১.৩

কোনো সুপরিবাহী পদার্থের অর্থাৎ, ধাতব পদার্থের তাপ পরিবাহকত্ব সার্লির পদ্ধতিতে নির্ণয় করা যায়। যে পদার্থের তাপ পরিবাহকত্ব নির্ণয় করতে হবে তার সুষম প্রস্থচ্ছেদের একটি দণ্ড XY নেওয়া হয় [চিত্র ১১.৩]। দণ্ডটির X প্রান্ত একটি বাষ্প প্রকোষ্ঠে ঢুকানো হয় অপর প্রান্তে একটি তামার নল C পেচানো থাকে। C নলের মধ্য দিয়ে পানি প্রবাহিত করা হয়। পানি M পথে প্রবেশ করে এবং N পথে নির্গত হয়। T_3 ও T_4 থার্মোমিটার যথাক্রমে, গরম পানি ও শীতল পানির তাপমাত্রা নির্দেশ করে। পরীক্ষণীয় দণ্ড XY-এর মাঝে d m দূরে দুটি গর্ত করে তাতে পারদ রেখে দুটি থার্মোমিটার T_1 ও T_2 স্থাপন করা হয়। তাপ ক্ষয় রোধ করার জন্য সমগ্র যন্ত্রটিকে তুলা, পশম ইত্যাদি দিয়ে ঘিরে রাখা হয়। বাষ্প প্রকোষ্ঠে বাষ্প চালনা করা হলে বাষ্পের সংস্পর্শে এসে XY দণ্ডের X প্রান্ত উত্তপ্ত হয় এবং এই তাপ পরিবহণ পদ্ধতিতে দণ্ডের মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হবে। C কুণ্ডলী দিয়ে ঠান্ডা পানি চালনা নিয়ন্ত্রণ করলে কিছুক্ষণ পরে প্রতিটি থার্মোমিটার এক একটি স্থির তাপমাত্রা নির্দেশ করবে অর্থাৎ, স্থিরাবস্থার উদ্ভব হবে।

এই স্থিরাবস্থায় পৌছানোর পরই পাঠ নিতে হয়। বিকিরণ পদ্ধতি বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে তাপ ক্ষয় না হওয়ায় দণ্ডের প্রত্যেক প্রস্থচ্ছেদের মধ্য দিয়ে সমান সময়ে সমপরিমাণ তাপ পরিবাহিত হবে, অর্থাৎ, তাপ প্রবাহের হার সমান হবে। এখন যদি কুণ্ডলী দিয়ে t sec সময়ে m kg পানি প্রবাহিত হয় এবং T_3 ও T_4 থার্মোমিটার দুটি যদি θ_3°C এবং θ_4°C($\theta_3 > \theta_4$) তাপমাত্রা নির্দেশ করে, তবে t sec-এ পানি কর্তৃক গৃহীত তাপ :

$$Q_1 = mS(\theta_3 - \theta_4)\ J$$

এখানে S হচ্ছে পানির আপেক্ষিক তাপ।

আবার দণ্ডের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল যদি Am^2 এবং T_1 ও T_2 থার্মোমিটারের তাপমাত্রা θ_1°C ও θ_2°C($\theta_1 > \theta_2$) হয়, থার্মোমিটার দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব d m এবং দণ্ডের পদার্থের তাপ পরিবাহকত্ব K হয় তাহলে t sec–এ পরিবাহিত তাপ

$$Q_2 = \frac{KA(\theta_1 - \theta_2)t}{d}\ J$$

কিন্তু স্থিরাবস্থায়, $Q_1 = Q_2$

$$\text{বা } mS(\theta_3 - \theta_4) = \frac{KA(\theta_1 - \theta_2)t}{d}$$

$$\therefore K = \frac{mS(\theta_3 - \theta_4)d}{A(\theta_1 - \theta_2)t}\ Wm^{-1}K^{-1} \quad \text{...... ....} \quad (১১.৪)$$

১১.৭। তাপ সঞ্চালনজনিত ঘটনার উদাহরণ
Examples of Transmission of Heat

১। রোদে রাখা এক টুকরা লোহাকে এক টুকরা কাঠের চেয়ে গরম এবং ঘরে রাখা এক টুকরা লোহাকে এক

টুকরা কাঠের চেয়ে ঠান্ডা মনে হয় :

কোনো বস্তুর তাপমাত্রা যদি দেহের তাপমাত্রার চেয়ে বেশি হয় অর্থাৎ, বস্তুকে স্পর্শ করলে যদি বস্তু দেহে তাপ দেয় তবে বস্তুকে গরম মনে হবে আর যদি বস্তুর তাপমাত্রা দেহের তাপমাত্রার চেয়ে কম হয় অর্থাৎ, বস্তুকে স্পর্শ করলে যদি দেহ থেকে তাপ নেয় তবে তাকে ঠান্ডা মনে হয়।

যে বস্তু যত বেশি তাপের সুপরিবাহী হবে সে তত দ্রুত তাপ সঞ্চালন করতে পারে অর্থাৎ, তত দ্রুত তাপ দেবে বা তাপ নেবে।

রোদে রাখলে এক টুকরা লোহা বা এক টুকরো কাঠের তাপমাত্রা এক হলেও যেহেতু লোহা তাপের সুপরিবাহক তাই লোহা তাড়াতাড়ি দেহে তাপ সঞ্চালন করে কিন্তু কাঠ তাপের কুপরিবাহক বলে কাঠ তাড়াতাড়ি তাপ সঞ্চালন করতে পারে না। কাজেই লোহা তাড়াতাড়ি দেহে তাপ পরিবহণ করে বলে লোহাকে কাঠের চেয়ে বেশি গরম মনে হয়। অন্যদিকে ঘরে রাখলে লোহা ও কাঠের তাপমাত্রা দেহের তাপমাত্রা থেকে কম থাকে বলে উভয়ই দেহ থেকে তাপ নেয়। কিন্তু লোহা সুপরিবাহক বলে দ্রুত তাপ নেয়, কাঠ কুপরিবাহক বলে তাড়াতাড়ি তাপ নিতে পারে না। কাজেই লোহা কাঠের চেয়ে বেশি তাপ শোষণ করে। সুতরাং দেহ দ্রুত তাপ হারায় এবং লোহাকে কাঠের চেয়ে বেশি ঠান্ডা মনে হয়।

২। আগুনের পাশের কোনো স্থান থেকে একই দূরত্বে ঠিক উপরে বেশি গরম লাগে :

বায়বীয় পদার্থে তাপ পরিচলন ও বিকিরণ উভয় পদ্ধতিতে সঞ্চালিত হয়। কিন্তু পরিচলন পদ্ধতিতে তাপ সঞ্চালিত হবার সময় নিচের বায়ু তাপ গ্রহণ করে হালকা হয়ে উপরে ওঠে যায় অর্থাৎ, পরিচলন পদ্ধতিতে বায়ুতে তাপ শুধু উপরের দিকে সঞ্চালিত হয়। বিকিরণ পদ্ধতিতে তাপ চারদিকে সমভাবে সঞ্চালিত হয়।

আগুনের পাশের কোনো স্থানে তাপ শুধু বিকিরণ পদ্ধতিতেই সঞ্চালিত হয়। কিন্তু একই দূরত্বে উপরের কোনো স্থানে তাপ বিকিরণ পদ্ধতি ছাড়াও পরিচলন পদ্ধতিতেও সঞ্চালিত হয়। কাজেই একই দূরত্বে পাশের কোনো স্থান থেকে উপরের কোনো স্থানে দুই পদ্ধতিতে তাপ সঞ্চালিত হওয়ায় বেশি তাপ সঞ্চালিত হয়। ফলে পাশের কোনো স্থান থেকে একই দূরত্বে ঠিক উপরে বেশি গরম লাগে।

৩। মরু অঞ্চলে দিনে তীব্র গরম আর রাতে তীব্র শীত অনুভূত হয় :

দিনের বেলা সূর্য তাপ বিকিরণ করে, আর পৃথিবী সে তাপ শোষণ করে ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়। ভূপৃষ্ঠ যত বেশি উত্তপ্ত হবে তত বেশি গরম অনুভূত হবে, আর ভূপৃষ্ঠ তাপ বিকিরণ করে যত শীতল হবে তত বেশি শীত অনুভূত হবে।

মরু অঞ্চলের বায়ু শুষ্ক থাকে। এ শুষ্ক বায়ু বিকিরণের জন্য স্বচ্ছ পদার্থ হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ, শুষ্ক বায়ুর মধ্য দিয়ে তাপ সহজে বিকিরিত হতে পারে।

মরু অঞ্চলের দিনের বেলা তাই শুষ্ক বায়ুর মধ্য দিয়ে সূর্য থেকে বিকীর্ণ তাপ সহজেই ভূপৃষ্ঠে পৌঁছায় এবং ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়। তাই মরু অঞ্চলে দিনে তীব্র গরম অনুভূত হয়।

আবার রাতের বেলায় ভূপৃষ্ঠ তাপ বিকিরণ করে। মরু অঞ্চলের শুষ্ক বায়ুর মধ্য দিয়ে এ বিকীর্ণ তাপ সহজেই বায়ুমণ্ডল ভেদ করে চলে যায় এবং ভূপৃষ্ঠ খুব শীতল হয়। এ জন্য রাতের বেলা তীব্র শীত অনুভূত হয়।

১১.৮। তাপ সঞ্চালনের নিয়ম প্রয়োগের উদাহরণ
Examples of the application of Principle of Transmission of Heat

১। খড়ের ছাদযুক্ত ঘর গরমকালে ঠান্ডা এবং শীতকালে গরম থাকে :

যে ঘরের ছাদের মধ্য দিয়ে গরমকালে বাইরে থেকে তাপ ভিতরে আসতে পারে না আর শীতকালে বাইরের তাপমাত্রা ঘরের ভিতর থেকে কম থাকায় বাইরে তাপ যেতে পারে না অর্থাৎ, যে ঘরের ছাদ কুপরিবাহক পদার্থের তৈরি হবে সেই ঘর গরমকালে ঠান্ডা আর শীতকালে গরম থাকে।

খড় তাপের কুপরিবাহক। এছাড়া ছাদ খড়ের তৈরি হলে খড়ের মাঝে মাঝে অনেক ফাঁক থাকে যাতে বায়ু আবদ্ধ থাকে। বায়ু তাপের কুপরিবাহক বলে গরমের দিনে বাইরের তাপমাত্রা বেশি হলেও খড়ের ছাদের মধ্য দিয়ে তাপ ভিতরে আসতে পারে না বলে ঘর ঠান্ডা মনে হয়। আবার শীতকালে বাইরের তাপমাত্রা কম থাকলেও ভিতরের তাপ বাইরে যেতে পারে না বলে গরম মনে হয়।

২। কম্বলে ঢেকে রাখলে মানুষের দেহ শীতের দিনে গরম থাকে, অথচ এক টুকরো বরফ কম্বলে ঢেকে রাখলে গরমের দিনে ঠান্ডা থাকে :

কম্বল তাপের কুপরিবাহক কারণ কম্বলের ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য ছিদ্র পথে বায়ু আবদ্ধ থাকে। বায়ু তাপের কুপরিবাহক বলে এই বায়ুস্তর তাপ সঞ্চালনে বাধা প্রদান করে।

শীতের দিনে মানুষের দেহ কম্বলে ঢেকে রাখলে কম্বলের মধ্য দিয়ে মানুষের দেহের তাপ বাইরে যেতে পারে না। ফলে শরীর গরম থাকে। অপর পক্ষে গরমের দিনে বায়ুমণ্ডল থেকে তাপ গ্রহণ করে বরফ গলতে থাকে। কিন্তু কম্বলে ঢাকা থাকলে কম্বল তাপের কুপরিবাহক বলে বাইরের তাপ কম্বল ভেদ করে বরফে আসতে পারে না। ফলে বরফ কোনো তাপ গ্রহণ করে না, তাই এটি ঠান্ডাই থাকে।

৩। গরমের দিনে সাদা কাপড় ও শীতের দিনে রঙিন কাপড় ব্যবহার করা আরামদায়ক :

যে কাপড় যত বেশি তাপ শোষণ করে উত্তপ্ত হয় সেই কাপড় ব্যবহার করলে তত বেশি গরম লাগে। গরমের দিনে এমন কাপড় ব্যবহার করা হয় যা তাপ কম শোষণ করে আর শীতের দিনে এমন কাপড় ব্যবহার করা হয় যা বেশি তাপ শোষণ করে।

বস্তুর তাপ শোষণ ক্ষমতা তার রঙের ওপরও নির্ভর করে। সাদা বস্তুর তাপ শোষণ ক্ষমতা একেবারেই কম এবং আপতিত তাপের বেশির ভাগই প্রতিফলিত করে, অপর পক্ষে রঙিন বস্তু বেশি তাপ শোষণ করে। গরমের দিনে সাদা কাপড় ব্যবহার করলে সূর্যের বিকীর্ণ তাপ সাদা কাপড়ে পড়ে বেশির ভাগই প্রতিফলিত হয়ে যায়, কাপড়ের তাপমাত্রা তাতে সামান্য বাড়ে। শীতের দিনে বিভিন্ন রঙিন কাপড় ব্যবহার করলে সূর্যের তাপ কাপড়ে পড়ে শোষিত হয়। ফলে কাপড়ের তাপমাত্রা বাড়ে এবং আরাম লাগে। এ কারণে গরমের দিনে সাদা কাপড় ও শীতের দিনে রঙিন কাপড় ব্যবহার করা আরামপ্রদ।

৪। কাচের ঘর বা সবুজ বাড়ি সব সময় গরম থাকে :

বিকীর্ণ তাপ সব বস্তুর মধ্য দিয়ে সমভাবে সঞ্চালিত হতে পারে না। যে বস্তুর ভিতর দিয়ে বিকীর্ণ তাপ সঞ্চালিত হতে পারে তাকে তাপস্বচ্ছ এবং যে বস্তুর মধ্য দিয়ে তাপ সঞ্চালিত হতে পারে না তাকে তাপরোধী পদার্থ বলে। বেশির ভাগ বস্তুই কয়েকটি বিশেষ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সাপেক্ষে তাপস্বচ্ছ আবার অন্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সাপেক্ষে তাপরোধীও হতে পারে। কাচের মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তাপ সহজে চলে যেতে পারে, কিন্তু দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকীর্ণ তাপ যেতে পারে না।

কাচের এ ধর্মের ওপর ভিত্তি করে সবুজ বাড়ি (Green house) তৈরী। এ সবুজ বাড়িতে গাছপালা, ফুল, মূল্যবান উদ্ভিদ ইত্যাদি কাচের ঘরের মধ্যে রাখা হয়। কারণ সূর্য থেকে নির্গত ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকীর্ণ তাপ কাচের মধ্য দিয়ে চলে যেতে পারে। এর ফলে গাছপালা বা মাটি গরম হয়ে যায়। গরম মাটি বা গরম গাছপালা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তাপ বিকিরণ করে। এই দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকীর্ণ তাপ কাচের মধ্য দিয়ে বাইরে যেতে পারে না। ফলে কাচের ঘরটি বেশ গরম থাকে এবং ভিতরে রাখা বস্তুদের প্রায় সব সময়ই প্রয়োজনীয় তাপমাত্রায় রাখে। এর ওপর ভিত্তি করেই আজকাল শীতপ্রধান দেশে সবুজ বাড়ির বহুল ব্যবহার হচ্ছে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। রৌদ্রে রাখা গাড়ীর জানালা বন্ধ রাখলে ভেতরে বেশি গরম অনুভূত হয় কারণ–

i. কাচের মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্রতর দৈর্ঘ্যের তাপ সহজে প্রবেশ করতে পারে কিন্তু বের হতে পারে না।

ii. কাচের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তাপ সহজে প্রবেশ করতে পারে কিন্তু বের হতে পারে না

iii. কাচের তাপ ধারণ ক্ষমতা বেশি

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i খ. ii

গ. i ও iii ঘ. ii ও iii

২। তাপ পরিবাহকত্বের মান নির্ভর করে?

ক. পরিবাহকের দৈর্ঘ্যের ওপর খ. পরিবাহকের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের ওপর

গ. পরিবাহকের আয়তনের ওপর ঘ. পরিবাহকের উপাদানের ওপর

নিচের বিবৃতির সাহায্যে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও–

কোনো ঘরের দেওয়ালের ক্ষেত্রফল 100 m^2 এবং পুরুত্ব 25 cm দেওয়ালের দুই পাশের তাপমাত্রার পার্থক্য 10^0C হলে এর মধ্যে দিয়ে প্রতি মিনিটে 3×10^5 J তাপ পরিবাহিত হয়।

৩। দেওয়ালের তাপ পরিবাহকত্ব নির্ণয়ে কোন সূত্র প্রয়োগ করতে হবে ?

ক. $K = \frac{AQd}{\Delta\theta t}$ খ. $K = \frac{Qd}{A\Delta\theta t}$

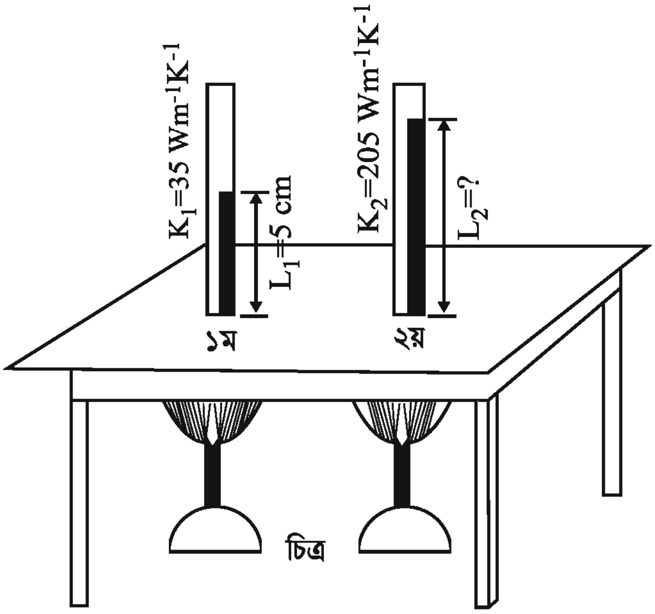
গ. $K = \frac{A\Delta\theta t}{Qd}$ ঘ. $K = \frac{Q\Delta\theta}{dt}$

৪। দেওয়ালের তাপ পরিবাহকত্ব কত হবে ?

ক. 125 $Wm^{-1}K^{-1}$ খ. 12.5 $Wm^{-1}K^{-1}$

গ. 1.25 $Wm^{-1}K^{-1}$ ঘ. 1250 $Wm^{-1}K^{-1}$

সৃজনশীল প্রশ্ন



চিত্র

চিত্রের সাহায্যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও–

ক. তাপ পরিবাহকত্ব কাকে বলে?

খ. দুইটি দণ্ডের মোমের গলন ভিন্ন হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. ২য় দণ্ডের মোম যে দূরত্ব পর্যন্ত গলেছে তার দৈর্ঘ্য কত?

ঘ. চিত্রে প্রদর্শিত ব্যবস্থায় কোনো পরিবাহীর তাপ পরিবাহকত্ব নির্ণয় কতটুকু নির্ভুলভাবে করা যাবে– তোমার মতামত লেখ।

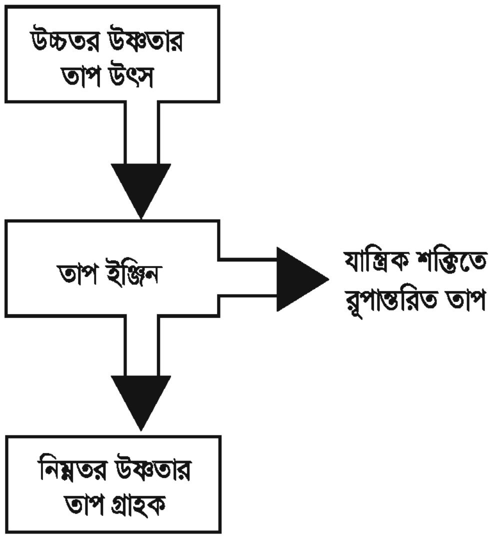
দ্বাদশ অধ্যায়
তাপীয় যন্ত্র
THERMAL MACHINE

প্রকৃতিতে শক্তি নানারূপে বিরাজ করছে। প্রকৃতিতে মোট শক্তির পরিমাণ অপরিবর্তিত থেকে শক্তি সর্বদা এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তিত হচ্ছে। আমাদের দৈনন্দিন কাজে, যানবাহন, কলকারখানা ইত্যাদি সচল রাখতে যান্ত্রিক শক্তি একান্ত প্রয়োজন। নানা রকম শক্তিই বেশ সহজে এমনকি অনেক সময় আপনা আপনি তাপে পরিণত হতে পারে। যেমন পাহাড় থেকে পানি যখন প্রচন্ড বেগে নিচে নামে তখন এর গতিশক্তি আপনা থেকেই তাপে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু তাপ সহজে অন্য কোনো শক্তিতে রূপান্তরিত হতে চায় না। যে কোনো জ্বালানি পুড়িয়ে সহজেই তাপ পাওয়া যায়। কিন্তু এই সহজলভ্য তাপকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরের উপায় কী? বিগত শতাব্দী ধরে সাদি, কার্নো, জুল, ক্লসিয়াস, ওয়াট, কেলভিন, প্লাঙ্ক, অটো প্রভৃতি মনীষীরা নানা গবেষণা করে তাপশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরের উপায় উদ্ভাবন করে গেছেন। এ অধ্যায়ে তাপ ইঞ্জিন কীভাবে তাপকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে কাজ সম্পাদন করতে পারে এবং তাপ–পাম্প ব্যবহার করে কীভাবে রেফ্রিজারেটর নিম্নতাপমাত্রা সৃষ্টি করে আমাদের খাদ্য সামগ্রী সংরক্ষণ করে তা আলোচনা করা হবে।

১২.১। তাপ ইঞ্জিন
Heat engine

তাপ শক্তিকে দিয়ে কাজ করাতে হলে প্রয়োজন একটা যান্ত্রিক ব্যবস্থার। এই যান্ত্রিক ব্যবস্থাই ইঞ্জিন।

যে যন্ত্র তাপ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপন্তরিত করে তাকে তাপ ইঞ্জিন বলে। ইঞ্জিন তাপ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে কীভাবে? প্রত্যেক তাপ ইঞ্জিনের অবশ্যই একটা তাপ উৎস থাকতে হবে।



চিত্র : ১২.১

আমরা জানি তাপ সর্বদা উচ্চ তাপমাত্রা থেকে নিম্নতর তাপমাত্রার দিকে প্রবাহিত হয়। ইঞ্জিন উৎস থেকে তাপ গ্রহণ করে তার খানিকটা যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে, কারণ সমস্ত তাপকে কখনো কাজে রূপান্তরিত করা যায় না। অরূপান্তরিত তাপশক্তি যা ইঞ্জিনে রয়ে যায় তা ইঞ্জিনের তাপমাত্রা তাপ উৎসের সমান বা তার চেয়ে বেশি করে দেয়। এ অবস্থায় ইঞ্জিনকে কাজ করার জন্য পুনরায় উৎস থেকে তাপ নিতে হলে তাকে শীতল হতে হবে। এজন্যে ইঞ্জিনে এমন ব্যবস্থা থাকতে হবে যাতে কাজে রূপান্তরিত হওয়ার পর যেটুকু তাপশক্তি উদ্বৃত্ত থাকে তা পরিবেশে বা অন্য কোনো উপযুক্ত জায়গা যা তাপ গ্রহণ করতে পারে তাতে ছেড়ে দিয়ে আদি অবস্থায় ফিরে আসে। অর্থাৎ, ইঞ্জিনকে উচ্চতর উষ্ণতার কোনো উৎস থেকে তাপ সংগ্রহ করে সেই তাপের খানিকটা কাজে পরিণত করে বাকিটা নিম্নতর উষ্ণতায় ছেড়ে দিতে হবে। কোনো জ্বালানি পুড়িয়ে ইঞ্জিনে তাপশক্তি সরবরাহ করা হয়। জ্বালানি পোড়ানোর ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে ইঞ্জিনকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা হয়;

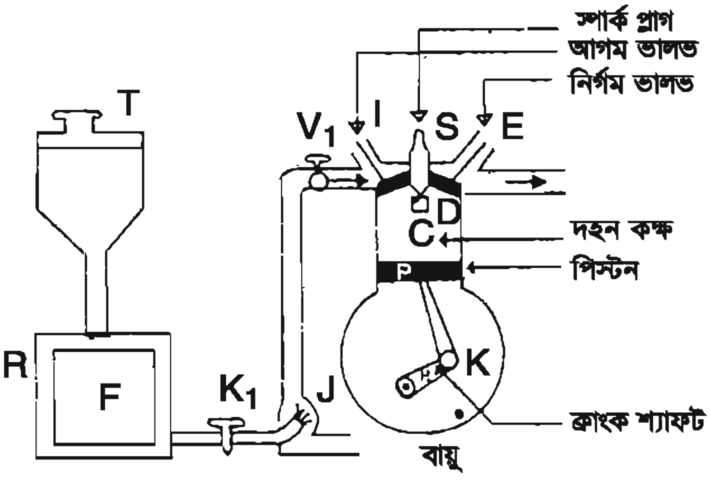
যথা– ১. বহির্দহ ইঞ্জিন (External combustion engine)
২. অন্তর্দহ ইঞ্জিন (Internal combustion engine)

যে ইঞ্জিনে জ্বালানির দহন ক্রিয়া ইঞ্জিনের মূল অংশের বাইরে ঘটে তাকে বহির্দহ ইঞ্জিন বলে। বাষ্পীয় ইঞ্জিন একটি বহির্দহ ইঞ্জিন। এ ইঞ্জিনে মূল ইঞ্জিনের বাইরে বয়লারে কয়লার আগুনে পানি ফুটিয়ে বাষপ তৈরি করা হয় এবং এ বাষপ শক্তিকে ইঞ্জিন চালানোর কাজে ব্যবহার করা হয়।

যে ইঞ্জিনে জ্বালানির দহন ক্রিয়া ইঞ্জিনের মূল অংশের ভিতরে ঘটে তাকে অন্তর্দহ ইঞ্জিন বলে। পেট্রোল ইঞ্জিন, ডিজেল ইঞ্জিন ইত্যাদি অন্তর্দহ ইঞ্জিনের উদাহরণ। এ সকল ইঞ্জিনে মূল ইঞ্জিনের ভিতরে পেট্রোল বা ডিজেল দহন করে যে শক্তি পাওয়া যায় তা কাজে লাগানো হয়। মোটর গাড়ি ও এরোপ্লেনে এ ধরনের ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়।

১২.২। পেট্রোল ইঞ্জিন
Petrol Engine

পেট্রোল ইঞ্জিনে জ্বালানির দহন ক্রিয়া ইঞ্জিনের ভিতরেই ঘটে। এজন্যে এ ইঞ্জিনকে অন্তর্দহ ইঞ্জিন বলে। এ ইঞ্জিনে পেট্রোলকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। মোটর গাড়ি, লঞ্চ, এরোপ্লেন ইত্যাদিতে এ ধরনের ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়। ১২.২ চিত্রে একটি পেট্রোল ইঞ্জিনের প্রধান প্রধান অংশ দেখানো হয়েছে।



চিত্র : ১২.২

(১) পেট্রোল ট্যাংক T : এটি একটি ধাতব পাত্র যাতে পেট্রোল রাখা হয়। পাত্রটি কিছুটা উঁচুতে থাকে। এর তলদেশ হতে একটি ধাতব নল বের হয়ে চাপ নিয়ন্ত্রণ প্রকোষ্ঠ R–এর সাথে যুক্ত হয়। ট্যাঙ্ক থেকে পেট্রোল নলের মধ্য দিয়ে R–প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করতে পারে।

(২) চাপ নিয়ন্ত্রণ প্রকোষ্ঠ R : এই প্রকোষ্ঠ পেট্রোল ট্যাঙ্কের কিছুটা নিচে থাকে। এর মধ্যে পেট্রোল অপেক্ষা হালকা পদার্থের একটি আয়তাকার বস্তু F থাকে। প্রকোষ্ঠে নির্দিষ্ট পরিমাণ পেট্রোল এসে জমা হলে F বস্তুটি ভেসে ওঠে ট্যাঙ্ক থেকে পেট্রোলের প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেয়। প্রকোষ্ঠের নিচের দিকে একটি ভালব (K_1) যুক্ত পার্শ্বনল থাকে। প্রকোষ্ঠে পেট্রোল একটি নির্দিষ্ট চাপে থাকে। ভালভ K_1 খোলা থাকলে পেট্রোল নির্দিষ্ট চাপে ভালভের মধ্য দিয়ে কারবুরেটর J- এর মধ্যে প্রবেশ করে।

(৩) কারবুরেটর J : ইঞ্জিনের এ অংশে পেট্রোলকে বাষ্পে রূপান্তরিত করা হয়। একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র যুক্ত নলের মধ্য দিয়ে উচ্চচাপে চালনা করে পেট্রোলকে বাষ্পীভূত করা হয়। এ পেট্রোল বাষ্পকে যথাযথ অনুপাতে বায়ুর সাথে মিশিয়ে বিস্ফোরক গ্যাসে পরিণত করা হয়। এই মিশ্রণ ইঞ্জিনের জ্বালানি হিসেবে কাজ করে। সমন্বয় যোগ্য ভালভ V_1 (যাকে থ্রোটল ভালভ বলে)–এর মধ্য দিয়ে এই মিশ্রণ নিয়ন্ত্রিত ভাবে দহন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করানো হয়।

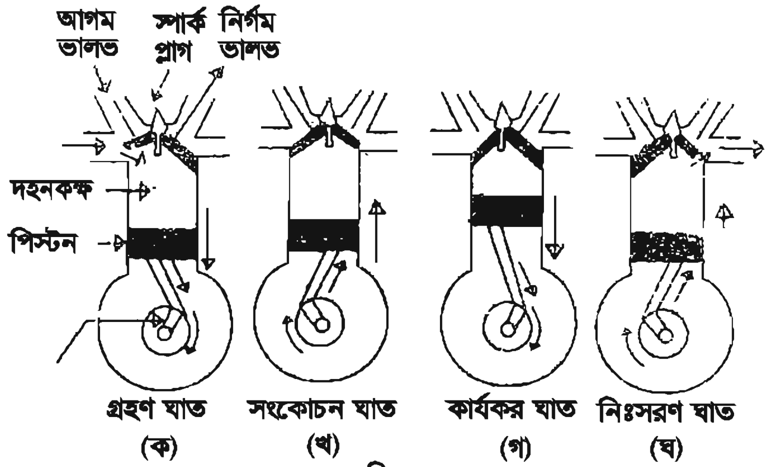
(৪) দহন প্রকোষ্ঠ D : দহন প্রকোষ্ঠটি ইঞ্জিনের সিলিন্ডার C এর ঠিক উপরে থাকে। এ প্রকোষ্ঠে বায়ু মিশ্রিত বিস্ফোরক পেট্রোল গ্যাসে স্পার্ক প্লাগ S থেকে উৎপন্ন তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ দ্বারা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দহন শুরু করা হয়। ইঞ্জিন দ্বারা চালিত ম্যাগনেটো নামক ক্ষুদ্র ডায়নামো থেকে তড়িৎ প্রবাহ সরবরাহ করে স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করা হয়।

(৫) সিলিন্ডার C : এটি দহন প্রকোষ্ঠের ঠিক নিচে অবস্থিত। সিলিন্ডারের মধ্যে একটি আগম ভালভ (intake valve) I এবং একটি নির্গম ভালভ (exhaust valve) E থাকে।

I ভালভটি উন্মুক্ত হলে বিস্ফোরক বাষ্প দহন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করতে পারে এবং E–ভালভ উন্মুক্ত হলে দহন প্রকোষ্ঠের পোড়া বাষ্প বের হয়ে যেতে পারে। সিলিন্ডারের মধ্যে একটি ইস্পাতের তৈরী বায়ুরোধী পিস্টন P ওঠানামা করতে পারে। পিস্টনটি ইঞ্জিনের প্রধান শ্যাফট H–এর সাথে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফট K–দ্বারা আটকানো থাকে। প্রধান শ্যাফট H–এর সাথে একটি ফ্লাই হুইল সংযুক্ত থাকে এবং শ্যাফটি তেল জাতীয় পদার্থ পূর্ণ একটি চৌবাচ্চার মধ্যে রাখা হয়। পিস্টনের গতির ফলে প্রধান শ্যাফট এবং সাথে সাথে ফ্লাই হুইলে ঘূর্ণন সৃষ্টি হয়। গ্যাস দহনের ফলে সৃষ্ট অত্যধিক গরমের হাত থেকে সিলিন্ডারটিকে রক্ষা করার জন্য এর চারদিকে নলের মধ্যদিয়ে অবিরাম পানি প্রবাহিত হয়।

ক্রিয়া : এ ইঞ্জিনে পিস্টনের দুবার সামনে এবং দুবার পিছনে এ চারবার গতির সময়ে মাত্র একবার জ্বালানি সরবরাহ করা হয় বলে এ ইঞ্জিনটিকে চতুর্ঘাত ইঞ্জিন বলে। ১৮৮৬ সালে ড. অটো সর্বপ্রথম সফলতার সাথে এই ইঞ্জিন চালু করেন বলে চক্রের পর পর চারটি ঘাতের ক্রিয়াকে 'অটোচক্র' বা Otto cycle বলে। (একটি পূর্ণচক্রের চারটি ঘাত নিম্নোক্ত ক্রম অনুসারে সংঘটিত হয়।)

(১) প্রথম ঘাত বা গ্রহণ ঘাত (Intake) : এ ঘাতে পিস্টন উপর থেকে নামে এবং আগম ভালভ I খুলে যায়। এর ফলে কারবুরেটর থেকে কিছু জ্বালানি দহন প্রকোষ্ঠ হয়ে সিলিন্ডারে প্রবেশ করে [চিত্র ১২.৩ ক]।



চিত্র : ১২.৩

(২) দ্বিতীয় ঘাত বা সংকোচন ঘাত (Compression) : এ ঘাতে পিস্টন উপরে ওঠে এবং দাহ্য মিশ্রণকে এর আয়তনের প্রায় এক পঞ্চমাংশে সংকুচিত করে। এই ঘাতের সময় E এবং I উভয় ভালভই বন্ধ থাকে এবং মিশ্রণের তাপমাত্রা প্রায় 600°C–এ উন্নীত হয় [চিত্র ১২.৩ খ] এই ঘাতের শেষে স্ফুলিংগ প্লাগ থেকে অনেকগুলো স্ফুলিংগের দ্বারা মিশ্রণে আগুন ধরে।

(৩) তৃতীয় ঘাত বা কার্যকর ঘাত (Power) : এবার একটি স্পার্ক প্লাগ থেকে তড়িৎ স্ফুলিংগের দ্বারা মিশ্রণের অগ্নি সংযোগ করা হয়। সাথে সাথে এক বিস্ফোরণ ঘটে এবং দহনের জন্য অত্যধিক তাপ উৎপন্ন হয়। তাপমাত্রা প্রায় 2000°C–এ উন্নীত হয় এবং চাপ প্রায় 15 বায়ুমন্ডলীয় চাপে বৃদ্ধি পায়। গ্যাসের প্রসারণের ফলে পিস্টন প্রচন্ড বলে বাইরের দিকে সরে আসে। এই সময় ভালব দুটি বন্ধ থাকে [চিত্র ১২.৩ গ] একমাত্র এই ঘাতেই ইঞ্জিনটি কাজ করে।

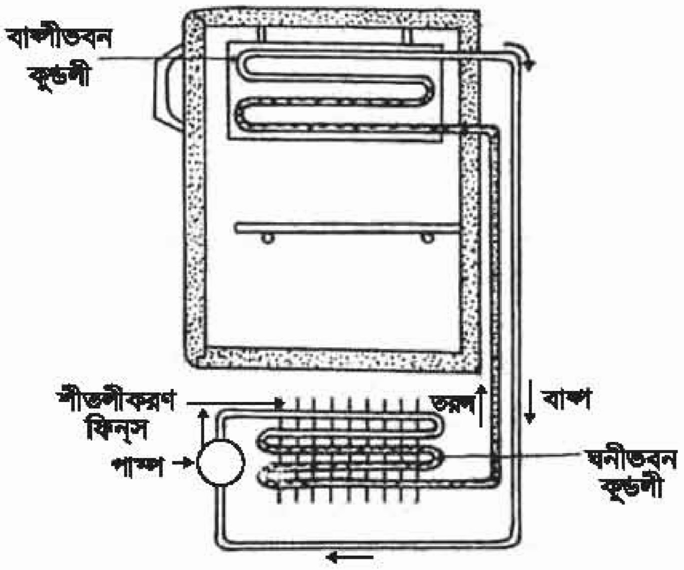
(৪) চতুর্থ ঘাত বা নিঃসরণ ঘাত (Exhaust) : এ ঘাতে পিস্টন উপরে উঠে, নির্গম ভালভ E খুলে যায় এবং দগ্ধ গ্যাস উক্ত পথে বের হয়ে যায়। এই সময় আগম ভালভ I বন্ধ থাকে [চিত্র ১২.৩ ঘ]।
নির্গমন শেষ হলে আদি অবস্থায় পুনরায় ফিরে আসে এবং নতুন চক্র শুরু হয়। যেহেতু ইঞ্জিনটি কেবল কার্যকর ঘাতেই শক্তি গ্রহণ করে, তাই ফ্লাই চাকা খুব ভারী হতে হয় যাতে এ ঘাতে এর অর্জিত জড়তা পরবর্তী তিন ঘাতে কোনো প্রকার দৃষ্টিগ্রাহ্য ক্ষয় ব্যতিরেকেই এ দ্রুতি বজায় রাখে।
একটি পেট্রোল ইঞ্জিনের দক্ষতা প্রায় ৩০%। এর অর্থ হচ্ছে, যে তাপশক্তি ইঞ্জিনকে সরবরাহ করা হয় তার শতকরা ত্রিশভাগ মাত্র যান্ত্রিক শক্তিকে রূপান্তরিত হয়।

১২.৩। রেফ্রিজারেটর বা হিমায়ক
Refrigerator

আমরা জানি প্রকৃতির নিয়ম হচ্ছে তাপ সবসময় উষ্ণতর বস্তু থেকে শীতলতর বস্তুতে সঞ্চালিত হয়। শীতল কোনো বস্তু থেকে তাপ কখনোই আপনা আপনি উষ্ণ কোনো বস্তুতে যাবে না। কোনো নিম্নতর উষ্ণতার বস্তু থেকে তাপ বের করে আনতে হলে তার জন্য আমাদের যান্ত্রিক শক্তি ব্যয় করতে হয়। যান্ত্রিক শক্তি ব্যয় না করে তাপকে নিম্ন উষ্ণতা থেকে উচ্চ উষ্ণতায় নেওয়া সম্ভব নয়। রেফ্রিজারেটরে পাম্পের সাহায্যে যান্ত্রিক শক্তি ব্যয় করে তাপশক্তি বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। নিচে রেফ্রিজারেটরের গঠন ও কার্যনীতি বর্ণনা করা হল :

রেফ্রিজারেটর (প্রচলিত ভাষায় অনেকে একে ফ্রিজ বলে থাকেন) বা হিমায়ক আজকাল একটি বহুল ব্যবহৃত শীতলীকরণ যন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে খাদ্য বস্তু বা অন্যান্য পচনশীল সামগ্রিকে নিম্ন তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয়। এতে খাদ্যবস্তু বা অন্যান্য সামগ্রী অনেক দিন ভাল ও টাটকা থাকে।

রেফ্রিজারেটরের কাজ হচ্ছে নিম্নতাপমাত্রা সৃষ্টি করে পচনশীল দ্রব্য সামগ্রী সংরক্ষণ করা। এর প্রধান অংশ একটি শীতলকরণ প্রকোষ্ঠ যার মধ্যে সংরক্ষণের জন্য দ্রব্যাদি রাখা হয়। যে কোনো বস্তুকে শীতল হওয়ার জন্য তাপ বর্জন করা প্রয়োজন। কিন্তু তাপ সবসময় উচ্চ তাপমাত্রা থেকে নিম্নতাপমাত্রার দিকে সঞ্চালিত হয়। শীতলীকরণ প্রকোষ্ঠের বাইরে চারদিকের তাপমাত্রা স্বভাবতই বেশি থাকে, ফলে স্বাভাবিক উপায়ে শীতলীকরণ প্রকোষ্ঠের তাপমাত্রা হ্রাস পায় না। এ জন্যে এমন ব্যবস্থা করা প্রয়োজন যাতে করে শীতলীকরণ প্রকোষ্ঠের তাপ বের করে নিয়ে আসা যায়। আমরা জানি কোনো তরল পদার্থের বাষ্পে পরিণত হওয়ার জন্য সুপ্ততাপ প্রয়োজন। কোনো তরল পদার্থকে যদি শীতলীকরণ প্রকোষ্ঠের সন্নিকটে বাষ্পে পরিণত করা যায় তাহলে বাষ্পীভবনের জন্য প্রয়োজনীয় তাপ শীতলীকরণ প্রকোষ্ঠ থেকে টেনে বের করে নেওয়া যাবে। প্রকৃত পক্ষে এ প্রক্রিয়াতেই রেফ্রিজারেটরে শীতলতা সৃষ্টি করা হয় বলে একে অনেক সময় তাপ পাম্প (Heat Pump) বলা হয়ে থাকে।



চিত্র : রেফ্রিজারেটর

রেফ্রিজারেটরের শীতলীকরণ প্রকোষ্ঠকে ঘিরে থাকে কপারের তৈরি ফাঁপা নলের কুণ্ডলী। একে বাষ্পীভবন কুণ্ডলী (evaporating coil) বলে। এই কুণ্ডলীর মধ্যে উদ্বায়ী পদার্থ ফ্রেয়ন [হিমায়ন পদার্থসমূহের সম্মিলিত নাম ফ্রেয়ন যেমন ডাইক্লোরো ডাইফ্লোরো মিথেন একটি হিমায়ন পদার্থ] থাকে। এই নলের সাথে একটি সংকোচন পাম্প বা কম্প্রেসার (compressor) সংযুক্ত থাকে। পাম্প চালু করা হলে নলের ভিতরের চাপ কমে যাওয়ায় ফ্রেয়ন দ্রুত বাষ্পীভূত হয়। এজন্য যে সুপ্ততাপ প্রয়োজন তার খানিকটা ফ্রেয়ন নিজে সরবরাহ করে আর বাকিটা আসে শীতলীকরণ প্রকোষ্ঠ থেকে, ফলে শীতলীকরণ ঘটে।

বাষ্পীভূত ফ্রেয়নকে এখন ঘনীভবন কুণ্ডলীর (condenser) মধ্যে এনে কম্প্রেসারের সাহায্যে সংকুচিত করা হয়। এ সময়ে ফ্রেয়ন গ্যাস সুপ্ততাপ বর্জন করে পুনরায় তরলে পরিণত হয়। তরল ফ্রেয়ন পুনরায় বাষ্পীভবন কুণ্ডলীতে পাঠানোর আগেই এই তাপ বের করে দেওয়া প্রয়োজন তা না হলে শীতলীকরণ প্রকোষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে। কনডেনসারের সাথে সংযুক্ত তামার জালিতে এই তাপ পরিবহণ প্রক্রিয়ায় সঞ্চালিত হয় এবং সেখান থেকে পরিচলন ও বিকিরণ প্রক্রিয়ায় তাপ পরিবেশে ছড়িয়ে যায়। শীতল ফ্রেয়নকে পুনরায় বাষ্পীভবন কুণ্ডলীর মধ্যদিয়ে চালনা করে সমগ্র প্রক্রিয়াটি পুনরাবৃত্তি করা হয়। রেফ্রিজারেটরের ভিতরকার একটি থার্মোস্টাট কম্প্রেসারের সুইচ অন অফ করার মাধ্যমে রেফ্রিজারেটরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। রেফ্রিজারেটরের দেয়াল তাপ কুপরিবাহী হওয়ায় তাপ ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। নিচের কোন ইঞ্জিনটি অন্তর্দহ ইঞ্জিন নয়?

ক. পেট্রোল ইঞ্জিন
খ. ডিজেল ইঞ্জিন
গ. এরোপ্লেনের ইঞ্জিন
ঘ. বাষ্পীয় ইঞ্জিন

২। রেফ্রিজারেটরে ব্যবহৃত তরলের নাম–

ক. ইথেন
খ. রেয়ন
গ. ফ্রেয়ন
ঘ. মিথেন

৩। রেফ্রিজারেটরের ক্ষেত্রে –

i. যান্ত্রিক শক্তি ব্যয় করে তাপশক্তি বের করে দেওয়া হয়।
ii. রাসায়নিক শক্তি ব্যয় করে তাপশক্তি বের করে দেওয়া হয়।
iii. বরফের সাহায্যে তাপশক্তি শোষণ করে নেওয়া হয়।

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i
খ. ii
গ. i ও ii
ঘ. i ও iii

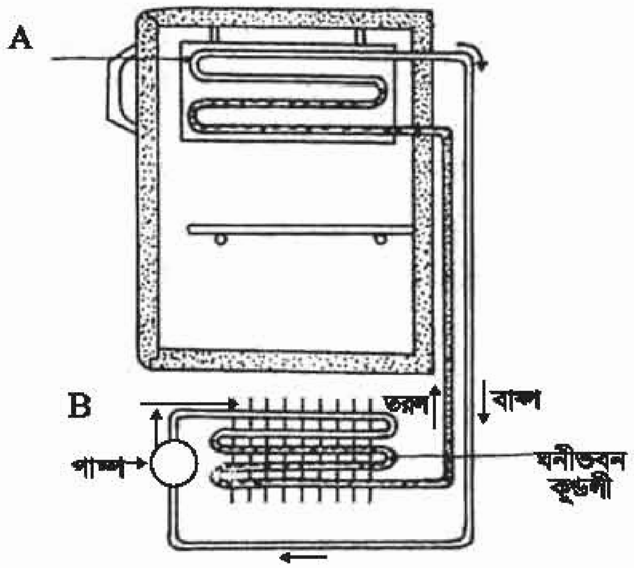
৪। পেট্রোল ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে –

i. প্রথম ঘাতে আগম ভালভ খুলে যায়
ii. দ্বিতীয় ঘাতে আগম ভালভ খুলে যায়
iii. দ্বিতীয় ঘাতে আগম ও নির্গম উভয় ভালভ বন্ধ থাকে।

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন



ক. যন্ত্রটির নাম কী?

খ. 'A' চিহ্নিত অংশ এবং ঘনীভবন কুণ্ডলীর পার্থক্য ব্যাখ্যা কর।

গ. 'B' চিহ্নিত অংশটির প্রয়োজনীয়তা কী?

ঘ. প্রাত্যহিক জীবনে চিত্রে উল্লিখিত যন্ত্রটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আলোর প্রকৃতি

NATURE OF LIGHT

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে আলো দ্বৈত চরিত্রের অধিকারী। আলো কখনো কখনো তরঙ্গের মত আচরণ করে, আবার অন্য সময় তার আচরণ কণা ধর্মী। খ্রিস্ট পূর্ব যুগের চিন্তা নায়করা যেমন আলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করে গেছেন, তেমনি বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীরাও আলো এবং আলোর ন্যায় অন্যান্য তাড়িতচৌম্বক বিকিরণ যেমন তাপ, বেতার, তরঙ্গ, এক্সরে, গামা রশ্মি, অতিবেগুনি ও অবলোহিত তরঙ্গ নিয়ে নিরন্তর গবেষণা করছেন। এ অধ্যায়ে আমরা আলোর প্রকৃতি সম্পর্কিত প্রাচীন মতবাদ থেকে শুরু করে বর্তমানে স্বীকৃত তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি বিভিন্ন তাড়িতচৌম্বক বিকিরণ বা তরঙ্গের মধ্যে পার্থক্য কোথায় তা বুঝতে চেষ্টা করব। আলো শক্তির একটি রূপ। এ আলো সম্পর্কিত বিভিন্ন পরিমেয় রাশি যেমন দীপন ক্ষমতা, দীপন তীব্রতা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা থাকবে এ অধ্যায়ের শেষাংশে।

১৩.১। আলো
Light

চোখ বন্ধ করলে কিছুই দেখা যায় না। আবার সম্পূর্ণ অন্ধকার স্থানে আমরা চোখ খোলা রাখলেও কোনো কিছু দেখতে পাই না। আলো হচ্ছে সেই নিমিত্ত যার সাহায্যে আমরা দেখতে পাই। প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ আলোর প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা করার চেষ্টা করে আসছে। মিশরিয় এবং গ্রিক দার্শনিকেরা মনে করতেন আমাদের চোখ হতে আলো কোনো বস্তুর উপর পড়লে আমরা সেই বস্তু দেখতে পাই। নেহায়েত অনুমান নির্ভর এ ধারণার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না বলে এ ধারণা কখনো গ্রহণযোগ্য হয়নি। দশম শতকের শেষের দিকে আরবিয় বিজ্ঞানী আল হাসান, ইউরোপে যিনি আল হ্যাজেন নামে পরিচিত, পরীক্ষা নিরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেন যে বাহ্যবস্তু থেকে আলো আমাদের চোখে এসে পড়লেই সেই বস্তু আমরা দেখতে পাই। আলো এক প্রকার শক্তি। এ শক্তির উপস্থিতিতে আমরা বিভিন্ন বস্তু দেখতে পাই কিন্তু আলো নিজে অদৃশ্য। আলো শূন্যস্থানে 3×10^8 ms^{-1} বেগে চলে। শূন্য স্থানের মধ্যে কোনো বস্তুই আলোর চেয়ে বেশি বেগে চলতে পারে না। আলোকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় :

আলো এক প্রকার শক্তি বা বাহ্যিক কারণ যা চোখে প্রবেশ করে দর্শনের অনুভূতি জন্মায়।

১৩.২। আলোর বিভিন্ন তত্ত্ব
Different Theories of Light

দীপ্তমান বস্তু থেকে আলো কীভাবে আমাদের চোখে আসে তা ব্যাখ্যার জন্য বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত চারটি তত্ত্ব প্রদান করেছেন। যথা – ১. কণা তত্ত্ব (Corpuscular theory), ২. তরঙ্গ তত্ত্ব (Wave theory), ৩. তাড়িত চৌম্বক তত্ত্ব (Electromagnetic theory) এবং ৪. কোয়ান্টাম তত্ত্ব (Quantum theory)।

কণাতত্ত্ব : স্যার আইজ্যাক নিউটন ১৬৭২ সালে আলোর কণাতত্ত্ব প্রদান করেন। এ তত্ত্ব অনুসারে কোনো উজ্জ্বল বস্তু থেকে অনবরত ঝাঁক ঝাঁক অতি ক্ষুদ্র কণা নির্গত হয়। এ কণাগুলো প্রচণ্ড বেগে সরল রেখা বরাবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং যখন আমাদের চোখে গিয়ে আঘাত করে তখন ঐ বস্তু সম্পর্কে আমাদের দর্শনানুভূতি হয়। এ কণাগুলোর বিভিন্ন আকারের জন্য বিভিন্ন বর্ণের সৃষ্টি হয়। এ তত্ত্বের সাহায্যে আলোর ঋজুগতি, প্রতিফলন, প্রতিসরণ ইত্যাদি আলোকীয় ঘটনা ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু ব্যতিচার, সমবর্তন, বিচ্ছুরণ ইত্যাদি আলোকীয় ঘটনার কোনো ব্যাখ্যা এ তত্ত্বের সাহায্যে করা সম্ভব হয় না।

তরঙ্গ তত্ত্ব : ১৬৭৮ সালে হাইগেন সর্বপ্রথম আলোর তরঙ্গ তত্ত্ব প্রদান করেন। পরবর্তীকালে ইয়ং, ফ্রেনেল ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা এ তত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

এ তত্ত্ব অনুসারে আলো ইথার নামে এক কাল্পনিক মাধ্যমের ভিতর দিয়ে তরঙ্গ আকারে 3×10^8 ms^{-1} বেগে সঞ্চালিত হয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায় এবং আমাদের চোখে পৌঁছে দর্শনের অনুভূতি সৃষ্টি করে। ইথারকে কল্পনা করা হয় একটি অবিচ্ছিন্ন মাধ্যম রূপে যার স্থিতিস্থাপকতা অনেক বেশি কিন্তু ঘনত্ব খুবই কম। আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য খুব

কম এবং নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ নির্দিষ্ট বর্ণের অনুভূতি সৃষ্টি করে। এ তত্ত্বের সাহায্যে আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ, বিচ্ছুরণ ব্যতিচার ও অপবর্তন ব্যাখ্যা করা গেলেও সমবর্তন, আলোক তড়িৎক্রিয়ার ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি। মাইকেলসন ও মর্লি পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেন ইথার বলে কিছুই নেই।

তাড়িতচৌম্বক তত্ত্ব : ১৮৬৪ সালে ম্যাক্সওয়েল আলোর তাড়িতচৌম্বক তত্ত্বের অবতারণা করেন। এ তত্ত্ব অনুসারে যখন গতিশীল চৌম্বক ও তড়িৎ ক্ষেত্রের দ্রুত পর্যাবৃত্ত পরিবর্তন ঘটে তখন দৃশ্য ও অদৃশ্য বিকিরণের উদ্ভব হয় যা তরঙ্গ আকারে 3×10^8 ms^{-1} বেগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এটি অনুপ্রস্থ তরঙ্গ এবং এর সঞ্চালনের জন্য ইথারের কল্পনা প্রয়োজন হয় না।

কোয়ান্টাম তত্ত্ব : কোনো কোনো ধাতুর উপর আলো পড়লে তাৎক্ষণিক ইলেকট্রন নির্গত হয় যাকে ফটো তড়িৎ ক্রিয়া (photo electric effect) বলে। আলোর তরঙ্গ ধর্মের সাহায্যে এই ঘটনার ব্যাখ্যা করা যায় না। ১৯০৫ সালে আলোর কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাহায্যে আইনস্টাইন এ ঘটনার ব্যাখ্যা দেন, সেজন্যে তাঁকে ১৯২১ সালে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

১৯০০ সালে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক সর্বপ্রথম কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রদান করেন। এ তত্ত্ব অনুসারে আলোকশক্তি কোনো উৎস থেকে অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গের আকারে না বেরিয়ে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি গুচ্ছ বা প্যাকেজ আকারে বের হয়। প্রত্যেক রঙের আলোর জন্য এ শক্তি প্যাকেটের শক্তির একটা সর্বনিম্ন মান আছে। এই সর্ব নিম্নমানের শক্তি সম্পন্ন কণিকাকে কোয়ান্টাম (quantum) বা ফোটন (photon) বলে।

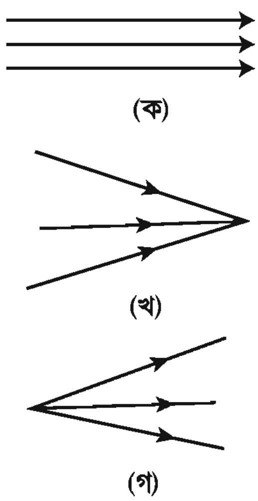
ফটোতড়িত ক্রিয়ার মতো ঘটনা যেমন আলোর কণারূপকে উৎঘাটন করে তেমনি ব্যতিচার, সমবর্তন, অপবর্তন ইত্যাদি ঘটনা আলোর তরঙ্গ ধর্মকে প্রকাশ করে। ফলে আলো কণা না তরঙ্গ এ নিয়ে বিজ্ঞানীদের বিতর্কের অবসান ঘটেনি, ম্যাক্সবর্নের ব্যবস্থা অনুসারে এখন মনে করা হয় অবস্থা বিশেষ আলোক কণা অথবা তরঙ্গারূপে আচরণ করে। তবে কখনোই এক সঙ্গে কণা এবং তরঙ্গ নয়।

১৩.৩। আলোক রশ্মি ও রশ্মিগুচ্ছ
Ray of light & Beam of light

আলোক রশ্মি : কোনো দীপ্তিমান বস্তুর কোনো বিন্দু থেকে আলো যে কোনো দিকে যে ঋজু পথ ধরে চলে, সে পথকেই আলোক রশ্মি বলে। সাধারণত তীর চিহ্নিত সরলরেখা দ্বারা আলোকরশ্মিকে নির্দেশ করা হয়। তীর চিহ্ন আলোকরশ্মির গতির দিক নির্দেশ করে।

রশ্মিগুচ্ছ : পাশাপাশি অনেকগুলো আলোক রশ্মির সমষ্টিকে রশ্মিগুচ্ছ বলে। আলোক রশ্মিগুচ্ছ তিন রকমের হয়– (ক) সমান্তরাল (খ) অভিসারী এবং (গ) অপসারী।

(ক) সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ (Parallel beam of light) : কতকগুলো সমান্তরাল আলোক রশ্মি নিয়ে সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ গঠিত হয় (চিত্র ১৩.১ ক)।



চিত্র : ১৩.১

(খ) অভিসারী রশ্মিগুচ্ছ (Convergent beam of light) : আলোক রশ্মিগুলো যদি কোনো এক বিন্দুতে মিলিত হয় তাহলে সে রশ্মিগুচ্ছক অভিসারী রশ্মিগুচ্ছ বলে (চিত্র ১৩.১ খ)।

(গ) অপসারী রশ্মিগুচ্ছ (Divergent beam of light) : কোনো বিন্দু থেকে উৎপন্ন আলোক রশ্মিগুলো যদি চারদিক ছড়িয়ে পড়ে তাহলে তাকে অপসারী রশ্মিগুচ্ছ বলে (চিত্র ১৩.১ গ)।

১৩.৪। তাড়িতচৌম্বক বর্ণালি
Electromagnetic spectrum

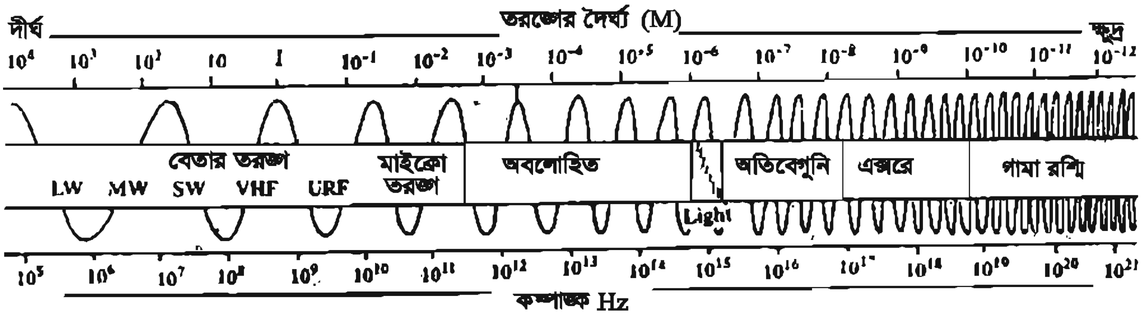
আলো একপ্রকার শক্তি। কোনো পদার্থের পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনগুলো নির্দিষ্ট দূরত্বে বিভিন্ন খোলকে অবস্থান করে। পরমাণুতে যখন কোনো শক্তি, যেমন তাপ সরবরাহ করা হয় তখন ইলেকট্রনগুলো এক খোলক থেকে অন্য খোলকে লাফিয়ে চলে যায়। পরে যখন ইলেকট্রনগুলো নিজ নিজ খোলকে ফিরে আসে তখন ইলেকট্রনের মধ্যে সঞ্চিত শক্তির বিকিরণ হয়। এই বিকিরিত শক্তিই আলো। শক্তির বিকিরণ তরঙ্গ আকারে ঘটে, যা তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ (electromagnetic wave)। শুধু আলোই নয়– বিকীর্ণ তাপ তরঙ্গ, বেতার তরঙ্গ, এক্স রশ্মি, অতিবেগুনি রশ্মি, গামা রশ্মি এরা সবাই তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ। এসবই যদি তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ হয়, তাহলে এদের একের সাথে অন্যের পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য হল তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা কম্পাঙ্কে। সব তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গের বেগ শূন্যের মধ্যে একই এবং তা সেকেন্ডে প্রায় তিন লক্ষ কিলোমিটার।

তাড়িতচৌম্বক বিকিরণ বা তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গের সমগ্র পরিসরকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বা কম্পাঙ্কের ভিত্তিতে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে; একে বলা হয় তাড়িতচৌম্বক বর্ণালি (electromagnetic spectrum)। ১৩.২ চিত্রে তাড়িতচৌম্বক বর্ণালির বিভিন্ন অংশ দেখানো হয়েছে।

10^{-11}m এর চেয়ে ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সকল বিকিরণই গামা রশ্মি। পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে যে তেজস্ক্রিয় রশ্মি উৎপন্ন হয় তার অধিকাংশই গামা রশ্মি। প্রাণীদেহের জন্য এ রশ্মি ক্ষতিকারক। এ রশ্মির শক্তি দৃশ্য আলোর চেয়ে পঞ্চাশ হাজারগুণ বেশি।

গামা রশ্মির চেয়ে এক্সরে অপেক্ষাকৃত বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের। বর্ণালিতে 10^{-11}m থেকে 10^{-8} m পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ হচ্ছে এক্সরে। এ রশ্মি মানুষের দেহের নরম অংশের মধ্যদিয়ে ভেদ করে যেতে পারে কিন্তু হাড় বা টিউমারের মধ্য দিয়ে যেতে পারে না। এ রশ্মির সাহায্যে ফটো তুলে দেখা যায় দেহের কোনো হাড় ভেঙেছে কি না।

এক্সরের চেয়ে বড় কিন্তু দৃশ্যমান আলোর বেগুনি রঙের আলোর চেয়ে ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকিরণকে অতিবেগুনি রশ্মি (ultraviolet ray) বলে। বর্ণালিতে 10^{-9} m থেকে 3.5×10^{-7} m –এর চেয়ে কিছু বেশি দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ পর্যন্ত অতি বেগুনি রশ্মির এলাকা। এ রশ্মি শরীরের ত্বকে ভিটামিন তৈরি করতে সাহায্য করে। তবে বেশিক্ষণ এ রশ্মিতে থাকলে ক্ষতি হতে পারে বিশেষ করে চোখের।



চিত্র : ১৩.২

আমরা যে আলোতে দেখি তা তাড়িতচৌম্বক বর্ণালির একটা ক্ষুদ্র অংশ। 4×10^{-7} m থেকে 7×10^{-7} m পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ হচ্ছে দৃশ্যমান আলো। তবে দৃশ্যমান আলোর সকল তরঙ্গ একই দৈর্ঘ্যের নয়। এর মধ্যে লাল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি এবং বেগুনি আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম। সূর্য থেকে যে বিকীর্ণ তাপ আসে তাকে বলা হয় অবলোহিত রশ্মি (infrared ray)। কাঠের আগুন বা বৈদ্যুতিক চুলা থেকে যে তাপ বিকীর্ণ হয় তাও অবলোহিত রশ্মি। দৃশ্যমান লাল আলোর চেয়ে এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি। বর্ণালির মোটামুটি 10^{-6} m থেকে 10^{-3} m তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পর্যন্ত এলাকা অবলোহিত বিকিরণের।

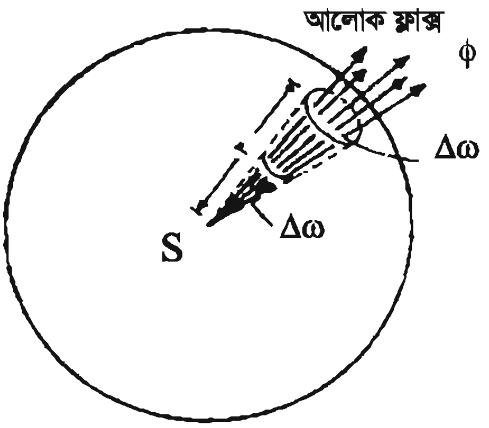
অবলোহিত বিকিরণের চেয়ে অর্থাৎ, 10^{-3} m এর চেয়ে বেশি দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ হচ্ছে বেতার তরঙ্গ (radio wave)। বেতার তরঙ্গের দৈর্ঘ্য 10^4 m পর্যন্ত হতে পারে। এসব তরঙ্গের কম্পাঙ্ক দৃশ্যমান আলোর কম্পাঙ্কের চেয়ে অনেক কম। দৃশ্যমান আলোর কম্পাঙ্ক যেখানে 10^{14} Hz সেখানে বেতার তরঙ্গের কম্পাঙ্ক 10^{12} Hz –এর চেয়ে কম। 10^{12} Hz এর চেয়ে কম কম্পাঙ্কের সকল তরঙ্গাকে বেতার তরঙ্গ হিসেবে ধরা হয়। বেতার তরঙ্গের মধ্যেও আবার নানা ভাগ আছে। মিডিয়ামওয়েভ বা মাঝারি তরঙ্গে ব্যবহার করা হয় মোটামুটি 200 m থেকে 500 m দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ। শর্টওয়েভ বা হ্রস্ব তরঙ্গের দৈর্ঘ্য 10 m থেকে 100 m । আবার টেলিভিশনের জন্য যে অতিহ্রস্ব তরঙ্গ বা মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করা হয় তার দৈর্ঘ্য মাত্র তিন সেন্টিমিটারের মত।

১৩.৫। দীপ্তিমিতি
Photometry

আমরা অভিজ্ঞতা থেকে দেখতে পাই যে সকল দীপ্তিমান বস্তু সমান আলো দেয় না। একটা মোমবাতি যে আলো ছড়ায় একটা বৈদ্যুতিক বাতি তার চেয়ে অনেক বেশি আলো দেয়। আবার কোনো বই পড়ার সময় তুমি কোনো বাতির যত কাছে যাবে বইয়ের পাতাগুলো তোমার কাছে তত বেশি উজ্জ্বল মনে হবে। একটি বাতি কী পরিমাণ আলো দেয় বা কোন পৃষ্ঠে কীভাবে আলো পড়লে সেটি কেমন উজ্জ্বল দেখায় এসব নিয়ে যে আলোচনা তাকে দীপ্তিমিতি (Photometry) বলে। দীপ্তিমিতির আলোচনায় ঘনকোণের ধারণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কাগজ, বোর্ড প্রভৃতি সমতলে দুটি পরস্পরচ্ছেদী সরলরেখা যে কোণ উৎপন্ন করে তাকে সমতলীয় কোণ বা সাধারণভাবে কোণ বলে। কিন্তু সমতলের পরিবর্তে ত্রিমাত্রিক স্থানেও কোণ হয়। তাকে ঘনকোণ বলা হয়। তলের সীমারেখার বিভিন্ন বিন্দু থেকে যদি অন্য কোনো বিন্দু পর্যন্ত সরলরেখা আঁকা যায় তাহলে একটি শঙ্কু উৎপন্ন হয়, যার শীর্ষ ঐ বিন্দুতে থাকে। এই শংকুর শীর্ষ বিন্দুতে যে কোণ উৎপন্ন হয় তাই হল ঐ তল কর্তৃক আবদ্ধ ঘনকোণ (চিত্র ১৩.৩)।

কোনো একটি পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল বাইরের কোনো বিন্দুতে যে ঘনকোণ উৎপন্ন করে তা আসলে নির্ধারণ করে, ঐ বিন্দু থেকে সবদিকে বিকীর্ণ রশ্মির মত কত অংশ এই পৃষ্ঠে এসে পড়েছে।



চিত্র : ১৩.৩

একটি গোলকের পৃষ্ঠের কোনো অংশ গোলকের কেন্দ্রে যে ঘনকোণ আবদ্ধ করে তার মান পৃষ্ঠের ঐ অংশের ক্ষেত্রফলকে গোলকের ব্যাসার্ধের বর্গ দ্বারা ভাগ করলে পাওয়া যায়। r ব্যাসার্ধের কোনো গোলকের পৃষ্ঠের A ক্ষেত্রফল কর্তৃক আবদ্ধ ঘনকোণ $\Delta\omega = \dfrac{\Delta A}{r^2}$ ।

ঘনকোণের একক হল স্টেরেডিয়ান (steredian বা সংক্ষেপ sr)। 1m ব্যাসার্ধবিশিষ্ট গোলকের পৃষ্ঠের $1m^2$ ক্ষেত্রফল গোলকের কেন্দ্রে যে ঘনকোণ আবদ্ধ করে তাকে এক স্টেরেডিয়ান বলে। যেহেতু 1m ব্যাসার্ধবিশিষ্ট গোলকের পৃষ্ঠের $1m^2$ ক্ষেত্রফল গোলকের কেন্দ্রে যে ঘনকোণ আবদ্ধ করে তাকে এক স্টেরেডিয়ান বলে সেহেতু r ব্যাসার্ধের গোলকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল $A = 4\pi r^2$ সুতরাং সম্পূর্ণ গোলক পৃষ্ঠ কর্তৃক আবদ্ধ ঘনকোণ,

$$\omega = \frac{4\pi r^2}{r^2} = 4\pi$$

অতএব একটি গোলক তার কেন্দ্রে 4π স্টেরেডিয়ান ঘনকোণ আবদ্ধ করে।

দীপন ক্ষমতা
Luminous intensity

আমরা আগেই বলেছি যে, সকল দীপ্তিমান বস্তু সমান আলো দেয় না। কোনো আলোক উৎসের দীপন ক্ষমতা বলতে আমরা বুঝি আলোক সৃষ্টির ব্যাপারে ঐ উৎস কত তীব্র অর্থাৎ, একটা উৎস থেকে কী হারে আলোকশক্তি নির্গত হচ্ছে দীপন ক্ষমতা দ্বারা তা বুঝা যায়। কোনো বিন্দু উৎস থেকে প্রতি সেকেন্ডে কোনো নির্দিষ্ট দিকে একক ঘনকোণে যে পরিমাণ আলোক শক্তি নির্গত হয় তাকে ঐ উৎসের দীপনক্ষমতা বলে। আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে যে সাতটি রাশিকে মৌলিক রাশি হিসেবে ধরা হয়েছে দীপন ক্ষমতা তার একটি। এর সংকেত I এবং একক ক্যান্ডেলা (Candela) 101325 প্যাসকেল চাপে প্লাটিনামের হিমাঙ্কে (2042K) কোনো কৃষ্ণবস্তুর (black body) পৃষ্ঠের $\frac{1}{600000}$ m^2 পরিমিত ক্ষেত্রফলের পৃষ্ঠের অভিলম্ব বরাবর দীপন ক্ষমতাকে 1 ক্যান্ডেলা (1cd) বলে।

আলোক ফ্লাক্স
Luminous flux

কোনো দীপ্তিমান বস্তু থেকে প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ আলোক শক্তি নির্গত হয় তাকে দীপ্তি বা আলোক প্রবাহ বা আলোক ফ্লাক্স বলে। আলোক ফ্লাক্সকে ϕ (ফাই) দ্বারা সূচিত করা হয়। আলোক ফ্লাক্স পরিমাপের একক লুমেন (lumen)।

এক ক্যান্ডেলা দীপন ক্ষমতার কোনো বিন্দু উৎস থেকে যে পরিমাণ আলোক ফ্লাক্স এক স্টেরেডিয়ান ঘনকোণে নির্গত হয় তাকে এক লুমেন (1 lm) বলে।

$$1 \text{ lm} = 1 \text{ cd sr} \quad \ldots \quad (১৩.১)$$

লুমেন যেহেতু আলোকশক্তি প্রবাহের হার সুতরাং ক্ষমতার একক, অর্থাৎ, ওয়াটের সাথে সম্পর্কযুক্ত। পরীক্ষা করে দেখা গেছে 621 lm সবুজ আলো প্রায় এক ওয়াট ক্ষমতার সমান।

দীপন তীব্রতা
Illumination

ঘরে বাতি জ্বালালে সব জায়গায় সমভাবে আলোকিত হয় না। একই উৎস দ্বারা বিভিন্ন পৃষ্ঠ বিভিন্ন রকমভাবে আলোকজ্জ্বল হতে পারে। কোনো পৃষ্ঠের দীপন তীব্রতা বলতে আমরা বুঝি, ঐ পৃষ্ঠটি উৎস দ্বারা কী পরিমাণ আলোকিত হয়েছে। কোনো পৃষ্ঠের এক বর্গমিটার ক্ষেত্রফলে আপতিত আলোক ফ্লাক্সের পরিমাণকে ঐ তলের দীপন তীব্রতা বলে। দীপন তীব্রতাকে E দ্বারা সূচিত করা হয়। কোনো পৃষ্ঠের ΔA ক্ষেত্রফলে আপতিত আলোক ফ্লাক্সের পরিমাণ ϕ হলে, ঐ পৃষ্ঠের দীপন তীব্রতা,

$$E = \frac{\phi}{\Delta A} \quad \ldots \quad (১৩.২)$$

দীপন তীব্রতা পরিমাপের একক লাক্স (lux)। কোনো পৃষ্ঠের প্রতি বর্গমিটার ক্ষেত্রে এক লুমেন আলোক ফ্লাক্স যে দীপন তীব্রতা সৃষ্টি করে তাকে এক লাক্স (lux) বলে। অর্থাৎ,

$$1lx = \frac{1lm}{1m^2} = 1lm\ m^{-2} \quad \ldots \quad (১৩.৩)$$

১৩.৬। দীপন তীব্রতা ও দীপন ক্ষমতার মধ্যে সম্পর্ক
Relation between Illumination & Luminous Intensity

r ব্যাসার্ধের একটি গোলক কল্পনা করা যায় যার কেন্দ্রে রয়েছে I দীপন ক্ষমতা বিশিষ্ট একটি বিন্দু আলোক উৎস S (চিত্র ১৩.৩)। উৎস থেকে গোলকের পৃষ্ঠের অংশবিশেষ ΔA ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত আলোক ফ্লাক্সের পরিমাণ ϕ এবং ΔA ক্ষেত্র দ্বারা গোলকের কেন্দ্রে উৎপন্ন ঘনকোণ $\Delta\omega$ হলে,

$\phi = I\Delta\omega$ ... ... (১৩.৪)

বা, $I = \dfrac{\phi}{\Delta\omega}$ ... ... (১৩.৫)

আবার ΔA পৃষ্ঠের দীপন তীব্রতা E হলে,

$E = \dfrac{\phi}{\Delta A}$ ... ... (১৩.৬)

সমীকরণ ১৩.৬ কে ১৩.৫ দ্বারা ভাগ করে পাই,

$\dfrac{E}{I} = \dfrac{\Delta\omega}{\Delta A}$ ... ... (১৩.৭)

কিন্তু $\Delta\omega = \dfrac{\Delta A}{r^2}$ বা $\Delta A = \Delta\omega\, r^2$

১৩.৭ সমীকরণে ΔA এর মান বসিয়ে,

$\dfrac{E}{I} = \dfrac{\Delta\omega}{\Delta\omega r^2}$

$\therefore E = \dfrac{I}{r^2}$ ... ... (১৩.৮)

অর্থাৎ, দীপন তীব্রতা = $\dfrac{\text{দীপন ক্ষমতা}}{(\text{দূরত্ব})^2}$

১৩.৮ সমীকরণ থেকে দেখা যায়, r = 1m এবং I = 1cd হলে, E = 1*l*ux হয়। অর্থাৎ,

$1lux = 1cd.m^{-2}$ ... ... (১৩.৯)

১৩.৭। দীপন তীব্রতার বিপরীত বর্গীয় সূত্র

Inverse square law of illumination.

সূত্রের বিবৃতি : কোনো উৎস দ্বারা কোনো পৃষ্ঠে সৃষ্ট দীপন তীব্রতা ঐ উৎস থেকে পৃষ্ঠের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়।

গাণিতিক ব্যাখ্যা : ধরা যাক, S বিন্দুতে একটি বিন্দু আলোক উৎস রয়েছে। S কে কেন্দ্র করে যথাক্রমে r_1 ও r_2 ব্যাসার্ধের দুটি গোলক কল্পনা করা হল। গোলক পৃষ্ঠদ্বয়ের দীপন তীব্রতা যথাক্রমে E_1, E_2 এবং ক্ষেত্রফল

$4\pi r_1^2$ ও $4\pi r_2^2$ হলে, $\dfrac{E_1}{E_2} = \dfrac{\phi}{4\pi r_1^2} \div \dfrac{\phi}{4\pi r_2^2} = \dfrac{r_2^2}{r_1^2}$; ϕ = আলোক উৎস হতে নির্গত আলোর ফ্লাক্স।

অর্থাৎ, কোনো পৃষ্ঠের দীপন তীব্রতা উৎস থেকে ঐ পৃষ্ঠের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়।

উদাহরণ ১৩.১। 6m × 8m দেয়ালে সুষমভাবে আলো পড়লে এর কোনো বিন্দুর দীপন তীব্রতা 100 *l*ux হয়। দেয়ালে পতিত আলোক ফ্লাক্সের পরিমাণ নির্ণয় কর।

সমাধান :

আমরা জানি,

$$E = \frac{\phi}{\Delta A}$$

$$\therefore \phi = E\,\Delta A$$

$= (100\ lux)\ (48 m^2)$

$= 4800\ lm$

উ: 4800 lm

এখানে,

ক্ষেত্রফল, $\Delta A = 6\ m \times 8\ m$

$= 48\ m^2$

দীপন তীব্রতা, $E = 100\ lux$

আলোক ফ্লাক্স, $\phi = ?$

উদাহরণ : ১৩.২। 100 cd দীপন ক্ষমতার একটি বাতি থেকে 5m দূরে রাখা কোনো বইয়ের পৃষ্ঠার দীপন তীব্রতা কত?

সমাধান :

আমরা জানি,

$$E = \frac{I}{r^2} = \frac{100cd}{(5m)^2}$$

$= 4\ cd.\ m^{-2}$

উ: $4\ cd.\ m^{-2}$

এখানে,

বাতির দীপন ক্ষমতা $I = 100\ cd$

বইয়ের দূরত্ব, $r = 5m$

দীপন মাত্রা, $E = ?$

উদাহরণ : ১৩.৩। সমান দীপন ক্ষমতার তিনটি বাতি 3m দূরত্বে এবং এরূপ দুটি বাতি 2m দূরত্বে রাখলে কোনটি বেশি আলোকিত করবে?

সমাধান : ধরা যাক, প্রতিটি বাতির দীপন ক্ষমতা = I cd

$\therefore$ তিনটি বাতি কর্তৃক 3m দূরে সৃষ্ট দীপন তীব্রতা,

$$E_1 = \frac{I_1}{r_1^2} = \frac{3Icd}{(3m)^2} = \frac{I}{3}\ \ cd\ m^{-2}$$

এবং দুটি বাতি কর্তৃক 2m দূরে সৃষ্ট দীপন তীব্রতা,

$$E_2 = \frac{I_2}{r_2^2} = \frac{2Icd}{(2m)^2} = \frac{I}{2}\ \ cd.\ m^{-2}$$

$\therefore E_2 > E_1,\ \therefore$ দুটি বাতি বেশি আলোকিত করবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। আলোক শক্তি গুচ্ছ বা প্যাকেট আকারে এক স্থান হতে অন্য স্থানে গমন করে। আলোর কোন তত্ত্ব হতে এ ধারণা পাওয়া যায়?

ক. তাড়িতচৌম্বক তত্ত্ব খ. কণা তত্ত্ব

গ. কোয়ান্টাম তত্ত্ব ঘ. তরঙ্গতত্ত্ব

২। তরঙ্গ তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়–

i. দুইটি মাধ্যমের ভিতর দিয়ে আলোর গতিপথ

ii. মসৃণ তল থেকে আলোর ফিরে আসা

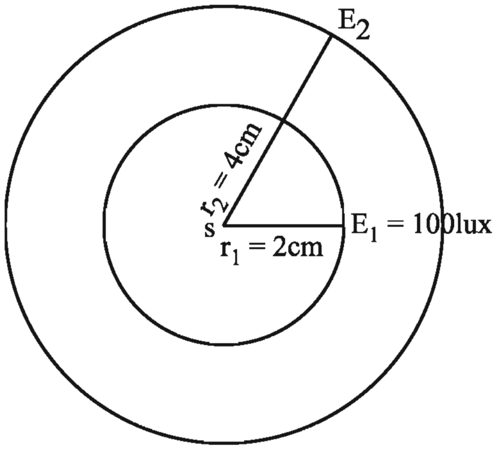
iii. ছোট ছিদ্র থেকে আলোর বিভিন্ন পথে বেঁকে যাওয়া।

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i, ii ও iii

চিত্র অনুসারে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



৩। E_1 ও E_2 এর অনুপাত–

ক. $\frac{r_1}{r_2}$ খ. $\frac{r_1^2}{r_2^2}$

গ. $\frac{r_2}{r_1}$ ঘ. $\frac{r_2^2}{r_1^2}$

৪। E_2 এর মান–

ক. 400 lux খ. 200 lux

গ. 50 lux ঘ. 25 lux

সৃজনশীল প্রশ্ন

বাবুর পড়ার টেবিলটি ঘরের বালব থেকে 2m দূরে ছিল। হঠাৎ প্রয়োজনে তার টেবিলটি বালব থেকে 4m দূরে সরানো হল। এতে তার বইয়ের অক্ষরগুলো তার কাছে পূর্বের চেয়ে আরও অনুজ্জ্বল মনে হয়। এ অসুবিধা দূর করার জন্য বাবু উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি বালব ব্যবহার করে।

ক. আলো কী?

খ. টেবিল সরানোর পর বইয়ের অক্ষর কম উজ্জ্বল দেখা গেল কেন।

গ. টেবিল স্থানান্তরের পর বালবের দীপন তীব্রতার অনুপাত কত?

ঘ. উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বালবের ব্যবহার দীপন তীব্রতার ওপর কী ধরনের প্রভাব ফেলে। মতামত দাও।

চতুর্দশ অধ্যায়

আলোর প্রতিফলন

REFLECTION OF LIGHT

আয়নার সামনে দাঁড়ালে আমরা আয়নায় আমাদের বিম্ব দেখি। দর্পণে আলোর প্রতিফলনের ফলে বিম্বের সৃষ্টি হয়। এই অধ্যায়ে আমরা আলোর প্রতিফলনের সূত্রাবলি, বিভিন্ন প্রকার দর্পণ, রশ্মি চিত্রের সাহায্যে দর্পণে বিম্বের সৃষ্টি এবং দর্পণে সৃষ্ট বিম্বের প্রকৃতি ও আকৃতি নিয়ে আলোচনা করব।

১৪.১ আলোর প্রতিফলন
Reflection of Light

কোনো স্বচ্ছ সমসত্ব মাধ্যমে আলোক রশ্মি সরলরেখায় চলে। কিন্তু আলো যখন এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যায় তখন সাধারণভাবে তিন ধরনের ঘটনা ঘটে; যথা–

১. কিছু পরিমাণ আলো প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসে বা আলোর প্রতিফলন হয়।
২. কিছু পরিমাণ আলো দ্বিতীয় মাধ্যম কর্তৃক শোষিত হয়।
৩. দ্বিতীয় মাধ্যম স্বচ্ছ হলে কিছু পরিমাণ আলো দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রবেশ করে বা আলোর প্রতিসরণ হয়।

প্রতিফলনের সংজ্ঞা : আলো যখন বায়ু বা অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় অন্য কোনো মাধ্যমে বাধা পায় তখন দুই মাধ্যমের বিভেদতল থেকে কিছু পরিমাণ আলো প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসে। একে আলোর প্রতিফলন বলে।

যে পৃষ্ঠ থেকে বাধা পেয়ে আলোক রশ্মি ফিরে আসে তাকে প্রতিফলক পৃষ্ঠ বলে।

আপতিত আলোর কতটুকু প্রতিফলিত হবে তা দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে; যথা–

১. আপতিত আলো প্রতিফলকের উপর কত কোণে আপতিত হচ্ছে; এবং
২. প্রথম ও দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রকৃতি।

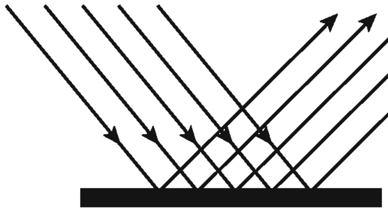
আপতিত রশ্মি যত বেশি কোণে আপতিত হয়, প্রতিফলনের পরিমাণও তত বেশি হয়। আবার প্রতিফলক যত মসৃণ হয় আলো তত বেশি প্রতিফলিত হয়, পক্ষান্তরে স্বচ্ছ প্রতিফলক থেকে আলো প্রতিফলিত হয় কম। দেখা গেছে, বায়ু মাধ্যম থেকে কাচ মাধ্যমে আলো যদি লম্বভাবে আপতিত হয় তাহলে প্রায় ৪.৫% পরিমাণ আলো প্রতিফলিত হয়। কিন্তু প্রতিফলক যদি সমতল দর্পণ হয় তাহলে প্রায় ৪০% আলো প্রতিফলিত হয়। আবার কোনো কালো বস্তুর উপর আলো পড়লে তা প্রকৃতপক্ষে প্রতিফলিত হয় না বরং ঐ তল কর্তৃক শোষিত হয়। এ জন্য ক্যামেরা, দূরবীক্ষণ ইত্যাদি আলোকীয় যন্ত্রের ভিতরের অংশ কালো করা হয়। আবার কোনো সাদা তলের ক্ষেত্রে ঠিক বিপরীত ঘটনা ঘটে। সাদা তল সব রঙের আলোই প্রতিফলিত করে, তাই সিনেমায় সাদা রঙের পর্দা ব্যবহার করা হয়। এতে বিম্বের ঔজ্জ্বল্য বেড়ে যায়।

প্রতিফলক পৃষ্ঠের প্রকৃতি অনুসারে প্রতিফলন দুই প্রকারের হতে পারে; যথা–

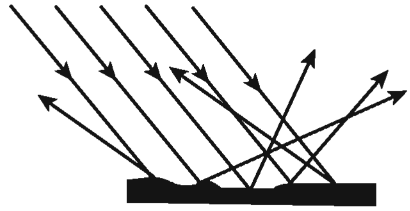
১. নিয়মিত প্রতিফলন (Regular reflection)
২. ব্যাপ্ত প্রতিফলন (Diffused reflection)

১. নিয়মিত প্রতিফলন : যদি একগুচ্ছ সমান্তরাল আলোক রশ্মি কোনো পৃষ্ঠে আপতিত হয়ে প্রতিফলনের পর রশ্মিগুচ্ছ যদি সমান্তরাল থাকে বা অভিসারী বা অপসারীগুচ্ছে পরিণত হয় তবে আলোর সেই প্রতিফলনকে নিয়মিত প্রতিফলন বলে।

প্রতিফলক পৃষ্ঠ মসৃণ হলে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে। সমতল দর্পণে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন হয়। এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি আলোক রশ্মির আপতন কোণ সমান হয় এবং প্রতিফলন কোণগুলোও সমান হয় (চিত্র ১৪.১ ক)।



(ক)



(খ)

চিত্র : ১৪.১

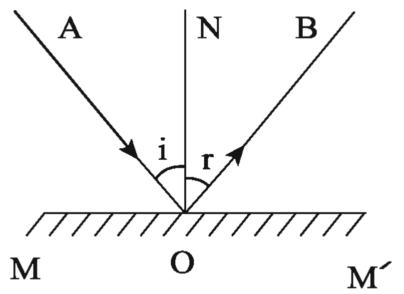
২. ব্যাপ্ত প্রতিফলন : যদি এক গুচ্ছ সমান্তরাল আলোক রশ্মি কোনো পৃষ্ঠে আপতিত হয়ে প্রতিফলনের পর আর সমান্তরাল থাকে না বা অভিসারী বা অপসারীগুচ্ছে পরিণত হয় না তখন আলোর সেই প্রতিফলনকে ব্যাপ্ত প্রতিফলন বলে।

প্রতিফলক পৃষ্ঠ মৃসণ না হলে এরূপ ঘটে। এ ক্ষেত্রে সমান্তরাল রশ্মিগুলো প্রতিফলক পৃষ্ঠের বিভিন্ন বিন্দুতে বিভিন্ন কোণে আপতিত হয়, ফলে তাদের প্রতিফলন কোণও বিভিন্ন হয়। এতে প্রতিফলিত রশ্মিগুলো আর সমান্তরাল থাকে না, বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে (চিত্র ১৪.১ খ)।

বেশির ভাগ পৃষ্ঠ যা খালি চোখে দেখলে মসৃণ মনে হয়, প্রকৃত পক্ষে সেগুলো অমসৃণ, অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলেই বুঝা যায় এগুলো কত এবড়ো থেবড়ো। ঘরের দেয়াল, ঘষা কাচ, কাগজ ইত্যাদি পৃষ্ঠ অমসৃণ বলে আলোক রশ্মির ব্যাপ্ত প্রতিফলন হয়। এর ফলে এ বস্তুগুলোকে যেদিক থেকেই দেখা হোক না কেন একই রকম উজ্জ্বল দেখায়। কিন্তু সমতল দর্পণে সুষম প্রতিফলন হয় বলে দর্পণের যে অংশ প্রতিফলনে অংশ গ্রহণ করে সেই অংশ বেশি উজ্জ্বল দেখায়। অমসৃণ তলের বক্রতা, রং এবং উপাদানের ওপর এই প্রতিফলন নির্ভর করে।

১৪.২। কয়েকটি সংজ্ঞা
A Few Definition

MM´একটি মসৃণ প্রতিফলক পৃষ্ঠ। ধরা যাক, AO আলোক রশ্মি প্রতিফলকের O বিন্দুতে পড়ে OB পথে প্রতিফলিত হয় (চিত্র১৪.২)।



চিত্র : ১৪.২

আপতিত রশ্মি (Incident ray) : যে রশ্মি প্রতিফলকের উপর এসে পড়ে তাকে আপতিত রশ্মি বলে। চিত্রে AO আপতিত রশ্মি।

আপতন বিন্দু (Point of incidence) : আপতিত রশ্মি প্রতিফলকের উপর যে বিন্দুতে এসে পড়ে তাকে আপতন বিন্দু বলে। চিত্রে O আপতন বিন্দু।

অভিলম্ব (Normal) : আপতন বিন্দুতে প্রতিফলকের উপর অঙ্কিত লম্বকে অভিলম্ব বলে। চিত্রে NO অভিলম্ব।

প্রতিফলিত রশ্মি (Reflected ray) : প্রতিফলকে বাধা পেয়ে যে রশ্মি আগের মাধ্যমে ফিরে আসে তাকে প্রতিফলিত রশ্মি বলে। চিত্রে **OB** প্রতিফলিত রশ্মি।

আপতন কোণ (Angle of incidence) : আপতিত রশ্মি ও অভিলম্বের মধ্যবর্তী কোণকে আপতন কোণ বলে। আপতন কোণকে i দ্বারা প্রকাশ করা হয়। চিত্রে $\angle AON$ আপতন কোণ।

প্রতিফলন কোণ (Angle of reflection) : প্রতিফলিত রশ্মি অভিলম্বের সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে তাকে প্রতিফলন কোণ বলে। প্রতিফলন কোণ r দ্বারা প্রকাশ করা হয়। চিত্রে $\angle NOB$ প্রতিফলন কোণ।

১৪.৩। আলোর প্রতিফলনের সূত্র
Laws of Reflection of Light

আলোর প্রতিফলন দুটি সূত্র মেনে চলে; যথা–

১. আপতিত রশ্মি, আপতন বিন্দুতে প্রতিফলকের উপর অঙ্কিত অভিলম্ব এবং প্রতিফলিত রশ্মি একই সমতলে থাকে।

২. আপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণ সর্বদা সমান হয়, অর্থাৎ, $\angle i = \angle r$

১৪.৪। দর্পণ
Mirror

যে মসৃণ তলে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে তাকে দর্পণ বলে।

সাধারণত কাচের একদিকে ধাতুর (সাধারণত রুপার) প্রলেপ লাগিয়ে দর্পণ তৈরি করা হয়। কাচের উপর ধাতুর প্রলেপ দেওয়াকে পারা লাগানো বা "সিলভারিং" করা বলে। কাচের যেদিকে পারা লাগানো হয় তার বিপরীত পৃষ্ঠকে দর্পণের পৃষ্ঠ বা প্রতিফলক পৃষ্ঠ বলে। পারা লাগানো কাচই যে কেবল দর্পণ তা নয়, যে কোনো মসৃণ তল যেমন পালিশ করা টেবিল, চকচকে ধাতব পাত, স্থির পানি পৃষ্ঠ, পরিষ্কার পারদ পৃষ্ঠ ইত্যাদি সবই দর্পণ হিসেবে কাজ করে।

দর্পণ প্রধানত দুপ্রকার ; যথা–

১. সমতল দর্পণ (Plane mirror) ও

২. গোলীয় দর্পণ (Spherical mirror)।

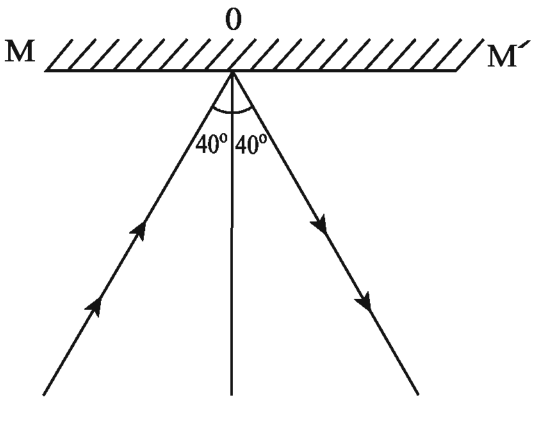
সমতল দর্পণ : কোনো সমতল পৃষ্ঠ যদি মসৃণ হয় এবং তাতে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে তবে তাকে সমতল দর্পণ বলে। আমরা প্রত্যহ চেহারা দেখার জন্য যে আয়না ব্যবহার করি সেটি সমতল দর্পণ।

গোলীয় দর্পণ : যে দর্পণের প্রতিফলক পৃষ্ঠ কোনো গোলকের অংশ বিশেষ তাকে গোলীয় দর্পণ বলে।

১৪.৫। প্রতিফলনের সূত্রের পরীক্ষামূলক প্রমাণ
Experimental Verification of the Laws of Reflection

একটি ড্রইং বোর্ডের উপর একটি সাদা কাগজ পিন দিয়ে আটকানো হয়। এই সাদা কাগজের উপর একটি সরলরেখা আঁকা হয় এবং সরলরেখার উপর একটি লম্ব টানা হয়। এরপর চাঁদার সাহায্যে লম্বের সাথে ৪০°, ৫০°, ৬০°, ৭০° এবং ৮০° কোণ এঁকে পিনের সাহায্যে পরীক্ষাটি করা হয়।

[বিস্তারিত পদ্ধতির জন্য ব্যবহারিক অংশ দ্রষ্টব্য।]



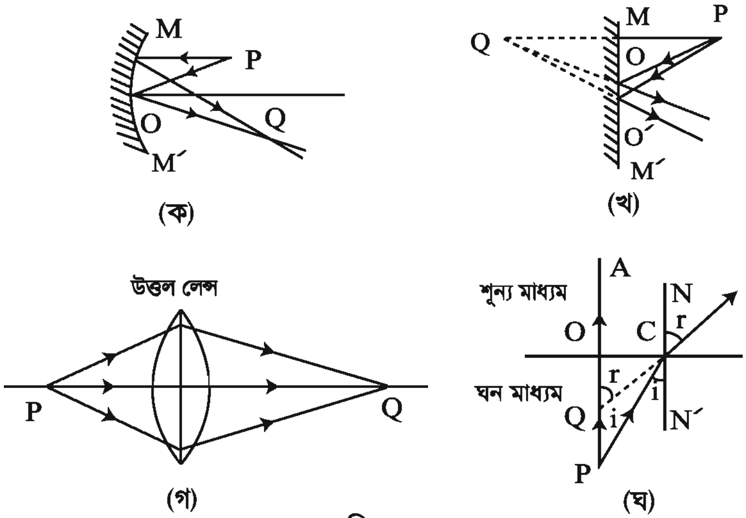
চিত্র : ১৪.৩

১৪.৬। বিম্ব
Image

আমরা প্রত্যহ আয়নায় আমাদের প্রতিচ্ছবি দেখি। শুধু আয়নাই নয়, যে কোনো মসৃণ তলের সামনে দাঁড়ালে প্রতিচ্ছবি দেখা যেতে পারে। কোনো বস্তু থেকে নিঃসৃত আলোক রশ্মি সরাসরি আমাদের চোখে প্রবেশ করলে আমরা সে বস্তুটি দেখতে পাই। বস্তু থেকে নিঃসৃত আলোক রশ্মি সরাসরি আমাদের চোখে না এসে যদি অন্য কোনো মাধ্যমে প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত হয়ে আমাদের চোখে প্রবেশ করে তাহলেও আমরা বস্তুটিকে দেখতে পাব, তবে তখন মনে হয় যেন বস্তুটি তার নিজের স্থানে নেই। তুমি যখন আয়নায় কোনো বস্তুর প্রতিচ্ছবি দেখ, তখন তোমার কাছে মনে হয় যেন বস্তুটি

আয়নার পিছনে আছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বস্তুটি আয়নার সামনেই থাকে। আয়নার উপস্থিতির জন্য নতুন অবস্থানে আমরা বস্তুটির যে প্রতিচ্ছবি দেখি তাই বস্তুর বিম্ব।

কোনো বিন্দু থেকে নিঃসৃত আলোক রশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত হয়ে যদি দ্বিতীয় কোনো বিন্দুতে মিলিত হয় বা দ্বিতীয় কোনো বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয়, তাহলে ঐ দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর বিম্ব বলে। ১৪.৪ চিত্রে Q হল P বিন্দুর বিম্ব।



চিত্র : ১৪.৪

বিম্ব দুই রকমের হয়। যথা–

১. সদ বিম্ব (Real image) ও

২. অসদ বিম্ব (Virtual image)।

১. সদ বিম্ব (Real image) : কোনো বিন্দু থেকে নিঃসৃত আলোক রশ্মিগুলো প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত হয়ে যদি দ্বিতীয় কোনো বিন্দুতে প্রকৃতপক্ষে মিলিত হয় তাহলে দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর সদ বিম্ব বলে। ১৪.৪ (ক) চিত্রে প্রতিফলনের দরুন সদ বিম্ব। ১৪.৪ (গ) চিত্রে প্রতিসরণের সদ বিম্ব দেখানো হল।

২. অসদ বিম্ব (Virtual image): কোনো বিন্দু থেকে নিঃসৃত আলোক রশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত হয়ে যদি দ্বিতীয় কোনো বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয়, তাহলে দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর অসদ বিম্ব বলে। ১৪.৪ (খ) চিত্রে প্রতিফলনের দরুন অসদ বিম্ব দেখানো হল। সমতল দর্পণে আমরা আমাদের এরূপ প্রতিবিম্ব দেখে থাকি। ১৪.৪ (ঘ) চিত্রে প্রতিসরণের দরুন অসদ বিম্ব দেখানো হল।

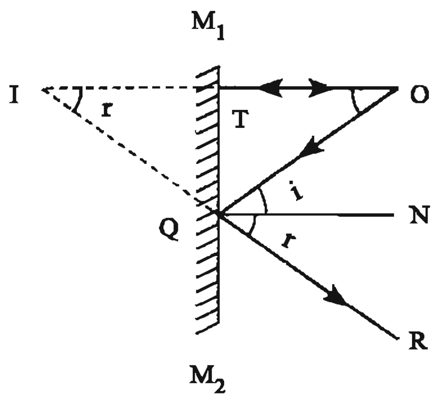
সদ ও অসদ বিম্বের পার্থক্য (Distinction between Real and Virtual image) :

সদ বিম্ব	অসদ বিম্ব
১. কোনো বিন্দু থেকে নিঃসৃত আলোক রশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলন বা প্রতিসরণের পর দ্বিতীয় কোনো বিন্দুতে মিলিত হলে সদ বিম্ব গঠিত হয়।	১. কোনো বিন্দু থেকে নিঃসৃত আলোক রশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলন বা প্রতিসরণের পর দ্বিতীয় কোনো বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হলে দ্বিতীয় বিন্দুতে অসদ বিম্ব গঠিত হয়।
২. প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত আলোক রশ্মির প্রকৃত মিলনের ফলে সদ বিম্ব গঠিত হয়।	২. অসদ বিম্বের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত রশ্মিগুলোর প্রকৃত মিলন হয় না।
৩. চোখে দেখা যায় এবং পর্দায়ও ফেলা যায়।	৩. চোখে দেখা যায় কিন্তু পর্দায় ফেলা যায় না।
৪. অবতল দর্পণ ও উত্তল লেন্সে উৎপন্ন হয়।	৪. সব রকম দর্পণ ও লেন্সে উৎপন্ন হয়।

১৪.৭। সমতল দর্পণে বিম্ব গঠন
Formation of Image by a Plane Mirror

(ক) বিন্দু লক্ষবস্তু (Point Object)

M_1M_2 একটি সমতল দর্পণের সামনে O একটি লক্ষবস্তু। O থেকে OT রশ্মি দর্পণে অভিলম্বভাবে আপতিত হয়ে TO পথে ফিরে আসে। আর একটি রশ্মি OQ প্রতিফলিত হয়ে QR পথে চলে যায়। QN অভিলম্ব। TO এবং QR প্রতিফলিত রশ্মি দুটি পিছনে বর্ধিত করলে I বিন্দুতে মিলিত হয়। অর্থাৎ, প্রতিফলিত রশ্মি দুটি যেন I বিন্দু থেকে আসছে মনে হয়। সুতরাং I বিন্দু O বিন্দুর অসদ বিম্ব।



চিত্র : ১৪.৫

এখন TO ও QN সমান্তরাল বলে, $\angle TOQ = \angle OQN = i$ ....(১৪.১)

আবার OI ও QN সমান্তরাল এবং RQI সরলরেখা এদের ছেদ করেছে।

$\therefore \angle TIQ = \angle NQR = r$ ....(১৪.২)

যেহেতু $i = r$ সুতরাং

(১৪.১) ও (১৪.২) সমীকরণ থেকে $\angle TOQ = \angle TIQ$ এখন Δ QOT ও Δ QTI –এর মধ্যে

$\angle TOQ = \angle TIQ$, TQ সাধারণ বাহু এবং

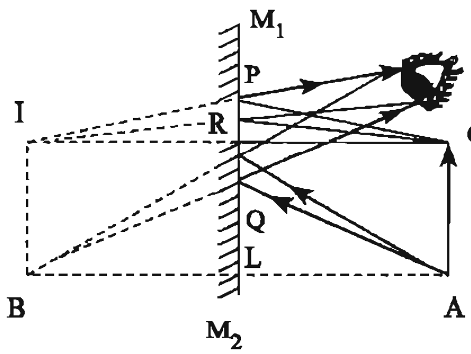
$\angle QTO = \angle QTI$ [উভয়ই 90°]

$\therefore$ ত্রিভুজদ্বয় সর্বসম।

সুতরাং OT =TI

অর্থাৎ, লক্ষবস্তু O দর্পণের যত সামনে থাকে বিম্ব I দর্পণের ঠিক ততটা পেছনে গঠিত হয়।

(খ) বিস্তৃত লক্ষবস্তু (Extended Object) যে কোনো বিস্তৃত বস্তুকে অসংখ্য বিন্দু বস্তুর সমষ্টি বলে মনে করা হয়। প্রত্যেক বিন্দুর জন্যই দর্পণের পিছনে অসদ বিম্ব গঠিত হয়। [চিত্র ১৪.৬]।



চিত্র : ১৪.৬

চিত্রে বস্তু OA এবং প্রতিবিম্ব IB। O ও A থেকে M_1M_2 –এর উপর দুটি লম্ব টানা হল। ধরা যাক, এরা M_1M_2–কে যথাক্রমে R ও L বিন্দুতে ছেদ করল। এখন OR ও AL–কে যথাক্রমে I ও B পর্যন্ত এমনভাবে বাড়ানো হল যেন,

OR = IR এবং AL = BL হয়।

I, B যোগ করা হল। তাহলে IB হল M_1M_2 দর্পণে গঠিত OA লক্ষবস্তুর অসদ বিম্ব।

সমতল দর্পণে গঠিত প্রতিবিম্ব সোজা হয় এবং প্রতিবিম্বের আকার লক্ষবস্তুর সমান হয়।

সমতল দর্পণে বিম্বের পার্শ্ব পরিবর্তন (Lateral inversion)

সমতল দর্পণের সামনে দাঁড়ালে আমাদের ডান হাতকে বাম হাত এবং বাম হাতকে ডান হাত বলে মনে হয়। মনে হয় যেন সমগ্র দেহের পার্শ্ব পরিবর্তন হয়েছে। একে পার্শ্ব পরিবর্তন বলে। সমতল দর্পণে সৃষ্ট বিম্বের দূরত্ব লক্ষবস্তুর দূরত্বের সমান হওয়ার জন্য এরকম হয়।

একটি কাগজে 'ক' অক্ষর লিখে একটি সমতল দর্পণের সামনে ধরলে দেখা যাবে প্রতিবিম্ব উল্টে গেছে [চিত্র ১৪.৭]। তবে প্রতিসম বস্তুর ক্ষেত্রের পার্শ্ব পরিবর্তন বুঝা যায় না। যেমন বাংলা "৪"–এর পার্শ্ব পরিবর্তন বুঝা যায় না।

সমতল দর্পণে সৃষ্ট বিম্বের বৈশিষ্ট্য

সমতল দর্পণে সৃষ্ট বিম্বের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ রয়েছে :

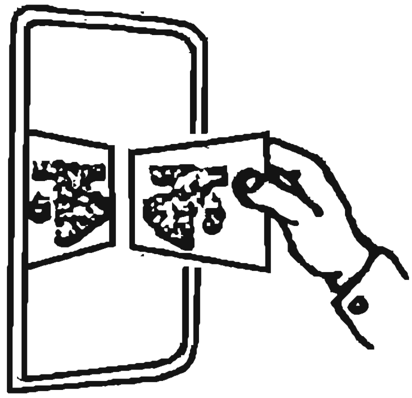
১. দর্পণ থেকে বস্তুর দূরত্ব যত, দর্পণ থেকে বিম্বের দূরত্বও তত।

২. বস্তু ও বিম্ব যে সরলরেখায় অবস্থিত, সেটি দর্পণকে লম্বভাবে ছেদ করে।

৩. বিম্ব অসদ ও সোজা।

৪. বিম্বের পার্শ্ব পরিবর্তন ঘটে।

৫. বিম্বের আকার বস্তুর আকারের সমান।



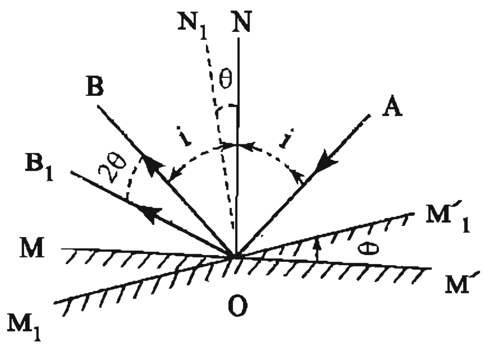
চিত্র : ১৪.৭

১৪.৮। সমতল দর্পণে প্রতিফলনের কয়েকটি ঘটনা

Some Phenomenon of Reflection on Plane Mirror

১। কোন সমতল দর্পণকে যে কোণে ঘুরান হয় প্রতিফলিত রশ্মি তার দ্বিগুণ কোণে ঘুরে যায় :

আপতিত রশ্মির দিক পরিবর্তন না করে যদি দর্পণকে θ কোণে ঘুরান হয় তাহলে প্রতিফলিত রশ্মি 2θ কোণে ঘুরে যায়।



চিত্র : ১৪.৮

ধরা যাক, MM′ দর্পণটি O বিন্দু বরাবর ঘুরতে পারে [চিত্র ১৪.৮]। MM′ অবস্থান AO আপতিত রশ্মি এবং OB প্রতিফলিত রশ্মি। ON, O বিন্দুতে অভিলম্ব।

এখন $\angle AON = i$ হলে, প্রতিফলনের সূত্রানুসারে

$\angle AON = \angle BON = i$

সুতরাং $\angle AOB = 2i$

এবার দর্পণটিকে θ কোণে ঘুরিয়ে M_1M_1' অবস্থানে আনা হল। সুতরাং অভিলম্ব θ কোণে ঘুরে ON_1 অবস্থানে আসবে। এ অবস্থায় OB_1 হবে প্রতিফলিত রশ্মি। সুতরাং প্রতিফলিত রশ্মি $\angle BOB_1$ কোণে ঘুরে যাবে।

এখন প্রতিফলনের সূত্রানুযায়ী, $\angle AON_1 = \angle B_1ON_1$

কিন্তু $\angle AON_1 = i + \theta$

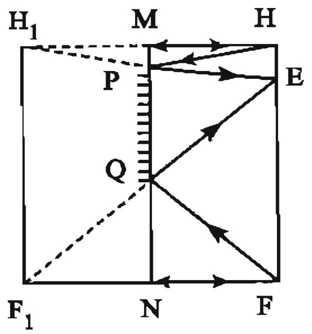
সুতরাং $\angle AOB_1 = 2(i + \theta)$

$\therefore \angle BOB_1 = \angle AOB_1 - \angle AOB = 2(i + \theta) - 2i = 2\theta$

অর্থাৎ, আপতিত রশ্মিকে স্থির রেখে দর্পণকে θ কোণে ঘুরালে প্রতিফলিত রশ্মি 2θ কোণে ঘুরে যাবে।

২। সমতল দর্পণে নিজের পূর্ণ বিম্ব দেখতে হলে দর্পণের দৈর্ঘ্য দর্শকের উচ্চতার কমপক্ষে অর্ধেক হওয়া প্রয়োজন :

HEF একজন দর্শক। H তার মাথা, E চোখ এবং F পায়ের পাতা। MN দর্শকের সামনে একটি দর্পণ (চিত্র ১৪.৯)। এই দর্পণে নিজের পূর্ণ বিম্ব দেখতে হলে H ও F থেকে আলোক রশ্মি দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে দর্শকের চোখ E–তে পৌঁছতে হবে। এখন বিম্ব গঠনের সূত্রানুসারে $HF = H_1F_1$ এবং $HM = H_1M$ ও $FN = F_1N$



চিত্র : ১৪.৯

এবার H_1E ও F_1E যোগ করা হল। এগুলো দর্পণকে যথাক্রমে P ও Q বিন্দুতে ছেদ করে। HP ও FQ যোগ করা হল। দর্শকের সর্বোচ্চ বিন্দু H থেকে রশ্মি দর্পণের P বিন্দুতে আপতিত হয়ে H_1 বিম্ব গঠন করে। একইভাবে F থেকে আলোক রশ্মি দর্পণের Q বিন্দুতে আপতিত হয়ে F_1 বিম্ব গঠন করে। সুতরাং FH দর্শকের সম্পূর্ণ বিম্ব দেখতে হলে দর্পণের দৈর্ঘ্য PQ হওয়া প্রয়োজন।

এখন, HH_1E ত্রিভুজে HH_1 বাহুর মধ্যবিন্দু M ; HE ও MP সমান্তরাল। সুতরাং P হল H_1E বাহুর মধ্যবিন্দু। একইভাবে F_1FE ত্রিভুজের EF_1 বাহুর মধ্যবিন্দু Q।

এখন H_1EF_1 ত্রিভুজের EH_1 ও EF_1 বাহুর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে P ও Q। আবার $PQ \parallel H_1F_1$

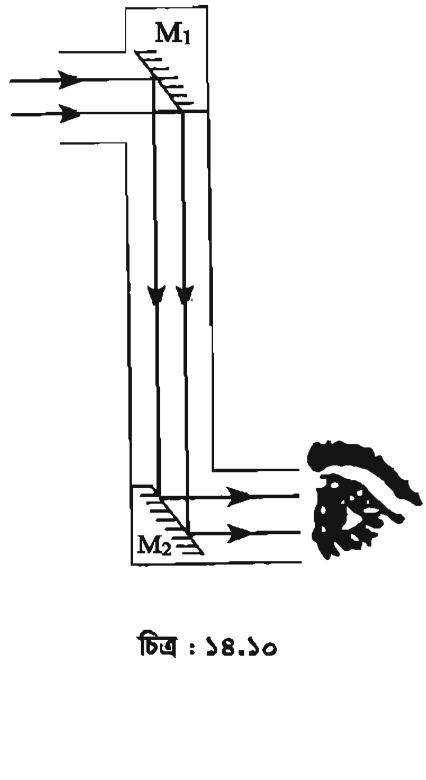
সুতরাং $PQ = \frac{1}{2} H_1F_1 = \frac{1}{2} HF$

$\therefore$ দর্পণের দৈর্ঘ্য $= \frac{1}{2} \times$ দর্শকের উচ্চতা

অর্থাৎ, সমতল দর্পণে নিজের পূর্ণ বিম্ব দেখতে হলে দর্পণের দৈর্ঘ্য দর্শকের উচ্চতার কমপক্ষে অর্ধেক হওয়া প্রয়োজন।

৩. সরল পেরিস্কোপ (Simple Periscope) : কোনো দূরের জিনিস সোজাসুজি দেখতে বাধা থাকলে এই যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। দুটি সমতল দর্পণের ক্রমিক প্রতিফলন ব্যবহার করে এ যন্ত্র তৈরি করা হয়। ১৪.১০ চিত্রে একটি সরল পেরিস্কোপ দেখানো হয়েছে। একটি লম্বা আয়তাকার কাঠ বা ধাতব নলের মধ্যে দুটি সমতল দর্পণকে মুখোমুখি পরস্পরের সমান্তরাল এবং নলের অক্ষের সাথে 45° কোণ করে রাখা হয়। দূরের বস্তু থেকে আলোক রশ্মি প্রথমে সোজা এসে M_1 দর্পণে আপতিত হয়। আপতিত রশ্মি M_1 দর্পণ দ্বারা প্রতিফলিত হয়ে নলের অক্ষ বরাবর এসে M_2 দর্পণে পড়ে। আলোক রশ্মি M_2 দর্পণে পুনরায় প্রতিফলিত হয়ে অনুভূমিকভাবে চোখে পড়ে ফলে বস্তুটি দেখা যায়।

ভীড় এড়িয়ে খেলা দেখা, শত্রু সৈন্যের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি কাজে এ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। ডুবোজাহাজে আরো উন্নত ধরনের পেরিস্কোপ ব্যবহার করা হয়।



চিত্র : ১৪.১০

ভাল সমতল দর্পণের বৈশিষ্ট্য

একটি ভাল সমতল দর্পণের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন :

১. দর্পণের পৃষ্ঠ সমতল হতে হবে।

২. দর্পণের পুরুত্ব কম এবং সুষম হতে হবে।

৩. দর্পণের পিছনে ধাতব প্রলেপ ভালো হতে হবে। প্রলেপ যত ভালো হবে বিম্ব তত উজ্জ্বল হয়।

৪. দর্পণের কাচ বায়ু বুদবুদ শূন্য হবে।

১৪.৯। গোলীয় দর্পণ
Spherical Mirror

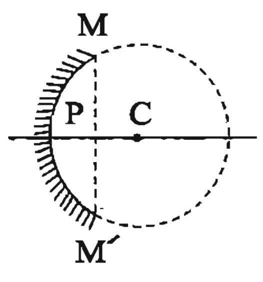
গোলীয় পৃষ্ঠে আলোর প্রতিফলনের জন্য গোলীয় দর্পণ ব্যবহার করা হয়।

কোনো ফাঁপা গোলকের পৃষ্ঠের অংশ বিশেষ যদি মসৃণ হয় এবং তাতে আলোক রশ্মির নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে তবে তাকে গোলীয় দর্পণ বলে।

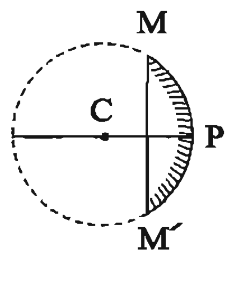
১৪.১১ এবং ১৪.১২ চিত্রে MPM′ একটি গোলীয় দর্পণ। একটি স্বচ্ছ ফাঁপা গোলকের খানিকটা অংশ কেটে নিয়ে যদি একদিকে পারা লাগানো হয় তাহলে একটি গোলীয় দর্পণ তৈরি হয় । গোলীয় দর্পণ দুই প্রকার হয়।

যথা– (১) অবতল দর্পণ (Concave mirror) এবং (২) উত্তল দর্পণ (Convex mirror)।

১. অবতল দর্পণ : কোনো ফাঁপা গোলকের ভিতরের পৃষ্ঠের কিছু অংশ যদি মসৃণ হয় এবং তাতে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে, অর্থাৎ, গোলকের অবতল পৃষ্ঠ যদি প্রতিফলকরূপে কাজ করে, তবে তাকে অবতল দর্পণ বলে। কোনো স্বচ্ছ ফাঁকা গোলকের খানিকটা অংশ যদি কেটে নিয়ে এর বাইরের পৃষ্ঠে অর্থাৎ, উত্তল পৃষ্ঠে পারা লাগানো হয় তাহলে অবতল দর্পণ তৈরি হয় [চিত্র ১৪.১১]।



চিত্র : ১৪.১১



চিত্র : ১৪.১২

২. উত্তল দর্পণ : কোনো ফাঁপা গোলকের বাইরের পৃষ্ঠের কিছু অংশ যদি মসৃণ হয় এবং তাতে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে, অর্থাৎ, গোলকের উত্তল পৃষ্ঠে যদি প্রতিফলকরূপে কাজ করে, তবে তাকে উত্তল দর্পণ বলে। কোনো স্বচ্ছ ফাঁপা গোলক থেকে কেটে নেওয়া অংশের অবতল দিকে, অর্থাৎ, ভিতরের দিকে যদি পারা লাগানো হয়, তাহলে উত্তল দর্পণ তৈরি হয় [চিত্র ১৪.১২]।

কয়েকটি সংজ্ঞা

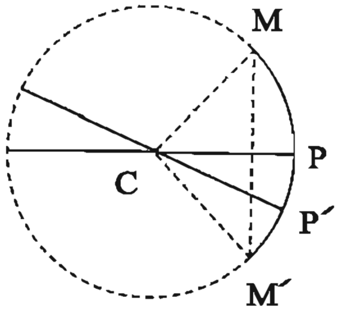
১. মেরু (Pole) : গোলীয় দর্পণের প্রতিফলক পৃষ্ঠের মধ্য বিন্দুকে দর্পণের মেরু বলে। ১৪.১৩ চিত্রে P দর্পণের মেরু । অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে প্রতিফলক পৃষ্ঠের সবচেয়ে নিচু বিন্দু এবং উত্তল দর্পণের প্রতিফলক পৃষ্ঠের সবচেয়ে উঁচু বিন্দুই মেরু ।

২. বক্রতার কেন্দ্র (Centre of curvature) : গোলীয় দর্পণ যে গোলকের অংশ, সেই গোলকের কেন্দ্রকে ঐ দর্পণের বক্রতার কেন্দ্র বলে। ১৪.১৩ চিত্রে C দর্পণের বক্রতার কেন্দ্র। বক্রতার কেন্দ্র একটি বিন্দু।

৩. বক্রতার ব্যাসার্ধ (Radius of curvature) : গোলীয় দর্পণ যে গোলকের অংশ , সেই গোলকের ব্যাসার্ধকে ঐ গোলীয় দর্পণের বক্রতার ব্যাসার্ধ বলে। ১৪.১৩ চিত্রে PC, MC বা M′ C দৈর্ঘ্য MPM′ দর্পণের বক্রতার ব্যাসার্ধ। মেরু থেকে বক্রতার কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্বকে বক্রতার ব্যাসার্ধ ধরা হয়। বক্রতার ব্যাসার্ধকে সাধারণত r দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

৪. প্রধান অক্ষ (Principal axis) : গোলীয় দর্পণের মেরু ও বক্রতার কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে গমনকারী সরলরেখাকে দর্পণের প্রধান অক্ষ বলে। ১৪.১৩ চিত্রে PC সরলরেখা দর্পণের প্রধান অক্ষ।

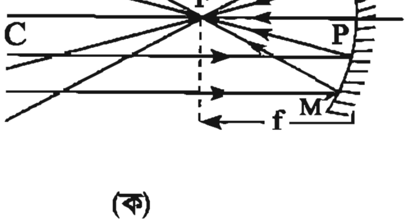
৫. গৌণ অক্ষ (Secondary axis) : মেরু বিন্দু ব্যতিত দর্পণের প্রতিফলকে পৃষ্ঠের উপরস্থ যেকোনো বিন্দু ও বক্রতার কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে গমনকারী সরলরেখাকে গৌণ অক্ষ বলে। ১৪.১৩ P′C সরলরেখা দর্পণের একটি গৌণ অক্ষ। প্রধান অক্ষ ও গৌণ অক্ষ উভয়ই দর্পণের উপর লম্ব।



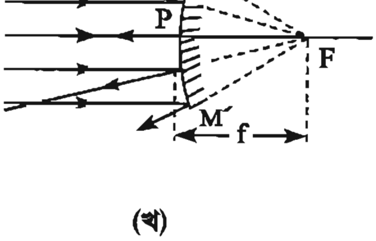
চিত্র : ১৪.১৩

৬. প্রধান ফোকাস (Principal Focus) : অবতল দর্পণে আপতিত প্রধান অক্ষের নিকটবর্তী সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলনের পর প্রধান অক্ষের উপরস্থ একটি বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করে। এই বিন্দুকে অবতল দর্পণের প্রধান ফোকাস বলে। ১৪.১৪ (ক) চিত্রে F বিন্দু অবতল দর্পণের প্রধান ফোকাস। এটি একটি সদ বিন্দু। উত্তল দর্পণে আপতিত প্রধান অক্ষের নিকটবর্তী সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলনের পর প্রধান অক্ষের উপরস্থ একটি বিন্দু থেকে অপসৃত হয় বলে মনে হয়। এই বিন্দুকে উত্তল দর্পণের প্রধান ফোকাস বলে। ১৪.১৪ (খ) চিত্রে F উত্তল দর্পণের প্রধান ফোকাস। এটি একটি অসদ বিন্দু।

গোলীয় দর্পণে আপতিত প্রধান অক্ষের নিকটবর্তী সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলনের পর প্রধান অক্ষের উপর যে বিন্দুতে মিলিত হয় (অবতল দর্পণে) বা যে বিন্দু থেকে অপসৃত হয় বলে মনে হয় (উত্তল দর্পণে) তাকে প্রধান ফোকাস বলে।



(ক)



(খ)

চিত্র : ১৪.১৪

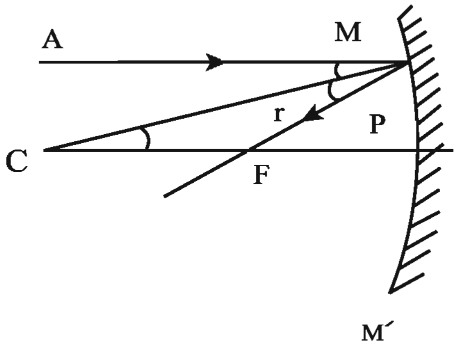
৭। ফোকাস দূরত্ব (Focal length) : গোলীয় দর্পণের মেরু থেকে প্রধান ফোকাস পর্যন্ত দূরত্বকে ফোকাস দূরত্ব বলে। ফোকাস দূরত্বকে f দ্বারা প্রকাশ করা হয়। ১৪.১৪ চিত্রে PF ফোকাস দূরত্ব।

৮ ফোকাস তল (Focal plane) : কোনো গোলীয় দর্পণের প্রধান ফোকাসের মধ্য দিয়ে প্রধান অক্ষের সাথে লম্বভাবে যে সমতল কল্পনা করা হয় তাকে ফোকাস তল বলে।

১৪.১০। গোলীয় দর্পণের ফোকাস দূরত্ব ও বক্রতার ব্যাসার্ধের মধ্যে সম্পর্ক
Relation Between Focal Length and Radius of Curvature of a Spherical Mirror.

ক. অবতল দর্পণ

ধরা যাক, MPM′ একটি অবতল দর্পণ (চিত্র ১৪.১৫)। C দর্পণের বক্রতার কেন্দ্র এবং P এর মেরু । ধরা যাক, প্রধান অক্ষ CP এর নিকটবর্তী এবং সমান্তরাল AM রশ্মি দর্পণের উপর M বিন্দুতে আপতিত হয়। CM যোগ করা হল। CM দর্পণের বক্রতার ব্যাসার্ধ বলে এটি M বিন্দুতে দর্পণের উপর লম্ব। এখন আপতন কোণ ∠AMC এর সমান করে ∠CMF কোণ অঙ্কন করলে MF প্রতিফলিত রশ্মি পাওয়া যায়। এই প্রতিফলিত রশ্মি প্রধান অক্ষকে F বিন্দুতে ছেদ করে। সংজ্ঞানুসারে F অবতল দর্পণের প্রধান ফোকাস। এখন প্রতিফলনের সূত্রানুসারে



চিত্র : ১৪.১৫

$\angle AMC = \angle CMF$

আবার AM এবং CP পরস্পর সমান্তরাল হওয়ায়
$\angle AMC = \angle MCF$ [একান্তর কোণ বলে]

বা, $\angle CMF = \angle MCF$ $\therefore$ MCF একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ।

সুতরাং MF = FC

এখন M বিন্দু P বিন্দুর খুব নিকটবর্তী হওয়ায় MF = PF লেখা যায়।

$\therefore$ PF = FC

অতএব, F, PC এর মধ্যবিন্দু।

সুতরাং $PF = \frac{1}{2} PC$ কিন্তু ফোকাস দূরত্ব, PF = f এবং বক্রতার ব্যাসার্ধ, PC= r

$\therefore f = \frac{r}{2}$ অর্থাৎ, অবতল দর্পণের ফোকাস দূরত্ব বক্রতার ব্যাসার্ধের অর্ধেক ।

খ. উত্তল দর্পণ

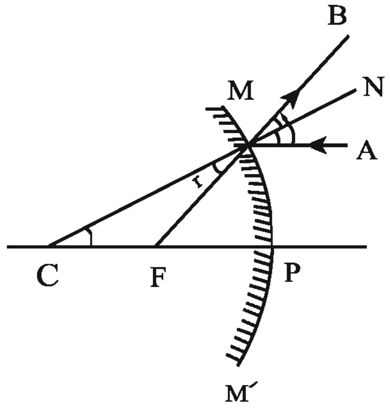
ধরা যাক, MPM′ একটি উত্তল দর্পণ [চিত্র ১৪.১৬] । C দর্পণের বক্রতার কেন্দ্র এবং P এর মেরু । ধরা যাক প্রধান অক্ষ PC–এর সমান্তরাল AM রশ্মি দর্পণের উপর M বিন্দুতে আপতিত হয়। CM যোগ করে N পর্যন্ত বাড়ানো হল। CM দর্পণের বক্রতার ব্যাসার্ধ বলে এটি M বিন্দুতে দর্পণের উপর লম্ব। এখন আপতন কোণ ∠AMN-এর সমান করে ∠NMB অঙ্কন করলে MB প্রতিফলিত রশ্মি পাওয়া যায়। এই প্রতিফলিত রশ্মিকে পিছন দিকে বাড়ালে প্রধান অক্ষকে F বিন্দুতে ছেদ করে। সংজ্ঞানুসারে F উত্তল দর্পণের প্রধান ফোকাস। এখন প্রতিফলনের সূত্রানুসারে–

$\angle AMN = \angle NMB$

আবার, AM ও PC পরস্পর সমান্তরাল হওয়ায়,

$\angle AMN = \angle MCF$ [অনুরূপ কোণ বলে]

এবং $\angle NMB = \angle CMF$ [বিপ্রতীপ কোণ বলে]
সুতরাং $\angle CMF = \angle MCF$
$\therefore$ MCF একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ। সুতরাং MF = FC
এখন M বিন্দু P বিন্দুর খুব নিকটবর্তী হওয়ায়
MF = PF লেখা যায়।
$\therefore$ PF = FC
অর্থাৎ, F, PC –এর মধ্যবিন্দু।
সুতরাং $PF = \frac{1}{2} PC$
কিন্তু ফোকাস দূরত্ব, PF = f
এবং বক্রতার ব্যাসার্ধ, PC = r



চিত্র ঃ ১৪.১৬

$\therefore f = \frac{r}{2}$

অর্থাৎ, উত্তল দর্পণের ফোকাস দূরত্ব বক্রতার ব্যাসার্ধের অর্ধেক।

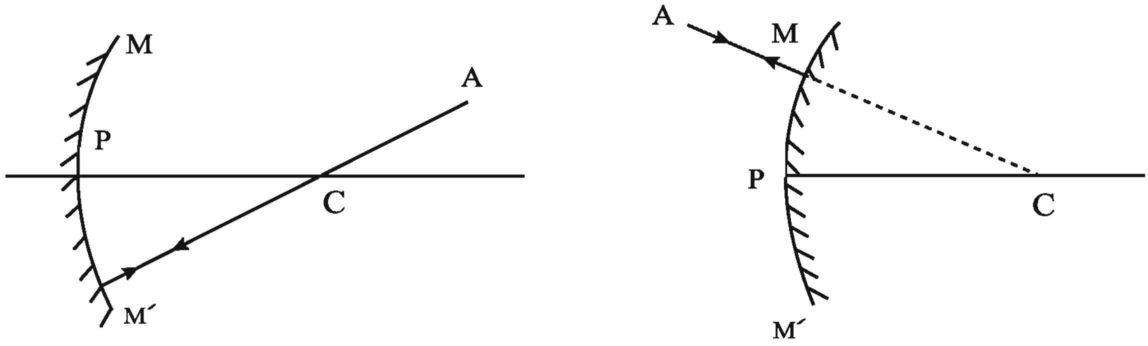
সুতরাং দেখা যায় যে, অবতল বা উত্তল অর্থাৎ, যে কোনো গোলীয় দর্পণের ফোকাস দূরত্ব বক্রতার ব্যাসার্ধের অর্ধেক।

১৪.১১। গোলীয় দর্পণে রশ্মি চিত্র
Ray Diagram in Spherical Mirror

গোলীয় দর্পণের সামনে কোনো বস্তু রাখলে দর্পণে তার বিম্ব গঠিত হয়। এই বিম্বের অবস্থান, আকৃতি ও প্রকৃতি কেমন হবে তা জানতে হলে, বস্তু থেকে নিঃসৃত আলোক রশ্মিগুচ্ছ দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে কোথায় মিলিত হয় বা কোথা থেকে আসছে বলে মনে হয় তা জানতে হবে। গোলীয় দর্পণের প্রধান ফোকাস তথা বক্রতার কেন্দ্র নির্দিষ্ট থাকলে কয়েকটি বিশেষ রশ্মি ঐ দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে কোন পথে যাবে তা আমরা সহজেই স্থির করতে পারি। এ সকল রশ্মির রশ্মিচিত্র অঙ্কন করে আমরা সহজে বিম্বের অবস্থান, প্রকৃতি ও আকৃতি নির্ণয় করতে পারি। উত্তল ও অবতল উভয় প্রকার দর্পণের ক্ষেত্রে সচরাচর নিচের তিন ধরনের রশ্মি ব্যবহার করে বিম্ব অঙ্কন করা যায়। যেমন–

১. গোলীয় দর্পণের বক্রতার ব্যাসার্ধ বরাবর আপতিত রশ্মি প্রতিফলনের পর আবার সেই পথে ফিরে যায়।

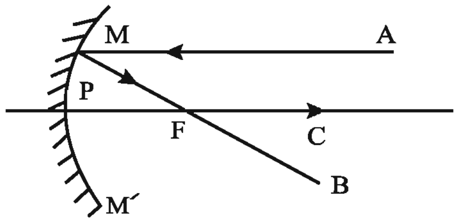
১৪.১৭ (ক) চিত্রে একটি রশ্মি AM′ অবতল দর্পণে বক্রতার ব্যাসার্ধ বরাবর M′ বিন্দুতে লম্বভাবে আপতিত হয়ে M′A পথে প্রতিফলিত হয়। ১৪.১৭ (খ) চিত্রে একটি রশ্মি AM উত্তল দর্পণে বক্রতার ব্যাসার্ধ বরাবর M বিন্দুতে লম্বভাবে আপতিত হয়ে MA পথে প্রতিফলিত হয়।



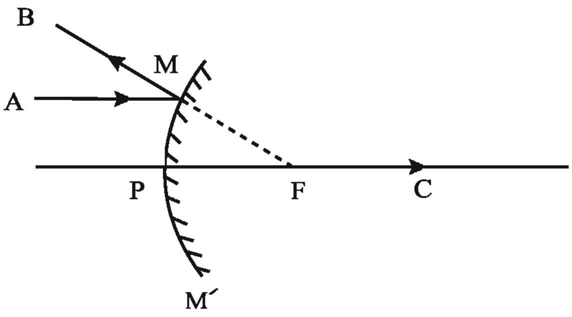
(ক) (খ)

চিত্র : ১৪.১৭

২. গোলীয় দর্পণের প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আপতিত রশ্মি প্রতিফলনের পর প্রধান ফোকাস দিয়ে যায় (অবতল দর্পণে) বা প্রধান ফোকাস থেকে আসছে বলে মনে হয় (উত্তল দর্পণে)



চিত্র ঃ ১৪.১৮ (ক)

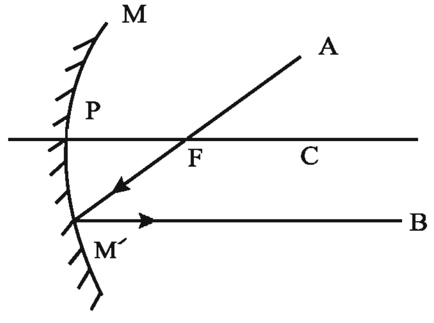


চিত্র ঃ ১৪.১৮ (খ)

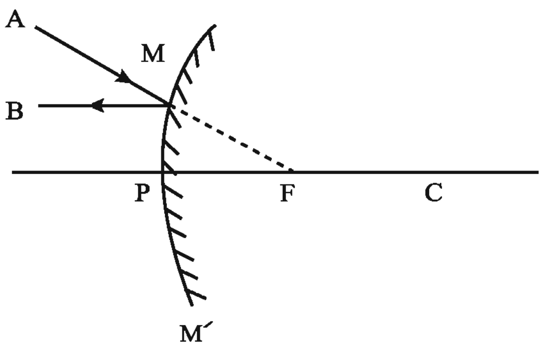
১৪.১৮ (ক) চিত্রে একটি রশ্মি AM অবতল দর্পণের প্রধান অক্ষ CP এর সমান্তরালে M বিন্দুতে আপতিত হয়ে প্রধান ফোকাস F দিয়ে MB পথে প্রতিফলিত হয়। ১৪.১৮ (খ) চিত্রে একটি রশ্মি AM উত্তল দর্পণের প্রধান অক্ষ PC এর সমান্তরালে M বিন্দুতে আপতিত হয়ে MB পথে এমনভাবে প্রতিফলিত হয় যেন এটি প্রধান ফোকাস F থেকে আসছে বলে মনে হয়।

৩. গোলীয় দর্পণের প্রধান ফোকাসের মধ্য দিয়ে (অবতল দর্পণে) বা প্রধান ফোকাস অভিমুখে (উত্তল দর্পণে) আপতিত রশ্মি প্রতিফলনের পর প্রধান অক্ষের সমান্তরাল হয়ে যায়।

১৪.১৯ (ক) চিত্রে একটি রশ্মি AM′ অবতল দর্পণের প্রধান ফোকাস F দিয়ে M′ বিন্দুতে আপতিত হয়ে প্রধান অক্ষ PC এর সমান্তরালে M′B পথে প্রতিফলিত হয়। ১৪.১৯ (খ) চিত্রে উত্তল দর্পণের প্রধান ফোকাস F অভিমুখে আপতিত একটি রশ্মি AM দর্পণের M বিন্দুতে আপতিত হয়ে প্রধান অক্ষ CP–এর সমান্তরালে MB পথে প্রতিফলিত হয়।



(ক)

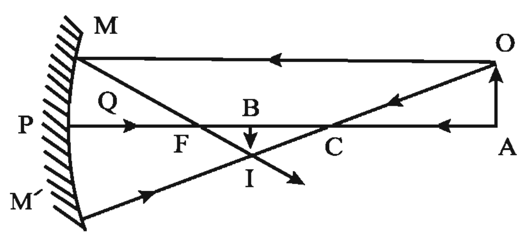


(খ)

চিত্র : ১৪.১৯

১৪.১২। বিস্তৃত বস্তুর বিম্ব
Image of an Extended Object

যে কোনো বিস্তৃত লক্ষবস্তু অসংখ্য বিন্দু বস্তুর সমষ্টি। এখন প্রত্যেকটি বিন্দু বস্তুর বিম্বের অবস্থান নির্ণয় করলেই সমগ্র বস্তুটির বিম্ব পাওয়া যায়। জ্যামিতিক উপায়ে কোনো সরল বিস্তৃত বস্তুর বিম্বের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য উপরে বর্ণিত রশ্মি চিত্রের সাহায্যে বস্তুটির সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বিন্দুদ্বয়ের বিম্ব অঙ্কন করা হয়। এখন একটি সরলরেখা দ্বারা বিম্বদ্বয় যোগ করে দিলে সমগ্র বস্তুটির বিম্ব পাওয়া যায়।

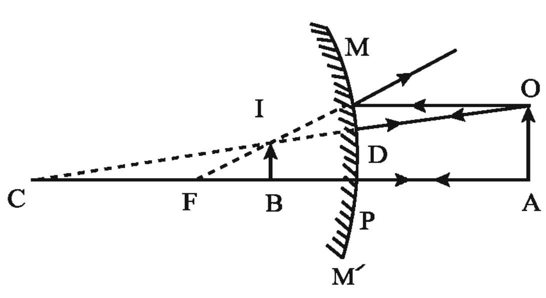


চিত্র : ১৪.২০

অবতল দর্পণ : ধরা যাক, MPM′ একটি অবতল দর্পণ। PC এর প্রধান অক্ষ, C বক্রতার কেন্দ্র, F প্রধান ফোকাস এবং P দর্পণের মেরু। এর সম্মুখে OA একটি বিস্তৃত লক্ষবস্তু প্রধান অক্ষের উপর লম্বভাবে অবস্থিত [চিত্র ১৪.২০]। OA এর বিম্ব নির্ণয় করতে হবে। OA বস্তুটির একে অন্যের উপর স্থাপিত অসংখ্য বিন্দু বস্তুর সমষ্টি হিসেবে কল্পনা করা যেতে পারে। এভাবে ধরে O ও A বিন্দু দুটি লক্ষবস্তুর দুটি প্রান্ত বিন্দু। এখন এই প্রান্ত বিন্দু O ও A–এর বিম্বের অবস্থান জানলেই OA -এর সম্পূর্ণ বিম্বের অবস্থান পাওয়া যাবে।

O বিন্দুর বিম্ব নির্ণয়ের জন্য O বিন্দু থেকে নিঃসৃত আলোক রশ্মির রশ্মি চিত্র আঁকতে হবে। O বিন্দু থেকে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল OM রশ্মি দর্পণের M বিন্দুতে আপতিত হয়ে প্রধান ফোকাসের মধ্য দিয়ে MI পথে প্রতিফলিত হয়। O থেকে আর একটি রশ্মি OCM´ দর্পণের বক্রতার কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে এসে দর্পণে আপতিত হওয়ায় প্রতিফলনের পর সেটি একই পথে ফিরে যায়। এখন O থেকে নির্গত রশ্মি দুটি প্রতিফলনের পর I বিন্দুতে প্রকৃতপক্ষে মিলিত হয়। সুতরাং I হচ্ছে O বিন্দুর সদ বিম্ব। A থেকে প্রধান অক্ষ বরাবর আপতিত রশ্মি ঐ পথেই ফিরে যায়। ফলে A এর বিম্ব ঐ রেখার উপরই হবে। যেহেতু OA লক্ষবস্তু প্রধান অক্ষের উপর লম্বভাবে অবস্থিত তাই I থেকে প্রধান অক্ষের উপর IB লম্ব টানলেই IB হবে OA লক্ষবস্তুর বিম্ব। এই বিম্ব সদ, উল্টো এবং আকারে লক্ষবস্তুর চেয়ে ছোট।

উত্তল দর্পণ : M P M´ একটি উত্তল দর্পণ। PC এর প্রধান অক্ষ, C বক্রতার কেন্দ্র, F প্রধান ফোকাস এবং P দর্পণের মেরু। একটি বিস্তৃত লক্ষবস্তু OA দর্পণের সামনে প্রধান অক্ষের উপর লম্বভাবে আছে [চিত্র ১৪.২১]। OA এর বিম্ব অঙ্কন করতে হবে।



চিত্র : ১৪.২১

O বিন্দু থেকে নিঃসৃত আলোক রশ্মি প্রধান অক্ষের সমান্তরাল হয়ে M বিন্দুতে আপতিত হলে প্রতিফলনের পর রশ্মিটি দর্পণের প্রধান ফোকাস F থেকে আসছে বলে মনে হয়। দর্পণের বক্রতার কেন্দ্রমুখী অপর একটি রশ্মি OD লম্বভাবে দর্পণে আপতিত হওয়ায় একই পথে প্রতিফলিত হয়।

এখন এই অপসারী প্রতিফলিত রশ্মিদ্বয়কে পিছনের দিকে বাড়িয়ে দিলে এরা I বিন্দু থেকে আসছে বলে মনে হবে। সুতরাং I বিন্দুই হবে O বিন্দুর অসদ বিম্ব। এখন I থেকে অক্ষের উপর IB লম্ব টানলে IB–ই হবে OA লক্ষবস্তুর অসদ বিম্ব।

১৪.১৩। রৈখিক বিবর্ধন
Linear Magnification

বিম্ব লক্ষবস্তুর তুলনায় কত গুণ বড় বা ছোট রৈখিক বিবর্ধন দ্বারা তা বুঝা যায়।

বিম্বের দৈর্ঘ্য ও লক্ষবস্তুর দৈর্ঘ্যের অনুপাতকে রৈখিক বিবর্ধন বলে।

কোনো লক্ষবস্তুর দৈর্ঘ্য L_o এবং বিম্বের দৈর্ঘ্য L_i হলে রৈখিক বিবর্ধন

$$m = \frac{\text{বিম্বের দৈর্ঘ্য}}{\text{লক্ষবস্তুর দৈর্ঘ্য}} = \frac{L_i}{L_o}$$

বিবর্ধনের মান 1–এর চেয়ে বড় হলে বিম্বটি বিবর্ধিত হবে অর্থাৎ, বিম্ব লক্ষবস্তুর তুলনায় বড়, বিবর্ধনের মান 1–এর সমান হলে বিম্ব লক্ষবস্তুর সমান এবং বিবর্ধনের মান 1–এর চেয়ে ছোট হলে বিম্বটি খর্বিত হবে অর্থাৎ, বিম্ব লক্ষবস্তুর তুলনায় ছোট হবে।

একটি বিম্বের পূর্ণ বিবরণ

একটি বিম্বের পূর্ণ বিবরণের জন্য নিচের বিষয়গুলো উল্লেখ করতে হয়; যথা–

১. অবস্থান : দর্পণ থেকে এর দূরত্ব।

২. প্রকৃতি : (ক) সদ না অসদ

(খ) সোজা না উল্টো।

৩. আকৃতি : বিবর্ধিত না খর্বিত না লক্ষবস্তুর সমান।

১৪.১৪। গোলীয় দর্পণের প্রধান অক্ষের উপর লক্ষবস্তুর বিভিন্ন অবস্থানের জন্য বিম্বের অবস্থান, প্রকৃতি ও আকৃতি নির্ণয়
Determination of the Position, Nature and Size of the lmage Formed by Spherical Mirror for Different Positions of an Object Placed on the Principal Axis.

গোলীয় দর্পণে গঠিত বিম্বের অবস্থান, আকৃতি ও প্রকৃতি দর্পনের সামনে অবস্থিত লক্ষবস্তুর অবস্থানের ওপর নির্ভর করে। লক্ষবস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটলে বিম্বের, আকৃতি ও প্রকৃতিরও পরিবর্তন ঘটে।

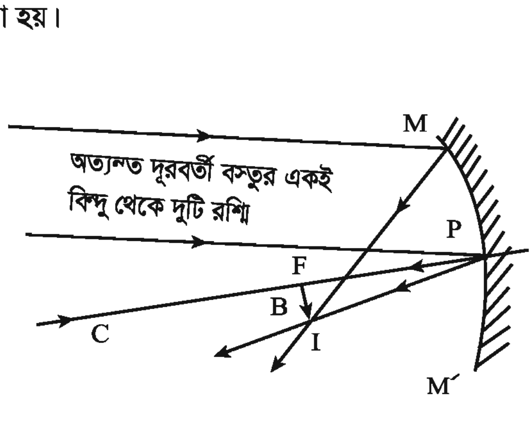
ধরা যাক, MPM′ একটি অবতল দর্পণ। P এর মেরু, F প্রধান ফোকাস এবং C বক্রতার কেন্দ্র। এর প্রধান অক্ষ PC–এর উপর বিভিন্ন অবস্থানে OA লক্ষবস্তু লম্বভাবে অবস্থিত [চিত্র ১৪.২২–১৪.২৭] OA এর বিম্ব অঙ্কনের জন্য ১৪.১১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত যে কোনো দুটি রশ্মি বিবেচনা করা হয়।

১. লক্ষবস্তু অসীম দূরে অবস্থিত : অসীম দূরে অবস্থিত লক্ষবস্তু শীর্ষ থেকে আগত পরস্পর সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ প্রধান অক্ষের সাথে আনতভাবে আপতিত হয়ে প্রতিফলনের পর ফোকাস তলের I বিন্দুতে মিলিত হয় [চিত্র ১৪.২২]। I থেকে প্রধান অক্ষের উপর অঙ্কিত IB লম্বই OA–এর বিম্ব।

অবস্থান : ফোকাস তলে।

প্রকৃতি : সদ ও উল্টো।

আকৃতি : অত্যন্ত খর্বিত।



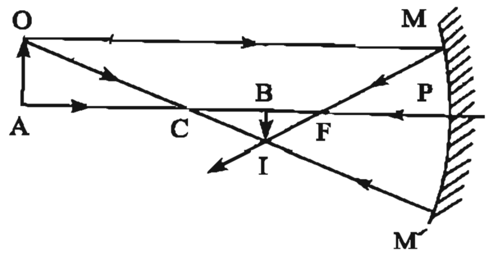
চিত্র : ১৪.২২

২. লক্ষবস্তু অসীম ও বক্রতার কেন্দ্রের মধ্যে : O থেকে একটি রশ্মি বক্রতার ব্যাসার্ধ বরাবর এবং একটি রশ্মি প্রধান অক্ষের সমান্তরাল বিবেচনা করলে প্রতিফলনের পর এগুলো I বিন্দুতে মিলিত হয় [চিত্র ১৪.২৩]। I থেকে প্রধান অক্ষের উপর অঙ্কিত IB লম্বই OA এর বিম্ব।

অবস্থান : বক্রতার কেন্দ্র ও প্রধান ফোকাসের মধ্যে।

প্রকৃতি : সদ ও উল্টো

আকৃতি : খর্বিত।



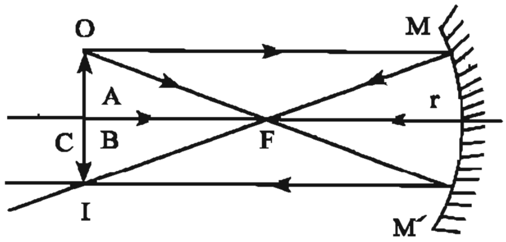
চিত্র : ১৪.২৩

৩. লক্ষবস্তু বক্রতার কেন্দ্রে : O থেকে একটি রশ্মি প্রধান অক্ষের সমান্তরাল এবং একটি রশ্মি প্রধান ফোকাস বরাবর বিবেচনা করলে প্রতিফলনের পর I বিন্দুতে মিলিত হয় [চিত্র ১৪.২৪]। I থেকে প্রধান অক্ষের উপর অঙ্কিত IB লম্বই OA এর বিম্ব।

অবস্থান : বক্রতার কেন্দ্রে।

প্রকৃতি : সদ ও উল্টো

আকৃতি : লক্ষবস্তুর সমান ।



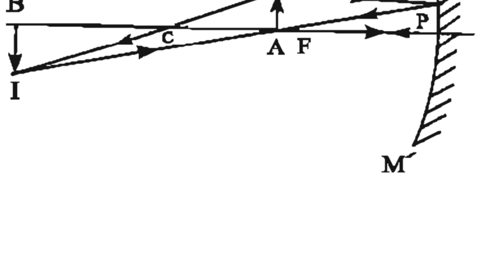
চিত্র : ১৪.২৪

৪. লক্ষবস্তু বক্রতার কেন্দ্র ও প্রধান ফোকাসের মধ্যে : O থেকে একটি রশ্মি বক্রতার ব্যাসার্ধ বরাবর এবং একটি রশ্মি প্রধান অক্ষের সমান্তরাল বিবেচনা করলে প্রতিফলনের পর I বিন্দুতে মিলিত হয় [চিত্র ১৪.২৫]। I থেকে প্রধান অক্ষের উপর IB অঙ্কিত লম্বই OA এর বিম্ব।

অবস্থান : বক্রতার কেন্দ্র ও অসীমের মধ্যে।

প্রকৃতি : সদ ও উল্টো

আকৃতি : বিবর্ধিত।



চিত্র : ১৪.২৫

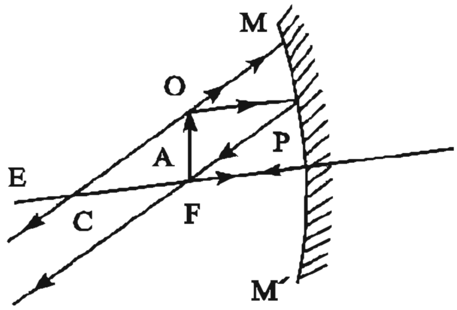
৫. লক্ষবস্তু প্রধান ফোকাসে : O থেকে একটি রশ্মি বক্রতার ব্যাসার্ধ বরাবর এবং একটি রশ্মি প্রধান অক্ষের সমান্তরাল বিবেচনা করলে প্রতিফলনের পর এগুলো পরস্পর সমান্তরাল হয় [চিত্র ১৪.২৬]।

দর্পণের সামনে এগুলো অসীমে মিলিত হয় অথবা পেছন দিকে বাড়ালে অসীম থেকে আসছে বলে মনে হয়।

অবস্থান : অসীমে।

প্রকৃতি : সদ ও উল্টো অথবা অসদ ও সোজা।

আকৃতি : অত্যন্ত বিবর্ধিত।



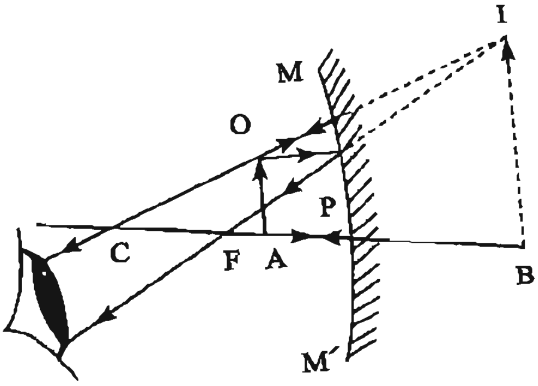
চিত্র : ১৪.২৬

৬. লক্ষবস্তু প্রধান ফোকাস ও মেরুর মধ্যে : O থেকে একটি রশ্মি বক্রতার ব্যাসার্ধ বরাবর ও একটি রশ্মি প্রধান অক্ষের সমান্তরাল বিবেচনা করলে প্রতিফলনের পর পরস্পর অপসারী হয়। এগুলোকে পিছন দিকে বাড়ালে I বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয়। I থেকে প্রধান অক্ষের উপর অঙ্কিত IB লম্বই OA এর বিম্ব [চিত্র ১৪.২৭]।

অবস্থান : দর্পণের পিছনে।

প্রকৃতি : অসদ ও সোজা।

আকৃতি : বিবর্ধিত।



চিত্র : ১৪.২৭

লক্ষবস্তু দর্পণের মেরুতে থাকলে বিম্ব দর্পণের মেরুতে গঠিত হয়। এক্ষেত্রে বিম্ব অসদ, সোজা এবং আকারে লক্ষবস্তুর সমান হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে যখন লক্ষবস্তু অসীম দূরত্বে থাকে তখন বিম্ব দর্পণের প্রধান ফোকাসে গঠিত হয়। এখন লক্ষবস্তুকে ক্রমশ সরিয়ে অসীম দূরত্ব থেকে বক্রতার কেন্দ্রে নিয়ে এলে বিম্বও ক্রমশ প্রধান ফোকাস থেকে বক্রতার কেন্দ্রে সরে আসে। এখানে সর্বক্ষেত্রে বিম্ব বাস্তব ও উল্টো হয় এবং এর আকার লক্ষবস্তুর চেয়ে অনেক ছোট থেকে ক্রমশ বড় হয়ে বক্রতার কেন্দ্রে এসে লক্ষবস্তুর সমান হয়।

এরপর লক্ষবস্তুকে বক্রতার কেন্দ্র থেকে প্রধান ফোকাসের দিকে সরিয়ে আনলে বিম্ব বক্রতার কেন্দ্র থেকে অসীমের দিকে সরে যায়। এখানেও সর্বক্ষেত্রে বিম্ব সদ, উল্টো ও আকারে লক্ষবস্তুর চেয়ে ক্রমশ বড় হতে থাকে। লক্ষবস্তু প্রধান ফোকাসে থাকলে বিম্ব অসীম দূরত্বে সরে যায় এবং অসীম গুণ বিবর্ধিত হয়।

এবার লক্ষবস্তুকে প্রধান ফোকাস থেকে ক্রমশ দর্পণের মেরুর দিকে নিয়ে গেলে বিম্ব দর্পণের সামনে অসীম দূরত্ব থেকে দর্পণের পিছনে চলে যায় এবং ক্রমশ দর্পণের মেরুর দিকে সরে আসে। এখানে বিম্ব সর্বক্ষেত্রে অসদ ও সোজা হয় এবং আকার ক্রমশ ছোট হতে থাকে। লক্ষবস্তু যখন মেরুতে পৌঁছে, বিম্বও তখন মেরুতে গঠিত হয়। এখানে বিম্ব অসদ ও সোজা তবে আকার লক্ষবস্তুর আকারের সমান।

১৪.১৫। দর্পণ চেনার উপায়
Identification of Mirror

কোনো দর্পণের একেবারে নিকটে একটি আঙুল খাড়াভাবে স্থাপন করলে যদি সোজা বিম্ব লক্ষবস্তুর চেয়ে বড় হয় তাহলে দর্পণটি অবতল, আর যদি ছোট হয় তাহলে দর্পণটি উত্তল এবং বিম্ব লক্ষবস্তুর সমান হলে দর্পণটি সমতল হবে।

১৪.১৬। দর্পণের ব্যবহার
Uses of Mirrors

বিভিন্ন ধরনের দর্পণ আমরা বিভিন্নভাবে ব্যবহার করি।

সমতল দর্পণ : সমতল দর্পণ দর্শকের চেহারা দেখার জন্য ব্যবহার করা হয়। এই দর্পণের সাহায্যে সরল পেরিস্কোপ তৈরি করা হয়।

অবতল দর্পণ : অভিসারী রশ্মিগুচ্ছ সৃষ্টি করতে বা কোনো বস্তুর বিবর্ধিত বিম্ব সৃষ্টি করতে ব্যবহার করা হয়। সুবিধাজনক আকৃতির অবতল দর্পণ ব্যবহার করে মুখমণ্ডলের বিবর্ধিত বিম্ব তৈরি করা হয়, এতে রূপ চর্চা ও দাঁড়ি কাটার সময় সুবিধা হয়। কোনো স্টিমারের সার্চ লাইটে প্রতিফলক হিসেবে অবতল দর্পণ ব্যবহার করা হয়। নভো দূরবীক্ষণেও অবতল দর্পণের ব্যবহার দেখা যায়। এ দর্পণের সাহায্যে আলোক রশ্মিগুচ্ছকে একত্রিত করে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে ফেলা যায় বলে ডাক্তাররা চোখ, নাক, কান ও গলা পর্যবেক্ষণ করার সময় এ দর্পণ ব্যবহার করেন।

উত্তল দর্পণ : উত্তল দর্পণে যে কোনো বস্তুর অসদ, সোজা ও বস্তুর চেয়ে ছোট বিম্ব গঠন করে বলে পিছনের যানবাহন বা পথচারী দেখার জন্য বিভিন্ন গাড়িতে এ দর্পণ ব্যবহার করা হয়। এ দর্পণ আলোক রশ্মি চারদিকে ছড়িয়ে দেয় বলে মোটর গাড়ির হেডলাইট বা রাস্তার লাইটে প্রতিফলক হিসেবে উত্তল দর্পণ ব্যবহার করা হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের অংশটুকু পড়ে ১–২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

একটি সমতল দর্পণের সামনে একটি 10 মিটার দৈর্ঘ্যের লক্ষবস্তু রাখা হল। তাতে বস্তুটির পূর্ণ বিম্ব গঠিত হল।

১। দর্পণের ন্যূনতম দৈর্ঘ্য–

ক. 5m   খ. 10m

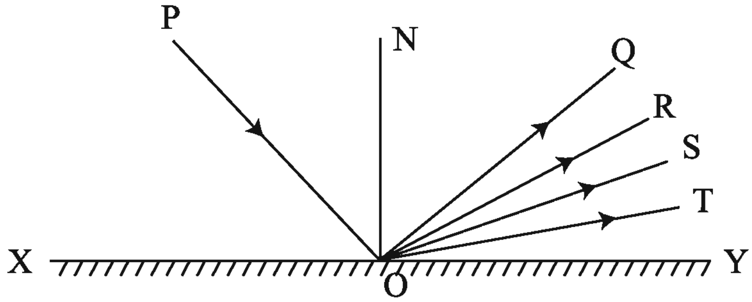
গ. 20m   ঘ. 40m

২। বস্তুটির বিবর্ধন

ক. 0.2   খ. 0.5

গ. 1   ঘ. 2

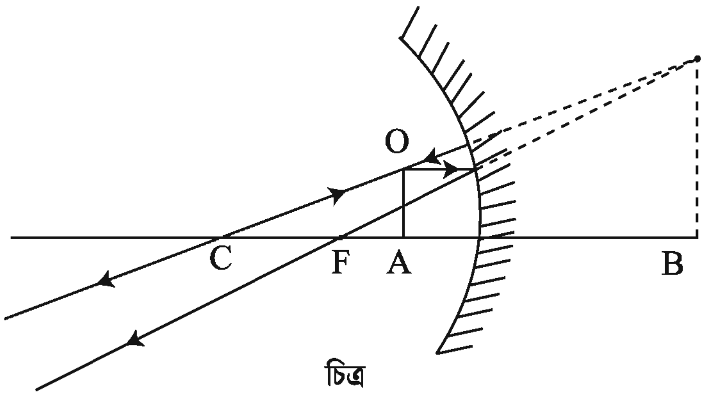
৩।



চিত্র

উপরের চিত্র অনুযায়ী কোন রশ্মিটি PO এর প্রতিফলিত রশ্মি।

ক. OQ
খ. OR
গ. OS
ঘ. OT



চিত্র

৪। চিত্রের আলোকে গঠিত বিম্বের ক্ষেত্রে –

i. প্রতিফলিত রশ্মিগুলোর প্রকৃত মিলন হয় না

ii. চোখে দেখা যায় কিন্তু পর্দায় ফেলা যায় না

iii. চোখে দেখা যায় না কিন্তু পর্দায় ফেলা যায়।

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i | খ. ii

গ. i ও ii | ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

রানুর উচ্চতা 1.4m। তাদের ঘরে ছোট একটি আয়না ছিল। আয়নাতে সে তার পূর্ণ অবয়ব দেখতে পেত না। এতে সে বাবার কাছে বায়না ধরল একটি ড্রেসিং টেবিল কিনে দেওয়ার জন্য। মেয়ের বায়না অনুযায়ী বাবা একটি ড্রেসিং টেবিল কিনে দিল। ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় রানু তার পূর্ণ অবয়ব দেখতে পেল।

ক. প্রতিবিম্ব কী?

খ. ছোট আয়নায় রানুর পূর্ণ প্রতিবিম্ব দেখা যায়নি কেন।

গ. ড্রেসিং টেবিলের আয়নার ন্যূনতম দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

ঘ. ড্রেসিং টেবিলে রানুর পূর্ণ প্রতিবিম্ব কীভাবে তৈরি হল আলোক রশ্মির ক্রিয়া রেখা অঙ্কন করে ব্যাখ্যা কর।

পঞ্চদশ অধ্যায়

আলোর প্রতিসরণ

REFRACTION OF LIGHT

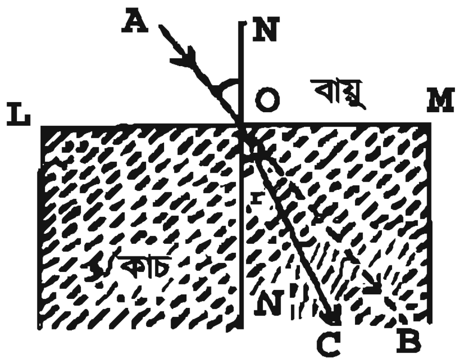
আগের অধ্যায়ে আমরা আলোর প্রতিফলন আলোচনা করেছি। এ অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব দুটি স্বচ্ছ মাধ্যমের বিভেদ তলে আলোর দিক পরিবর্তনের ঘটনা তথা আলোর প্রতিসরণ। প্রতিসরণের সূত্রাবলি, প্রতিসরণাঙ্ক, ক্রান্তি কোণ, পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন প্রভৃতি এখানে আলোচিত হবে একে একে।

১৫.১। প্রতিসরণ
Refraction

আমরা জানি যে, আলোকরশ্মি কোনো স্বচ্ছ ও সমসত্ত্ব মাধ্যমে সরলরেখায় চলে। কিন্তু আলো যখন এক আলোকীয় মাধ্যম থেকে অন্য কোনো মাধ্যমে তীর্যকভাবে প্রবেশ করে তখন মাধ্যমদ্বয়ের বিভেদ তলে এর গতি পথ পরিবর্তিত হয়। আলোর প্রতিসরণের জন্য এরূপ ঘটে।

আলোকরশ্মি এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে যাওয়ার সময় মাধ্যমদ্বয়ের বিভেদ তলে তীর্যকভাবে আপতিত আলোকরশ্মির দিক পরিবর্তন করার ঘটনাকে আলোর প্রতিসরণ বলে।

আলোকরশ্মি বিভেদ তলের যে বিন্দুতে আপতিত হয়ে দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রবেশ করে সেই বিন্দুকে আপতন বিন্দু বলে। আপতন বিন্দুতে বিভেদ তলের উপর অঙ্কিত লম্বকে অভিলম্ব বলে। আলোকরশ্মি হালকা মাধ্যম (বায়ু) থেকে ঘন মাধ্যমে (কাচ) প্রবেশ করলে অভিলম্বের দিকে সরে যায়; আবার ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে প্রবেশ করলে অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যায়।



চিত্র : ১৫.১

ধরা যাক, LOM হচ্ছে বায়ু ও কাচ মাধ্যমের বিভেদ তল। AO রশ্মি বায়ু মাধ্যম থেকে O বিন্দুতে কাচ মাধ্যমে প্রবেশ করে OC পথে চলে যায় [চিত্র ১৫.১]। যদি কাচখণ্ড না থাকতো তা হলে আলোক রশ্মি এ পথে না গিয়ে OB পথে চলে যেত। কাচ খণ্ডের উপস্থিতির জন্য আলোক রশ্মির গতিপথ বেঁকে যাচ্ছে। এখানে AO আপতিত রশ্মি, OC প্রতিসরিত রশ্মি। O আপতন বিন্দু এবং NON′ অভিলম্ব। আপতিত রশ্মি অভিলম্বের সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে তাকে আপতন কোণ বলে। ১৫.১ চিত্রে $\angle AON = i$, আপতন কোণ। আর প্রতিসরিত রশ্মি অভিলম্বের সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে তাকে প্রতিসরণ কোণ বলে। চিত্রে $\angle N'OC = r$, প্রতিসরণ কোণ।

১৫.২। প্রতিসরণের সূত্র
Laws of refraction

আলোর প্রতিসরণ দুটি সূত্র মেনে চলে। যথা –

১. আপতিত রশ্মি, আপতন বিন্দুতে বিভেদ তলের উপর অঙ্কিত অভিলম্ব এবং প্রতিসরিত রশ্মি একই সমতলে থাকে।

২. একজোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম ও নির্দিষ্ট রঙের আলোর জন্য আপতন কোণের সাইন ও প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত সর্বদা ধ্রুব থাকে।

এ ধ্রুব সংখ্যাকে η দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এ ধ্রুব সংখ্যাই নির্দিষ্ট রঙের জন্য প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের

প্রতিসরণাঙ্ক। এ সম্পর্কে পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

অর্থাৎ, যদি আপতন কোণকে i এবং প্রতিসরণ কোণকে r ধরা হয় তাহলে,

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \eta = \text{ধ্রুব সংখ্যা} \quad .... \quad .... \quad .... \quad .... \quad .... \quad .... \quad .... \quad .... \qquad (১৫.১)$$

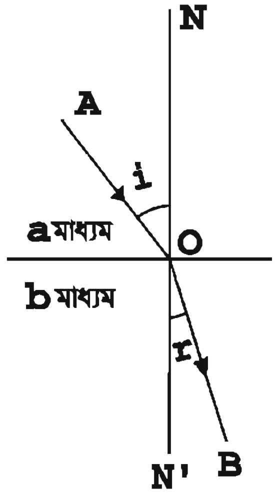
বিজ্ঞানী স্নেল দ্বিতীয় সূত্রটি আবিষ্কার করেন বলে তাঁর নামানুসারে এ সূত্রটিকে স্নেলের সূত্র বলা হয়। আপতন কোণ পরিবর্তন করে i_1, i_2, i_3 ইত্যাদি করলে প্রতিসরণ কোণ যদি যথাক্রমে r_1, r_2, r_3 ------- ইত্যাদি হয়, তাহলে স্নেলের সূত্রানুযায়ী,

$$\frac{\sin i_1}{\sin r_1} = \frac{\sin i_2}{\sin r_2} = \frac{\sin i_3}{\sin r_3} = ---------- = \eta$$

১৫.৩। প্রতিসরণাঙ্ক
Refractive Index

ক. আপেক্ষিক প্রতিসরণাঙ্ক (Relative Refractive Index)

প্রতিসরণের দ্বিতীয় সূত্র থেকে দেখা যায়, একজোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যমে ও নির্দিষ্ট রঙের আলোর জন্য আপতন কোণের সাইন ও প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত ধ্রুব থাকে। এই ধ্রুব সংখ্যাকেই প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের আপেক্ষিক প্রতিসরণাঙ্ক হিসেবে নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়।



চিত্র : ১৫.২

আলোকরশ্মি যখন এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে তীর্যকভাবে প্রবেশ করে তখন নির্দিষ্ট রঙের আলোর জন্য আপতন কোণের সাইন ও প্রতিসরণ কোণের সাইন–এর অনুপাত যে ধ্রুব সংখ্যা হয় তাকে প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক বলে।

আলোকরশ্মি যখন 'a' মাধ্যম থেকে 'b' মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন আপতন কোণের সাইন ও প্রতিসরণ কোণের সাইন–এর অনুপাতকে 'a' মাধ্যমের সাপেক্ষে 'b' মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক বলে। 'a' মাধ্যমে আপতন কোণ i ও 'b' মাধ্যমে প্রতিসরণ কোণ r হলে, (চিত্র ১৫.২) 'a' মাধ্যমের সাপেক্ষে 'b' মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক,

$$_a\eta_b = \frac{\sin i}{\sin r} \quad .... \quad .... \quad .... \quad .... \quad .... \quad .... \quad .... \quad .... \quad .... \qquad (১৫.২)$$

η –এর নিচে ডান দিকের অক্ষরটি নির্দেশ করে কোন মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক এবং বাম দিকের অক্ষরটি নির্দেশ করে কোন মাধ্যমের সাপেক্ষে।

আবার আলোক রশ্মি যদি 'b' মাধ্যম থেকে 'a' মাধ্যমে প্রবেশ করে সেক্ষেত্রে আলোক রশ্মি প্রত্যাবর্তনের সূত্রানুসারে ১৫.২ চিত্রে BO হবে আপতিত রশ্মি এবং OA প্রতিসরিত রশ্মি, অর্থাৎ, আপতন কোণ = r ও প্রতিসরণ কোণ = i এবং 'b' মাধ্যমের সাপেক্ষে 'a' মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক হবে,

$$_b\eta_a = \frac{\sin r}{\sin i} = \frac{1}{\sin i/\sin r} = \frac{1}{_a\eta_b} \quad .... \quad .... \quad .... \quad .... \quad .... \quad .... \quad .... \quad .... \qquad (১৫.৩)$$

অর্থাৎ, 'b' মাধ্যমের সাপেক্ষে 'a' মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক, 'a' মাধ্যমের সাপেক্ষে 'b' মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্কের বিপরীত রাশি। বায়ুর সাপেক্ষে কাচের প্রতিসরণাঙ্ক যদি 3/2 হয়, তবে কাচের সাপেক্ষে বায়ুর প্রতিসরণাঙ্ক 2/3 হবে।

একক : যেহেতু প্রতিসরণাঙ্ক একই জাতীয় দুটি রাশির অনুপাত কাজেই এর কোনো একক নেই। তাছাড়া sin i বা sinr –এর কোনো একক নেই।

বায়ুর সাপেক্ষে পানির প্রতিসরণাঙ্ক 1.33 বলতে বুঝায় যে আলোকরশ্মি যদি বায়ু মাধ্যম থেকে পানিতে প্রবেশ করে তাহলে আপতন কোণের সাইন ও প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত সর্বদা 1.33 হবে।

খ. পরম প্রতিসরণাঙ্ক (Absolute Refractive Index)

শূন্য মাধ্যম থেকে যখন আলোক রশ্মি কোনো মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন সেই মাধ্যমের যে প্রতিসরণাঙ্ক হিসাব করা হয় অর্থাৎ, শূন্যমাধ্যম সাপেক্ষে কোনো মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ককে ঐ মাধ্যমের পরম প্রতিসরণাঙ্ক ধরা হয়।

আলোক রশ্মি যখন শূন্য মাধ্যম থেকে কোনো বস্তু মাধ্যমে তীর্যকভাবে প্রবেশ করে তখন নির্দিষ্ট রঙের আলোর জন্য আপতন কোণের সাইন ও প্রতিসরণ সাইনের অনুপাতকে ঐ মাধ্যমের পরম প্রতিসরণাঙ্ক বলে।

শূন্যমাধ্যমে আপতন কোণ i এবং অন্য কোনো মাধ্যম 'a তে প্রতিসরণ কোণ r হলে, a মাধ্যমের পরম প্রতিসরণাঙ্ক $\eta = \frac{\sin i}{\sin r}$,
কোনো মাধ্যমের পরম প্রতিসরণাঙ্ক প্রকাশের বেলায় η এর বামদিকে কিছু না লিখে কেবল ডানদিকে মাধ্যম লেখা হয়। যেমন 'a' মাধ্যমের পরম প্রতিসরণাঙ্কের সংকেত হচ্ছে η_a।

সাধারণভাবে বায়ুর সাপেক্ষে কোনো মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ককে পরম প্রতিসরণাঙ্ক ধরা হয়। কোনো মাধ্যমের সাপেক্ষে তা উল্লেখ না করে শুধু প্রতিসরণাঙ্ক বললে মাধ্যমের পরম প্রতিসরণাঙ্ককেই বুঝায়।

কাচের পরম প্রতিসরণাঙ্ক 1.5 বলতে বুঝায় যে শূন্য মাধ্যম বা বায়ু থেকে আলো কাচে তীর্যকভাবে প্রবেশ করলে আপতন কোণের সাইন এবং প্রতিসরণ কোণের সাইন–এর অনুপাত 1.5 হয়। সারণি ১৫.১ এ কয়েকটি পদার্থের প্রতিসরণাঙ্ক দেওয়া হল।

সারণি ১৫.১ : কয়েকটি পদার্থের প্রতিসরণাঙ্ক

পদার্থ	প্রতিসরণাঙ্ক	পদার্থ	প্রতিসরণাঙ্ক
ক্রাউন কাচ	1.5225	বরফ	1.3087
হালকা ফ্লিন্ট কাচ	1.5875	পানি	1.3333
ঘন ফ্লিন্ট কাচ	1.6670	কেরোসিন	1.44
হীরক	2.4172	গ্লিসারিন	1.47
কোয়ার্টজ	1.5438	বেনজিন	1.50

প্রতিসরণাঙ্ক সম্পর্কে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় :

১. আলোকরশ্মি যে মাধ্যমে প্রবেশ করে প্রতিসরণাঙ্ক হয় সেই মাধ্যমের। আর যে মাধ্যম থেকে আসে প্রতিসরণাঙ্ক হয় সেই মাধ্যমের সাপেক্ষে।

২. প্রতিসরণাঙ্ক আপতন কোণের ওপর নির্ভর করে না, কেবল মাধ্যমদ্বয়ের প্রকৃতি ও আলোর রঙের ওপর নির্ভর করে। লাল রঙের আলোর জন্য নির্দিষ্ট মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্কের মান সবচেয়ে কম এবং বেগুনি আলোর জন্য সবচেয়ে বেশি। সারণি ১৫.২ এ কয়েকটি পদার্থের বিভিন্ন রঙের জন্য প্রতিসরণাঙ্ক দেওয়া হল।

সারণি ১৫.২ : বিভিন্ন রঙের জন্য প্রতিসরণাঙ্ক

পদার্থ	বেগুনি	আসমানি	সবুজ	হলুদ	কমলা	লাল
ক্রাউন	1.5380	1.5310	1.5260	1.5225	1.5216	1.5200
হালকা ফ্লিন্ট কাচ	1.6040	1.5960	1.5910	1.5875	1.5867	1.5850
ঘন ফ্লিন্ট কাচ	1.6980	1.6836	1.6738	1.6670	1.6650	1.6620
কোয়ার্টজ	1.5570	1.5510	1.5468	1.5438	1.5432	1.5420
হীরক	2.4580	2.4439	2.4260	2.4172	2.4150	2.4100
বরফ	1.3170	1.3136	1.3110	1.3087	1.3080	1.3060

৩. যে মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক বেশি সেই মাধ্যমের আলোকীয় ঘনত্ব (Optical density) বেশি বা সেটি আলোর সাপেক্ষে ঘনতর (Optically denser)। আর যে মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক কম তার আলোকীয় ঘনত্ব কম বা সেটি আলোর সাপেক্ষে লঘুতর (Optically rarer)। তবে এই ঘনত্ব বা লঘুত্বের সাথে মাধ্যমের প্রাকৃতিক ঘনত্ব বা আপেক্ষিক গুরুত্বের কোনো সম্পর্ক নেই। যেমন কেরোসিনের ঘনত্ব $800\ kgm^{-3}$ পানির ঘনত্ব $1000\ kgm^{-3}$ এর চেয়ে কম কিন্তু এর প্রতিসরণাঙ্ক (1.44) পানির প্রতিসরণাঙ্ক (1.33) এর চেয়ে বেশি।

আলোর বেগের সাথে প্রতিসরণাঙ্কের সম্পর্ক

আলোক রশ্মি যখন এক স্বচ্ছ সমসত্ত্ব মাধ্যমে থেকে অন্য এক স্বচ্ছ সমসত্ত্ব মাধ্যমে তীর্যকভাবে প্রবেশ করে তখন প্রতিসরণের জন্য বিভেদ তলে এর দিক পরিবর্তন করে। বিভিন্ন মাধ্যমে আলোর বেগের বিভিন্নতার জন্যই আলোক রশ্মির দিক পরিবর্তন বা প্রতিসরণ হয়। আলোর তরঙ্গ তত্ত্ব থেকে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

আলোর তরঙ্গ তত্ত্ব থেকে আমরা পাই, কোনো মাধ্যমের পরম প্রতিসরণাঙ্ক η হলে,

$$\eta = \frac{\text{শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ (C)}}{\text{ঐ মাধ্যমে আলোর বেগ } (C_m)} \quad \dots \quad (১৫.৪)$$

বা, $\eta = \dfrac{C}{C_m}$

এখন আলোর রশ্মি যদি ‘a’ মাধ্যম থেকে ‘b’ মাধ্যমে প্রবেশ করে তাহলে ‘a’ মাধ্যমের সাপেক্ষে ‘b’ মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক,

$${}_a\eta_b = \frac{\text{‘a’ মাধ্যমে আলোর বেগ } C_a}{\text{‘b’ মাধ্যমে আলোর বেগ } C_b} \quad \dots \quad (১৫.৫)$$

$${}_a\eta_b = \frac{C_a}{C_b}$$

এখন ‘b’ মাধ্যম যদি ‘a’ মাধ্যমের চেয়ে আলোর সাপেক্ষে ঘন হয় তাহলে ${}_a\eta_b > 1$ অর্থাৎ, সেক্ষেত্রে ‘b’ মাধ্যমে আলোর বেগ ‘a’ মাধ্যমের চেয়ে কম হয়। সুতরাং ঘনতর মাধ্যমে আলোর বেগ হালকা মাধ্যমের চেয়ে কম হয়।

উদাহরণ ১৫.১। বেনজিনে আলোর বেগ $2 \times 10^8 ms^{-1}$ হলে কেরোসিনে আলোর বেগ নির্ণয় কর। বেনজিনের সাপেক্ষে কেরোসিনের প্রতিসরণাঙ্ক 0.96।

সমাধান :

এখানে,

বেনজিনে আলোর বেগ, $C_b = 2 \times 10^8 ms^{-1}$

বেনজিনের সাপেক্ষে কেরোসিনের প্রতিসরণাঙ্ক, ${}_b\eta_k = 0.96$

কেরোসিনে আলোর বেগ, $C_k = ?$

আমরা জানি,

$${}_b\eta_k = \frac{C_b}{C_k}$$

$$\therefore C_k = \frac{C_b}{{}_b\eta_k}$$

$$= \frac{2 \times 10^8 \times ms^{-1}}{0.96}$$

$$= 2.08 \times 10^8 ms^{-1}$$

উত্তর : $2.08 \times 10^8 ms^{-1}$

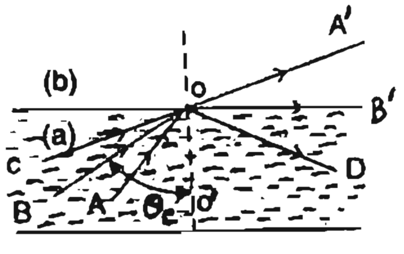
১৫.৪। কাচের প্রতিসরণাঙ্ক নির্ণয়
Determination of Refractive index of Glass

একটি ড্রইং বোর্ডের উপর একটি সাদা কাগজ পিন দিয়ে আটকানো হয়। এখন এ সাদা কাগজের মাঝামাঝি একটুকরা আয়তাকার কাচফলক স্থাপন করে পিন দিয়ে আপতিত রশ্মি, প্রতিসরিত রশ্মি, নির্গত রশ্মি নির্ণয় করে আপতন কোণ ও প্রতিসরিত কোণ বের করা হয়। [বিস্তারিত পরীক্ষার জন্য ব্যবহারিক অংশ দ্রষ্টব্য]

১৫.৫ । ক্রান্তি কোণ ও পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন
Critical angle and Total Internal Reflection

আলোকরশ্মি যখন দুই স্বচ্ছ মাধ্যমের বিভেদ তলে আপতিত হয় তখন আপতিত রশ্মির কিছু অংশ প্রথম মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়, কিছু অংশ মাধ্যমদ্বয় কর্তৃক শোষিত হয় এবং বাকি অংশ দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রতিসরিত হয়। এখন আলোকরশ্মি যদি হালকা থেকে ঘন মাধ্যমে প্রবেশ করে তাহলে যে কোনো মানের আপতন কোণের জন্য কিছু পরিমাণ আলোকরশ্মি সব সময়ই প্রতিসরিত হবে। কিন্তু আলোকরশ্মি যদি ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে প্রবেশ করে তাহলে দেখা যায় যে, আপতন কোণের মান একটা নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করলে আলোকরশ্মি আর দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রতিসরিত হয় না।

আলোকরশ্মি যখন ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন প্রতিসরিত রশ্মি অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যায়। ১৫.৩ চিত্রে AO আলোকরশ্মি ঘন মাধ্যম a থেকে হালকা মাধ্যম b–তে গেলে প্রতিসরিত হয়ে OA′ পথে অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যায়। এখন আপতন কোণ ক্রমশ বাড়তে থাকলে প্রতিসরণ কোণও বাড়তে থাকবে। এভাবে বাড়াতে বাড়াতে এমন একটা আপতন কোণ পাওয়া যাবে যার জন্য প্রতিসরিত কোণের মান হবে সর্বাধিক 90°। সেক্ষেত্রে BO আপতিত রশ্মির জন্য প্রতিসরিত রশ্মি বিভেদ তল ঘেষে OB′ পথে চলে যাবে। আপতন কোণের এই মানকে ক্রান্তি কোণ বলে। চিত্রে ∠BOO′ = ক্রান্তি কোণ। ক্রান্তি কোণকে θ_C দ্বারা প্রকাশ করা হয়।



চিত্র : ১৫.৩

আপতন কোণের মান যদি আরো বাড়ানো হয় তাহলে আলোক রশ্মি প্রতিসরিত হবে না সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়ে ঘন মাধ্যমে ফিরে আসবে। চিত্রে CO আপতিত রশ্মির জন্য এই প্রতিফলিত রশ্মি হল OD। এ ঘটনাকে অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন বলে। আলোক রশ্মি সম্পূর্ণরূপে প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসে বলে একে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন বলে।

ক্রান্তি কোণের সংজ্ঞা : নির্দিষ্ট রঙের আলোকরশ্মি ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে প্রতিসরিত হওয়ার সময় আপতন কোণের যে মানের জন্য প্রতিসরণ কোণের মান 90° হয়, অর্থাৎ, প্রতিসরিত রশ্মি বিভেদ তল ঘেঁষে চলে যায় তাকে হালকা মাধ্যমের সাপেক্ষে ঘন মাধ্যমের ক্রান্তি কোণ বলে। ক্রান্তি কোণকে সাধারণত θ_C দ্বারা প্রকাশ করা হয়। চিত্রে $\angle BOO' = \theta_C$।

ক্রান্তি কোণও আলোর রঙের ওপর নির্ভর করে। নির্দিষ্ট মাধ্যমের ক্রান্তি কোণ বিভিন্ন রঙের আলোর জন্য বিভিন্ন হয়। হলুদ আলোর জন্য পানির সাপেক্ষে কাচের ক্রান্তি কোণ 60° বলতে কাচ থেকে পানিতে হলুদ আলোকরশ্মি প্রতিসরিত হওয়ার সময় কাচে 60° কোণে আপতিত হলে প্রতিসরিত রশ্মি কাচ ও পানির বিভেদ তল ঘেঁষে যাবে।

হীরকের ক্রান্তি কোণ 24° বলতে বুঝায় শূন্য মাধ্যমে (বা বায়ু) ও হীরকের বিভেদ তলে হীরক থেকে 24° কোণে আপতিত রশ্মি বিভেদ তল ঘেষে প্রতিসরিত হবে। আপতন কোণের মান 24° –এর চেয়ে বেশি হলে আলোক রশ্মির প্রতিসরণ না হয়ে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হবে।

পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের সংজ্ঞা : আলোক রশ্মি যখন ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে ক্রান্তি কোণের চেয়ে বড় মানের কোণে আপতিত হয় তখন প্রতিসরণের পরিবর্তে আলোকরশ্মি সম্পূর্ণরূপে ঘন মাধ্যমের অভ্যন্তরে প্রতিফলনের

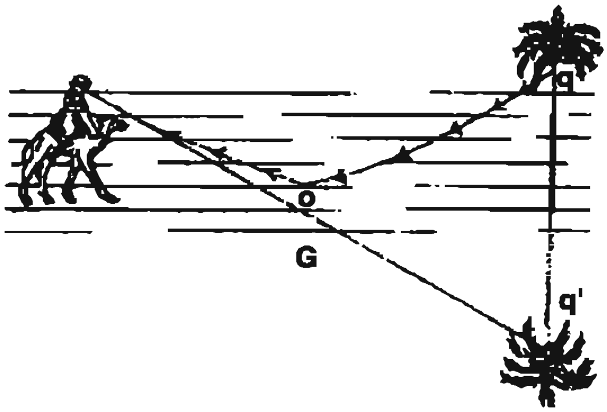
সূত্রানুযায়ী প্রতিফলিত হয়। এই ঘটনাকে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন বলে।

পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন সংঘটিত হওয়ার শর্ত :

১. আলোকরশ্মি ঘন মাধ্যম থেকে ঘন ও হালকা মাধ্যমের বিভেদ তলে আপতিত হবে।

২. আপতন কোণ ক্রান্তি কোণের চেয়ে বড় হবে।

১৫.৬ মরীচিকা
Mirage



চিত্র ১৫.৪

উত্তপ্ত মরুভূমিতে মরীচিকা সৃষ্টি হয়। মরুভূমিতে পথচারীর কাছে প্রায় মনে হয় তার সামনে অল্প দূরত্বে বুঝি পানি আছে। কিন্তু তিনি কখনও সেই পানির কাছে পৌঁছতে পারেন না, কেননা, এটি একটি অলোকীয় অলীক ঘটনা। মরুভূমিতে সূর্যের প্রচণ্ড তাপে বালি খুব তাড়াতাড়ি উত্তপ্ত হয়। ফলে বালি সংলগ্ন বায়ুর তাপমাত্রাও খুব বেশি থাকে। এতে করে বালি সংলগ্ন বায়ু হালকা হয়। ভূপৃষ্ঠ থেকে যত উপরের দিকে যাওয়া যায় বায়ুর তাপমাত্রা তত কমতে থাকে ফলে বায়ু ধীরে ধীরে ঘনতর হতে থাকে।

এখন মরুভূমিতে দূরে কোনো গাছ q থেকে আলোকরশ্মি পথিকের চোখে আসার সময় ঘনতর মাধ্যম থেকে লঘুতর মাধ্যমে প্রবেশ করতে থাকে। ফলে প্রতিসরিত রশ্মি অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। এভাবে বাঁকতে বাঁকতে এমন একটা স্তর আসে যখন আপতন কোণ ক্রান্তি কোণের চেয়ে বড় হবে। এ সময় আলোকরশ্মির প্রতিসরণ না হয়ে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হবে এবং আলোকরশ্মি উপরের দিকে ওঠে বাঁকা পথে পথিকের চোখে পৌঁছাবে। এখন এই রশ্মিকে পিছনের দিকে বাড়ালে মনে হবে যে তা q' বিন্দু থেকে আসছে। ফলে q' অবস্থানে তার উল্টো বিম্ব দেখা যাবে। এ ভাবে আকাশ এবং দূরবর্তী গাছপালা বা ঘরবাড়ির উল্টো বিম্ব দেখা যাবে। পথিকের চোখ আলোর এ ঘটনা ধরতে পারে না এবং তাঁর কাছে মনে হবে যেন ভূপৃষ্ঠ থেকে আলোর প্রতিফলন হয়েছে, যেমন দর্পণের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তার কাছে মনে হয় সামনে কোনো জলাশয় আছে এবং তাতে প্রতিফলন হয়েছে। পথিকের কাছে এ জলাশয়ের দূরত্ব সবসময় একই মনে হবে। এ দূরত্ব নির্ভর করবে ভূপৃষ্ঠ থেকে পথিকের চোখের উচ্চতার ওপর। এ ঘটনাকেই মরীচিকা বলে।

মরীচিকা দেখতে হলে যে সাহারা বা মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমিতে যেতে হবে এমন কোনো কথা নেই। গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত পিচঢালা মসৃন রাজপথে তোমাদের অনেকেই মরীচিকা দেখে থাকতে পার। গরমের এমন দিনে পথচারীর সামনে রাজপথকে বৃষ্টির অব্যবহিত পরবর্তী সময়ের মত ভেজা ও চকচকে মনে হয়। যেহেতু আমরা নিথর পানিতে আকাশের বিম্ব দেখে অভ্যস্ত, কাজেই পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের ফলে রাজপথে আকাশের বিম্ব দেখে আমরা স্বভাবতই ভেবে বসি যে, রাজপথ ভেজা এবং সেখানে আলোর প্রতিফলন ঘটছে।

১৫.৭। অপটিক্যাল ফাইবার
Optical Fibres

ফাইবার হচ্ছে খুব সরু এবং নমনীয় কাচ তন্তু। আলো বহনের কাজে এটি ব্যবহৃত হয়। যখন আলোক রশ্মি কাচ তন্তুর এক প্রান্ত দিয়ে প্রবেশ করে, তখন তন্তুর দেয়ালে বারবার এর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটে, যতক্ষণ না অপর প্রান্ত দিয়ে নির্গত হয়। এভাবে আলোকরশ্মি দণ্ডের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য অতিক্রম করে (চিত্র ১৫.৫)। একগুচ্ছ অপটিক্যাল ফাইবারকে আলোক নল বলা হয়। চিকিৎসকরা মানবদেহের ভিতরের কোনো অংশ দেখার জন্য এরূপ আলোক নল ব্যবহার করেন। এ ছাড়া বর্তমানে টেলিযোগাযোগে ও ইন্টারনেট ব্যবস্থায় অপটিক্যাল ফাইবারের ব্যবহার ক্রমবর্ধমান।



চিত্র : ১৫.৫

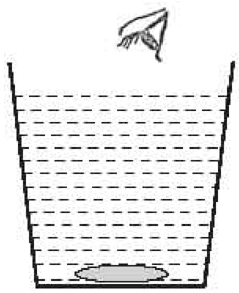
অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বায়ুর সাপেক্ষে কাচের প্রতিসরনাঙ্ক 1.52 হলে কাচ সাপেক্ষে বায়ুর প্রতিসরনাঙ্ক কত হবে?

ক. 0.55 খ. 0.66

গ. 1.00 ঘ. 1.09



চিত্র

২। চিত্রে পানি ভর্তি গ্লাসের তলায় একটি আধুলি আছে। উপর থেকে তাকালে আধুলিটি–

ক. ছোট দেখা যাবে খ. বড় দেখা যাবে

গ. তলা থেকে সামান্য ওপরে দেখা যাবে ঘ. তলাতেই দেখা যাবে

৩। প্রতিসরণাঙ্ক নির্ভর করে–

i. মাধ্যমের ঘনত্বের ওপর

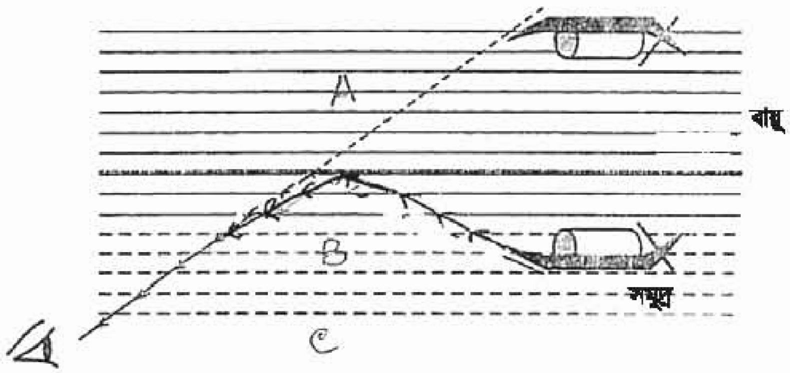
ii. তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ওপর

iii. আলোকীয় ঘনত্বের ওপর।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. iii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii



চিত্র

উপরের চিত্রের সাহায্যে ৪ ও ৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও–

৪। চিত্রটি ব্যাখ্যা করে আলোর–

ক. প্রতিফলন
খ. প্রতিসরণ
গ. পূর্ণ অভ্যন্তরীন প্রতিফলন
ঘ. প্রতিফলন ও প্রতিসরণ

৫। নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. A মাধ্যম B মাধ্যম অপেক্ষা বেশি ঘন
খ. B মাধ্যম A মাধ্যম অপেক্ষা বেশি ঘন
গ. A মাধ্যম ও C মাধ্যমের ঘনত্ব সমান
ঘ. A মাধ্যম ও B মাধ্যমের ঘনত্ব সমান

সৃজনশীল প্রশ্ন

এক গ্রীষ্মের দুপুরে নন্দা তার মামার সাথে গাড়িতে করে পিচঢালা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। যেতে যেতে সে দেখল যে দূরে রাস্তা ভেজা ও চকচকে দেখা যাচ্ছে। সে যতই সামনে যাচ্ছে ততই এ দৃশ্যটি দেখছে। বিষয়টি তাকে অবাক করল। কারণ শীতকালে একই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় সে এ ঘটনাটি দেখেনি।

ক. পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন কাকে বলে?
খ. রাস্তা ভেজা দেখার কারণ কী।
গ. শীতকালে ঐ ধরনের ঘটনা দেখা যায়নি কেন? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. রাস্তায় এ ধরনের দৃষ্টিভ্রমের ক্ষেত্রে চালকের কী ধরনের সতর্কতা গ্রহণ করা উচিত বলে তুমি মনে কর।

ষোড়শ অধ্যায়

লেন্স

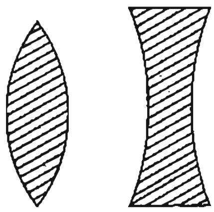
LENS

বহু শতাব্দী পূর্ব থেকেই গ্রিক এবং আরবিয়রা বিবর্ধক কাচরূপে লেন্সের ব্যবহার জানত। আজকাল আমাদের দৈনন্দিন জীবনে লেন্স অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। চশমা হিসেবে লেন্স ব্যবহারের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যে শুধু বিনা ক্লেশে পড়াশুনা করতে পারে তাই নয়, চোখের নানা প্রকার ত্রুটির প্রতিকার করাও সম্ভব হয়। আমাদের জীবনযাত্রার ধরনই পাল্টে যেত যদি ক্যামেরা, প্রজেক্টর, অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা দুরবীক্ষণ যন্ত্র না থাকত। আর এ সবই তৈরি হয় লেন্স দ্বারা । লেন্সে আলোর প্রতিসরণ ঘটে এবং এর ফলে বিম্বের সৃষ্টি হয়। এ অধ্যায়ে আমরা বিভিন্ন লেন্স, রশ্মি চিত্রের সাহায্যে লেন্সে বিম্বের সৃষ্টি এবং লেন্সে সৃষ্ট বিম্বের প্রকৃতি ও আকৃতি এবং লেন্সের ক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করব।

১৬.১। লেন্স

Lens

দুটি গোলীয় পৃষ্ঠ দ্বারা সীমাবদ্ধ কোনো স্বচ্ছ প্রতিসারক মাধ্যমকে লেন্স বলে।

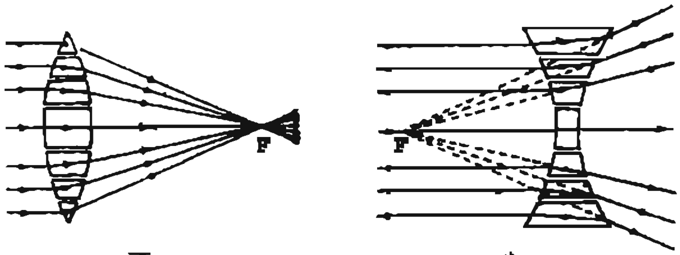

(ক) (খ)

চিত্র ঃ ১৬.১

১৬.১ চিত্রে ক ও খ দুটি লেন্স। লেন্সের পৃষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে একটি সমতল ও অপরটি গোলক পৃষ্ঠের অংশ হতে পারে। কাচ, কোয়ার্টজ, প্লাস্টিক ইত্যাদি দ্বারা লেন্স তৈরি করা হলেও অধিকাংশ লেন্সই থাকে কাচের তৈরি। লেন্স প্রধানত দুরকমের হতে পারে; যথা

ক. স্থূলমধ্য বা উত্তল বা অভিসারী লেন্স (Convex lens) এবং
খ. ক্ষীণমধ্য বা অবতল বা অপসারী লেন্স (Concave lens)।

উত্তল বা অভিসারী লেন্স : যে লেন্সের মধ্যভাগ মোটা ও প্রান্ত সরু তাকে উত্তল লেন্স বলে। উত্তল লেন্সে আলোক রশ্মি উত্তল পৃষ্ঠে আপতিত হয় বলে তাকে উত্তল লেন্স বলে [চিত্র ১৬.১(ক)]। এ লেন্স সাধারণত এক গুচ্ছ সমান্তরাল আলোক রশ্মিকে অভিসারী করে থাকে বলে তাকে অভিসারী লেন্সও বলা হয় [চিত্র ১৬.২ (ক)]।



ক খ

চিত্র : ১৬.২

অবতল বা অপসারী লেন্স : যে লেন্সের মধ্যভাগ সরু ও প্রান্তের দিক মোটা তাকে অবতল লেন্স বলে। অবতল লেন্সে আলোক রশ্মি অবতল পৃষ্ঠে আপতিত হয় বলে তাকে অবতল লেন্স বলে [চিত্র ১৬.২(খ)] । এ লেন্স সাধারণত এক গুচ্ছ আলোক রশ্মিকে অপসারী করে থাকে বলে তাকে অপসারী লেন্সও বলা হয় [চিত্র ১৬.২ (খ)]।
তলের আকৃতির ওপর নির্ভর করে প্রত্যেক প্রকার লেন্স আবার তিন ধরনের হতে পারে। যথা—

ক. উত্তল লেন্স

১. দ্বি-উত্তল লেন্স (Bi-convex lens) : যে লেন্সের দুটি তলই উত্তল তাকে দ্বি-উত্তল বা উভোত্তল লেন্স বলে। [চিত্র ১৬.৩(ক)]

২. সমতলোত্তল লেন্স (Plano convex lens) : যে লেন্সের একটি তল সমতল ও অপরটি উত্তল তাকে সমতলোত্তল লেন্স বলে। [চিত্র ১৬.৩ (খ)]

৩. অবতলোত্তল লেন্স (Concave convex lens) : যে উত্তল লেন্সের একটি তল অবতল ও অপরটি উত্তল তাকে অবতলোত্তল লেন্স বলে। [চিত্র : ১৬.৩ (গ)]

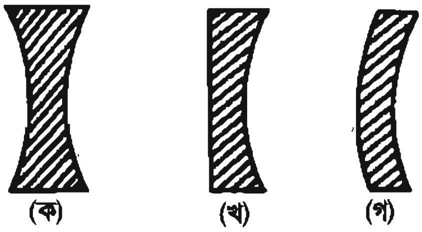
খ. অবতল লেন্স :

১. দ্বি-অবতল লেন্স (Bi-concave lens) : যে লেন্সের দুই তলই অবতল তাকে দ্বি-অবতল বা উভাবতল লেন্স বলে [চিত্র ১৬.৪ (ক) ।

২. সমতলাবতল লেন্স (Plano concave lens) : যে লেন্সের একটি তল সমতল ও অপরটি অবতল তাকে সমতলাবতল লেন্স বলে [চিত্র ১৬.৪ (খ)]।



চিত্র : ১৬.৩

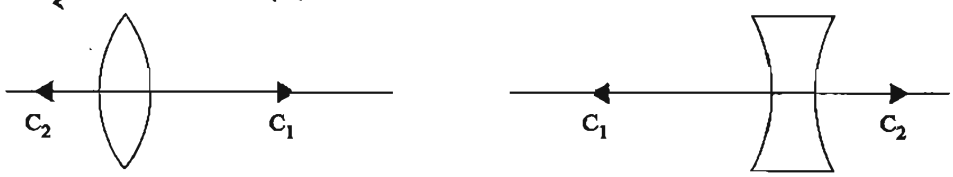


চিত্র : ১৬.৪

৩. উত্তলাবতল (Convexo concave lens) : যে অবতল লেন্সের একটি তল উত্তল ও অপরটি অবতল তাকে উত্তলাবতল লেন্স বলে [চিত্র ১৬.৪ (গ)]।

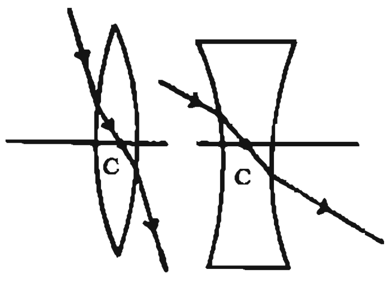
১৬.২। কয়েকটি সংজ্ঞা
A Few Definitions

১. প্রধান অক্ষ : (Principal axis) দুটি গোলীয় পৃষ্ঠ দ্বারা লেন্স গঠিত । সুতরাং লেন্সের বক্রতার কেন্দ্র এবং বক্রতার ব্যাসার্ধ দুটি। লেন্সের উভয় পৃষ্ঠের বক্রতার কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে গমনকারী সরল রেখাকে প্রধান অক্ষ বলে। ১৬.৫ চিত্রে C_1C_2 সরলরেখা লেন্সের প্রধান অক্ষ। লেন্সের একটি পৃষ্ঠ সমতল ও অপর পৃষ্ঠ গোলীয় হলে গোলীয় পৃষ্ঠের বক্রতার কেন্দ্র থেকে সমতল পৃষ্ঠের উপর অভিলম্বই হবে লেন্সের প্রধান অক্ষ।



চিত্র : ১৬.৫

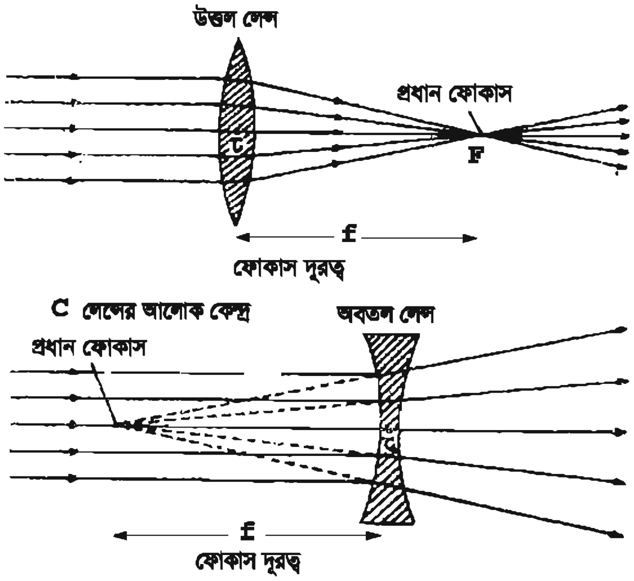
২. আলোক কেন্দ্র (Optical centre) : কোনো আলোক রশ্মি যদি কোনো লেন্সের এক পৃষ্ঠে আপতিত হয়ে নির্গত হওয়ার সময় আপতিত রশ্মির সমান্তরালভাবে নির্গত হয় তাহলে সেই রশ্মি লেন্সের প্রধান অক্ষের উপর যে বিন্দু দিয়ে যায় সেই বিন্দুকে লেন্সের আলোক কেন্দ্র বলে। ১৬.৬ চিত্রে C লেন্সের আলোক কেন্দ্র। সরু লেন্সের ক্ষেত্রে আলোক কেন্দ্র দিয়ে কোনো আলোক রশ্মি গেলে প্রতিসরণের ফলে এর দিকের কোনো পরিবর্তন হয় না।



চিত্র : ১৬.৬

৩. প্রধান ফোকাস (Principal Focus) : লেন্সের প্রধান অক্ষের সমান্তরাল এবং নিকটবর্তী রশ্মিগুচ্ছ প্রতিসরণের পর প্রধান অক্ষের উপর যে বিন্দুতে মিলিত হয় (উত্তল লেন্সে) বা যে বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয় (অবতল লেন্সে), সেই বিন্দুকে লেন্সের প্রধান ফোকাস বলে। ১৬.৭ চিত্রে F লেন্সের প্রধান ফোকাস। আলোক রশ্মি লেন্সের যে কোনো এক পৃষ্ঠে আপতিত হয়ে অপর পৃষ্ঠ দিয়ে প্রতিসৃত হতে পারে। তাই প্রত্যেক লেন্সেরই আলোক কেন্দ্রের দুই পাশে দুটি প্রধান ফোকাস থাকে। লেন্সের

আকৃতি যাই হোক না কেন যে কোনো লেন্সের ক্ষেত্রে বিন্দু দুটি আলোক কেন্দ্র থেকে সমদূরবর্তী। উত্তল লেন্সের প্রধান ফোকাস একটি সদ বিন্দু এবং অবতল লেন্সের প্রধান ফোকাস একটি অসদ বিন্দু।



চিত্র : ১৬.৭

৪. ফোকাস দূরত্ব (Focal length) : আলোক কেন্দ্র থেকে লেন্সের প্রধান ফোকাস পর্যন্ত দূরত্বকে লেন্সের ফোকাস দূরত্ব বলে। ফোকাস দূরত্বকে f দিয়ে প্রকাশ করা হয় (চিত্র ১৬.৭)।

ফোকাস দূরত্ব লেন্সের প্রত্যেক পৃষ্ঠের বক্রতার ওপর নির্ভর করে। কিন্তু গোলীয় দর্পণের মত এই সম্পর্ক এত সহজ নয়। তবে সাধারণভাবে বলা যায়, পৃষ্ঠগুলোর বক্রতার ব্যাসার্ধ যত বেশি হবে ফোকাস দূরত্ব তত কম হবে।

৫. ফোকাস তল (Focal plane) : কোনো লেন্সের প্রধান ফোকাসের মধ্য দিয়ে প্রধান অক্ষের সাথে লম্বভাবে যে সমতল কল্পনা করা যায় তাকে ফোকাস তল বলে।

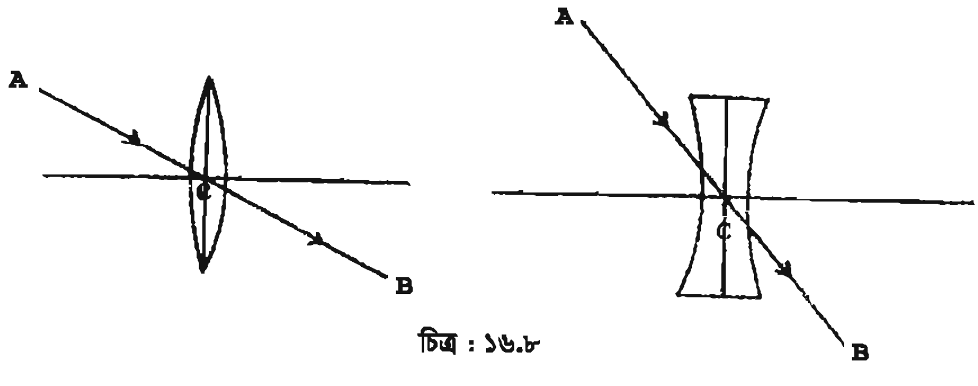
১৬.৩। লেন্সে রশ্মি চিত্র
Ray Diagram in Lens

কোনো লেন্সের সামনে বস্তু রাখলে লেন্সে আলোর প্রতিসরণের ফলে বস্তুর বিম্ব গঠিত হয়। এই বিম্বের অবস্থান, প্রকৃতি ও আকৃতি কেমন হবে তা জানতে হলে বস্তু থেকে নিঃসৃত আলোক রশ্মিগুচ্ছ লেন্সে প্রতিসরিত হয়ে কোথায় মিলিত হয় বা কোথা থেকে আসছে বলে মনে হয় তা জানতে হবে। কোনো লেন্সের আলোক কেন্দ্র এবং প্রধান ফোকাস নির্দিষ্ট বলে কয়েকটি বিশেষ রশ্মি ঐ লেন্সে প্রতিসরিত হয়ে কোন পথে যাবে তা আমরা সহজে স্থির করতে পারি। এ সকল রশ্মির রশ্মি চিত্র অঙ্কন করে আমরা সহজে বিম্বের অবস্থান, প্রকৃতি ও আকৃতি নির্ণয় করতে পারি।

রশ্মি চিত্র অঙ্কনের সময়, চিত্রগুলোকে সহজ করার জন্য লেন্সের মধ্যভাগ দিয়ে অঙ্কিত উলম্ব রেখা বরাবর আলোক রশ্মি দিক পরিবর্তন করেছে বলে দেখানো হয়েছে, যদিও প্রকৃত পক্ষে লেন্সের দুই পৃষ্ঠে দুই বার আলোকরশ্মির দিক পরিবর্তন ঘটে।

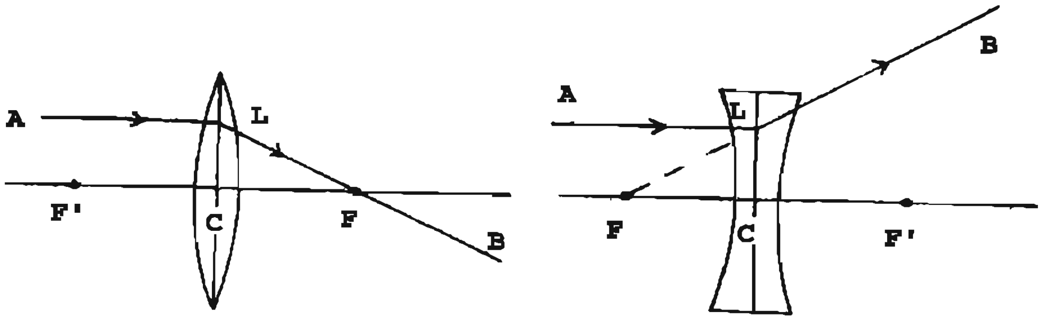
সরু উত্তল এবং অবতল উভয় প্রকার লেন্সের ক্ষেত্রে সচরাচর নিচের তিন ধরনের রশ্মি ব্যবহার করে বিম্ব অঙ্কন করা যায়। যেমন–

১. লেন্সের আলোক কেন্দ্র দিয়ে আপতিত রশ্মি প্রতিসরণের পর সোজাসুজি চলে যায়।



চিত্র : ১৬.৮

১৬.৮ (ক) ও (খ) চিত্রে একটি রশ্মি AC লেন্সের আলোক কেন্দ্র C বরাবর আপতিত হয়ে সোজাসুজি CB পথে প্রতিসরিত হয়।

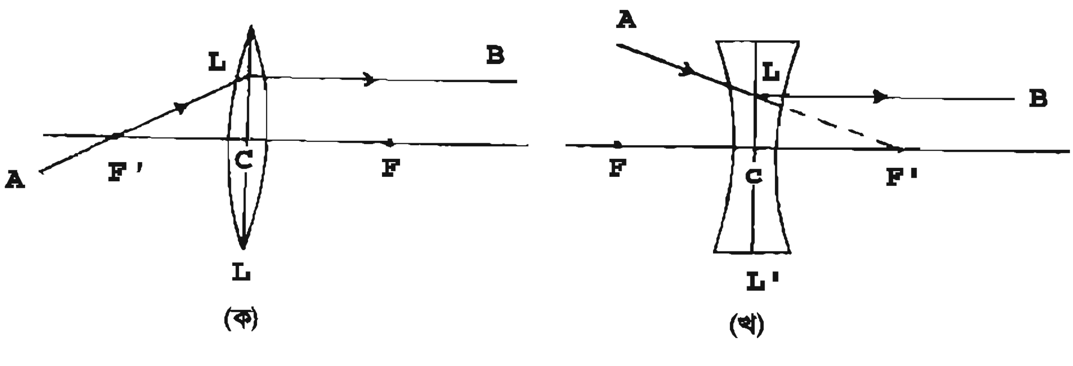


চিত্র : ১৬.৯

২. লেন্সের প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আপতিত রশ্মি প্রতিসরণের পর প্রধান ফোকাস দিয়ে যায় (উত্তল লেন্সে) বা প্রধান ফোকাস থেকে আসছে বলে মনে হয় (অবতল লেন্সে)।

১৬.৯ (ক) চিত্রে একটি রশ্মি AL উত্তল লেন্সের প্রধান অক্ষ FCF' এর সমান্তরালে L বিন্দুতে আপতিত হয়ে প্রধান ফোকাস F দিয়ে LFB পথে প্রতিসরিত হয়। ১৬.৯ (খ) চিত্রে একটি রশ্মি AL অবতল লেন্সের প্রধান অক্ষ FCF' এর সমান্তরালে L বিন্দুতে আপতিত হয়ে LB পথে এমনভাবে প্রতিসরিত হয় যেন এটি প্রধান ফোকাস F থেকে আসছে বলে মনে হয় অর্থাৎ, LB –কে পেছন দিকে বাড়ালে F বিন্দুতে মিলিত হয়।

৩. লেন্সের প্রধান ফোকাসের মধ্য দিয়ে (উত্তল লেন্সে) বা প্রধান ফোকাস অভিমুখী (অবতল লেন্সে) আপতিত রশ্মি প্রতিসরণের পর প্রধান অক্ষের সমান্তরাল হয়ে যায়।



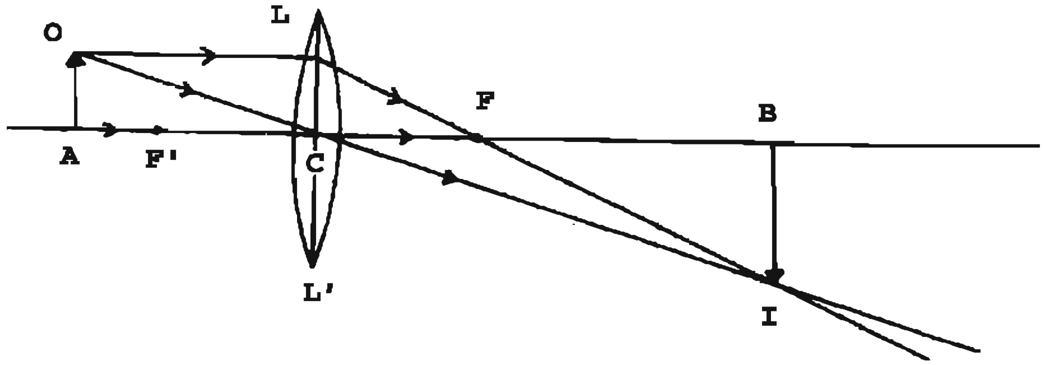
চিত্র : ১৬.১০

১৬.১০ (ক) চিত্রে একটি রশ্মি AL উত্তল লেন্সের প্রধান ফোকাস F' দিয়ে L বিন্দুতে আপতিত হয়ে প্রধান অক্ষ FCF' এর সমান্তরালে LB পথে প্রতিসরিত হয়। ১৬.১০ (খ) চিত্রে অবতল লেন্সের প্রধান F' ফোকাস অভিমুখে আপতিত একটি রশ্মি AL লেন্সের L বিন্দুতে আপতিত হয়ে প্রধান অক্ষ FCF' এর সমান্তরালে LB পথে প্রতিসরিত হয়।

১৬.৪। বিস্তৃত বস্তুর বিম্ব
Image of an Extended Object

যে কোনো বিস্তৃত লক্ষবস্তু অসংখ্য বিন্দু বস্তুর সমষ্টি। এখন প্রত্যেকটি বিন্দু বস্তুর বিম্বের অবস্থান নির্ণয় করলেই সমগ্র বস্তুটির বিম্ব পাওয়া যায়। জ্যামিতিক উপায়ে কোনো সরল বিস্তৃত বস্তুর বিম্বের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য উপরে বর্ণিত রশ্মি চিত্রের সাহায্যে বস্তুটির সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বিন্দুদ্বয়ের বিম্ব অঙ্কন করা হয়। এখন একটি সরলরেখা দ্বারা বিম্ব দুটি যোগ করে দিলে সমগ্র বস্তুটির বিম্ব পাওয়া যায়।

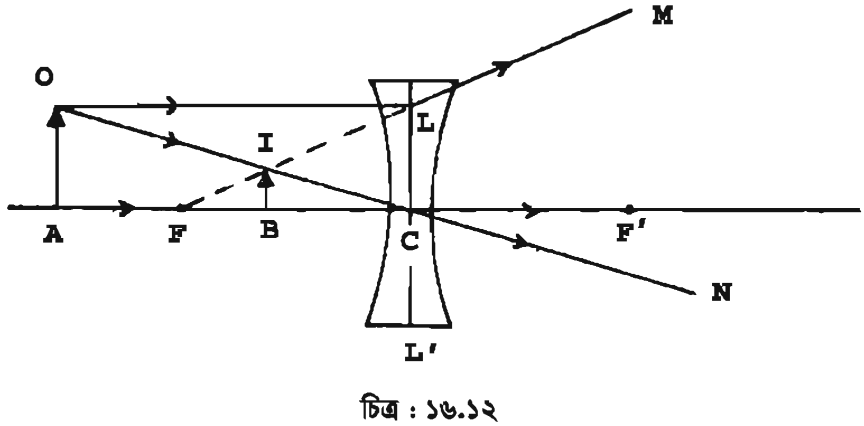
উত্তল লেন্স : ধরা যাক LCL′ একটি উত্তল লেন্স। F′ CF এর প্রধান অক্ষ, C আলোক কেন্দ্র, F প্রধান ফোকাস। লেন্সের সামনে এর প্রধান ফোকাস F এর বাইরে OA একটি বিস্তৃত লক্ষবস্তু প্রধান অক্ষের উপর লম্বভাবে অবস্থিত [চিত্র ১৬.১১]। OA এর বিম্ব নির্ণয় করতে হবে। OA বস্তুটিকে অসংখ্য বিন্দু বস্তুর সমষ্টি হিসেবে কল্পনা করা যেতে পারে। এভাবে O ও A বিন্দু দুটি লক্ষবস্তুর দুটি প্রান্ত বিন্দু। এখন এই প্রান্ত বিন্দু O ও A এর বিম্বের অবস্থান জানলেই OA –এর সম্পূর্ণ বিম্বের অবস্থান পাওয়া যাবে।



চিত্র : ১৬.১১

O বিন্দুর বিম্ব নির্ণয়ের জন্য O বিন্দু থেকে নিঃসৃত আলোক রশ্মির রশ্মি চিত্র আঁকতে হবে। O বিন্দু থেকে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল OL রশ্মি লেন্সের L বিন্দুতে আপতিত হয়ে প্রধান ফোকাস F এর মধ্য দিয়ে FI পথে প্রতিসরিত হয়। O থেকে আর একটি রশ্মি OC আলোক কেন্দ্র দিয়ে লেন্সে আপতিত হয়ে সোজাসুজি CI পথে প্রতিসরিত হয়। এখন O থেকে নির্গত রশ্মি দুটি প্রতিসরণের পর I বিন্দুতে প্রকৃত পক্ষে মিলিত হয়। সুতরাং I হচ্ছে O বিন্দুর সদ বিম্ব। A থেকে প্রধান অক্ষ বরাবর আপতিত রশ্মি সোজাসুজি প্রতিসরিত হবে। ফলে A বিন্দুর বিম্ব প্রধান অক্ষের উপরই হবে। যেহেতু OA লক্ষবস্তু প্রধান অক্ষের উপর লম্বভাবে অবস্থিত তাই I থেকে প্রধান অক্ষের উপর IB লম্ব টানলেই IB হবে OA লক্ষবস্তুর বিম্ব। এই বিম্ব সদ, উল্টো এবং আকারে লক্ষবস্তুর চেয়ে বড়। লক্ষবস্তুর অবস্থানের ওপর নির্ভর করে উত্তল লেন্সে সৃষ্ট বিম্ব সদ ও অসদ, সোজা ও উল্টো, লক্ষবস্তুর চেয়ে আকারে ছোট, বড় ও সমান হতে পারে যা পরবর্তী অনুচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে দেখানো হয়েছে।

অবতল লেন্স : ধরা যাক LCL′ একটি অবতল লেন্স। F′ FC এর প্রধান অক্ষ, C আলোক কেন্দ্র, F প্রধান ফোকাস। লেন্সের সামনে OA একটি বিস্তৃত লক্ষবস্তু প্রধান অক্ষের উপর লম্বভাবে অবস্থিত [চিত্র ১৬.১২]। OA এর বিম্ব অঙ্কন করতে হবে।



চিত্র : ১৬.১২

O বিন্দু থেকে নিঃসৃত একটি আলোক রশ্মি OL প্রধান অক্ষের সমান্তরাল হয়ে লেন্সে L বিন্দুতে আপতিত হলে

প্রতিসরণের পর রশ্মিটি LM পথে এমনভাবে প্রতিসরিত হয় যেন রশ্মিটি প্রধান ফোকাস F থেকে আসছে বলে মনে হয়। O থেকে আরেকটি রশ্মি OC আলোক কেন্দ্র দিয়ে লেন্সে আপতিত হয়ে সোজাসুজি ON পথে প্রতিসরিত হয়। এই প্রতিসরিত রশ্মি দুটি অপসারী বলে মিলিত হয় না। এদেরকে পেছন দিকে বাড়িয়ে দিলে I বিন্দু থেকে আসছে বলে মনে হয়। সুতরাং I বিন্দুই হচ্ছে O বিন্দুর অসদ বিম্ব। এখন I থেকে প্রধান অক্ষের উপর IB লম্ব টানলে IB–ই হবে OA লক্ষবস্তুর বিম্ব। এই বিম্ব অসদ, সোজা এবং আকারে লক্ষবস্তুর চেয়ে ছোট। অবতল লেন্স সর্বদা অসদ, সোজা এবং লক্ষবস্তুর চেয়ে ছোট আকারের বিম্ব গঠন করে।

১৬.৫। লেন্সের প্রধান অক্ষের উপর লক্ষবস্তুর বিভিন্ন অবস্থানের জন্য বিম্বের অবস্থান, প্রকৃতি ও আকৃতি নির্ণয়

Determination of the Position, Nature and Size of the Image Formed by a Lens for Different Positions of an Object Placed on the Principal Axis

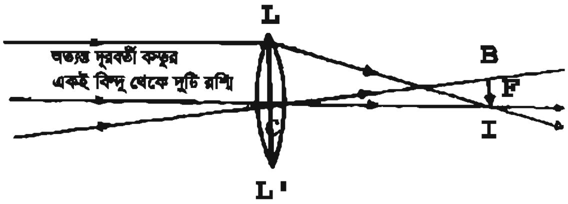
লেন্সের গঠিত বিম্বের অবস্থান, আকৃতি ও প্রকৃতি লেন্সের সামনে অবস্থিত লক্ষবস্তুর অবস্থানের ওপর নির্ভর করে। লক্ষবস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটলে বিম্বের অবস্থান, আকৃতি ও প্রকৃতির পরিবর্তন হয়।

ক. উত্তল লেন্স :

ধরা যাক, LCL′ একটি উত্তল লেন্স। C এর আলোক কেন্দ্র, F, F′ এর প্রধান ফোকাস এবং ফোকাস দূরত্ব f। এর প্রধান অক্ষ FF′–এর উপর OA লক্ষবস্তু লম্বভাবে অবস্থিত। OA –এর বিম্ব অঙ্কনের জন্য ১৬.৪ অনুচ্ছেদে বর্ণিত যে কোনো দুটি রশ্মি বিবেচনা করা হয়।

১. লক্ষবস্তু অসীম দূরে অবস্থিত : অসীম দূরে অবস্থিত লক্ষবস্তুর শীর্ষ থেকে আগত পরস্পর সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ প্রধান অক্ষের সাথে আনতভাবে আপতিত হয়ে প্রতিসরণের পর ফোকাস তলের I বিন্দুতে মিলিত হয় [চিত্র ১৬.১৩]। I থেকে প্রধান অক্ষের উপর অঙ্কিত IB লম্বই OA এর বিম্ব।

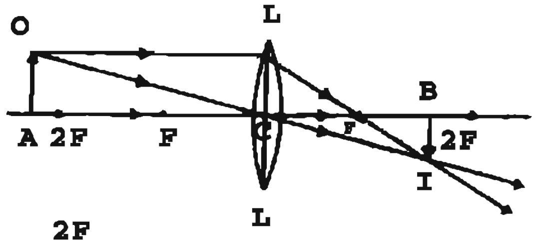
অবস্থান : প্রধান ফোকাসে
প্রকৃতি : সদ ও উল্টো
আকৃতি : অত্যন্ত খর্বিত।



চিত্র : ১৬.১৩

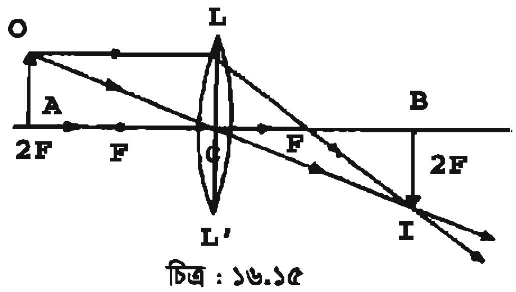
২. লক্ষবস্তু লেন্স থেকে 2f এর বেশি দূরত্বে অবস্থিত : O থেকে একটি রশ্মি আলোক কেন্দ্র বরাবর এবং একটি রশ্মি প্রধান অক্ষের সমান্তরাল বিবেচনা করলে প্রতিসরণের পর এগুলো I বিন্দুতে মিলিত হয় [চিত্র ১৬.১৪]। I থেকে প্রধান অক্ষের উপর অঙ্কিত IB লম্বই OA এর বিম্ব।

অবস্থান : f ও 2f এর মধ্যে।
প্রকৃতি : সদ ও উল্টো
আকৃতি : খর্বিত।



চিত্র : ১৬.১৪

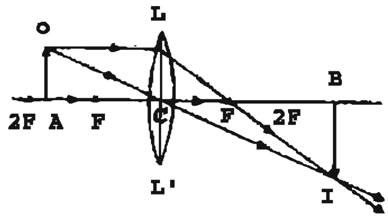
৩. লক্ষবস্তু 2f দূরত্বে : O থেকে একটি রশ্মি আলোক কেন্দ্র বরাবর এবং একটি রশ্মি প্রধান অক্ষের সমান্তরাল বিবেচনা করলে প্রতিসরণের পর I বিন্দুতে মিলিত হয় [চিত্র ১৬.১৫]। I থেকে প্রধান অক্ষের উপর অঙ্কিত IB লম্বই OA এর বিম্ব।



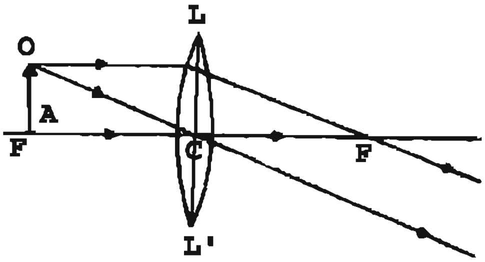
চিত্র : ১৬.১৫

অবস্থান : 2f দূরত্বে।
প্রকৃতি : সদ ও উল্টো
আকৃতি : লক্ষবস্তুর সমান।

৪. লক্ষবস্তু f ও 2f এর মধ্যে : O থেকে একটি রশ্মি আলোক কেন্দ্র বরাবর এবং একটি রশ্মি প্রধান অক্ষের সমান্তরালে বিবেচনা করলে প্রতিসরণের পর I বিন্দুতে মিলিত হয় [চিত্র ১৬.১৬]। I থেকে প্রধান অক্ষের উপর অঙ্কিত IB লম্বই OA -এর বিম্ব।
অবস্থান : 2f এর বেশি দূরত্বে।
প্রকৃতি : সদ ও উল্টো
আকৃতি : বিবর্ধিত।



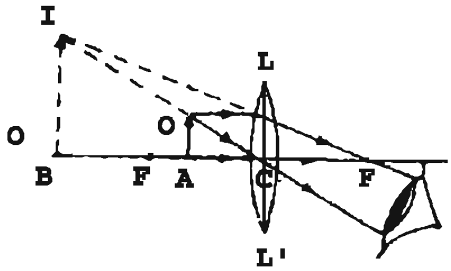
চিত্র : ১৬.১৬



চিত্র ঃ ১৬.১৭

৫. লক্ষবস্তু প্রধান ফোকাসে : O থেকে একটি রশ্মি আলোক কেন্দ্র বরাবর এবং একটি রশ্মি প্রধান অক্ষের সমান্তরালে বিবেচনা করলে প্রতিসরণের পর এগুলো পরস্পর সমান্তরাল হয় [চিত্র ১৬.১৭]। এগুলো অসীমে মিলিত হয় কিংবা পেছন দিকে বাড়ালে অসীম থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয়।
অবস্থান : অসীমে।
প্রকৃতি : সদ ও উল্টো অথবা অসদ ও সোজা।
আকৃতি : অত্যন্ত বিবর্ধিত।

৬. লক্ষবস্তু আলোক কেন্দ্র ও প্রধান ফোকাসের মধ্যে : O থেকে একটি রশ্মি আলোক কেন্দ্র বরাবর ও একটি রশ্মি প্রধান অক্ষের সমান্তরালে বিবেচনা করলে প্রতিসরণের পর পরস্পর অপসারী হয়। এগুলোকে পেছন দিকে বাড়ালে I বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয়। I থেকে প্রধান অক্ষের উপর অঙ্কিত IB লম্বই OA এর বিম্ব (চিত্র ১৬.১৮)।
অবস্থান : লক্ষবস্তু লেন্সের যে পাশে বিম্বও লেন্সের সেই পাশে লক্ষবস্তুর পেছনে ফোকাসের বাইরে।
প্রকৃতি : অসদ ও সোজা
আকৃতি : বিবর্ধিত।



চিত্র : ১৬.১৮

১৬.৬। উত্তল লেন্সের ফোকাস দূরত্ব নির্ণয়
Determination of Focal Length of a Convex Lens

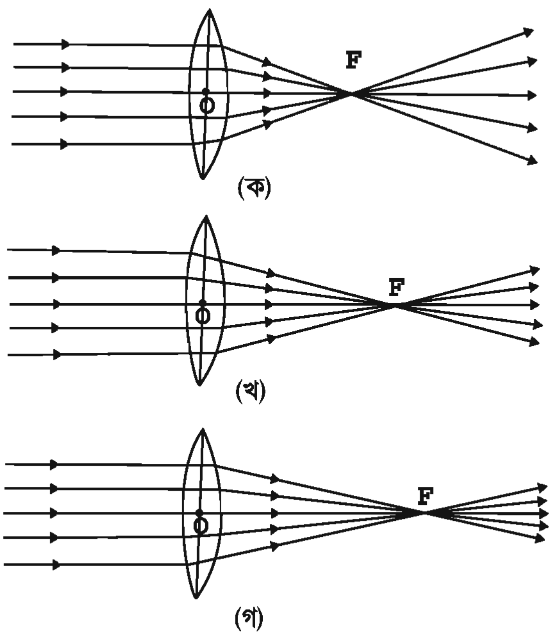
কোনো উত্তল লেন্সের ফোকাসে প্রধান অক্ষের উপর লম্বভাবে যদি একটি বস্তু রাখা হয়, তাহলে ঐ বস্তু থেকে নিঃসৃত আলোক রশ্মি লেন্সে প্রতিসরিত হয়ে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল হয়ে চলে যায়। এখন লেন্সের পিছনে একটি সমতল দর্পণ যদি প্রধান অক্ষের সাথে সমকোণে রাখা যায় তাহলে প্রতিসরিত রশ্মিগুলো দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে একই পথে সমান্তরাল রশ্মিরূপে ফিরে আসে। এ সমান্তরাল রশ্মিগুলো লেন্সে প্রতিসরিত হয়ে পুনরায় ফোকাস বিন্দুতে একত্রিত হয়। ফলে ফোকাস বিন্দুতে লক্ষবস্তুর একটি অসদ বিম্ব গঠিত হয়। এ নীতির ওপর ভিত্তি করে উত্তল লেন্সের ফোকাস দূরত্ব নির্ণয় করা যায়। (ব্যবহারিক অংশে দ্রষ্টব্য)

১৬.৭। লেন্স শনাক্তকরণ
Indentification of lens

উত্তল লেন্সের ফোকাস দূরত্বের মধ্যে কোনো লক্ষবস্তু থাকলে সেই বস্তুর অসদ, সোজা ও বিবর্ধিত বিম্ব গঠিত হয়। আবার অবতল লেন্সের সামনে বস্তু থাকলে তার অসদ, সোজা ও খর্বিত বিম্ব গঠিত হয়। সুতরাং লেন্স শনাক্ত করার জন্য লেন্সের সামনে খুব কাছাকাছি একটি আঙুল রেখে অপর দিক থেকে দেখলে যদি আঙুলের সোজা ও বিবর্ধিত বিম্ব গঠিত হয় সেই লেন্স উত্তল আর যদি সোজা কিন্তু খর্বিত প্রতিবিম্ব গঠিত হয় তাহলে সেই লেন্স অবতল।

১৬.৮। চিহ্নের প্রথা
Sign Convention

লেন্সের সামনে লক্ষবস্তুর বিভিন্ন অবস্থানের জন্য বিম্বও বিভিন্ন অবস্থানে গঠিত হয়। কখনো লক্ষবস্তু যে দিকে সেই দিকে, কখনো বা লক্ষবস্তুর বিপরীত দিকে বিম্ব গঠিত হয়। তাই লক্ষবস্তুর দূরত্ব, বিম্বের দূরত্ব ও ফোকাস দূরত্বের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য এদের চিহ্ন (ধনাত্মক ও ঋণাত্মক) ঠিক করে নেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সাধারণত দুই রকমের চিহ্নের প্রথা বর্তমানে প্রচলিত। যথা–



চিত্র : ১৬.১৯

১. সদ ধনাত্মক প্রথা (Real Positive convention)

২. নতুন কার্তেসীয় প্রথা (New Cartesian convention)

এই বই–এ সদ ধনাত্মক প্রথা ব্যবহার করা হয়েছে। এ প্রথা অনুসারে–

১. সকল দূরত্ব লেন্সের আলোক কেন্দ্র থেকে পরিমাপ করতে হবে।

২. সকল সদ দূরত্ব ধনাত্মক; সদ দূরত্ব বলতে আলোক রশ্মি প্রকৃতপক্ষে যে দূরত্ব অতিক্রম করে সেই দূরত্বকে বুঝায়। অর্থাৎ, সদ লক্ষবস্তু, সদ বিম্ব বা সদ ফোকাসের দূরত্বকে ধনাত্মক ধরা হয়।

৩. সকল অসদ দূরত্ব ঋণাত্মক। যে দূরত্ব আলোক রশ্মি প্রকৃতপক্ষে অতিক্রম করে না, অতিক্রম করেছে বলে মনে হয় সেই দূরত্বকে অসদ দূরত্ব বলে। অসদ লক্ষবস্তু, অসদ বিম্ব, অসদ ফোকাসের দূরত্বকে অসদ দূরত্ব ধরা হয়।

   উত্তল লেন্সের ফোকাস দূরত্ব সদ। কারণ আলোকরশ্মি প্রকৃতপক্ষে এ দূরত্ব অতিক্রম করে। তাই উত্তল লেন্সের ফোকাস দূরত্ব ধনাত্মক। পক্ষান্তরে, অবতল লেন্সের ফোকাস দূরত্ব অসদ। কারণ, আলোক রশ্মি প্রকৃত পক্ষে এ দূরত্ব অতিক্রম করে না। তাই অবতল লেন্সের ফোকাস দূরত্ব ঋণাত্মক ধরা হয়।

১৬.৯। লেন্সের ক্ষমতা
Power of a Lens

আমরা জানি, প্রধান অক্ষের সমান্তরাল একগুচ্ছ রশ্মিকে উত্তল লেন্স প্রধান ফোকাসে একত্রিত করে আর অবতল লেন্স সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছকে এমনভাবে অপসারী করে যেন এগুলো প্রধান ফোকাস থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয়। লেন্সের ক্ষমতা বলতে আমরা লেন্সের এই অভিসারী বা অপসারী ক্ষমতাকেই বুঝি। যে উত্তল লেন্সের প্রধান ফোকাস লেন্সের যত কাছে অর্থাৎ, যার ফোকাস দূরত্ব যত কম সেটি একগুচ্ছ সমান্তরাল রশ্মিকে তত তাড়াতাড়ি একবিন্দুতে একত্রিত করতে পারে ফলে তার ক্ষমতা তত বেশি হয়। ১৬.১৯ চিত্রের (ক) লেন্সের ক্ষমতা (খ) লেন্সের ক্ষমতার চেয়ে বেশি; আবার (খ) লেন্সের ক্ষমতা (গ) লেন্সের ক্ষমতার চেয়ে বেশি। অনুরূপভাবে যে অবতল লেন্সের প্রধান ফোকাস লেন্সের যত কাছে

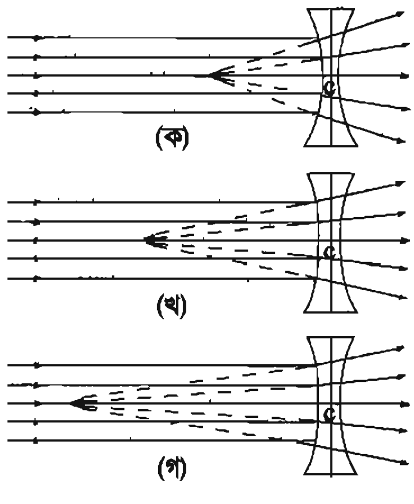
অর্থাৎ, যার ফোকাস দূরত্ব যত কম সেটি একগুচ্ছ সমান্তরাল রশ্মিকে তত বেশি অপসারী করতে পারে, ফলে তার ক্ষমতা তত বেশি হয়। ১৬.২০ চিত্রে (ক) লেন্সের ক্ষমতা (খ) লেন্সের চেয়ে বেশি, আবার (খ) লেন্সের ক্ষমতা (গ) লেন্সের চেয়ে বেশি। একগুচ্ছ সমান্তরাল আলোকরশ্মিকে কোনো লেন্সের অভিসারী (উত্তল লেন্সে) গুচ্ছে বা অপসারী (অবতল লেন্সে) গুচ্ছে পরিণত করার সামর্থকে ঐ লেন্সের ক্ষমতা বলে।

যে লেন্সের ফোকাস দূরত্ব যত কম তার ক্ষমতা তত বেশি। সুতরাং লেন্সের ক্ষমতা তার ফোকাস দূরত্বের ব্যস্তানুপাতিক। লেন্সের ক্ষমতার প্রচলিত একক হল ডাইঅপ্টার (dioptre)। **এক মিটার ফোকাস দূরত্বের কোনো লেন্সের ক্ষমতাকে এক ডাইঅপ্টার (d) বলে। লেন্সের ফোকাস দূরত্বকে মিটারে প্রকাশ করে তার বিপরীত রাশি নিলে ডাইঅপ্টারে লেন্সের ক্ষমতা পাওয়া যায়।** কোনো লেন্সের ফোকাস দূরত্ব f মিটার এবং ক্ষমতা p ডাই অপ্টার হলে

$$p = \frac{1}{f} \quad \ldots \ldots \quad (১৬.১)$$

যেহেতু উত্তল লেন্সের ফোকাস দূরত্ব ধনাত্মক, সুতরাং এর ক্ষমতাও ধনাত্মক হবে। আবার, অবতল লেন্সের ফোকাস দূরত্ব ঋণাত্মক বলে এর ক্ষমতাও ঋণাত্মক হবে। কোনো লেন্সের ক্ষমতা +2d বলতে বুঝা যায়, লেন্সটি উত্তল এবং এটি প্রধান অক্ষের সমান্তরাল একগুচ্ছ আলোক রশ্মিকে লেন্স থেকে $\frac{1}{2}$ m দূরে এক বিন্দুতে একত্রিত করে।

আবার, কোনো লেন্সের ক্ষমতা −4d বলতে বুঝায় লেন্সটি অবতল এবং এটি প্রধান অক্ষের সমান্তরাল একগুচ্ছ আলোকরশ্মিকে এমনভাবে অপসারী করে যেন মনে হয় এগুলো লেন্স থেকে $\frac{1}{4}$ m দূরের কোনো বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে।



চিত্র : ১৬.২০

উদাহরণ ১৬.১। কোনো ব্যক্তি চশমা হিসাবে 20cm ফোকাস দূরত্বের অবতল লেন্স ব্যবহার করেন। লেন্সটির ক্ষমতা কত ?

সমাধান :

আমরা জানি,

$$p = \frac{1}{f}$$

$$= \frac{1}{-0.2\text{ m}}$$

$$= -5\text{ d}$$

উ: −5 d

এখানে,

অবতল লেন্সের ফোকাস দূরত্ব,

$f = -20\text{cm} = -0.2\text{m}$

লেন্সের ক্ষমতা, $p = ?$

উদাহরণ ১৬.২। +2d ক্ষমতা সম্পন্ন একটি লেন্সের ফোকাস দূরত্ব কত ? লেন্সটি উত্তল না অবতল ?

সমাধান :

আমরা জানি,

$$p = \frac{1}{f}$$

এখানে,

লেন্সের ক্ষমতা, $P = +2\text{d}$

বা, $f = \frac{1}{p}$ m

$= \frac{1}{2}$ m

= 0.5 m

ফোকাস দূরত্ব, f = ?

∴ ফোকাস দূরত্ব ধনাত্মক ∴ লেন্সটি উত্তল

উ: 0.5 m ; উত্তল

১৬.১০। লেন্সের ব্যবহার Uses of lens

উত্তল ও অবতল উভয় প্রকার লেন্সই আমাদের অনেক জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়।

উত্তল লেন্সের ব্যবহার : উত্তল লেন্সকে আতশি কাচ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। উত্তল লেন্সের সাহায্যে আলোকরশ্মিকে একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করে আগুন জ্বালানোর কাজে ব্যবহার করা হয়।

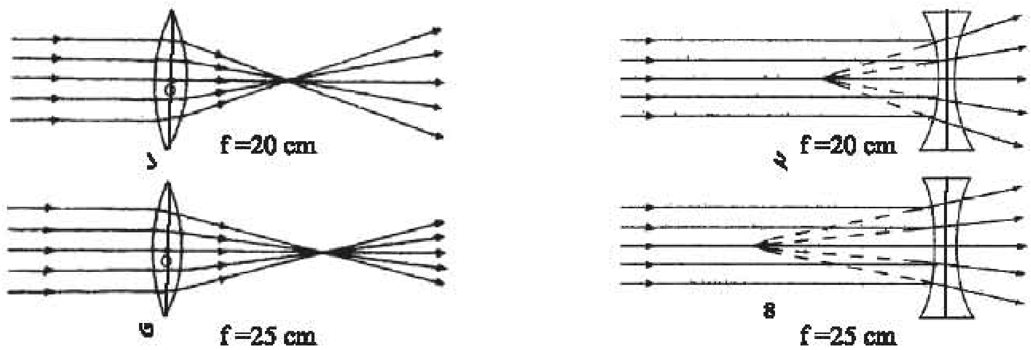
চশমা, ক্যামেরা, বিবর্ধক কাচ, অণুবীক্ষণ যন্ত্র, দূরবীক্ষণ যন্ত্র ইত্যাদি আলোক যন্ত্রে উত্তল লেন্স ব্যবহার করা হয়।

অবতল লেন্সের ব্যবহার : প্রধানত চশমায় ব্যবহার করা হয়। এছাড়া গ্যালিলিওর দূরবীক্ষণ যন্ত্রেও অবতল লেন্স ব্যবহার করা হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। নিচে চারটি লেন্সের রশ্মি চিত্র দেখানো হল। একজন ব্যক্তির ব্যবহৃত লেন্সের ক্ষমতা -4D হলে তিনি কোন লেন্সটি চশমার জন্য পছন্দ করবেন?



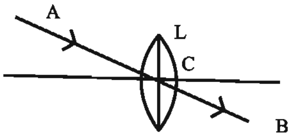
চিত্র

ক. চিত্র – ১ খ. চিত্র – ২

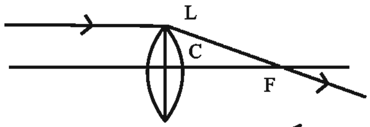
গ. চিত্র – ৩ ঘ. চিত্র – ৪

২। উত্তল লেন্সে বিম্ব অঙ্কনের ক্ষেত্রে সচরাচর ব্যবহৃত রশ্মি –

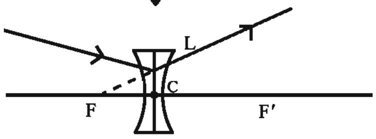
i.



ii.



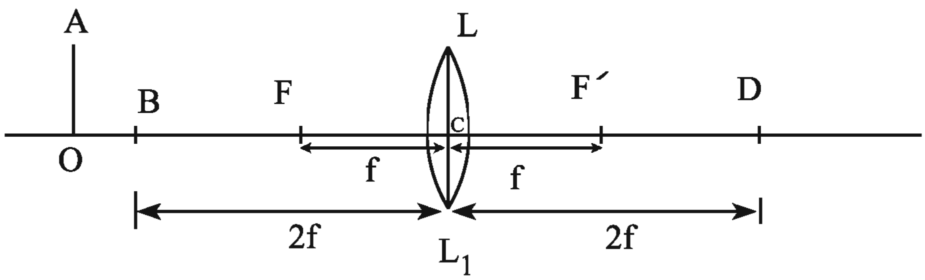
iii.



নিচের কোনটি সঠিক

ক. i খ. iii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii



চিত্র

চিত্রে LCL_1 একটি লেন্স এবং OA একটি লক্ষবস্তু।

এতথ্য ও চিত্র অনুসারে নিচের ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

৩। OA লক্ষবস্তুর বিম্ব কোথায় গঠিত হবে?

ক. F´ বিন্দুতে খ. D বিন্দুতে

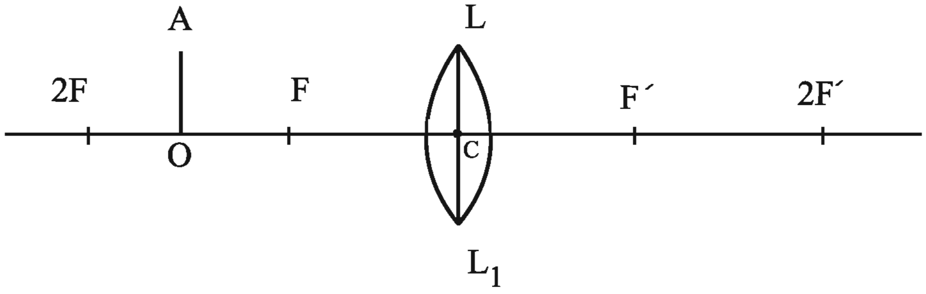
গ. F´ ও D এর মধ্যে ঘ. 2f এর বেশি দূরত্বে

৪। যদি OA লক্ষবস্তুর অবস্থান পরিবর্তন করে B বিন্দুতে আনা হয় তবে বিম্ব কেমন হবে?

ক. সদ ও উল্টো খ. অসদ ও উল্টো

গ. অসদ ও সোজা ঘ. সদ ও সোজা

সৃজনশীল প্রশ্ন



চিত্র

চিত্রে LCL_1 একটি লেন্স এবং এর সামনে OA একটি লক্ষবস্তু।

ক. LCL_1 কী ধরনের লেন্স?

খ. লেন্সের সামনে অবস্থিত OA বস্তুর বিম্ব অঙ্কনের সময় তুমি কোন রশ্মির সাহায্য নেওয়া সুবিধাজনক বলে মনে কর, ব্যাখ্যা কর।

গ. প্রদত্ত চিত্র থেকে লক্ষবস্তুটির বিম্ব অঙ্কন সম্পন্ন করে এর আকৃতি, প্রকৃতি ও অবস্থান লেখ।

ঘ. প্রদত্ত লেন্সের সাহায্যে কীভাবে লক্ষবস্তুর চেয়ে বড় আকারের বিম্ব গঠন করা যায় আলোক রশ্মির ক্রিয়ারেখা অঙ্কন করে ব্যাখ্যা কর।

সপ্তদশ অধ্যায়

দৃষ্টি সহায়ক যন্ত্র

VISION AID INSTRUMENTS

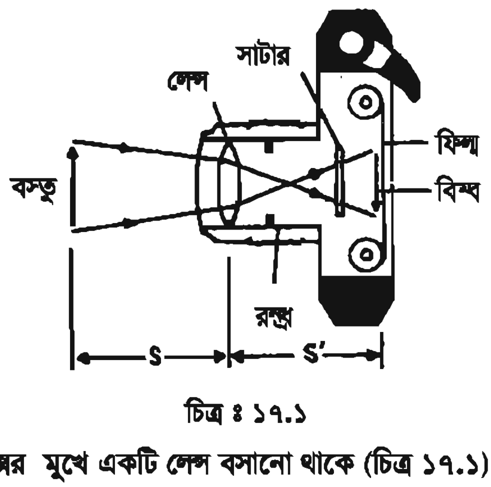
আগের অধ্যায়গুলোতে আমরা জেনেছি কোনো বস্তু থেকে সরাসরি বা অন্য কোথাও প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত হয়ে আলোক রশ্মিগুচ্ছ যদি আমাদের চোখে প্রবেশ করে তাহলে আমরা বস্তুটিকে বা বস্তুটির বিম্ব দেখতে পাই। চোখ আসলে কী এবং চোখে আলো পড়লে আমরা কীভাবে কোনো কিছু দেখি এবং চোখের সাথে ক্যামেরার মিল বা অমিল কোথায় এই অধ্যায়ে আমরা তাই আলোচনা করব। আমাদের অনেকেরই চোখে ত্রুটি থাকে ফলে আমাদের অনেক কিছু দেখতে অসুবিধা হয়। চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শে আমরা চশমা ব্যবহার করে এ সকল ত্রুটি কাটিয়ে উঠতে পারি। এ চশমা কীভাবে আমাদের দেখার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে তাও আলোচনা করা হবে এ অধ্যায়ে। এ ছাড়াও এতে থাকবে খালি চোখে কাছের বা দূরের যেসব বস্তু দেখা যায় না সেসব বস্তু দেখার জন্য কীভাবে লেন্স ব্যবহার করে দৃষ্টি সহায়ক যন্ত্রসমূহ যেমন বিবর্ধক কাচ, অণুবীক্ষণ যন্ত্র, দূরবীক্ষণ যন্ত্র ইত্যাদি তৈরি করা হয়।

১৭.১। ক্যামেরা
Camera

উত্তল লেন্সের একদিকে 2f এর চেয়ে বেশি দূরত্বে কোনো বস্তু রাখলে অপরদিকে বস্তুটির একটি বাস্তব, উল্টো ও খর্বিত বিম্ব গঠিত হয়। এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে ক্যামেরা তৈরি করা হয়েছে। ক্যামেরার গঠন ও কার্যপ্রণালি নিচে আলোচনা করা হল ।

গঠন প্রণালি :

১. আলোক নিরুদ্ধ বাক্স বা ক্যামেরা বাক্স (Light tight chamber or Camera box) : এটি কাপড় বা চামড়া বা কাঠের তৈরি ভিতরে কালো রং করা একটি বাক্স (চিত্র ১৭.১)।



চিত্র ঃ ১৭.১

২. লেন্স (Lens) : ক্যামেরা বাক্সের মুখে একটি লেন্স বসানো থাকে (চিত্র ১৭.১)। লেন্সটি একাধিক উত্তল ও অবতল লেন্সের সমন্বয়ে এমনভাবে গঠিত যে এটি একটি উত্তল লেন্স হিসেবে কাজ করে। র‍্যাক ও পিনিয়ন (rack and pinion) ব্যবস্থার সাহায্যে লেন্সটিকে সামনে বা পিছনে সরিয়ে লেন্স ও ফিল্মের মধ্যবর্তী দূরত্ব নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৩. ডায়াফ্রাম বা রন্ধ্র (Diaphragm or aperture) : এটি ক্যামেরার লেন্সের পিছনে অবস্থিত একটি ছিদ্রপথ। এই ছিদ্রকে ছোট-বড় করে লেন্সের উন্মেষ পরিবর্তন করা হয় এবং প্রয়োজন মত আলো ফিল্মের উপর ফেলা হয়।

৪. সাটার (Shutter) : ডায়াফ্রামের পিছনেই থাকে ক্যামেরার সাটার। এটি একটি ক্ষুদ্র ছিদ্রপথ যার মধ্য দিয়ে আলো ক্যামেরার মধ্যে প্রবেশ করে। সাটারটিকে ইচ্ছামত কম ও বেশি সময়ের জন্য খোলা রেখে আলোক সম্পাতের সময় তথা

ক্যামেরার মধ্যে প্রবিষ্ট আলোর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আধুনিক স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরায় $\frac{1}{10}$ সেকেন্ড থেকে $\frac{1}{100}$ সেকেন্ড পর্যন্ত আলোক সম্পাতের সময় নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৫. ফিল্ম বা আলোকচিত্রগ্রাহী পাত (Film or Photgraphic plate) : শক্ত সেলুলয়েডের তৈরী পর্দা বা স্বচ্ছ কাচ ক্যামেরার ফিল্ম বা আলোকচিত্রগ্রাহী পাতের কাজ করে। এর উপর রুপা ও হ্যালোজেন যৌগের একটি আলোক সংবেদনশীল প্রলেপ থাকে। পর্দায় যে চিত্র হয় তাকে নেগেটিভ বলে।

৬. পর্দা (Screen) : লেন্স থেকে যত দূরত্বে ক্যামেরার মধ্যে ফিল্ম থাকে ঠিক সেই দূরত্বে একটি ঘসা কাচের পর্দা বসানো থাকে। ছবি তোলার আগে এই পর্দাটি থেকে লেন্স এর দূরত্ব বাড়িয়ে কমিয়ে পর্দার উপর স্বচ্ছ বিম্ব ফেলা হয় । এর ফলে লেন্স সাপেক্ষে ফিল্মের অবস্থান ঠিক হয়। একে ফোকাসিং বলে।

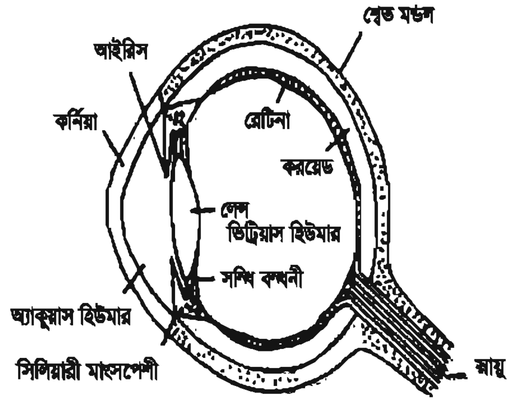
ক্যামেরার কার্যপ্রণালি (Action of camara) : যে বস্তুর ফটো তুলতে হবে প্রথমে ক্যামেরাটি সেই বস্তুটির দিকে মুখ করে ধরতে হবে। এবার ক্যামেরার লেন্সটিকে সামনে-পিছনে সরিয়ে পর্দার উপর বস্তুটির একটি স্পষ্ট বিম্ব ফেলতে হবে। একে ফোকাসিং বলে। ফোকাসিং করা হয়ে গেলে ক্যামেরা ছবি তোলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। ক্যামেরার বাক্সের মধ্যে নির্দিষ্ট জায়গায় ফিল্মের স্পুল আগেই লাগিয়ে নেওয়া হয়। এখন সাটার খুললে ছিদ্র পথে আলোক রশ্মি ফিল্মের উপর এসে পড়ে এবং এই আলোর প্রভাবে ফিল্মের উপর প্রলেপ দেওয়া রাসায়নিক দ্রব্যের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়। কিন্তু তখনি কোনো ছবি ওঠে না। যে বস্তুর ছবি তুলতে হবে তার ঔজ্জ্বল্যের ওপর নির্ভর করে আলোক সম্পাতের সময় নির্ধারিত করতে হয়।

এবার ফিল্মটিকে প্রথম ডেভেলপার (Developer) নামক একটি দ্রবণে ডুবানো হয়। ফিল্মের যে অংশে আলোক পড়ে সেই সব অংশের সিলভার হ্যালাইড ($AgBr$ বা AgI) –এর সাথে রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হয় ফলে বিজারণ প্রক্রিয়ায় ফিল্মের উপর মুক্ত রুপার স্তর জমা হয়। লক্ষবস্তুর যে অংশ যত উজ্জ্বল, নেগেটিভের সেই অংশে তত বেশি রুপা জমে এবং তা তত বেশি কালো হয়। রুপার স্তরের বেদের এই বৈষম্য নির্ভর করে আলোর তীব্রতা ও উন্মোচনকালের ওপর। এবার ফিল্মটিকে পানিতে ধুয়ে হাইপো (সোডিয়াম থায়োসালফেট) নামক দ্রবণে ডুবানো হয়। ফলে ফিল্মের যে অংশে আলো পড়ে না সে অংশের সিলভার হ্যালাইড গলে যায়। এবার পরিষ্কার পানিতে ফিল্মটি ধুয়ে নিলে বস্তুর একটি নেগেটিভ চিত্র পাওয়া যায়।

নেগেটিভ থেকে প্রকৃত চিত্র পাওয়ার জন্য নেগেটিভের নিচে সিলভার হ্যালাইডের প্রলেপ দেওয়া ফটোগ্রাফের কাগজ রেখে অল্প সময়ের জন্য নেগেটিভের উপর আলোর সম্পাত করা হয়। এরপর আগের মত হাইপো দ্রবণে ফটোগ্রাফের কাগজ ডুবিয়ে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে নিলে ফটোগ্রাফের কাগজের উপর বস্তুটির প্রকৃত চিত্র পাওয়া যায়।

১৭.২ । মানুষের চোখ
Human eye

মানুষের চোখের গঠন ও কার্যপ্রণালি অনেকটা ক্যামেরার মত। ক্যামেরার সামনে কোনো বস্তু রেখে যেমন তার ছবি তোলা যায় তেমনি চোখের সামনে কোনো বস্তু রাখলে চোখের ভিতর তার ছবি ওঠে এবং আমরা সে বস্তু দেখতে পাই। চোখের গঠন ও কার্যপ্রণালি নিচে আলোচনা করা হল।



চিত্র : ১৭.২

চোখের গঠন :

১. অক্ষিগোলক (Eye-ball) : চোখের কোটরের মধ্যে অবস্থিত এর গোলাকার অংশকে অক্ষিগোলক বলে। এর সামনে ও পিছনের অংশ খানিকটা চেপ্টা। এটি চোখের কোটরের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সীমার চারদিকে ঘুরতে পারে।

২. শ্বেতমণ্ডল (Sclerotic) : এটি শক্ত, সাদা, অস্বচ্ছ তন্তু দিয়ে তৈরী। অক্ষিগোলকের বাইরের আবরণ (চিত্র ১৭.২)। এটি চোখের আকৃতি ঠিক রাখে এবং বাইরের নানা প্রকার অনিষ্ট হতে চোখকে রক্ষা করে।

৩. কর্নিয়া (Cornea) : এটি শ্বেতমণ্ডলের সামনের অংশ। শ্বেতমণ্ডলের এ অংশ স্বচ্ছ এবং বাইরের দিকে কিছুটা উত্তল।

৪. কৃষ্ণমণ্ডল (Choroid) : শ্বেতমণ্ডলের ভিতরের গায়ে কালো রঙের একটি আস্তরণ থাকে। একে কৃষ্ণমণ্ডল বলে। এই কালো আস্তরণের জন্য চোখের ভিতরে অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হয় না।

৫. আইরিস (Iris) : কর্নিয়ার ঠিক পিছনে অবস্থিত একটি অস্বচ্ছ পর্দাকে আইরিস বলে। আইরিসের রং বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রকমের হয়। সাধারণত: এর রং কালো, হালকা নীল বা গাঢ় বাদামী হয়। আইরিস চক্ষু লেন্সের উপর আপতিত আলোর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।

৬. চোখের মণি ও তারারন্ধ্র (Pupil) : আইরিসের মাঝখানে একটি ছোট ছিদ্র থাকে। একে চোখের মণি বা তারারন্ধ্র বলে। তারারন্ধ্রের মধ্য দিয়ে আলো চোখের ভিতরে প্রবেশ করে।

৭. চক্ষু লেন্স (Eye lens) : তারারন্ধ্রের ঠিক পিছনে অবস্থিত এটি চোখের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি স্বচ্ছ জৈব পদার্থে তৈরী। লেন্সের পিছনের দিকের বক্রতা সামনের দিকের বক্রতার চেয়ে কিছুটা বেশি। লেন্সটি অক্ষিগোলকের সাথে সিলিয়ারি পেশি ও সাসপেন্সরি বন্ধনী দ্বারা আটকানো থাকে। এই পেশি ও বন্ধনীগুলোর সংকোচন ও প্রসারণের ফলে লেন্সের বক্রতা পরিবর্তিত হয় ফলে লেন্সের ফোকাস দূরত্বের পরিবর্তন ঘটে। দূরের বা কাছের জিনিস দেখার জন্য চক্ষু লেন্সের ফোকাস দূরত্বের পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়।

৮. রেটিনা (Retina) : চক্ষু লেন্সের পেছনে অবস্থিত অক্ষিগোলকের ভিতরের পৃষ্ঠের গোলাপী রঙের ঈষদচ্ছ আলোক সংবেদন আবরণকে রেটিনা বলে। এটি রড ও কোন (rods & cones) নামে কতগুলো স্নায়ুতন্তু দ্বারা তৈরী। এই তন্তুগুলো চক্ষু স্নায়ুর সাথে সংযুক্ত থাকে। রেটিনার উপর আলো পড়লে তা ঐ স্নায়ুতন্তুতে এক প্রকার উত্তেজনা সৃষ্টি করে ফলে মস্তিষ্কে দর্শনের অনুভূতি জাগে।

অ্যাকুয়াস হিউমার ও ভিট্রিয়াস হিউমার (Aqueous humour and Vitreous humour) : কর্নিয়া ও চক্ষু লেন্সের মধ্যবর্তী স্থান যে স্বচ্ছ লবণাক্ত জলীয় পদার্থে পূর্ণ থাকে তাকে অ্যাকুয়াস হিউমার বলে। অশ্রু বলতে আমরা অ্যাকুয়াস হিউমারকে বুঝি। রেটিনা ও চক্ষু লেন্সের মধ্যবর্তী স্থান যে জেলি জাতীয় পদার্থে পূর্ণ থাকে তাকে ভিট্রিয়াস হিউমার বলে।

চোখের উপযোজন বা বিম্ব স্থাপন বা সংযোজন (Accommodation of eye) : একটি উত্তল লেন্সের সামনে কোনো বস্তু রাখলে লেন্সের পিছনে বস্তুটির একটি বাস্তব বিম্ব গঠিত হয়। লেন্সের পিছনে একটি পর্দা রাখলে পর্দার উপর বস্তুটির একটি উল্টো বিম্ব দেখা যায়। পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে পর্দাটির একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে বিম্ব সবচেয়ে পরিষ্কার হয়। একটি বস্তুকে যদি লেন্সের নিকটে আনা হয় বা লেন্স থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া হয় তাহলে পরিষ্কার বিম্ব পাওয়ার জন্য পর্দাটিকে সামনে বা পিছনে সরাতে হয়। এখন আমরা যদি পর্দার পূর্ব অবস্থানে পরিষ্কার বিম্ব পেতে চাই তাহলে ভিন্ন ফোকাস দূরত্বের লেন্স ব্যবহার করতে হবে।

চোখের ক্ষেত্রে ঠিক একই রকম ঘটনা ঘটে। কর্নিয়া, অ্যাকুয়াস হিউমার, চক্ষু লেন্স ও ভিট্রিয়াস হিউমার একত্রে একটি অভিসারী লেন্সের কাজ করে। চোখের সামনে কোনো বস্তু থাকলে সেই বস্তুর বিম্ব যদি রেটিনার উপর পড়ে তাহলে মস্তিষ্কে দর্শনের অনুভূতি জাগে এবং আমরা সেই বস্তু দেখতে পাই। আমরা চোখের সাহায্যে বিভিন্ন দূরত্বের বস্তু দেখি। চোখের লেন্সের একটি বিশেষ গুণ হচ্ছে এর আকৃতি প্রয়োজন মতো বদলে যায় ফলে ফোকাস দূরত্বের পরিবর্তন ঘটে। ফোকাস দূরত্বের পরিবর্তনের ফলে লক্ষবস্তুর যে কোনো অবস্থানের জন্য লেন্স থেকে একই দূরত্বে অর্থাৎ, রেটিনার উপর স্পষ্ট বিম্ব গঠিত হয়। যে কোনো দূরত্বের বস্তু দেখার জন্য চোখের লেন্সের ফোকাস দূরত্ব নিয়ন্ত্রণ

করার ক্ষমতাকে বিম্ব স্থাপন বা সংযোজন ক্ষমতা বা উপযোজন ক্ষমতা বলে এবং এ প্রক্রিয়াকে বিম্ব স্থাপন বা চোখের সংযোজন বা উপযোজন বলে।

স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম দূরত্ব বা নিকট বিন্দু (Least distance of distinct vision & near point) : আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখতে পাই যে কোনো বস্তুকে চোখের যত নিকটে নিয়ে আসা যায় বস্তুটিও তত স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু কাছে আনতে আনতে এমন একটা সময় আসে যখন আর বস্তুটি খুব স্পষ্ট দেখা যায় না, কিম্বা স্পষ্ট দেখতে গেলে চোখের খুব কষ্ট হয়। যে নিকটতম দূরত্ব পর্যন্ত চোখ বিনা শ্রান্তিতে স্পষ্ট দেখতে পায় তাকে স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম দূরত্ব বলে। স্বাভাবিক চোখের জন্য স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম দূরত্ব প্রায় 25 সেন্টিমিটার। চোখ থেকে 25 সে.মি. দূরবর্তী বিন্দুকে চোখের নিকট বিন্দু বলে। কোনো বস্তু 25 সেন্টিমিটারের কম দূরত্বে থাকলে সেটি দেখতে চোখের বেশ কষ্ট হয় এবং অনেকক্ষণ ধরে দেখলে চোখ ব্যথা হয়।

সবচেয়ে বেশি যে দূরত্বে কোনো বস্তু থাকলে তা স্পষ্ট দেখা যায় তাকে চোখের স্পষ্ট দর্শনের দূরতম দূরত্ব বলে। একে চোখের দূরবিন্দুও বলে। স্বাভাবিক চোখের জন্য দূরবিন্দু অসীম দূরত্বে অবস্থিত হয়। অর্থাৎ, স্বাভাবিক চোখ বহুদুর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পায়।

চোখের ক্রিয়া (Function of eye) : রেটিনা, চোখের লেন্স, অ্যাকুয়াস হিউমার ও ভিট্রিয়াস হিউমার মিলে একত্রে একটি অভিসারী লেন্সের মতো কাজ করে। যখনই চোখের সামনে কোনো বস্তু আসে তখন ঐ বস্তু হতে আলোক রশ্মি ঐ লেন্স দ্বারা প্রতিসরিত হয়ে রেটিনার উপর উল্টো বিম্ব গঠন করে। রেটিনার উপর আলো পড়লে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রড ও কোন (rods & cones) সেই আলো গ্রহণ করে তাকে তড়িৎ প্রেরণায় পরিণত করে। প্রত্যেকটি রড ও কোন এক একটি স্নায়ুর সাথে যুক্ত। ঐ স্নায়ু তড়িৎ প্রেরণাকে অক্ষি স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে প্রেরণ করে। মস্তিষ্ক রেটিনায় সৃষ্ট উল্টো প্রতিবিম্বকে পুনরায় উল্টে দেয় ফলে আমরা বস্তুটিকে দেখতে পাই।

পরীক্ষা থেকে জানা গেছে যে কোনগুলো (cones) তীব্র আলোতে সাড়া দেয় এবং রঙের অনুভূতি ও রঙের পার্থক্য বুঝিয়ে দেয়; আর রডগুলো (rods) ক্ষীণ আলোতেও সংবেদনশীল হয় এবং বস্তুর নড়াচড়া ও আলোর তীব্রতার সামান্য হ্রাস–বৃদ্ধি বুঝিয়ে দেয়।

দর্শনানুভূতির স্থায়িত্বকাল (Persistence of vision) : চোখের সামনে কোনো বস্তু রাখলে রেটিনায় তার বিম্ব গঠিত হয় এবং আমরা বস্তুটি দেখতে পাই। এখন যদি বস্তুটিকে চোখের সম্মুখ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় তাহলে সরিয়ে নেওয়ার 0.1 সেকেন্ড পর্যন্ত এর অনুভূতি মস্তিষ্কে থেকে যায়। এই সময়কে দর্শনানুভূতির স্থায়িত্বকাল বলে। কোনো বস্তুকে চোখের সম্মুখ থেকে সরিয়ে এক সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগের মধ্যে যদি বস্তুকে আবার চোখের সম্মুখে আনা হয় তাহলে দর্শনানুভূতির স্থায়িত্বের জন্য বস্তুটির মাঝখানের অনুপস্থিতি টের পাওয়া যায় না। এই একই কারণে চোখের সামনে একটি জ্বলন্ত মশাল জোরে ঘুরালে আমরা চোখে আগুনের একটা বৃত্ত দেখি যদিও বিভিন্ন সময়ে মশালটি বিভিন্ন স্থানে থাকে।

দুটি চোখ থাকার সুবিধা (Advantages of having two eyes) : দুইটি বস্তুর প্রকৃত অবস্থান, তাদের পারস্পরিক দূরত্ব নির্ণয়ে এবং বস্তু সম্পর্কে ত্রিমাত্রিক ধারণা স্পষ্ট হওয়ার জন্য দুইটি চোখের প্রয়োজন। এক চোখ বন্ধ রেখে সুচে সুতো পরাতে গেলে বেশ অসুবিধা হয়। এর কারণ এক চোখ দিয়ে এদের পারস্পরিক দূরত্ব ঠিকভাবে বর্ণনা করা যায় না। আমরা যখন দুই চোখ দিয়ে দেখি তখন প্রত্যেকটি চোখ নিজের রেটিনায় একটি পৃথক বিম্ব গঠন করে। কিন্তু মস্তিষ্কে দুইটি বিম্ব মিলে একটি একক অনুভূতি সৃষ্টি করে। বস্তু সাপেক্ষে দুইটি চোখের অবস্থানের পার্থক্যের জন্য ডান চোখ বস্তুর ডান দিকের অংশ ও বাম চোখ বস্তুর বাম দিকের অংশ ভালভাবে দেখতে পায়। যখন দুইটি চোখ দিয়ে একই সঙ্গে বস্তুটি দেখা হয় তখন সামান্য ভিন্ন বিম্ব দুইটি পরস্পরের ওপর আরোপিত হয়। এই সমন্বয়ের ফলে বস্তুর সম্পর্কে ত্রিমাত্রিক ধারণা স্পষ্ট হয়।

১৭.৩। চোখের ত্রুটি ও তার প্রতিকার
Defects of vision and its Remedy

স্বাভাবিক চোখের দৃষ্টির পাল্লা 25 cm থেকে অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত অর্থাৎ, স্বাভাবিক চোখ 25 cm থেকে অসীম দূরত্বের মধ্যে যে কোনো বস্তু স্পষ্ট দেখতে পায়। যদি কোনো চোখ এই পাল্লার মধ্যে কোনো বস্তুকে স্পষ্ট দেখতে না পায় তাহলে সেই চোখ ত্রুটিপূর্ণ বলে ধরা হয়। চোখে প্রধানত দুই ধরনের ত্রুটি দেখা যায়। যথা–

১. হ্রস্ব দৃষ্টি বা মাইওপিয়া (Short sight or Myopia)

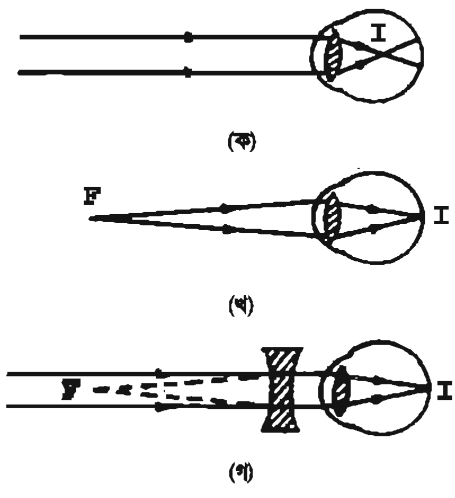
২. দীর্ঘ দৃষ্টি বা হাইপারমেট্রোপিয়া (Long sight or Hypermetropia)

১. হ্রস্ব দৃষ্টি বা মাইওপিয়া : এই ত্রুটিগ্রস্ত চোখ দূরের জিনিস ভালভাবে দেখতে পায় না কিন্তু কাছের জিনিস স্পষ্ট দেখতে পায়। এমনকি এই চোখের নিকট বিন্দু 25cm এরও কম হতে পারে।

কারণ : অক্ষিগোলকের ব্যাসার্ধ বেড়ে গেলে বা চোখের লেন্সের ফোকাস দূরত্ব কমে গেলে অর্থাৎ, অভিসারী ক্ষমতা বেড়ে গেলে এই ত্রুটি দেখা দেয় [চিত্র ১৭.৩ (ক)]।

ত্রুটির ফল : এক্ষেত্রে অনেক দূরবর্তী বস্তু থেকে আগত রশ্মিগুচ্ছ চোখের লেন্সে প্রতিসরিত হয়ে রেটিনার সামনে I বিন্দুতে মিলিত হয় [চিত্র১৭.৩ (ক)]। ফলে লক্ষবস্তু স্পষ্ট দেখা যায় না। এই চোখের দূরবিন্দু অসীমের পরিবর্তে F বিন্দুতে হয় যা অনেক সময় এক মিটার বা তার চেয়ে কম দূরত্বে অবস্থিত হয়। তাই এই চোখ F এর দূরবর্তী স্থানের কোনো বস্তু স্পষ্ট দেখতে পায় না [চিত্র ১৭.৩ (খ)]।

প্রতিকার : চোখের লেন্সের অভিসারী ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ার জন্য এই ত্রুটির উদ্ভব হয়। এ ত্রুটি দূর করার জন্য তথা চোখের লেন্সের অভিসারী ক্ষমতা কমাবার জন্য সহায়ক লেন্স বা চশমা হিসেবে অবতল লেন্স ব্যবহার করা হয়।

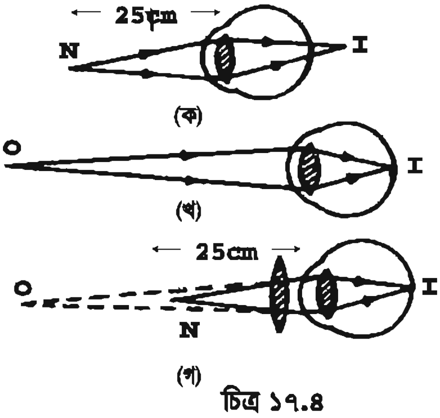


চিত্র ১৭.৩

তাছাড়া একমাত্র অবতল লেন্সই লক্ষবস্তুর চেয়েও নিকটে সমশীর্ষ অসদ বিম্ব গঠন করে বলে এক্ষেত্রে চোখের লেন্সের সামনে সহায়ক লেন্স বা চশমা হিসেবে এমন ক্ষমতা তথা ফোকাস দূরত্ব বিশিষ্ট অবতল লেন্স ব্যবহার করতে হবে যা অসীম দূরত্বে অবস্থিত লক্ষবস্তুর বিম্ব ত্রুটিপূর্ণ চোখের দূরবিন্দুতে গঠন করে [চিত্র ১৭.৩ (গ)]। আমরা জানি অসীম দূরত্বে অবস্থিত লক্ষবস্তুর বিম্ব ফোকাসে গঠিত হয়। সুতরাং অবতল লেন্সের ফোকাস দূরত্ব ত্রুটিপূর্ণ চোখের দূরবিন্দুর সমান হতে হবে।

২. দীর্ঘদৃষ্টি বা হাইপারমেট্রোপিয়া : এই ত্রুটিগ্রস্ত চোখ দূরের জিনিস দেখতে পায় কিন্তু কাছের জিনিস স্পষ্ট দেখতে পায় না।

কারণ : অক্ষিগোলকের ব্যাসার্ধ কমে গেলে বা চোখের লেন্সের ফোকাস দূরত্ব বেড়ে গেলে অর্থাৎ, অভিসারী ক্ষমতা কমে গেলে চোখে এ ধরনের ত্রুটি দেখা দেয় [চিত্র ১৭.৪ (ক)]



চিত্র ১৭.৪

ত্রুটির ফল : এক্ষেত্রে চোখের সামনে লক্ষবস্তু থেকে আগত আলোক রশ্মিগুচ্ছ চোখের লেন্সে প্রতিসরিত হয়ে রেটিনার পেছনে I বিন্দুতে মিলিত হয় [চিত্র ১৭.৪ (ক)]। ফলে লক্ষবস্তু স্পষ্ট দেখা যায় না। [এই চোখের নিকট বিন্দু N থেকে দূরে সরে O বিন্দুতে চলে যায় যা 25 cm চেয়ে অনেক বেশি । তাই এ চোখে O–এর চেয়ে নিকটবর্তী স্থানের বস্তু স্পষ্ট দেখা যায় না [চিত্র ১৭.৪ (খ)]।

প্রতিকার : চোখের লেন্সের অভিসারী ক্ষমতা কমে যাওয়ার দরুন এ ত্রুটির উদ্ভব হয়। তাই এ ত্রুটি দূর করতে চোখের লেন্সের অভিসারী ক্ষমতা বাড়াতে হয়। এ জন্যে সহায়ক লেন্স হিসেবে উত্তল লেন্স ব্যবহার করা হয়।

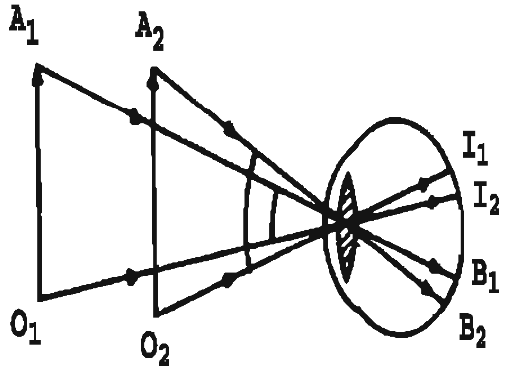
তাছাড়া একমাত্র উত্তল লেন্সই লক্ষবস্তুর চেয়েও দূরে সোজা অসদ বিম্ব গঠন করে। এক্ষেত্রে তাই চোখের লেন্সের সামনে সহায়ক লেন্স বা চশমা হিসেবে এমন ক্ষমতা তথা ফোকাস দূরত্ব বিশিষ্ট উত্তল লেন্স ব্যবহার করতে হবে যা স্বাভাবিক চোখের নিকট বিন্দু N- এ স্থাপিত লক্ষবস্তুর বিম্ব ত্রুটিপূর্ণ চোখের নিকট বিন্দু O-তে গঠন করে [চিত্র ১৭.৪ (গ)]।

১৭.৪। ক্যামেরার ও চোখের তুলনা
Comparison of camera and eye

ক্যামেরা	চোখ
১. ক্যামেরায় আলোক নিরূদ্ধ বাক্স আছে।	১. চোখের অক্ষিগোলক আলোক নিরূদ্ধ বাক্সের কাজ করে।
২. ক্যামেরায় এক বা একাধিক উত্তল লেন্স আছে যা সদ, উল্টো ও খর্বিত বিম্ব গঠন করে।	২. চোখের লেন্স চোখের সামনের বস্তুর সদ, উল্টো ও খর্বিত বিম্ব গঠন করে।
৩. ক্যামেরার ডায়াফ্রাম লেন্সের উন্মেষ নিয়ন্ত্রণ করে।	৩. চোখের আইরিস ডায়াফ্রামের কাজ করে।
৪. ক্যামেরার সাটার আলোক সম্পাতের সময় নিয়ন্ত্রণ করে।	৪. চোখের পাতাও একই কাজ করে।
৫. ক্যামেরায় আলোকসংবেদি ফিল্মে বিম্ব পড়ে।	৫. চোখের রেটিনায় বিম্ব গঠিত হয়।
৬. ক্যামেরার লেন্স ও ফিল্মের মধ্যবর্তী দূরত্ব নিয়ন্ত্রণ করে যে কোনো দূরত্বের বস্তুর ছবি তোলা যায়।	৬. চোখের উপযোজন ক্ষমতার জন্য যে কোনো অবস্থানের বস্তু দেখা যায়।
৭. অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন রোধ করার জন্য ক্যামেরার ভিতরে কালো রং করা থাকে।	৭. অক্ষিপটের কৃষ্ণমন্ডল চোখের ভিতরে অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন রোধ করে।

১৭.৫। বীক্ষণ কোণ
Angle of vision

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখতে পাই যে, একটি বস্তু যত দূরে সরে যায় তাকে তত ছোট দেখায়। চোখে একটি বস্তু বড় বা ছোট দেখাবে তা নির্ভর করে বস্তু দ্বারা উৎপন্ন বীক্ষণ কোণের ওপর। চোখে একটি বস্তু যে কোণ উৎপন্ন করে তাকে বীক্ষণ কোণ বলে। ১৭.৫ চিত্রে A_1O_1 অবস্থানে বস্তুটি চোখে যে কোণ উৎপন্ন করে



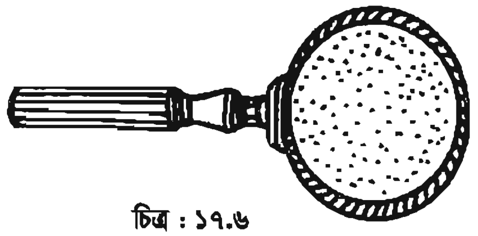
চিত্র : ১৭.৫

তার চেয়ে A_2O_2 অবস্থানে উৎপন্ন কোণ বড় তাই একই বস্তুকে A_1O_1 অবস্থানের চেয়ে A_2O_2 অবস্থানের বড় দেখাবে।

১৭.৬। দৃষ্টি সহায়ক যন্ত্র
Vision aid instrument

যে সকল যন্ত্র কোনো বস্তু দেখার ব্যাপারে আমাদের চোখকে সাহায্য করে তাদেরকে দৃষ্টি সহায়ক যন্ত্র বলে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা মাইক্রোস্কোপ, দুরবীক্ষণ যন্ত্র বা টেলিস্কোপ, বাইনোকুলার ইত্যাদি দৃষ্টি সহায়ক যন্ত্র।

বস্তু খুব দূরে থাকলে বা খুব ছোট হলে খালি চোখে দেখতে অসুবিধা হয়। বীক্ষণ কোণ বাড়িয়ে বস্তুর আপাত সাইজ বৃদ্ধি করতে পারলে দেখতে সুবিধা হয়। বীক্ষণ যন্ত্রপাতি বা দৃষ্টি সহায়ক যন্ত্রপাতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বীক্ষণ কোণ বৃদ্ধি করে বস্তুর আপাত সাইজ বৃদ্ধি করা। নিচে কয়েকটি দৃষ্টি সহায়ক যন্ত্রের বর্ণনা দেওয়া হল।



চিত্র : ১৭.৬

১৭.৭। মাইক্রোস্কোপ বা অণুবীক্ষণ যন্ত্র
Microscope

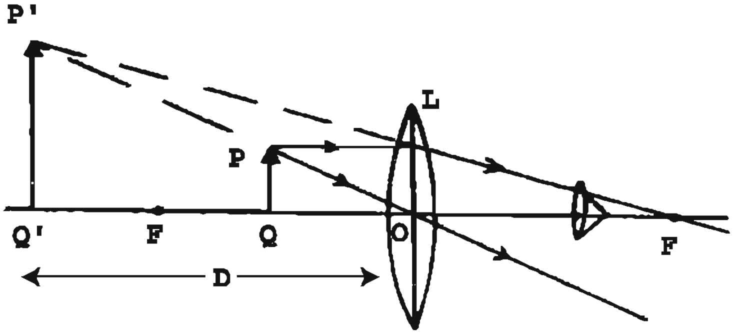
যে যন্ত্রের সাহায্যে চোখের নিকটবর্তী ক্ষুদ্র বস্তুকে বড় করে দেখা যায় তাকে অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা মাইক্রোস্কোপ বলে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দুই ধরনের হয়। যথা–

১. সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা বিবর্ধক কাচ (Simple microscope or Magnifying glass) ও
২. জটিল বা যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Compound microscope)

১. সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা বিবর্ধক কাচ : কোনো উত্তল লেন্সের ফোকাস দূরত্বের মধ্যে কোনো বস্তুকে স্থাপন করে লেন্সের অপর পাশ থেকে বস্তুটিকে দেখলে বস্তুটির একটি সোজা, বিবর্ধিত ও অসদ বিম্ব দেখা যায়। এখন এই বিম্ব চোখের যত কাছে গঠিত হবে চোখের বীক্ষণ কোণও তত বড় হবে এবং বিম্বটিকেও বড় দেখাবে। কিন্তু বিম্ব চোখের নিকট বিন্দুর চেয়ে কাছে গঠিত হলে সেই বিম্ব আর স্পষ্ট দেখা যায় না। সুতরাং বিম্ব যখন চোখের নিকট বিন্দু অর্থাৎ, স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম দূরত্বে গঠিত হয় তখনই বস্তু খালি চোখে সবচেয়ে স্পষ্ট দেখা যায়। ফলে যে সমস্ত লেখা বা স্কেল বা ক্ষুদ্র বস্তু চোখে পরিষ্কার দেখা যায় না তা স্পষ্ট ও বড় করে দেখার জন্য স্বল্প ফোকাস

দূরত্বের একটি উত্তল লেন্স ব্যবহার করা হয়। উপযুক্ত ফ্রেমে আবদ্ধ এ উত্তল লেন্সকে বিবর্ধক কাচ বা পঠন কাচ বা সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র বলে (চিত্র ১৭.৬)। এ যন্ত্রে খুব বেশি বিবর্ধন পাওয়া যায় না।

কার্যপ্রণালি : ধরা যাক, PQ একটি খুব ক্ষুদ্র বস্তুকে একটি উত্তল লেন্স LO-এর ফোকাস দূরত্ব f-এর মধ্যে এমনভাবে স্থাপন করা হল যেন এর অসদ, বিবর্ধিত, সোজা বিম্ব P′Q′ চোখের স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম দূরত্বে (D) গঠিত হয় (চিত্র ১৭.৭)।



চিত্র : ১৭.৭

বিবর্ধন : বীক্ষণ যন্ত্রে বীক্ষণ কোণ বাড়িয়ে বস্তুর আপাত সাইজ বৃদ্ধি করা হয় ফলে বস্তু দেখতে সুবিধা হয়। সে কারণে বীক্ষণ যন্ত্রের বিবর্ধন বস্তু ও বিম্ব চোখে যে বীক্ষণ কোণ উৎপন্ন করে তার ওপর নির্ভর করে।

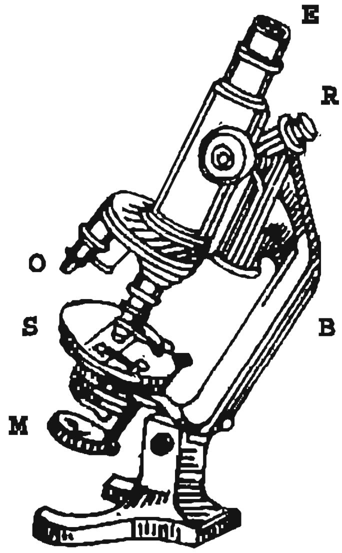
২. জটিল অণুবীক্ষণ যন্ত্র

গঠন : এই যন্ত্রে দুখানি উত্তল লেন্স একটি ধাতব নলের দুই প্রান্তে একই অক্ষ বরাবর বসানো থাকে। লক্ষবস্তুর কাছে যে লেন্সখানি থাকে তাকে অভিলক্ষ (O) বলে (চিত্র ১৭.৮)। এর ফোকাস দূরত্ব ও উন্মেষ অপেক্ষাকৃত ছোট। অপর লেন্সটিকে অভিনেত্র (E) বলে। অভিনেত্রের ফোকাস দূরত্ব ও উন্মেষ অপেক্ষাকৃত বড়। লক্ষবস্তু দেখার জন্য অভিনেত্রের পিছনে চোখ রাখতে হয়। অভিনেত্রটি মূল নলের ভিতর একটি টানা নলের মধ্যে বসানো থাকে। টানা নলটি ওঠা-নামা করে অভিনেত্র ও অভিলক্ষের মধ্যবর্তী দূরত্ব পরিবর্তন করা যায়। মূল নলটি একটি খাড়া দণ্ডের (B) সথে লাগানো থাকে।

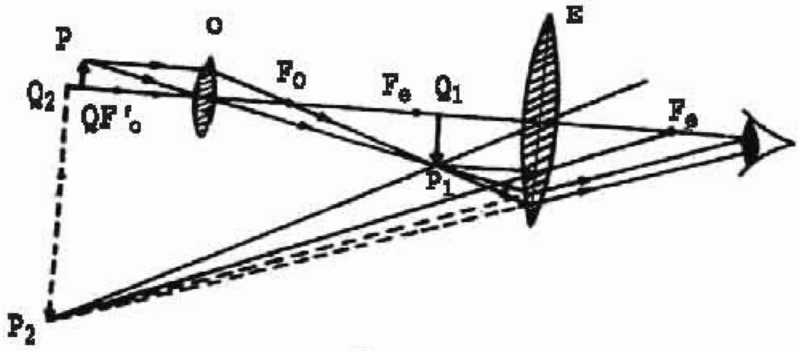
একটি স্ক্রু (R) সাহায্যে মূল নলটিকে লক্ষবস্তুর থেকে দূরে বা কাছে সরানো যায়। লক্ষবস্তুকে একটি পাটাতনের (S) উপর রাখা হয় এবং একটি অবতল দর্পণের (M) সাহায্যে একে প্রয়োজনানুসারে আলোকিত করা হয়।

ক্রিয়া : যন্ত্রটির নল নিচে নামিয়ে অভিলক্ষকে বস্তুর খুব কাছাকাছি আনা হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত স্পষ্ট ও বিবর্ধিত বিম্ব দেখা না যায় ততক্ষণ নলটিকে ধীরে ধীরে উপরে ওঠানো হয়।

প্রকৃতপক্ষে অভিলক্ষ ও অভিনেত্র দুইটি একাধিক লেন্সের সমন্বয়ে গঠিত হলেও আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য এদের প্রত্যেককে অল্প ফোকাস দূরত্বের উত্তল লেন্স হিসেবে কল্পনা করা হয়।



চিত্র : ১৭.৮



চিত্র ১৭.৯

চিত্রে যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আলোক ক্রিয়া বুঝানো হয়েছে। O ও E যথাক্রমে অভিলক্ষ ও অভিনেত্র। অতি ক্ষুদ্র বস্তু PQ–কে অভিলক্ষের ফোকাস বিন্দু F'_O এর ঠিক বাইরে স্থাপন করা হয়। এ অবস্থায় বস্তু থেকে নিঃসৃত আলোক রশ্মি অভিলক্ষ দ্বারা প্রতিসরিত হওয়ার পর সদ, উল্টো ও বিবর্ধিত বিম্ব P_1Q_1 গঠন করে। এখন P_1Q_1 থেকে আলোক রশ্মি অভিনেত্রে প্রতিসরিত হয়। অর্থাৎ, P_1Q_1 অভিনেত্র লেন্সের জন্য লক্ষবস্তু হিসেবে কাজ করে। এবার অভিনেত্রকে সরিয়ে এমন স্থানে রাখা হয় যেন P_1Q_1 অভিনেত্র লেন্সের ফোকাস বিন্দু F_e–এর ভিতরে পড়ে। এই অবস্থায় আলোক রশ্মি প্রতিসরিত হওয়ার পর অসদ, P_1Q_1–এর সাপেক্ষে সোজা ও বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব P_2Q_2 গঠিত হয়। অভিলক্ষ ও অভিনেত্রের মধ্যে দূরত্বও এমন রাখা হয় যেন P_2Q_2 প্রতিবিম্ব চোখের নিকট বিন্দুতে গঠিত হয়। ফলে দর্শক বিনাক্লেশে PQ লক্ষবস্তুর উল্টো ও বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব স্পষ্ট দেখতে পান।

১৭.৮। নভোবীক্ষণ যন্ত্র

Astronomical telescope

যে যন্ত্রের সাহায্যে বহু দূরের বস্তু পরিষ্কারভাবে দেখা যায় তাকে দূরবীক্ষণ যন্ত্র বা দূরবীক্ষণ বলে। আকাশ পর্যবেক্ষণের জন্যে যে দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তাকে নভোবীক্ষণ বা নভো টেলিস্কোপ বলে। নিচে একটি নভোবীক্ষণ যন্ত্রের বর্ণনা দেওয়া হল।

ডেনমার্কের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ কেপলার (1571–1630) সর্ব প্রথম এ যন্ত্র তৈরি করেন।

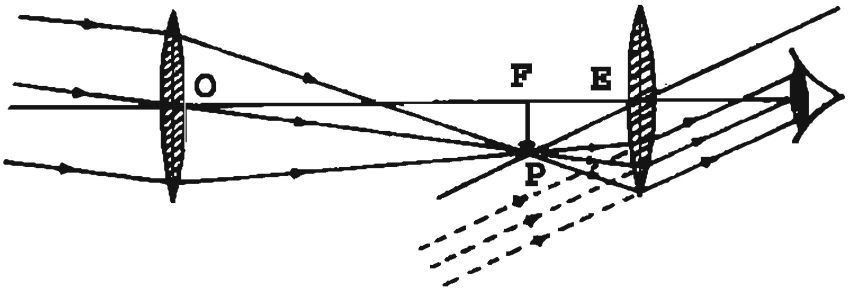


চিত্র : ১৭.১০

বর্ণনা : প্রধানত দুইটি লেন্সের সাহায্যে এ যন্ত্র তৈরি করা হয়।

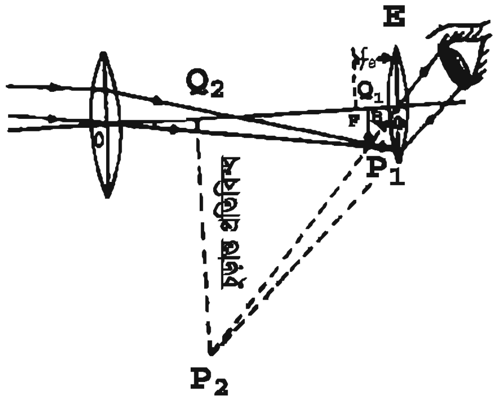
লেন্স দুটিকে দুটি টানা নলের সাহায্যে একটি ধাতব চোঙের দুই প্রান্তে সমাক্ষভাবে স্থাপন করা হয় (চিত্র ১৭.১০)। যে লেন্সটি সর্বদা বস্তুর দিকে থাকে তাকে অভিলক্ষ (O) বলে। এর ফোকাস দূরত্ব ও উন্মেষ অপেক্ষাকৃত বড়। যে লেন্সের পিছনে চোখ রেখে দেখতে হয় সেটি অভিনেত্র (E)। এর ফোকাস দূরত্ব ও উন্মেষ অপেক্ষাকৃত ছোট। প্রয়োজনে স্ক্রুর সাহায্যে অভিলক্ষ ও অভিনেত্রের মধ্যবর্তী দূরত্ব পরিবর্তন করা যায়।

কার্যপ্রণালি : ধরা যাক, O ও E যথাক্রমে অভিলক্ষ ও অভিনেত্র। OE এদের প্রধান অক্ষ। বহু দূরে কোনো বস্তু থেকে যে আলোক রশ্মি অভিলক্ষে এসে পড়ে তাদেরকে সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ বলে ধরা হয়। ধরা যাক, সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ সামান্য আনতভাবে অভিলক্ষের উপর আপতিত হয় [চিত্র ১৭.১১]। রশ্মিগুলো অভিলক্ষ দ্বারা প্রতিসরিত হয়ে লেন্সের ফোকাস তলে সদ, উল্টো ও বস্তুর চেয়ে ছোট FP বিম্ব গঠন করে।



চিত্র : ১৭.১১

এখন FP বিম্ব অভিনেত্রের সামনে লক্ষবস্তুর কাজ করে। অভিনেত্রটিকে এমন দূরত্বে রাখা হয় যেন FP বিম্ব অভিনেত্রের ফোকাস বিন্দুতে (F) থাকে। ফলে FP থেকে নিঃসৃত রশ্মিগুচ্ছ অভিনেত্র লেন্সে প্রতিসরিত হয়ে সমান্তরালভাবে চলে যাওয়ায় অসীম দূরত্বে লক্ষবস্তুর একটি উল্টো, বিবর্ধিত বিম্ব গঠিত হয়। স্ক্রুর সাহায্যে অভিনেত্রকে নির্দিষ্ট স্থানে বসানোকে ফোকাসিং বলে। দূরবীক্ষণের এই ফোকাসিংকে অসীম দূরত্ব বা স্বাভাবিক দর্শন ফোকাসিং বলে। এই ফোকাসিং–এর ফলে প্রতিবিম্ব অসীম দূরত্বে গঠিত হয় বলে চোখের জন্য পরিষ্কার দেখা যায় না। বিম্ব বিনা ক্লেশে স্পষ্টভাবে দেখতে হলে তা চোখের নিকট বিন্দুতে গঠিত হওয়া প্রয়োজন। এরূপ বিম্ব গঠনের জন্য অভিনেত্রকে অভিলক্ষের দিকে খানিকটা এগিয়ে দেওয়া হয় যাতে করে অভিলক্ষ দ্বারা স্পষ্ট বিম্ব P_1Q_1 অভিনেত্রের ফোকাস দূরত্বের মধ্যে পড়ে [চিত্র ১৭.১২]। এখন P_1Q_1 থেকে নির্গত আলোক রশ্মি অভিনেত্রের মধ্য দিয়ে প্রতিসৃত হয়ে P_2Q_2 সোজা, অসদ ও বিবর্ধিত বিম্ব গঠন করে। অভিনেত্রকে এমনভাবে স্থাপন করা হয় যেন P_2Q_2 বিম্ব চোখের নিকট বিন্দুতে গঠিত হয়। অভিনেত্রের এই ধরনের ফোকাসিংকে স্পষ্ট দর্শন ফোকাসিং বলে।



চিত্র : ১৭.১২

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। চক্ষু লেন্সে গঠিত প্রতিবিম্ব–

ক. সোজা এবং লক্ষবস্তুর সমান
খ. উল্টা এবং লক্ষবস্তুর সমান
গ. সোজা এবং বিবর্ধিত
ঘ. উল্টা এবং লক্ষবস্তুর চেয়ে আকারে ছোট

২। বিবৃতি তিনটি লক্ষ্য কর :

i. স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম দূরত্ব হল যে নিকট দূরত্ব পর্যন্ত চোখ বিনা শ্রান্তিতে স্পষ্ট দেখতে পায়।

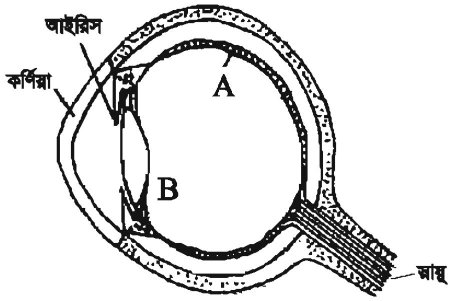
ii. নভোবীক্ষণ যন্ত্রে আপতিত রশ্মিগুলো অভিলক্ষ দ্বারা প্রতিসরিত হয়ে লেন্সের ফোকাস তলে সদ, উল্টো ও বস্তুর চেয়ে ছোট প্রতিবিম্ব গঠন করে।

iii. বীক্ষণ যন্ত্রের বিবর্ধন বস্তু ও বিম্ব চোখে যে বীক্ষণ কোণ উৎপন্ন করে তার ওপর নির্ভর করে না।

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. i ও iii

নিচের চিত্র থেকে ৩ ও ৪নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



চিত্র

৩। A চিহ্নিত অংশটির নাম কী?

ক. করয়েড খ. অ্যাকুয়াস হিউমার
গ. রেটিনা ঘ. ভিট্রিয়াস হিউমার

৪। B চিহ্নিত অংশটিকে যদি অক্ষি গোলকের সাথে শক্তভাবে আটকে থাকত তাহলে–

i. একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের বস্তু দেখা যেত

ii. দূরের বা কাছের বস্তু দেখা যেত

iii. দৃষ্টি সীমার সব বস্তু দেখা যেত

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থী জেরিনা একদিন পড়ার টেবিলে লক্ষ করল বইয়ের অক্ষরগুলো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না। তার বাবা তাকে ডাক্তারের নিকট নিয়ে গেলেন। ডাক্তার জেরিনাকে 2.5 D ক্ষমতার লেন্সের চশমা ব্যবহার করার পরামর্শ দেন। চোখের ন্যায় ক্যামেরাও বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন করতে পারে। তাই চোখের সাথে তুলনা করে ক্যামেরাকে ইলেক্ট্রনিক চোখ বলা হয়।

ক. D এর অর্থ কী?

খ. জেরিনার চোখের ত্রুটি ব্যাখ্যা কর

গ. জেরিনার চশমায় ব্যবহৃত লেন্সের ফোকাস দূরত্ব নির্ণয় কর

ঘ. কীভাবে ক্যামেরাকে ইলেক্ট্রনিক চোখ হিসেবে দাবি করা যায় তা বিশ্লেষণ কর।

অষ্টাদশ অধ্যায়

আলোর বিচ্ছুরণ ও বিক্ষেপণ

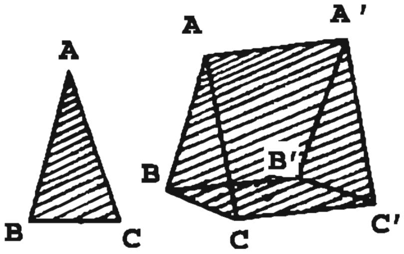
DISPERSION AND SCATTERING OF LIGHT

আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ এবং প্রতিফলন ও প্রতিসরণের ফলে আলোর বিচ্ছুরণ ও বিক্ষেপণের দরুন নানান রকম ঘটনা বা প্রতিভাস (Phenomenon) আমরা অবলোকন করি। যেমন প্রিজমের ভিতর দিয়ে গমনের ফলে সাদা আলো সাতটি রঙে বিশ্লিষ্ট হয়; পানির কণায় আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণ ঘটে সৃষ্টি হয় রংধনুর; মেঘমুক্ত আকাশ নীল দেখায়; ভোরের উদীয়মান এবং গোধূলির অস্তমান সূর্য লাল দেখায়।

এ অধ্যায়ে আমরা প্রিজম, প্রিজমে আলোর প্রতিসরণ ও সাদা আলোর সাত রঙে বিশ্লিষ্ট হওয়া, রংধনুর সৃষ্টি, আলোর প্রতিফলন ও শোষণের ফলে বস্তুর বর্ণ, আলোর বিক্ষেপণ ও আকাশের রং নিয়ে আলোচনা করব।

১৮.১। প্রিজম ও প্রিজমে আলোর প্রতিসরণ
Prism and refraction of light through prism

দুইটি হেলানো সমতল পৃষ্ঠ দ্বারা সীমাবদ্ধ প্রতিসারক মাধ্যমকে প্রিজম বলা হয়। প্রিজমে সাধারণত তিনটি আয়তক্ষেত্রিক ও দুটি ত্রিভুজাকৃতি তল থাকে (চিত্র ১৮.১)।



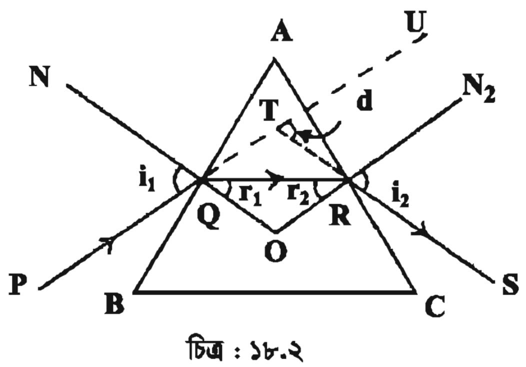
চিত্র : ১৮.১

প্রিজমে আলোর প্রতিসরণ

ধরা যাক PQ আলোর রশ্মি বায়ু মাধ্যমে প্রিজমের AB তলে Q বিন্দুতে আপতিত হল। Q বিন্দুতে মাধ্যমের পরিবর্তন হওয়ায় PQ রশ্মি প্রতিসরিত হয়ে অভিলম্ব NO এর দিকে সরে QR পথে চলে গেল। QR রশ্মিটি R বিন্দুতে আপতিত হয়ে পুনরায় প্রতিসরিত হয়ে অভিলম্ব ON_2 থেকে দূরে সরে RS পথে গেল। রশ্মিটি তার মূল বা আদি অভিমুখ থেকে বিচ্যুত হল। বিচ্যুতি কোণ d হল মূল রশ্মি ও প্রতিসরিত রশ্মির মধ্যবর্তী কোণ। অর্থাৎ, আপতিত রশ্মি ও নির্গত রশ্মির অন্তর্ভুক্ত কোণকে বিচ্যুতি কোণ (Angle of deviation) বা বিচ্যুতি বলে। প্রিজমে আপতিত রশ্মির বিচ্যুতি কোণের মান আপতন কোণের ওপর নির্ভর করে। আপতন কোণের মান খুব কম হলে বিচ্যুতি কোণের মান খুব বেশি হয়। আপতন কোণের মান ধীরে ধীরে বাড়তে থাকলে বিচ্যুতি কোণের মান কমতে থাকে।

বিচ্যুতি কোণের মান কমতে কমতে একটি সর্বনিম্ন মানে পৌঁছার পর এটি আর না কমে আপতন কোণের বৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়তে থাকে। বিচ্যুতি কোণের এই সর্বনিম্ন মানকে ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণ বলে।

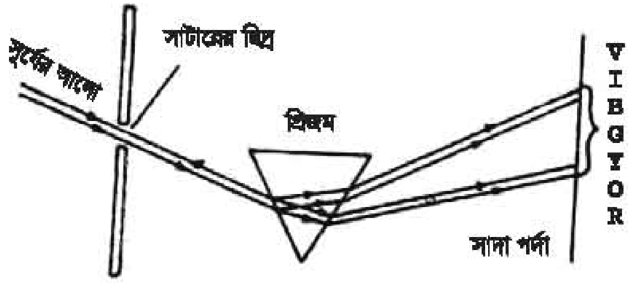
পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে কোনো বিশেষ বর্ণের রশ্মি যদি ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণে বা বিচ্যুতিতে নির্গত হয়ে আমাদের চোখে পৌঁছে তবে চোখে ঐ বর্ণের অনুভূতি প্রবল হয়।



চিত্র : ১৮.২

১৮.২। প্রিজমে আলোর বিচ্ছুরণ
Dispersion of light through prism

সূর্যের সাদা আলো যদি কোনো কাচের প্রিজমের মধ্য দিয়ে যায় তাহলে তা সাতটি রঙে বিশ্লিষ্ট হয়। প্রিজম থেকে নির্গত রশ্মিগুলোকে যদি কোনো পর্দার উপর ফেলা যায় তাহলে পর্দায় সাতটি রঙের পটি (Band) দেখা যায়। আলোর এই রঙিন পটিকে বর্ণালি (Spectrum) বলে। প্রিজমের মধ্য দিয়ে আলোর প্রতিসরণের ফলে সাদা রঙের আলো সাতটি মূল রঙের আলোকে বিশ্লিষ্ট হওয়ার প্রণালিকে আলোর বিচ্ছুরণ বলে। সুতরাং কোনো মাধ্যমে প্রতিসরণের ফলে যৌগিক আলো থেকে মূল বর্ণের আলো পাওয়ার পদ্ধতিকে আলোর বিচ্ছুরণ বলে।



চিত্র : ১৮.৩

পরীক্ষা : ১৬৬৬ সালে স্যার আইজ্যাক নিউটন একটি সহজ পরীক্ষার সাহায্যে সর্বপ্রথম আলোর বিচ্ছুরণ আবিষ্কার করেন। তিনি তাঁর ঘরের জানালায় একটি ছোট ছিদ্র করে এ পরীক্ষা করেন। অন্ধকার ঘরে জানালার এই ছোট ছিদ্র দিয়ে সূর্যালোক বিপরীত দিকে দেওয়ালের উপর পড়ে। আলোর গতিপথে একটি প্রিজম স্থাপন করে তিনি দেওয়ালে সাদা আলোর পরিবর্তে সাতটি রং দেখতে পান [চিত্র ১৮.৩]। সাতটি রঙের এই ব্যান্ড বা পটিকে নিউটন বর্ণালি আখ্যা দেন। বর্ণালিতে তিনি বেগুনি (Violet), আসমানি (Indigo), নীল (Blue), সবুজ (Green), হলুদ (Yellow), কমলা (Orange) ও লাল (Red) এ সাতটি রং পর পর দেখতে পান। রংগুলোর নাম ও ক্রম সহজে মনে রাখার জন্য এদের নামের আদ্যাক্ষরগুলো নিয়ে ইংরেজিতে VIBGYOR ও বাংলায় বেনীআসহকলা শব্দ গঠন করা হয়।

বর্ণালি থেকে দেখা যায় যে লাল রঙের আলোর বিচ্যুতি সবচেয়ে কম এবং বেগুনি আলোর বিচ্যুতি সবচেয়ে বেশি। হলুদ রঙের আলোর বিচ্যুতি লাল ও বেগুনি আলোর মাঝামাঝি বলে এর বিচ্যুতিকে গড় বিচ্যুতি বলে এবং হলুদ রশ্মিকে মধ্যরশ্মি বলে।

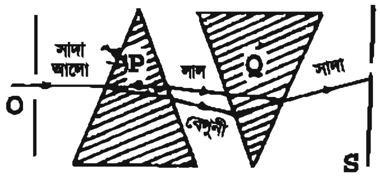
এ পরীক্ষা থেকে নিউটন এই সিদ্ধান্তে আসেন যে সূর্যের সাদা আলোর প্রকৃতি যৌগিক (Composite) এবং এই সাদা আলো সাতটি মূল রঙের আলোর সমষ্টি।

এখন প্রশ্ন আসে সাদা আলো কেন বিভিন্ন রঙে বিশ্লিষ্ট হয়?

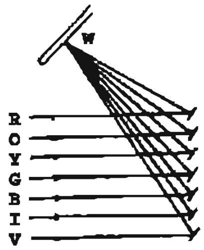
আমরা জানি, আলোক রশ্মি যখন এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অপর স্বচ্ছ মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন আলোক রশ্মি বিভেদ তলে বেঁকে যায়। এই বাঁকার পরিমাণ মাধ্যমদ্বয়ের প্রকৃতি ও আলোর রঙের ওপর নির্ভর করে। সূর্যের সাদা আলো সাতটি রঙের সমন্বয়ে সৃষ্টি। তাই যখন সূর্যের সাদা আলো কোনো প্রিজমের মধ্যে প্রবেশ করে তখন প্রতিসরণের ফলে রশ্মির গতিপথ বেঁকে যায়। এখন এক এক বর্ণের আলোর বাঁকার পরিমাণ ভিন্ন হওয়ার জন্য প্রিজমের মধ্যে সাদা আলো সাতটি বর্ণে বিশ্লিষ্ট হয় এবং এই বিশ্লিষ্ট অবস্থায়ই প্রায় প্রিজম থেকে নির্গত হয়। ফলে পর্দার উপর আমরা বর্ণালি দেখতে পাই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বর্ণভেদে আলোক রশ্মির বাঁকার পরিমাণ বিভিন্ন কেন? ভ্যাকুয়ামে সব কয়টি বর্ণের আলোক রশ্মি একই দ্রুতিতে চলে। কিন্তু অন্য যে কোনো মাধ্যমে এক এক বর্ণের আলোর দ্রুতি এক এক রকমের হয়। যেমন কাচের মধ্যে লাল রঙের আলোর দ্রুতি, বেগুনি রঙের আলোর দ্রুতির প্রায় 1.8 গুণ বেশি। তাই বেগুনি আলো সবচেয়ে বেশি এবং লাল আলো সবচেয়ে কম বাঁকে। ফলে বর্ণালি উৎপন্ন হয়। যে কারণে একই মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক ভিন্ন ভিন্ন রঙের জন্য বিভিন্ন হয়। সুতরাং বলা যায়, বিভিন্ন বর্ণের আলোর জন্য মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্কের বিভিন্নতার জন্য বর্ণালি উৎপন্ন হয়।

১৮.৩। সাদা আলোর যৌগিক প্রকৃতি
Compound nature of white light

আমরা দেখেছি যে সাদা রঙের আলো প্রিজমে বিচ্ছুরিত হয়ে সাতটি রঙে বিভক্ত হয়। এ থেকে বলা যায়, সাদা আলোর প্রকৃতি যৌগিক। এই সাতটি রঙের যে কোনো একটিকে আবার প্রিজমের মধ্য দিয়ে পাঠালে তা আর বিচ্ছুরিত হয় না। তাই এদেরকে একবর্ণী রশ্মি (monochromatic) বলে। আবার সাত রঙের আলোক রশ্মিকে মিলিয়ে সাদা রং পাওয়া যায় এ থেকেও সাদা আলোর যৌগিক প্রকৃতির প্রমাণ পাওয়া যায়। সাত রং মিশিয়ে সাদা আলো পাওয়ার কয়েকটি প্রক্রিয়া নিচে আলোচনা করা হল।



চিত্র : ১৮.৪ (ক)



চিত্র : ১৮.৪ (খ)



চিত্র : ১৮.৫

১. প্রিজমের সাহায্যে : একই ধরনের দুইটি প্রিজমকে পাশাপাশি উল্টো করে বসিয়ে সাদা আলোর পুনঃসংযোজন সম্ভব। P ও Q দুইটি একই ধরনের এবং একই উপাদানে তৈরী প্রিজমকে পাশাপাশি উল্টো করে বসানো হয় [চিত্র ১৮.৪(ক)]। একটি ছোট ছিদ্র O হতে সাদা আলোক রশ্মি P প্রিজমের উপর পড়ে বিচ্ছুরিত হয়ে সাতটি বর্ণে বিভক্ত হয় কিন্তু এই সাতটি বর্ণ আবার প্রিজমের মধ্য দিয়ে যাওয়ার ফলে পুনরায় সংযোজিত হয়ে সাদা আলোরূপে প্রিজম থেকে নির্গত হয়।

২. দর্পণের সাহায্যে : সূর্যের সাদা আলো প্রিজমের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় বিচ্ছুরিত হয়। এখন প্রত্যেকটি বর্ণের আলোক যদি এক একটি প্রতিফলক দর্পণের উপর এমনভাবে পড়ে যে প্রতিফলনের পর রশ্মিগুলো পর্দার উপর এক বিন্দুতে মিলিত হয় [চিত্র ১৮.৪(খ)]। এভাবে পুর্নযোজিত হওয়ার ফলে পর্দায় সাদা রঙের আলো দেখা যায়।

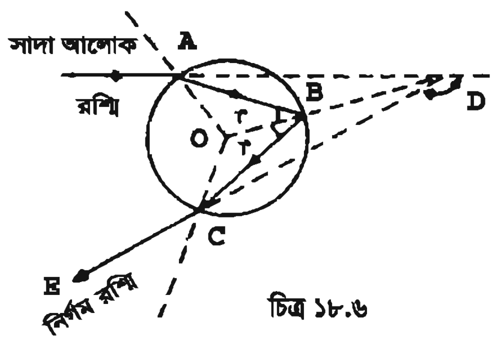
৩. নিউটনের বর্ণ চাকতি (Newton's colour disc) : এটি একটি কার্ড বোর্ডের চাকতি। একে সমান চার ভাগে ভাগ করা হয়। এখন প্রত্যেক ভাগে বর্ণালিতে যে ক্রমিক পর্যায়ে রংগুলো সাজানো থাকে এবং যতখানি জায়গা দখল করে সেই অনুপাতে রং করা হয় [চিত্র ১৮.৫]। এবার চাকতিটিকে জোরে ঘুরালে কোনো বিশেষ রঙের পরিবর্তে চাকতিটিকে সাদা মনে হয়। এর কারণ, চাকতিটি জোরে ঘুরালে চোখে এক বর্ণের অনুভূতি থাকতে থাকতে অন্য বর্ণ এসে পড়ে এবং এই দর্শনানুভূতির স্থায়িত্বকালের জন্য সাতটি রং মিলে সাদা রঙের অনুভূতি সৃষ্টি করে।

১৮.৪। রংধনু
Rainbow

এক পশলা বৃষ্টির পর আবার যখন সূর্য ওঠে তখন কখনও কখনও সূর্যের বিপরীত দিকে আকাশে উজ্জ্বল রঙের আর্ক বা অর্ধবৃত্ত দেখা যায় একে বলা হয় রংধনু বা রামধনু। রংধনুর সাত রং। এটি একটি আলোকীয় ঘটনা, বর্তুলাকার বৃষ্টির ফোঁটায় সূর্যের আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণ থেকে এর উৎপত্তি।

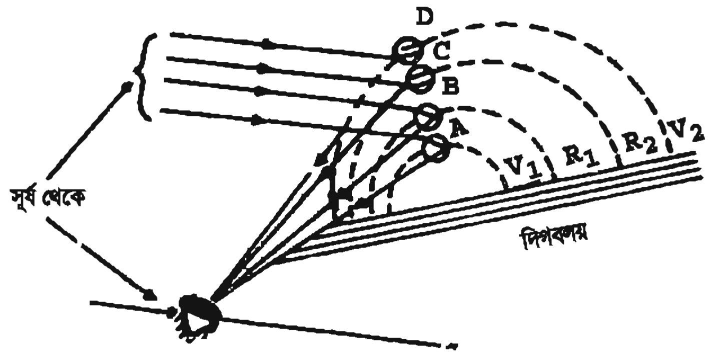
ধরা যাক, সূর্য থেকে আলো এসে একটি ক্ষুদ্র পানি কণা ABC এর উপর পড়ছে [চিত্র ১৮.৬]। এর মধ্যে যে কোনো একটি আলোক রশ্মি পানি কণার A বিন্দুতে পড়ে AB পথে প্রতিসরিত হয়। প্রতিসরিত রশ্মিটি পানি কণার ভিতরের তলে পূর্ণ অভ্যন্তরীণভাবে প্রতিফলিত হয়ে BC পথে C বিন্দুতে আপতিত হয় এবং সবশেষে প্রতিসরিত

হয়ে CE রশ্মিরূপে দর্শকের চোখে পৌঁছায়। চিত্র ১৮.৬ থেকে দেখা যায়, রশ্মি পানি কণা থেকে বের হলে এর পথে বিচ্যুতি হয়। এই বিচ্যুতির পরিমাণ ∠D। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, কোনো বিশেষ বর্ণের রশ্মি যদি ন্যূনতম বিচ্যুতিতে নির্গত হয়ে আমাদের চোখে পৌঁছে তবে ঐ বর্ণের অনুভূতি প্রবল হয়। লাল বর্ণের আলোক ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণ প্রায় 138° এবং বেগুনি বর্ণের রশ্মির 140°।



চিত্র ১৮.৬

এখন ধরা যাক, আকাশের এক প্রান্তে বৃষ্টি হচ্ছে এবং বিপরীত প্রান্ত হতে সূর্যরশ্মি বৃষ্টির কণাগুলোর উপর পড়েছে। একজন দর্শক সূর্যের দিকে পিছন ফিরে এবং বৃষ্টির দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আকাশের গায়ে যদি একটি বৃত্তচাপ কল্পনা করে যার উপর অবস্থিত পানি কণাগুলো দ্বারা প্রতিসৃত আলোক রশ্মি 138^o বিচ্যুতি কোণে তার চোখে প্রবেশ করে [চিত্র ১৮.৭]। তাহলে ঐ পানি বিন্দুগুলো তার কাছে লাল বলে মনে হবে এবং তিনি লাল বর্ণের ধনুকের মত বাঁকানো বৃত্তাংশ দেখতে পাবেন। তেমনি যদি আর একটি বৃত্তচাপ কল্পনা করা যায় যার উপর অবস্থিত পানিকণাগুলো দ্বারা সূর্যরশ্মি 140^O বিচ্যুতি কোণে দর্শকের চোখে পৌঁছে তবে দর্শক বৃত্তাংশকে বেগুনি রঙের দেখতে পাবেন। মধ্যস্থ অন্যান্য বর্ণের আলোক রশ্মিগুলোও এদের মধ্যে স্ব–স্ব বর্ণের বৃত্তাংশ গঠন করবে। এভাবে যে রংধনু সৃষ্টি হয় তাকে প্রাথমিক বা মুখ্য রংধনু (Primary rainbow) বলে। এর বৃত্তের বাইরের দিকে লাল (R_1) ও ভিতরের দিকে বেগুনি (V_1) বর্ণ থাকে।



চিত্র ১৮.৭

অনেক সময় প্রাথমিক রংধনুর বাইরে আকারে বড় কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল আর একটি রংধনু দেখা যায়, একে গৌণ রংধনু (Secondary rainbow) বলে। ১৮.৭ চিত্রে R_2V_2 গৌণ রংধনু। গৌণ রংধনুর বর্ণ সজ্জা প্রাথমিক রংধনুর উল্টো।

১৮.৫। মৌলিক ও পরিপূরক বর্ণ
Primary and Complementary colour

আমরা দেখেছি যে সাতটি মূল বর্ণের সমন্বয়ে বর্ণালি গঠিত হয়। তবে এই সাতটি রঙের মধ্যে তিনটি রং আছে যাদেরকে পরিমাণ মতো মিশিয়ে অপর যে কোনো রং তৈরি করা যেতে পারে। এই তিনটি রং হচ্ছে : লাল (Red), সবুজ (Green) ও নীল (Blue)। এদেরকে মৌলিক বর্ণ (Primary Colour) বলে।

যে সকল বর্ণ অন্য কোনো বর্ণের সমন্বয়ে তৈরি করা যায় না তাদেরকে মৌলিক বর্ণ বলে।

আমরা জানি, সাদা আলো সাতটি বিভিন্ন বর্ণের সমষ্টি। এখন সাতটি বর্ণ থেকে যদি কোনো একটি বর্ণ বাদ দেওয়া যায় তাহলে সে আর সাদা থাকে না, রঙিন বলে মনে হয়। এখন যে বর্ণটি বাদ দেওয়া হয়েছে এবং ঐ বর্ণ বাদ দেওয়ার ফলে যে বর্ণের সৃষ্টি হল, তাদেরকে যদি একত্রিত করা হয় তাহলে আবার সাদা আলো পাওয়া যায়। সে কারণে এই বর্ণদ্বয় পরস্পরের পরিপূরক।

১৮.৬। আলোর শোষণ, প্রতিফলন ও বস্তুর বর্ণ

Absorption and reflection of light and colour of a body

আলোর শোষণ ও প্রতিফলনের জন্য নানান রকম বিশেষ ঘটনা আমরা দেখতে পাই। কোনো বস্তুকে তার নিজস্ব রঙে দেখা যায়, কারণ নির্দিষ্ট রঙের বস্তুটি নিজের রং ছাড়া সকল রং শোষণ করে এবং নিজের রংকে প্রতিফলিত করে। তাই বস্তুকে তার নিজের রঙে দেখা যায়। আলোর প্রতিফলন ও শোষণ সংক্রান্ত কিছু ঘটনা আমরা নিচে আলোচনা করব।

১। লাল আলোতে গাছের পাতা কালো দেখায় : দিনের বেলায় সূর্যালোকে গাছের পাতা সবুজ দেখায় অথচ লাল আলোতে পাতার রং কালো বলে মনে হয়। দিনে গাছের পাতার ক্লোরোফিল সূর্যালোকের সবুজ বাদে সাতটি বর্ণের সবকটিকেই শোষণ করে ফলে সবুজ দেখায়। কিন্তু সবুজ পাতা লাল আলোক শোষণ করে নেয় বলে কোনো আলোই আর প্রতিফলিত হয় না তাই লাল আলোতে সবুজ পাতা কালো দেখায়।

২. নীল কাচের মধ্য দিয়ে সাদা ফুল নীল ও হলুদ ফুল কালো দেখায় : কোনো বস্তুর উপর আপতিত আলোক রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে আসলে সে বস্তুটি আমরা দেখতে পাই। প্রতিফলিত আলোর যে বর্ণ থাকে বস্তুটিকেও আমরা সেই বর্ণের দেখি। একটি সাদা ফুল সূর্যের সাতটি আলোই প্রতিফলিত করে বলে তা সাদা দেখায়। সাদা ফুল থেকে প্রতিফলিত আলোক রশ্মি যখন নীল কাচের মধ্য দিয়ে আসে তখন ঐ কাচ নীল বাদে অন্য সব বর্ণের আলো শোষণ করে নেয় তাই আমাদের চোখে শুধু নীল আলো পৌঁছে। ফলে ফুলটি নীল দেখায়।

পক্ষান্তরে হলুদ ফুল শুধু হলুদ বর্ণের আলো প্রতিফলিত করে বলে তা হলুদ দেখায়। কিন্তু হলুদ বর্ণের আলোক নীল কাচের মধ্য দিয়ে আসার সময় শোষিত হয় তাই হলুদ ফুলকে নীল কাচের মধ্য দিয়ে দেখলে কালো দেখায়।

৩. কোনো লাল কাপড়কে আমরা লাল দেখি : কোনো লাল রঙের কাপড়ে যখন আলো পড়ে, কাপড়টি তখন লাল রং ছাড়া, সাদা আলোর রং শোষণ করে নেয়। কাপড়টি স্বচ্ছ না থাকায় লাল রং কাপড়ের মধ্য দিয়ে গমন করতে পারে না, লাল রং কাপড় থেকে প্রতিফলিত হয়। এজন্যই কাপড়টিকে আমরা লাল দেখি।

১৮.৭। আলোর বিক্ষেপণ ও আকাশের নীল রং

Scattering of light and blue colour of sky

ছোট বেলা থেকে আকাশের নীল রঙের সাথে আমরা পরিচিত তাই আমরা এটা ভেবে অবাক হই না যে, আকাশ কেন নীল দেখায়।

আলোর বিক্ষেপণের কারণে আকাশ নীল দেখায়। প্রথমে আমরা দেখব আলোর বিক্ষেপণ (Scattering) কী? আমরা জানি, সূর্যের আলো সাতটি রঙের সমষ্টি। এই সাত রঙের আলোর প্রতিটির তরঙ্গদৈর্ঘ্য পৃথক। এই পৃথক তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কারণেই তাদের রঙও ভিন্ন। যখন কোনো আলোক তরঙ্গ কোনো ক্ষুদ্র কণিকার উপর পড়ে, তখন কণিকাগুলো আলোক তরঙ্গকে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দেয়। একে বলা হয় আলোর বিক্ষেপণ (Scattering)। কোনো আলোর কী পরিমাপ বিক্ষেপণ ঘটে তা নির্ভর করে এর রং বা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ওপর। আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য যত কম হবে তার বিক্ষেপণ তত বেশি হবে। আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি হলে তার বিক্ষেপণ তত কম। নীল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম হওয়ায় এর বিক্ষেপণ সবচেয়ে বেশি। আর লাল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি হওয়া এর বিক্ষেপণ সবচেয়ে কম।

আমরা সূর্য এবং সূর্য থেকে আসা আলোক রশ্মিও দেখতে পাই। গাছপালা ও দালানকোঠার ছায়া থেকেও আমরা সূর্যরশ্মির অস্তিত্ব বুঝতে পারি। আকাশে তো গাছপালা বা দালানকোঠা নেই যা থেকে আমরা সূর্যের আলোর অস্তিতত্বকে বুঝতে পারি। কিন্তু আমরা একথা ভুলে যাই যে, আমাদের চারপাশে এবং আকাশে আছে বায়ুমণ্ডল। এ বায়ুমণ্ডলের সব জায়গা দিয়ে সূর্য রশ্মি গমন করে।

মেঘমুক্ত নির্মল ধোঁয়াহীন আকাশ সবচেয়ে নীল দেখায়। এটা সাধারণত ঘটে এক পশলা জোরালো বৃষ্টির পর। এসময় বায়ুমণ্ডল থাকে প্রায় স্বচ্ছ। বায়ুর অণু সূর্যরশ্মির অবাধ গমনে বাধা সৃষ্টি করে। বায়ুর অণুতে বাধা পেয়ে কিছু আলো সকল দিকে ছড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ, বায়ুর অণু দ্বারা সূর্যরশ্মি বিক্ষিপ্ত হয়। আমরা জানি, যে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম তা বিক্ষিপ্ত হয় বেশি। নীল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম থাকায় সূর্যরশ্মির নীল আলো বেশি বিক্ষিপ্ত হয়। সুতরাং আকাশের দিকে তাকালে আমরা নীল রঙকে দেখি। এজন্যই আকাশ নীল দেখায়। যেসব ধূলিকণা, জলীয় বাষ্প মেঘ তৈরি করে তারা বায়ুর অণু থেকে অনেক বড়। এরা নীল আলোকেই শুধু বিক্ষেপ করে না, এদের দ্বারা সকল রঙের আলো সমানভাবে বিক্ষিপ্ত হয়। তাই মেঘ হয় সাদা এবং বায়ুমণ্ডলে ধূলিকণা থাকলে আকাশের নীল রং অনেকটা সাদাটে হয়ে যায়। বায়ুমণ্ডল না থাকলে আকাশের নীলিমা থেকে আমরা বঞ্চিত হতাম। কারণ সেক্ষেত্রে আলোক রশ্মির বিক্ষেপণ হত না। ফলে আকাশ অন্ধকার বা কালো দেখাত।

আলোর বিক্ষেপণের কারণেই দুপুরবেলা সূর্যকে হলদে দেখায়, সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের সময় সূর্য লাল দেখায়, সূর্যাস্তের পর চাঁদকে হলদে দেখায়।

২. সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময় সূর্য লাল দেখায় : সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সূর্য ও আকাশের খানিকটা অংশ গাঢ় লাল দেখায়। আলোক বিক্ষেপণের জন্য এরকম দেখায়। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সূর্য প্রায় দিগন্তরেখার কাছাকাছি থাকে এবং সূর্যালোক আমাদের চোখে পৌঁছতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের পুরু স্তর ভেদ করতে হয়। ফলে রশ্মিকে বায়ুমণ্ডলে ভাসমান ধূলিকণা, পানিকণা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় নীল প্রান্তের কম তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট বর্ণগুলো বিক্ষেপিত হয়, কিন্তু লাল প্রান্তের আলোকগুলি লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি হওয়ায় কম বিক্ষেপিত হয়, ফলে সরাসরি পৃথিবীতে চলে আসে। তাই আমরা প্রভাত সূর্য ও অস্তরবিকে লাল দেখি।

৩. দিনের বেলায় চাঁদকে পুরো সাদা দেখালেও সূর্যাস্তের পরে হলদে দেখায় : দিনের বেলায় আকাশ কর্তৃক বিক্ষিপ্ত হালকা নীল আলো চাঁদের নিজস্ব হলুদ রঙের সাথে মিশে যায়। এ দুইটি বর্ণের মিশ্রণের ফলে চোখে চাঁদকে সাদা বলে মনে হয়। কিন্তু সূর্যাস্তের পর আকাশের হালকা নীল বর্ণ লোপ পায় বলে চাঁদকে হলদে মনে হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোন আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম ?

ক. হলুদ খ. আসমানি

গ. সবুজ ঘ. কমলা

২। বিবৃতি তিনটি লক্ষ্য কর :

i. নীল আলোর বিচ্যুতি সবুজ আলোর চেয়ে বেশি

ii. লাল আলোর বেশি বিক্ষেপনের কারণেই সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ে সূর্য লাল দেখায়

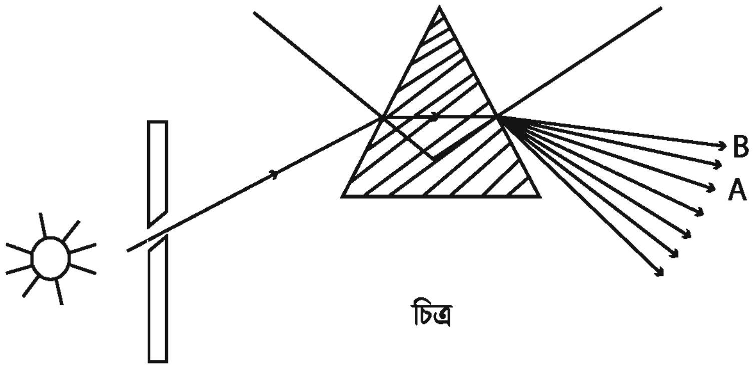
iii. বেগুনি বর্ণের আলোর ন্যূনতম বিচ্যুতি কোনো 138^0।

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i খ. iii

গ. i ও ii ঘ. i ও iii

নিচের চিত্র থেকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



চিত্র

৩। চিত্রে প্রদর্শিত A চিহ্নিত রশ্মিটি কোন বর্ণের?

ক. নীল খ. হলুদ

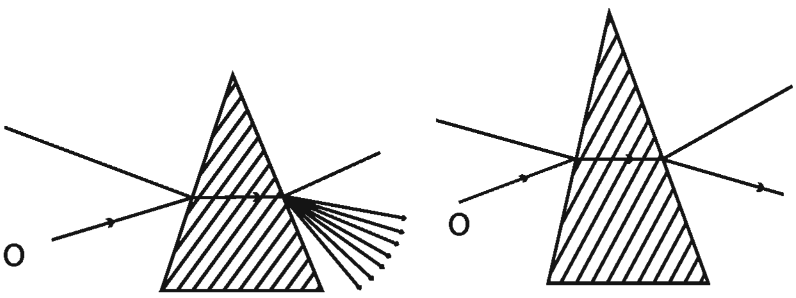
গ. সবুজ ঘ. কমলা

৪। B চিহ্নিত রশ্মির বিচ্যুতি কোণ কত?

ক. 138° খ. 139°

গ. 140° ঘ. 141°

সৃজনশীল প্রশ্ন



'ক' 'খ'

চিত্র

ক. প্রিজম কী?

খ. উপরের 'ক' চিত্রে আলোক রশ্মির ক্রিয়া ব্যাখ্যা কর

গ. 'ক' চিত্রে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের রশ্মি দুইটির বিচ্যুতি ক্রিয়া রেখা অংকন করে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'ক' ও 'খ' চিত্র দুইটির আলোক রশ্মির বিচ্ছুরণ বিশ্লেষণ পূর্বক আপাতিত রশ্মির বৈশিষ্ট্য নির্ণয় কর।

ঊনবিংশতম অধ্যায়

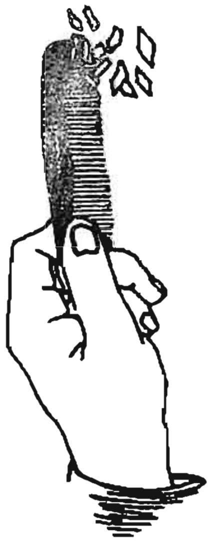
স্থির তড়িৎ

STATICAL ELECTRICITY

তুমি কি জান যে তুমি তোমার শরীরে 10^{28} টি–এর চেয়েও বেশি প্রোটন ও প্রায় সম সংখ্যক ইলেকট্রন বহন করে চলেছ? এ ইলেকট্রন ও প্রোটনের একটি মৌলিক ধর্ম হচ্ছে আধান (Charge)। প্রোটনের আধানকে ধনাত্মক এবং ইলেকট্রনের আধানকে ঋণাত্মক ধরা হয়। এই আধানগুলো পরস্পরের ওপর বল প্রয়োগ করে– যা তড়িৎ বল নামে পরিচিত। এ তড়িৎ বল প্রকৃতির একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বল।

যদি তোমার শরীরের এ ইলেকট্রন ও প্রোটনগুলো আলাদা করে 10m দূরে রাখা যেত, তাহলে তারা পরস্পরকে প্রায় 10^{27}N বলে আকর্ষণ করত যা তোমাকে পৃথিবী যে বলে আকর্ষণ করে তার চেয়ে 10^{24} গুণেরও বেশি। আমাদের সৌভাগ্য যে পৃথিবীতে আমরা 10^{28} টি প্রোটন এবং 10^{28}টি ইলেকট্রনকে আলাদা আলাদাভাবে এক স্থানে জড়ো করতে পারি না। প্রোটন ও ইলেকট্রন প্রায় সব সময় একত্রে পরমাণুতে আবদ্ধ থাকে এবং পরমাণুর কোনো নিট আধান থাকে না। যার জন্য এত বৃহৎ তড়িৎ বল পাওয়া যায় না।

তা সত্ত্বেও, অনেক সময় কোনো বস্তুতে ক্ষুদ্র আধানের অস্তিত্ব দেখা যায়। এ অধ্যায়ে আমরা দেখব কীভাবে কোনো বস্তুকে আহিত করা যায়। আমরা শিখব কীভাবে আধানের অস্তিত্ব বুঝা যায়, কীভাবে তাদের মধ্যকার বল হিসাব করতে হয়। যেহেতু এ আলোচনা আমরা সীমাবদ্ধ রাখব স্থির আধানের মধ্যে– তাই অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে স্থির তড়িৎ।



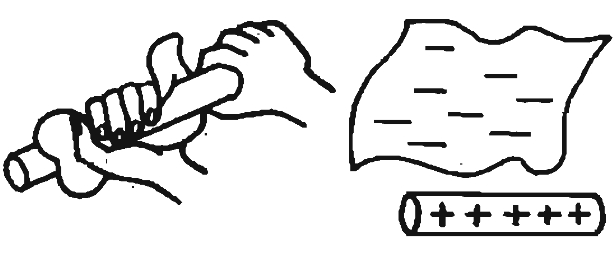
চিত্র : ১৯.১

১৯.১। ঘর্ষ তড়িৎ ও আধান
Frictional Electricity and Charge

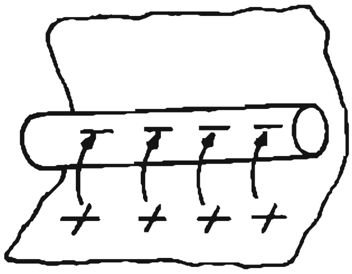
শীতকালে বিশেষ করে দেখা যায় একটা প্লাস্টিকের চিরুনি পশমি কাপড়ে ঘষে ছোট ছোট টুকরো কাগজের কাছে আনলে কিছু কাগজের টুকরো লাফিয়ে চিরুনির গায়ে লেগে যায় [চিত্র ১৯.১]। এ রকম হলে আমরা বলি চিরুনিটি তড়িৎগ্রস্ত হয়েছে। এই তড়িৎগ্রস্ত হওয়া বলতে প্রকৃতপক্ষে আমরা কী বুঝি?

আমরা জানি প্রত্যেক পদার্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দ্বারা গঠিত। এদেরকে পরমাণু বলে। প্রত্যেক পদার্থের পরমাণু, নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রন দ্বারা গঠিত। নিউক্লিয়াসের মধ্যে দুই ধরনের কণা থাকে– প্রোটন ও নিউট্রন। পদার্থ সৃষ্টিকারী প্রাথমিক কণিকাসমুহের (ইলেকট্রন, প্রোটন) মৌলিক ও বৈশিষ্ট্যমূলক ধর্ম হচ্ছে তড়িৎ ধর্ম যা চার্জ বা আধান দ্বারা নির্ধারিত হয়। ইলেকট্রনের আধানকে ঋণাত্মক এবং প্রোটনের আধানকে ধনাত্মক ধরা হয়। নিউট্রন তড়িৎ নিরপেক্ষ অর্থাৎ, এতে কোনো আধান নেই। একটি প্রোটনে আধানের পরিমাণ ইলেকট্রনের আধানের সমান। পরমাণুতে সমান সংখ্যক ইলেকট্রন ও প্রোটন থাকে। ফলে একটা গোটা পরমাণুতে কোনো তড়িৎ ধর্ম প্রকাশ পায় না। বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুতে ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা বিভিন্ন হয়।

কোনো পরমাণুতে যতক্ষণ পর্যন্ত ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা সমান থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তা নিস্তড়িত বা তড়িৎ নিরপেক্ষ। কিন্তু পরমাণুতে এদের সংখ্যা সমান না হলে পরমাণু তড়িৎগ্রস্ত অর্থাৎ, আহিত হয়। কোনো পরমাণুতে



চিত্র : ১৯.২



চিত্র : ১৯.৩

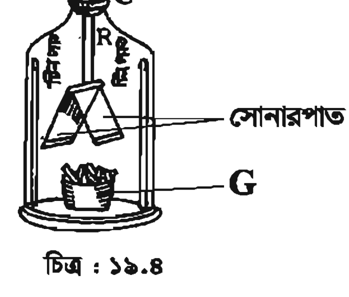
ইলেকট্রনের সংখ্যা কমে গেলে প্রোটনের আধিক্য দেখা যায়। এ অবস্থাকে বলা হয় ধনাত্মক আধানে আহিত হওয়া। আবার এই বিচ্ছিন্ন ইলেকট্রন অপর কোনো পরমাণুর সাথে যুক্ত হলে সে পরমাণুতে ইলেকট্রনের সংখ্যা বেড়ে যায়, ফলে ঋণাত্মক আধানে আহিত হয়। পরমাণুতে ইলেকট্রনের সংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে কম বা বেশি হওয়াকে আহিত হওয়া বলে।

স্বাভাবিক অবস্থায় পদার্থের পরমাণুতে ইলেকট্রন ও প্রোটন সমপরিমাণে থাকে। তবে প্রত্যেক পরমাণুরই প্রয়োজনের অতিরিক্ত ইলেকট্রনের প্রতি আসক্তি থাকে। ইলেকট্রনের প্রতি এই আসক্তি বিভিন্ন বস্তুতে বিভিন্ন রকম। তাই দুটি বস্তুকে যখন পরস্পরের সংস্পর্শে আনা হয় তখন যে বস্তুর ইলেকট্রন আসক্তি বেশি সে বস্তু অপর বস্তুটি থেকে মুক্ত ইলেকট্রন সংগ্রহ করে ঋণাত্মক আধানে আহিত হয়। একটি কাচদণ্ডকে রেশম দ্বারা ঘষলে এরকম ঘটনা ঘটে [চিত্র ১৯.২] রেশমের ইলেকট্রন আসক্তি কাচের চেয়ে বেশি বলে, এদের যখন পরস্পরের সাথে ঘষা হয়, তখন কাচ থেকে ইলেকট্রন রেশমে চলে যায়, ফলে রেশম ঋণাত্মক আধানে এবং কাচদণ্ড ধনাত্মক আধানে আহিত হয়। আবার ফানেলের সাথে ইবোনাইট দণ্ড ঘষলে, ইবোনাইট দণ্ড ঋণাত্মক আধানে আহিত এবং ফানেল ধনাত্মক আধানে আহিত হয়। কারণ, ইবোনাইটের ইলেকট্রন আসক্তি ফানেলের চেয়ে বেশি বলে, পরস্পরের সাথে ঘর্ষণের ফলে ফানেল থেকে ইলেকট্রন ইবোনাইট দণ্ডে চলে আসে [চিত্র ১৯.৩]।

১৯.২ স্বর্ণপাত তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্র

Goldleaf Electroscope

যে যন্ত্রের সাহায্যে কোনো বস্তুতে আধানের অস্তিতত্ব ও প্রকৃতি নির্ণয় করা যায় তাকে তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্র বলে। বেনেট নামক একজন ধর্মযাজক আধানের উপস্থিতি ও প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য এই তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। এই যন্ত্রে একটি পিতল বা অন্য যে কোনো ধাতব দণ্ড R –এর উপরে একটি ধাতব চাকতি বা গোলক আটকানো থাকে [চিত্র ১৯.৪]। দণ্ডের নিচের প্রান্তে দুইটি হালকা সোনার পাত সংযুক্ত থাকে। পাত দুইটি সোনার বদলে অ্যালুমিনিয়াম বা অন্য কোন হালকা ধাতুরও হতে পারে। পাতসহ দণ্ডের নিচের অংশ অপরিবাহী পদার্থ দিয়ে তৈরী ছিপি C–এর মধ্য দিয়ে একটি কাচপাত্রের মধ্যে প্রবেশ করানো থাকে। যন্ত্রটি কাচপাত্রের ভিতরে থাকায় বায়ুপ্রবাহ এর ক্ষতি করতে পারে না। কাচ পাত্রের ভিতরের বায়ুকে শুকনো রাখার জন্য কাচপাত্রের ভিতর অপর একটি পাত্র G–এ কিছু পানি শোষক পদার্থ যেমন, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড $CaCl_2$ বা সালফিউরিক এসিড H_2SO_4 এ সিক্ত কতকগুলো ঝামা পাথর রাখা হয়। সোনার পাত দুটির বিপরীত পাশে কাচপাত্রের ভিতরের গায়ে দুটি টিনের পাত আটকানো থাকে, এর ফলে যন্ত্রের সুবেদিতা বেড়ে যায়।



চিত্র : ১৯.৪

তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্রকে আহিতকরণ : একটি কাচদণ্ডকে রেশম দিয়ে ঘষলে কাচদণ্ডে ধনাত্মক আধানের উদ্ভব হয়। ঐ আহিত কাচদণ্ডকে তড়িৎবীক্ষণের চাকতি বা গোলকের গায়ে স্পর্শ করালে দণ্ড হতে খানিকটা আধান চাকতিতে চলে যায়। এই আধান সুপরিবাহী ধাতব দণ্ডের মধ্য দিয়ে সোনার পাতদ্বয়ে পৌঁছে। ফলে সোনার পাত দুটি একই জাতীয় আধান পেয়ে পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং পরস্পর থেকে দূরে সরে যায় বা বিস্ফোরিত হয়। এ অবস্থায় কাচদণ্ড সরিয়ে নিলে

যদি পাতদ্বয়ের মধ্যবর্তী ফাঁক না কমে, তাহলে যন্ত্রটি ধনাত্মক আধানে আহিত হয়েছে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। যন্ত্রকে ঋণাত্মক আধানে আহিত করতে হলে একটি ইবোনাইট দণ্ডকে ফানেল দ্বারা ঘষে ঋণাতক আধানযুক্ত করে উপরিউক্ত প্রক্রিয়ায় চাকতি স্পর্শ কর। এর ফলে স্বর্ণপাত দুইটি ঋণাত্মক আধান পেয়ে পরস্পর থেকে দূরে সরে ফাঁক হয়ে যাবে এবং সেই অবস্থায়ই থাকবে। আধান যত বেশি হবে, ধাতব পাতটিও তত বেশি পরিমাণ ফাঁক হয়ে যাবে।

আধানের অস্তিতত্ব নির্ণয় : কোনো বস্তুতে আধানের অস্তিতত্ব অর্থাৎ, কোনো বস্তুতে আধান আছে কিনা নির্ণয়ের জন্য বস্তুটিকে একটি অনাহিত তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্রের চাকতির কাছে আনতে হবে। এতে যদি পাত দুটি পরস্পর থেকে দূরে সরে যায়, তাহলে বুঝতে হবে বস্তুটিতে আধানের অস্তিতত্ব আছে। কিন্তু যদি পাত দুইটি পরস্পর থেকে দূরে সরে না যায়, তাহলে বুঝতে হবে বস্তুটিতে আধান নেই।

আধানের প্রকৃতি নির্ণয় : কোনো তড়িৎগ্রস্ত বস্তুতে কী ধরনের আধান আছে তা জানতে হলে তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্রটিকে প্রথমে ধনাত্মক কিংবা ঋণাত্মক আধানে আহিত করতে হবে। ধরা যাক, যন্ত্রটিকে ধনাত্মক আধানে আহিত করা হল। ঐ অবস্থায় পাতদ্বয়ের ধনাত্মক আধান থাকায় এরা ফাঁক হয়ে থাকবে। এখন পরীক্ষণীয় বস্তুটিকে তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্রের চাকতির সংস্পর্শে আনলে যদি পাত দুটির ফাঁক কমে যায়, তাহলে বুঝতে হবে ঐ বস্তুটি ঋণাত্মক আধানে আহিত। পক্ষান্তরে পরীক্ষণীয় বস্তুটিকে চাকতির সংস্পর্শে আনলে যদি ফাঁক বেড়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে বস্তুটি ধনাত্মক আধানে আহত।

তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্রে আধান	পরীক্ষণীয় বস্তুর আধান	পাতদ্বয়ের ফাঁক
+	+	ফাঁক বৃদ্ধি
–	–	ফাঁক বৃদ্ধি
+	–	ফাঁক হ্রাস
–	+	ফাঁক হ্রাস
+বা –	অনাহিত বস্তু	ফাঁক হ্রাস

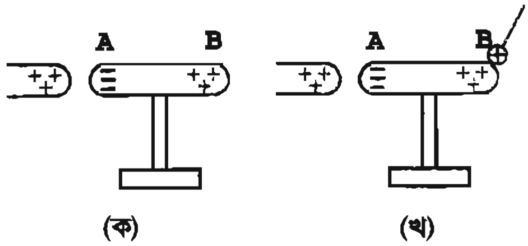
১৯.৩। তড়িৎ আবেশ
Electric Induction

আমরা দেখেছি যে দুইটি বস্তুর পারস্পরিক ঘর্ষণের ফলে আধানের উদ্ভব হয়। আবার কোনো একটি আহিত বস্তুকে অপর একটি অনাহিত বস্তুর সংস্পর্শে আনলে অনাহিত বস্তুটিও আহিত হয়। কিন্তু অনাহিত বস্তুটিকে আহিত বস্তুটির সংস্পর্শে না এনে শুধু কাছাকাছি নিয়ে এলেও এটি আহিত হয়ে পড়ে। আবেশের জন্য এরকম হয়। একটি আহিত বস্তুর কাছে এনে স্পর্শ না করে শুধুমাত্র এর উপস্থিতিতে কোনো অনাহিত বস্তুকে আহিত করার পদ্ধতিকে তড়িৎ আবেশ বলে।

একটি আহিত বস্তুকে কোনো পরিবাহকের নিকটে রেখে আহিত বস্তুর প্রভাবে পরিবাহকটি আহিত করার পদ্ধতিকে তড়িৎ আবেশ বলে।

নিচের সহজ পরীক্ষার সাহায্যে তড়িৎ আবেশ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রাবারের হাতল বিশিষ্ট একটি শুকনো কাচ দণ্ডকে রেশম দিয়ে ভালো করে ঘষে এর এক প্রান্ত হাতে ধরে অপর প্রান্ত একটি অনাহিত পরিবাহক দণ্ড AB-এর A প্রান্তের নিকটে আনলে, পরিবাহকের মুক্ত ইলেকট্রনগুলো কাচদণ্ডের ধনাত্মক আধান দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে A প্রান্তে সরে আসে [চিত্র ১৯.৫ ক]। ফলে B প্রান্তে ইলেকট্রন ঘাটতি সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ, B প্রান্ত ধনাত্মক আধানে আহিত হয় এবং A প্রান্ত ঋণাত্মক আধানযুক্ত হয়। আধান সংগ্রাহক [একটি অপরিবাহী হাতলের প্রান্তে লাগানো ক্ষুদ্র ধাতব পাত বা বল] দিয়ে B প্রান্ত থেকে কিছু আধান সংগ্রহ করে [চিত্র ১৯.৫ খ] তড়িৎ বীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এর প্রকৃতি নির্ণয় করলে, উপরিউক্ত বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হবে।

এখানে নতুন কোনো আধান উৎপন্ন হয় না। আহিত কাচদণ্ডের উপস্থিতির কারণে সমপরিমাণ বিপরীত জাতীয় আধান পৃথক হয়ে পরিবাহকের দুই প্রান্তে সরে গেছে মাত্র। যতক্ষণ কাচদণ্ডটি AB পরিবাহকের কাছে থাকবে ততক্ষণ বিপরীত আধান এভাবে পৃথক হয়ে পরিবাহকের দুই প্রান্তে অবস্থান করবে। কাচদণ্ডকে সরিয়ে নিয়ে কোনো তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করলে AB পরিবাহকে কোনো আধানের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ আধানগুলো একত্রিত হয়ে পরিবাহককে পুনরায় অনাহিত অবস্থায় ফিরিয়ে এনেছে। এ থেকে আমরা বলতে পারি, আহিত কাচদণ্ডের শুধু উপস্থিতির জন্য AB পরিবাহকে আধানের সঞ্চার হয়েছে।



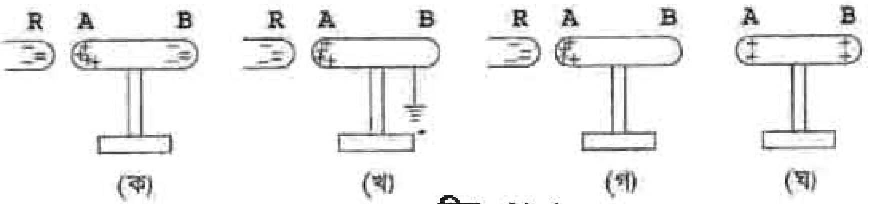
চিত্র ১৯.৫

উপরের পরীক্ষায় কাচদণ্ডের ধনাত্মক আধান যা AB পরিবাহকে আবেশ সৃষ্টি করল তাকে আবেশী আধান (inducing charge) বলে। আর AB পরিবাহকে যে আধানের সঞ্চার হয় তাকে আবিষ্ট আধান (induced charge) বলে। এখানে আবিষ্ট পরিবাহকের যে প্রান্ত আবেশী বস্তুর নিকটে থাকে (চিত্রে A প্রান্ত) সেই প্রান্তে যে আধানের সঞ্চার হয় তাকে বদ্ধ আধান বলে। এই আধানের প্রকৃতি আবেশী আধানের বিপরীত হওয়ায় এরা আবেশী আধানের আকর্ষণের প্রভাবে স্থান ত্যাগ করতে পারে না তাই এরা বদ্ধ আধান। কিন্তু আবিষ্ট পরিবাহকের B প্রান্তের আধান আবেশী আধানের সমধর্মী হওয়ায় বিকর্ষণ অনুভব করে ফলে এরা যতদূর সম্ভব দূরে সরে যেতে পারে। সেজন্যে আবিষ্ট বস্তুর দূরতম প্রান্তে সঞ্চারিত আধানকে মুক্ত আধান বলে।

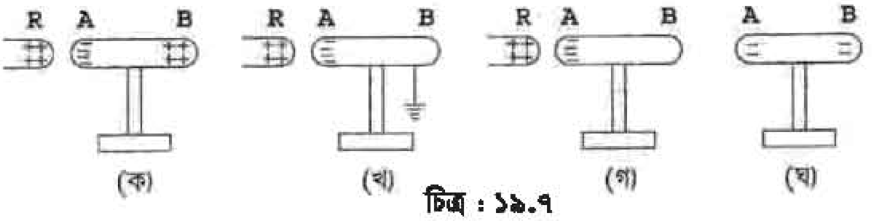
১৯.৪। আবেশ প্রক্রিয়ায় আহিতকরণ

(ক) ধনাত্মক আধানে আহিতকরণ : AB পরিবাহীটিকে ধনাত্মক চার্জে চার্জিত করার জন্য প্রথমে একটি ইবোনাইট দণ্ডকে (R) ফ্লানেলের সাথে ঘষে একে ঋণাত্মক আধানে আহিত কর। এবার একে পরিবাহক বস্তুটির A প্রান্তের নিকটে ধরলে পরিবাহকের মুক্ত ইলেকট্রনগুলো ইবোনাইট দণ্ডের ইলেকট্রনগুলো দ্বারা বিকর্ষিত হয়ে B প্রান্তে সরে যাবে [চিত্র ১৯.৬ক]। এখন ইবোনাইট দণ্ডটিকে না সরিয়ে AB পরিবাহকটি হাত দিয়ে স্পর্শ করলে বা কোনো পরিবাহক তার দিয়ে ভূ-সংযোজিত করলে মুক্ত ইলেকট্রনগুলো ভূপৃষ্ঠে চলে যাবে [চিত্র ১৯.৬ খ]। এখন ভূ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করলেও ধনাত্মক আধানগুলো A- প্রান্তে আবদ্ধ থাকবে [চিত্র ১৯.৬ গ]। এবার R দণ্ডটিকে সরিয়ে নিলে ধনাত্মক আধানগুলো বস্তুটির সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে, ফলে বস্তুটি ধনাত্মক আধানে আহিত হবে। [চিত্র ১৯.৬ঘ]।

(খ) ঋণাত্মক আধানে আহিতকরণ : AB পরিবাহককে ঋণাত্মক আধানে আহিত করার জন্য একটি কাচদণ্ডকে (R) রেশমে ঘষে ধনাত্মক আধানে আহিত করে AB পরিবাহকের A প্রান্তের নিকটে ধরলে পরীক্ষণীয় দণ্ডের মুক্ত ইলেকট্রনগুলো R দণ্ডের ধনাত্মক আধান কর্তৃক আকৃষ্ট হয়ে A প্রান্তে সরে আসবে। ফলে, B প্রান্তে ধনাত্মক আধানের সঞ্চার হবে [চিত্র ১৯.৭ক]। এখন R দণ্ডটিকে না সরিয়ে AB পরিবাহকটি হাত দিয়ে স্পর্শ করলে বা কোনো পরিবাহক তার দিয়ে ভূ-সংযোজিত করলে ভূমি থেকে ইলেকট্রন এসে B প্রান্তের ধনাত্মক আধানগুলো নিষ্ক্রিয় করে দেবে [চিত্র ১৯.৭খ]। এখন ভূ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করলেও আধানগুলো A প্রান্তে আবদ্ধ থাকবে [চিত্র ১৯.৭ গ]। এবার R দণ্ডটিকে সরিয়ে নিলে ঋণাত্মক আধানগুলো পরিবাহকের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। ফলে, পরিবাহকটি ঋণাত্মক আধানে আহিত হবে [চিত্র ১৯.৭ঘ]।



চিত্র : ১৯.৬



চিত্র : ১৯.৭

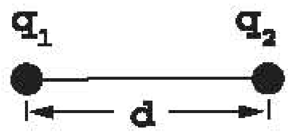
১৯.৫। কুলম্বের সূত্র
Coulomb's law

আমরা জানি, দুটি বিপরীত জাতীয় আধান পরস্পরকে আকর্ষণ করে, আর সমজাতীয় আধান পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। দুটি আধানের মধ্যবর্তী এই আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের মান নির্ভর করে,

১. আধান দুইটির পরিমাণের ওপর।
২. আধান দুইটির মধ্যবর্তী দূরত্বের ওপর।
৩. আধান দুইটি যে মাধ্যমে অবস্থিত তার প্রকৃতির ওপর।

দুটি আধানের মধ্যবর্তী আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল সম্পর্কে ফরাসি বিজ্ঞানী সি. এ. কুলম্ব একটি সূত্র বিবৃত করেন। একে কুলম্বের সূত্র বলে।

সূত্র : নির্দিষ্ট মাধ্যমে দুটি আহিত বস্তুর মধ্যে ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের মান তাদের আধানের গুণফলের সমানুপাতিক, মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এবং এই বল এদের সংযোজক সরলরেখা বরাবর ক্রিয়া করে।



চিত্র : ১৯.৮

ধরা যাক, দুইটি আধানের পরিমাণ যথাক্রমে q_1 ও q_2 এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব d [চিত্র ১৯.৯]। এদের মধ্যবর্তী ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের মান F হলে, কুলম্বের সূত্রানুসারে,

$$F \propto \frac{q_1 q_2}{d^2}$$

$$\text{বা, } F = k\,\frac{q_1 q_2}{d^2} \quad \ldots \ldots \ldots \quad (১৯.১)$$

এখানে k একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক, যার মান রাশিগুলোর একক এবং বস্তুদ্বয়ের মধ্যবর্তী মাধ্যমের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। এস. আই. এককে বলকে নিউটন (N), দূরত্বকে মিটার (m) এবং আধান কুলম্বে (C) পরিমাপ করা হলে শূন্যস্থানে একক সহ এই ধ্রুবকের মান হবে $9\times10^9 Nm^2C^{-2}$। এই সমানুপাতিক ধ্রুবককে $\frac{1}{4\pi\epsilon_o}$ আকারে প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ, শূন্যস্থানের জন্য

$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} = 9 \times 10^9 Nm^2C^{-2}$ হয়।

সুতরাং (১৯.১) সমীকরণকে এস. আই. এককে লেখা হয়–

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_o}\frac{q_1q_2}{d^2} \quad \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \quad (১৯.২)$$

এখানে, ϵ_o শূন্যস্থানের ভেদনযোগ্যতা = $8.854 \times 10^{-12}C^2N^{-1}m^{-2}$

কুলম্বের সংজ্ঞা : সমপরিমাণ ও সমধর্মী দুইটি আধান শূন্য মাধমে পরস্পর 1m দূরত্বে থেকে পরস্পর যদি পরস্পরকে 9×10^9N বলে বিকর্ষণ করে তবে আধান দুইটির প্রত্যেককে 1 কুলম্ব (1C) আধান বলে।

গাণিতিক উদাহরণ ১৯.১। একটি 20 কুলম্বের আহিত বস্তু বায়ুতে অপর একটি 70 কুলম্বের আহিত বস্তু থেকে 50 cm দূরে রাখা হল। এদের মধ্যবর্তী বলের মান নির্ণয় কর।

সমাধান :

আমরা জানি,

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_o}\frac{q_1q_2}{d^2}$$

$$= (9 \times 10^9 Nm^2C^{-2})\frac{(20C \times 70C)}{(0.5m)^2}$$

$$= 5.04 \times 10^{13}N$$

উ: 5.04×10^{13}N

এখানে,

$q_1 = 20$ C

$q_2 = 70$ C

$d = 50$ cm $= 0.5$m

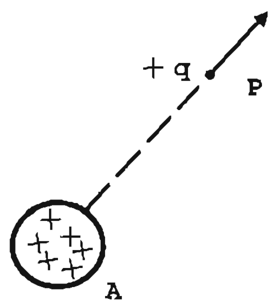
$\frac{1}{4\pi\epsilon_o} = 9 \times 10^9 Nm^2C^{-2}$

$F = ?$

১৯.৬। তড়িৎক্ষেত্র ও তড়িৎক্ষেত্রের তীব্রতা
Electric Field and Intensity of Electric field

ধরা যাক, A একটি ধনাত্মক আধানে আহিত বস্তু। এখন P বিন্দুতে যদি একটি আধান +q রাখা হয় তাহলে A বস্তুর আধানের জন্য + q আধানটি একটি বল অনুভব করবে। আমরা বলি p বিন্দুতে একটি তড়িৎক্ষেত্র বিরাজ করছে যার উৎস হচ্ছে আহিত বস্তু A। অর্থাৎ, একটি আহিত বস্তুর নিকটে অন্য একটি আহিত বস্তু আনলে সেটি আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল অনুভব করে। আহিত বস্তুর চারদিকে যে অঞ্চল জুড়ে এই প্রভাব বিদ্যমান থাকে সেই অঞ্চলই ঐ আহিত বস্তুটির তড়িৎক্ষেত্র।

একটি আহিত বস্তুর চারদিকে যে অঞ্চলব্যাপী তার প্রভাব বজায় থাকে অর্থাৎ, অন্য কোনো আহিত বস্তু আনা হলে সেটি আকর্ষিত বা বিকর্ষিত হয় সেই অঞ্চলকে ঐ আহিত বস্তুর তড়িৎ বলক্ষেত্র বা তড়িৎক্ষেত্র বলে। কুলম্বের সূত্র থেকে দেখা যায় যে p বিন্দুটি A বস্তুটির যত নিকটবর্তী হয় ঐ বিন্দুতে তড়িৎক্ষেত্রের সবলতাও তত বৃদ্ধি পায়। তড়িৎক্ষেত্রের সবলতাকে (strength) তীব্রতা বলে। **তড়িৎক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে একটি একক ধনাত্মক আধান স্থাপন করলে সেটি যে বল অনুভব করে তাকে ঐ বিন্দুর তড়িৎ তীব্রতা বলে।** তড়িৎক্ষেত্রের তীব্রতাকে $\vec{E}$ দ্বারা সূচিত করা হয়। P বিন্দুতে



চিত্র : ১৯.৯

স্থাপিত আধানটি যদি F বল লাভ করে তাহলে P বিন্দুর তড়িৎ তীব্রতা,

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} \quad \text{... ... .} \quad (১৯.৩)$$

তড়িৎ তীব্রতা পরিমাপের একক নিউটন/কুলম্ব (NC^{-1})। তড়িৎ তীব্রতা একটি ভেক্টর রাশি এবং এর দিক হচ্ছে তড়িৎক্ষেত্রে স্থাপিত ধনাত্মক আধানের ওপর ক্রিয়াশীল বলের দিকে। তড়িৎক্ষেত্রের কোনো বিন্দুর তীব্রতার মান,

$$E = \frac{F}{q} \quad \text{... ... ...} \quad (১৯.৪)$$

১৯.৪ নং সমীকরণ থেকে তড়িৎক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে স্থাপিত কোনো আধানের ওপর ক্রিয়াশীল বলের মান,

$$F = qE$$

অর্থাৎ, তড়িৎক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে স্থাপিত কোনো আধানের ওপর ক্রিয়াশীল বল ঐ বিন্দুর তীব্রতা এবং স্থাপিত আধানের গুণফলের সমান।

গাণিতিক উদাহরণ ১৯.২। কোনো তড়িৎক্ষেত্রে 10 কুলম্বের একটি আহিত বস্তু স্থাপন করলে সেটি 10 নিউটন বল লাভ করে। ঐ বিন্দুতে 15 কুলম্বের একটি আহিত বস্তু স্থাপন করলে বলের মান কত হবে?

সমাধান :

আমরা জানি,

$$E = \frac{F_1}{q_1}$$

$$= \frac{10N}{10C} = 1\ NC^{-1}$$

$$F_2 = Eq_2$$

$$= 1(NC^{-1}) \times 15C$$

$$= 15N$$

উ: 15N

এখানে,

বল, $F_1 = 10N$

আধান, $q_1 = 10C$

আধান, $q_2 = 15C$

বল, $F_2 = ?$

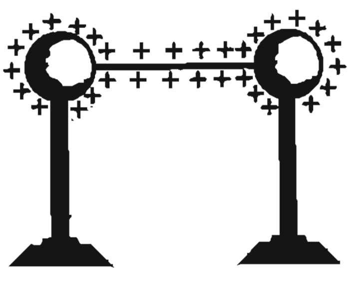
১৯.৭। তড়িৎ বিভব
Electric Potential

দুইটি ধনাত্মক আধানযুক্ত ধাতব গোলককে একটি পরিবাহী তার দ্বারা যুক্ত করলে [চিত্র ১৯.১০] নিচের যে কোনো একটি ঘটনা ঘটতে পারে।

১. বাম গোলক থেকে কিছু আধান ডান গোলকে যেতে পারে।

২. ডান গোলক থেকে কিছু আধান বাম গোলকে যেতে পারে।

৩. আধান যেমন ছিল তেমনই থাকতে পারে।



চিত্র : ১৯.১০

আধান কোন গোলক থেকে কোন গোলকে যাবে তা কিন্তু গোলকদ্বয়ে আধানের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে না। এটি নির্ভর করে যে বিষয়টির ওপর তাকে তড়িৎ বিভব বলে। যে গোলকের বিভব বেশি তা থেকে কম বিভবের গোলকে ধনাত্মক আধান প্রবাহিত হবে। দুইটি গোলকের বিভব সমান না হওয়া পর্যন্ত আধানের এ প্রবাহ চলবে।

সুতরাং বিভব হচ্ছে আহিত পরিবাহকের তড়িৎ অবস্থা যা নির্ধারণ করে ঐ পরিবাহকটিকে অন্য কোনো পরিবাহকের সাথে পরিবাহক দ্বারা সংযুক্ত করলে তা আধান দেবে বা নেবে।

দুইটি আহিত পরিবাহকের মধ্যে আধানের প্রবাহ আধানের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে না। ধরা যাক দুইটি পরিবাহক ধনাত্মকভাবে আহিত। প্রথম পরিবাহকের আধানের পরিমাণ দ্বিতীয় পরিবাহকের আধানের চেয়ে বেশি কিন্তু প্রথমটির বিভব দ্বিতীয়টির চেয়ে কম। এখন পরিবাহক দুইটিকে পরিবাহক দ্বারা সংযুক্ত করলে দ্বিতীয় পরিবাহক থেকে প্রথম পরিবাহকে ধনাত্মক আধান প্রবাহিত হবে। আধানের পরিমাণ প্রথম পরিবাহকে বেশি হওয়া সত্ত্বেও বিভব কম হওয়ায় এটি আধান গ্রহণ করে। আধানের প্রবাহের ফলে যখন পরিবাহী দুইটির বিভব সমান হবে তখন আধানের প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে।

১৯.৮। বিভবের পরিমাণ
Quantity of Potential

কোনো আহিত বস্তুর তড়িৎক্ষেত্রের মধ্যে একটি আধানকে এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে স্থানান্তরের জন্য কিছু কাজ সম্পন্ন করতে হয়। ক্ষেত্র সৃষ্টিকারী আধানটি ধনাত্মক হলে একটি ধনাত্মক আধানকে বস্তুর দিকে আনতে বিকর্ষণ বলের বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়। অর্থাৎ অসীমে অবস্থিত কোনো বিন্দু থেকে একটি একক ধনাত্মক আধানকে বস্তুর যত নিকটবর্তী কোনো বিন্দুতে আনতে হবে ততবেশি কাজ করতে হবে। সুতরাং ধনাত্মকভাবে আহিত একটি বস্তুর তড়িৎক্ষেত্রের মধ্যে একটি বিন্দু বস্তুটির যত নিকটে হবে তার বিভবও তত বেশি হবে। ক্ষেত্র সৃষ্টিকারী আহিত বস্তুটি ঋণাত্মক আধানে আহিত হলে একটি একক ধনাত্মক আধানকে ঐ বস্তুর দিকে আনতে আকর্ষণ বল দ্বারা কাজ সম্পন্ন হবে। অসীমে অবস্থিত কোনো বিন্দু থেকে একক ধনাত্মক আধানকে তড়িৎক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে আনতে যে পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হয় তা দ্বারা ঐ বিন্দুর বিভব পরিমাপ করা হয়। এখানে অসীম বলতে তড়িৎ ক্ষেত্রের বাইরের কোনো বিন্দু অর্থাৎ, যেখানে ক্ষেত্র সৃষ্টিকারী আধানের কোনো প্রভাব নেই তাকে বোঝান হয়েছে। কোনো চার্জ থেকে অসীম দূরত্বে তড়িৎ বিভবের মান শূন্য। হিসাবের সুবিধার জন্য পৃথিবীর বিভব শূন্য ধরা হয়। অসীম থেকে বা শূন্য বিভবের কোনো স্থান থেকে এক একক ধনাত্মক আধানকে পরিবাহকের নিকটে কোনো বিন্দুতে আনতে তড়িৎ বল দ্বারা বা তড়িৎ বলের বিরুদ্ধে যে পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হয় তাকে ঐ পরিবাহকের বিভব বলে।

আবার, অসীম বা শূন্য বিভবের কোনো স্থান থেকে এক একক ধনাত্মক আধানকে তড়িৎ ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে আনতে সম্পন্ন কাজের পরিমাণকে ঐ বিন্দুর বিভব বলে।

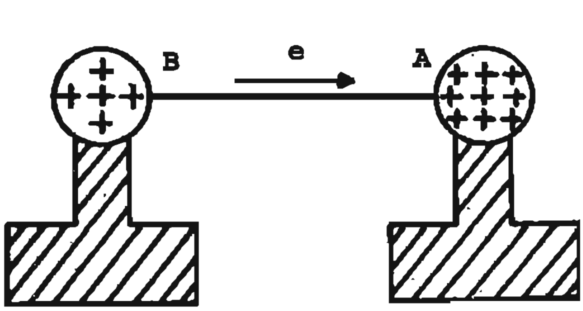
শূন্য বিভবের কোনো বিন্দু থেকে q একক ধনাত্মক আধানকে পরিবাহীর খুব নিকটে বা তড়িৎক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে আনতে যদি সম্পন্ন কাজের পরিমাণ W হয়, তবে ঐ পরিবাহী বা ঐ বিন্দুর বিভব V হবে,

$$V = \frac{W}{q}$$

বিভব একটি স্কেলার রাশি।

একক : এস. আই. এককে বিভব পরিমাপ করা হয় ভোল্ট (volt) এককে। অসীম থেকে 1C ধনাত্মক আধানকে তড়িৎ ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে আনতে যদি 1J কাজ সম্পন্ন হয়, তবে ঐ বিন্দুর বিভবকে 1V বলে।

$$\therefore\ 1\text{Volt (V)} = \frac{1J}{1C} = 1JC^{-1}$$



চিত্র : ১৯.১১

তাৎপর্য : তড়িৎ ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুর বিভব 1000V বলতে বুঝায় শূন্য বিভবের কোনো স্থান থেকে 1 কুলম্ব ধনাত্মক আধান ঐ বিন্দু পর্যন্ত আনতে 1000J কাজ করতে হবে।

১৯.৯। বিভবান্তর বা বিভব পার্থক্য
Potential difference

একটি আধানকে এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে সরানোর জন্য যদি কিছু কাজ সম্পাদিত হয় তাহলে বিন্দু দুইটি ভিন্ন বিভবে রয়েছে বলা যায়। ভূমির বিভবকে শূন্য ধরা হয়। সুতরাং কোনো বিন্দুর বিভব বলতে একটি ক্ষুদ্র ধনাত্মক আধানকে ভূমি বা অসীম থেকে ঐ বিন্দু পর্যন্ত আনতে সম্পাদিত কাজকে বুঝায়।

A ও B পরিবাহকদ্বয়কে কোনো পরিবাহী তার দ্বারা সংযুক্ত করলে পরিবাহকদ্বয়ের বিভর পার্থক্যের কারণে এদের মধ্যে আধানের প্রবাহ হবে (চিত্র ১৯.১১)।

ধরা যাক, A ও B পরিবাহকদ্বয়ের বিভব যথাক্রমে V_A এবং V_B। যেহেতু সংজ্ঞানুসারে শূন্য বিভবের স্থান অর্থাৎ, ভূমি থেকে একক ধনাত্মক আধান A পরিবাহকে আনতে কৃত কাজ V_A এবং B পরিবাহকে আনতে কৃত কাজ V_B। অতএব, একক ধনাত্মক আধানকে B বিন্দু থেকে A বিন্দুতে আনতে কাজের পরিমাণ অর্থাৎ, $V_A - V_B$ ঐ দুই পরিবাহকের বিভব পার্থক্য। সুতরাং একক ধনাত্মক আধানকে তড়িৎ ক্ষেত্রের এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে স্থানান্তর করতে সম্পন্ন কাজের পরিমাণকে ঐ দুই বিন্দুর বিভব পার্থক্য বলে। বিভব পার্থক্য পরিমাপ করা হয় ভোল্ট এককে। A ও B পরিবাহকদ্বয়ের বিভব পার্থক্য 1000V-এর অর্থ হচ্ছে B পরিবাহক থেকে 1C ধনাত্মক আধান A পরিবাহকে আনতে 1000J শক্তি ব্যয় করতে হবে।

যদি ধনাত্মক আধান পরিবাহিত হতে পারত তাহলে V_A উচ্চবিভব সম্পন্ন A পরিবাহক থেকে V_B নিম্ন বিভব সম্পন্ন B পরিবাহকে তা পরিবাহিত হত। প্রকৃতপক্ষে B পরিবাহক থেকে উচ্চবিভব সম্পন্ন A পরিবাহকে ইলেকট্রন পরিবাহিত হয়। A ও B এর বিভব সমান না হওয়া পর্যন্ত ইলেকট্রনের এই প্রবাহ অব্যাহত থাকে।

B পরিবাহক থেকে ইলেকট্রন চলে যাওয়ার অর্থ পরিবাহকটির ধনাত্মক আধান লাভ করা অর্থাৎ, এর বিভব V_B থেকে বৃদ্ধি পাওয়া। পক্ষান্তরে A পরিবাহকে ইলেকট্রন চলে আসায় এর ধনাত্মক আধান ইলেকট্রনের সংস্পর্শে এসে নিস্তড়িত হতে থাকে ফলে এর বিভব V_A থেকে হ্রাস পেতে থাকে। A ও B এর বিভব সমান হলে অর্থাৎ, A ও B এর বিভব পার্থক্য শূন্য হলে এদের মধ্যে ইলেকট্রনের প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়।

পৃথিবী বা ভূমির বিভব শূন্য

উপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে কোনো পরিবাহক ধনাত্মক আধান লাভ করলে এর বিভব বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পরিবাহকটি যদি অতিকায় গোলক হয় তাহলে ধনাত্মক আধান বৃদ্ধির কারণে–এর বিভবের বৃদ্ধি ততটা লক্ষণীয় হয় না। তাই বিশাল কোনো পরিবাহকে আধান দিলে বা পরিবাহক থেকে আধান নিলে বাহ্যত এর বিভবের কোনো পরিবর্তন হয় না। যেমন সাগর থেকে এক বালতি পানি তুলে নিলে বা একবালতি পানি ঢেলে দিলে এর পানিতলের উচ্চতার কোনোই পরিবর্তন হয় না। আমাদের পৃথিবী হচ্ছে তেমনি এক অতিকায় পরিবাহক। এটি ঋণাত্মক আধানের এক বিশাল ভান্ডার। তাই এতে কিছু ইলেকট্রন এলে বা এ থেকে কিছু ইলেকট্রন চলে গেলে এর বিভবের তেমন কোনো পরিবর্তন হয় না। তাই ভূমির বিভবকে আমরা শূন্য ধরি।

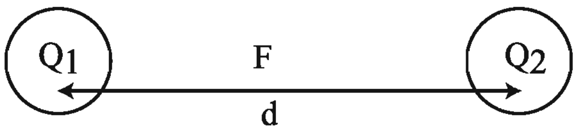
অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোন সম্পর্কটি সঠিক ?

ক. $E = Fq$ খ. $q = FE$

গ. $F = qE$ ঘ. $F = {}^{q}/E$



চিত্র

২। d এর মান বাড়ালে কোনটি ঘটবে

ক. F বাড়বে খ. F অপরিবর্তিত থাকবে

গ. F কমবে ঘ. F শূন্য হবে

৩। কোনো তড়িৎ ক্ষেত্রে 30 C একটি চার্জ স্থাপন করলে তা 15 N বল লাভ করে। ক্ষেত্রটির তড়িৎ তীব্রতা কত?

ক. $5\ NC^{-1}$ খ. $1\ NC^{-1}$

গ. $2\ NC^{-1}$ ঘ. $450\ NC^{-1}$

নিচে তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্রের আধান ও পরীক্ষণীয় বস্তুর আধানের চারটি ঘটনা উল্লেখ করা হল

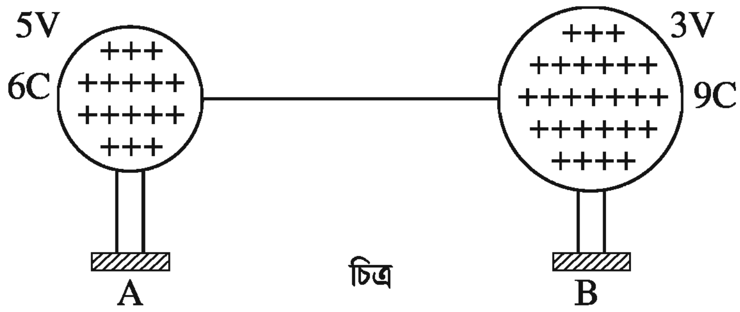
৪।

ঘটনা	তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্রের আধান	পরীক্ষণীয়বস্তুর আধান	পাতদ্বয়ের ফাঁক
A ⟶	+	+	কমবে
B ⟶	-	অনাহিতবস্তু	বৃদ্ধি পাবে
C ⟶	-	+	বৃদ্ধি পাবে
D ⟶	+	−	কমবে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. A খ. B

গ. C ঘ. D



চিত্র

৫। চিত্রে –

i. A গোলক থেকে কিছু আধান B গোলকে যাবে

ii. B গোলক থেকে কিছু আধান A গোলকে যাবে

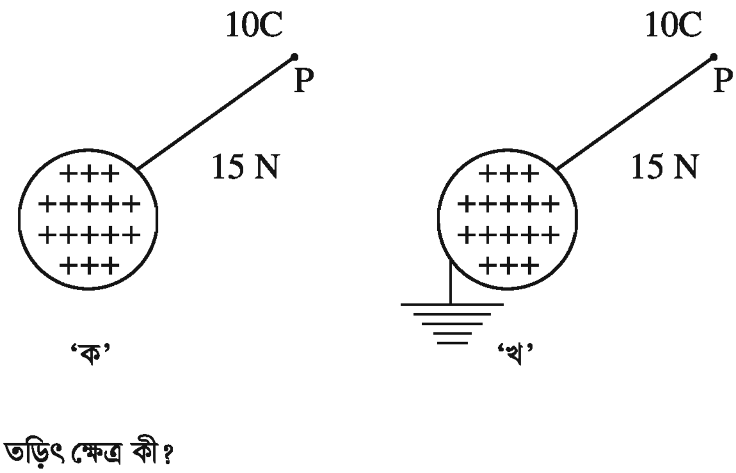
iii. আধান স্থানান্তর হবে না

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i , ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন



ক. তড়িৎ ক্ষেত্র কী?

খ. P বিন্দুতে স্থাপিত বস্তুর অবস্থান পরিবর্তন করলে এটির ওপর অনুভূত বলের কিরূপ পরিবর্তন ঘটবে?

গ. 'ক' চিত্রে P বিন্দুতে তড়িৎ প্রাবল্য নির্ণয় কর।

ঘ. চিত্র 'খ' অনুসারে তড়িৎ ক্ষেত্রের তীব্রতা ও বস্তুর ওপর অনুভূত বলের পরিবর্তন সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।

বিংশতম অধ্যায়

চল তড়িৎ

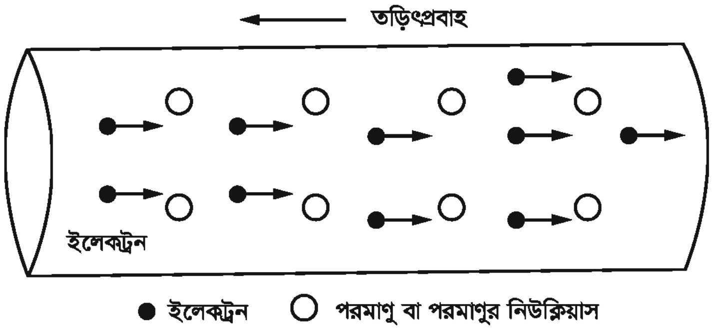
CURRENT ELECTRICITY

মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে তড়িতের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দৈনন্দিন জীবনে বাতি জ্বালানো, পাখা ঘোরানো, রেডিও, টেলিভিশন, টেপরেকর্ডার, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি চালানো, রান্না করা বিভিন্ন কাজে তড়িতের রয়েছে ব্যাপক ব্যবহার। কলকারখানা, যানবাহন ইত্যাদিতেও রয়েছে তড়িতের ব্যবহার। যে তড়িৎ আমরা ব্যবহার করি তা হল চল তড়িৎ। এর আগে আমরা স্থির তড়িৎ, নিয়ে আলোচনা করেছি। এ অধ্যায়ে আমরা চলতড়িৎ সম্পর্কে আলোচনা করব। এ অধ্যায়ে রয়েছে চলতড়িতের উৎপত্তি, সরল তড়িৎকোষ, শুষ্ক তড়িৎকোষ, তড়িচ্চালক বল, তড়িৎবর্তনী, ও'মের সূত্র ও রোধ, রোধের অনুক্রম ও সমান্তরাল সন্নিবেশ, অ্যামিটার, ভোল্টমিটার, বৈদ্যুতিক ক্ষমতা ও গৃহে তড়িৎ ব্যবহার ইত্যাদি।

২০.১। চল তড়িৎ
Current Electricity

দুটি ভিন্ন বিভবের বস্তুকে যখন পরিবাহক তার দ্বারা যুক্ত করা হয় তখন নিম্ন বিভবের বস্তু থেকে উচ্চ বিভবের বস্তুতে ইলেকট্রন প্রবাহিত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত বস্তুদ্বয়ের মধ্যবর্তী বিভব পার্থক্য শূন্য না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই প্রবাহ চলে। কোনো প্রক্রিয়ায় যদি বস্তুদ্বয়ের মধ্যে বিভব পার্থক্য বজায় রাখা যায় তাহলে এই ইলেকট্রন প্রবাহ নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। ঋণাত্মক আধান বা ইলেকট্রনের এই নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহই চল তড়িৎ (Current Electricity)।

ইলেকট্রন আবিষ্কারের প্রায় একশ বছর আগে মানুষ তড়িৎ আবিষ্কার করেছে। সে সময়ে মনে করা হত উচ্চ বিভবের বস্তু থেকে ধনাত্মক আধান নিম্ন বিভবের বস্তুতে প্রবাহিত হওয়ার ফলে তড়িৎপ্রবাহ চলে। প্রকৃত পক্ষে ধনাত্মক আধান অর্থাৎ প্রোটন পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে এবং ইলেকট্রনের তুলনায় প্রায় দুই হাজার গুণ ভারী হওয়ায় প্রবাহিত হতে পারে না। পরিবাহকের মুক্ত ইলেকট্রনের প্রবাহের জন্যই তড়িৎপ্রবাহ হয়। তড়িৎপ্রবাহের সংজ্ঞা **এভাবে দেওয়া যায়: কোনো পরিবাহকের যে কোনো প্রস্থচ্ছেদের মধ্য দিয়ে একক সময়ে যে পরিমাণ আধান প্রবাহিত হয় তাকে তড়িৎপ্রবাহ (Electric Current) বলে।**



চিত্র : ২০.১

কোনো পরিবাহকের যে কোনো প্রস্থচ্ছেদের মধ্য দিয়ে t সময়ে যদি Q পরিমাণ আধান প্রবাহিত হয়, তাহলে তড়িৎপ্রবাহ I হবে,

$$I = \frac{Q}{t} \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \qquad (২০.১)$$

একক : তড়িৎপ্রবাহের একক অ্যাম্পিয়ার (ampere)। একে A দ্বারা সূচিত করা হয়। শূন্য মাধ্যমে কোনো পরিবাহীর যে কোনো প্রস্থচ্ছেদের মধ্য দিয়ে 1 second-এ 1 coloumb আধান প্রবাহিত হলে যে পরিমাণ তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয় তাকে 1 অ্যাম্পিয়ার (1 A) বলে।

$$I = \frac{1C}{1s} = 1Cs^{-1} = 1A$$

কোনো পরিবাহকের মধ্য দিয়ে 10A তড়িৎ প্রবাহিত হওয়ার অর্থ, ঐ পরিবাহকের যে কোনো প্রস্থচ্ছেদের মধ্য দিয়ে

প্রতি সেকেন্ডে 10 কুলম্ব (C) আধান প্রবাহিত হচ্ছে।
অল্প পরিমাণ প্রবাহ পরিমাপের জন্য মিলি অ্যাম্পিয়ার (mA) এবং মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার (μA) একক ব্যবহার করা হয়।

$1mA = 10^{-3}A$ এবং $1\mu A = 10^{-6}A$

২০.২। চল তড়িতের উৎপত্তি
Production of Current Electricity

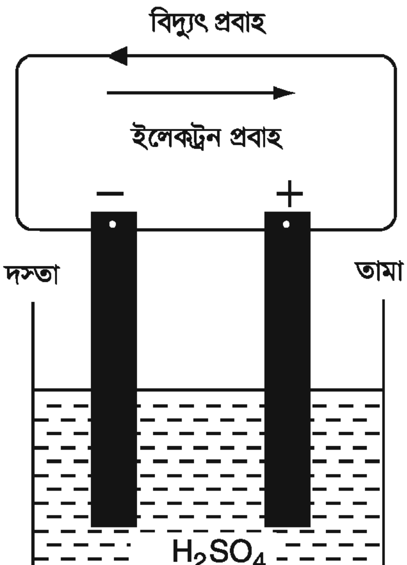
নিম্ন বিভব সম্পন্ন বস্তু থেকে উচ্চ বিভবের বস্তুতে ক্রমাগত ইলেকট্রন চলে আসার ফলে দুটি বস্তুর বিভব পার্থক্য ক্রমে ক্রমে কমতে থাকে। শেষে এক সময় বস্তু দুটির মধ্যে বিভব পার্থক্য শূন্য হয়ে যায় ফলে পরিবাহকের মধ্য দিয়ে আর কোনো তড়িৎপ্রবাহ থাকে না।

নিরবচ্ছিন্নভাবে তড়িৎপ্রবাহ পেতে হলে তাই এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে পরিবাহকের দুই প্রান্তের মধ্যে সর্বদা একটা বিভব পার্থক্য বজায় থাকে। পরিবাহকের দুই প্রান্তে বিভব পার্থক্য বজায় রাখার জন্য অনবরত শক্তির যোগান দেওয়া প্রয়োজন। তড়িৎকোষের রাসায়নিক শক্তি, কিংবা ডায়নামোর যান্ত্রিক শক্তি এই বিভব পার্থক্য বজায় রাখে। সরল তড়িৎকোষে কীভাবে রাসায়নিকশক্তি তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে চল তড়িৎ উৎপন্ন হয় তা নিচে বর্ণনা করা হল।

২০.৩। সরল ভোল্টার তড়িৎকোষ বা সরল তড়িৎকোষ
Simple Voltaic Cell or Simple Cell

রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যে যে যন্ত্র থেকে নিরবচ্ছিন্ন তড়িৎ প্রবাহ উৎপন্ন করা যায় তাকে তড়িৎকোষ বলে। ১৭৯৪ সালে আলেসান্দ্রো ভোল্টা সর্বপ্রথম তড়িৎকোষ আবিষ্কার করেন। তাই এই কোষকে ভোল্টার কোষ বলা হয়। এটি একটি সরলতম তড়িৎকোষ।

বর্ণনা : একটি কাচের পাত্রে খানিকটা পাতলা সালফিউরিক এসিড নিয়ে তার মধ্যে একটি দস্তা ও একটি তামার পাত পরস্পরকে স্পর্শ না করে ডুবালে একটি সরল ভোল্টার তড়িৎকোষ তৈরি হয় [চিত্র ২০.২]। পাত দুটির সাথে দুটি সংযোজক স্ক্রু লাগান থাকে। একটি তামার তার দিয়ে সংযোজক স্ক্রু দুটিকে সংযুক্ত করলে তারের মধ্য দিয়ে তামার পাত থেকে দস্তার পাতে তড়িৎপ্রবাহ শুরু হয় এবং তামার পাত বেয়ে হাইড্রোজেন গ্যাসের বুদ্‌বুদ্‌ উঠতে থাকে। দস্তা ও এসিডের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে তামা ও দস্তার পাতের মধ্যে বিভব পার্থক্য তৈরি হয়। তামার পাতের বিভব দস্তার পাতের চেয়ে উচ্চতর হওয়ায় তামার পাত থেকে দস্তার পাতে তড়িৎ প্রবাহিত হয়। পাতদ্বয়ের মধ্যে বিভব পার্থক্য যতক্ষণ বর্তমান থাকে তড়িৎপ্রবাহও ততক্ষণ ধরে চলে।



চিত্র : ২০.২

ক্রিয়া : ঘন সালফিউরিক এসিডের মধ্যে পানি মিশালে আয়নিক বিশ্লেষণের ফলে H_2SO_4-এর অণুগুলো বিভক্ত হয়ে বিপরীত জাতীয় আয়ন উৎপন্ন করে।

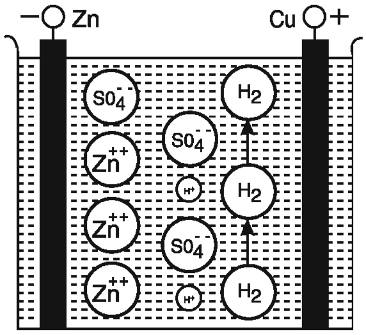
$$H_2SO_4 = 2H^+ + SO_4^{--}$$

এই আয়নগুলো এসিডের মধ্যে এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়ায়।

এখন দস্তার পাত এসিডে ডুবালে ঐ পাত হতে ধনাত্মক দস্তার আয়ন (Zn^{++}) এসিডে মিশে যায় এবং ঋণাত্মক সালফেট (SO_4^{--}) আয়নকে আকর্ষণ করে নিস্তড়িত সাধারণ $ZnSO_4$ অণু তৈরি করে।

$Zn = Zn^{++} + 2e^-$
$Zn^{++} + [2H^+ + SO_4^{--}] = ZnSO_4 + 2H^+$

এই $ZnSO_4$-এর সাদা গুঁড়ো পাত্রের তলায় জমা হয়। বিক্রিয়া স্থলে দস্তার এক একটি পরমাণু থেকে দুটি করে ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হয়ে দস্তার পাতে রয়ে যায় বলে দস্তার পাত ঋণাত্মক তড়িৎগ্রস্ত হয়। এভাবে দস্তার পাত ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ধনাত্মক দস্তার আয়ন সরবরাহ করে বলে দস্তার পাতকে সরল ভোল্টার কোষের জ্বালানি বলা হয়।



চিত্র ২০.৩

অপরদিকে ধনাত্মক হাইড্রোজেন আয়ন (H^+), ধনাত্মক আয়ন (Zn^{++}) কর্তৃক বিকর্ষিত হয়ে তামার পাতের দিকে যায় এবং তামার পাত থেকে একটি করে ইলেকট্রন সংগ্রহ করে হাইড্রোজেন অণুতে পরিণত হয়ে বুদ্‌বুদের আকারে বেরিয়ে আসে। তামার পাত ইলেকট্রন দান করে ধনাত্মক তড়িৎগ্রস্ত হয় [চিত্র ২০.৩]।

$Cu = Cu^{++} + 2e^-$
$2H^+ + 2e^- = H_2$

রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে দস্তার পাতে ঋণাত্মক আধান বেশি হওয়ায় সেটি ঋণাত্মক বিভবযুক্ত এবং তামার পাতে ধনাত্মক আধান বেশি হওয়ায় সেটি ধনাত্মক বিভবযুক্ত হয়। এর ফলে কোনো পরিবাহক তার দিয়ে সংযোগ দিলে তামার পাত থেকে দস্তার পাতের দিকে তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি হয়।

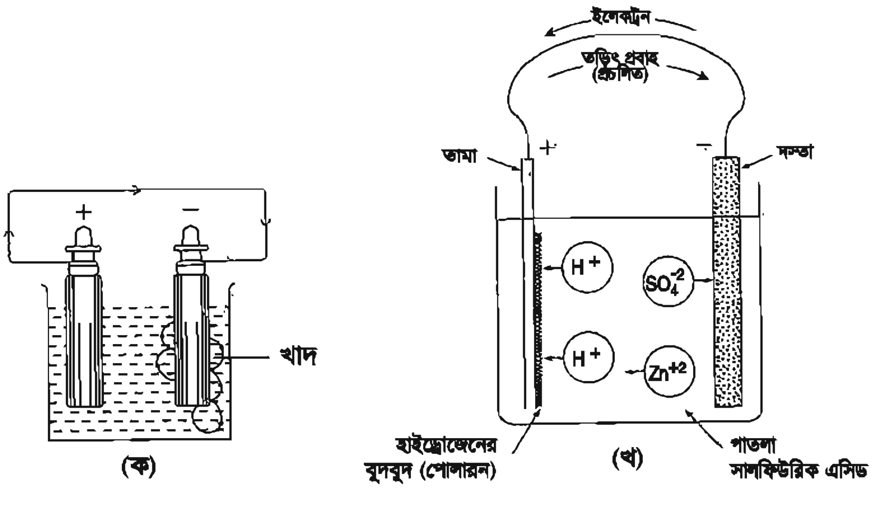
তড়িৎপ্রবাহের দিক নির্দেশের প্রচলিত প্রথা

প্রথম যখন চল তড়িৎ আবিষ্কার করা হয় তখন ধারণা করা হত উচ্চতর বিভব থেকে নিম্নতর বিভবের দিকে ধনাত্মক আধান প্রবাহিত হয়। সরল তড়িৎকোষের ক্ষেত্রে তড়িৎপ্রবাহের প্রচলিত দিক ধনাত্মক তামার পাত থেকে ঋণাত্মক দস্তার পাতের দিকে ধরা হয়। কিন্তু যেহেতু তড়িৎ প্রবাহিত হয় ঋণাতক আধান অর্থাৎ ইলেকট্রনের প্রবাহের জন্য কাজেই তড়িৎপ্রবাহের প্রকৃত দিক বা ইলেকট্রন প্রবাহের দিক হবে, নিম্নতর বিভব থেকে উচ্চতর বিভবের দিকে। অর্থাৎ সরল তড়িৎকোষের ক্ষেত্রে ঋণাত্মক দস্তার পাত থেকে ধনাত্মক তামার পাতের দিকে। ফলে তড়িৎপ্রবাহের প্রকৃত দিক প্রচলিত দিকের বিপরীত। তড়িৎপ্রবাহের দিক হিসেবে সারা বিশ্বব্যাপী প্রচলিত দিক অনুসরণ করা হয়। আমরাও তড়িৎপ্রবাহের দিক হিসেবে প্রচলিত দিক অর্থাৎ ধনাত্মক পাত থেকে ঋণাত্মক পাতের দিক গ্রহণ করব।

সরল কোষের ত্রুটি : সরল তড়িৎকোষে দুটি প্রধান ত্রুটি দেখা যায়; যথা– স্থানীয় ক্রিয়া (Local action) ও পোলারায়ণ (Polarisation)।

স্থানীয় ক্রিয়া : বাজারে সাধারণত যে দস্তা পাওয়া যায় তা বিশুদ্ধ নয়। তাতে অন্যান্য ধাতুর মিশ্রণ থাকে। খাদ মিশ্রিত দস্তা এসিডে ডুবালে এসিড ও খাদ মিলে ছোট ছোট স্থানীয় কোষ তৈরি করে। এই স্থানীয় কোষগুলোতে যে তড়িৎ প্রবাহিত হয় তা মূল তড়িৎপ্রবাহের সাথে যুক্ত হয় না। পাত দুটি বাইরে থেকে সংযুক্ত না থাকলেও এসব স্থানীয় কোষে তড়িৎপ্রবাহ চলতে থাকে। ফলে অকারণে দস্তার পাত ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং এসিডের শক্তি কমে যায়। এতে করে কোষের কার্যকারিতা ক্রমশ হ্রাস পায়। কোষের এই ত্রুটিকে স্থানীয় ক্রিয়া বলে। সাধারণ দস্তার পাতে পারদের প্রলেপ লাগিয়ে স্থানীয় ক্রিয়া ত্রুটি দূর করা যায়।

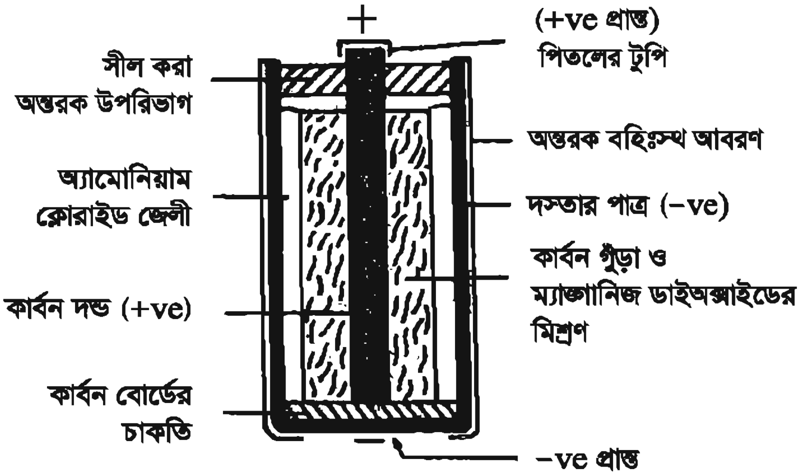
পোলারায়ন : তড়িৎকোষে রাসায়নিক ক্রিয়া শুরু হলে দুটো করে হাইড্রোজেন আয়ন তামার পাত থেকে ইলেকট্রন নিয়ে তামার পাতের বিভব বাড়িয়ে দেয় ও হাইড্রোজেন গ্যাসে পরিণত হয়। তামার পাতে বেশি হাইড্রোজেন গ্যাস জমে গেলে হাইড্রোজেন আয়ন তামার পাতের সংস্পর্শে এসে ইলেকট্রন নিতে পারে না, ফলে তামার পাতের বিভব কমতে থাকে। এতে করে তড়িৎপ্রবাহ হ্রাস পায়। একে পোলারায়ন বা পোলারন বলে। তামার পাতে হাইড্রোজেন গ্যাস জমতে না দিয়ে পোলারণ ত্রুটি দূর করা যায়। সাধারণত ব্রাশ দিয়ে ঘষে কিংবা পোলারন নিবারণ হিসেবে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে কোষকে এই ত্রুটি মুক্ত করা হয়।



চিত্র : ২০.৪ (ক) স্থানীয় ক্রিয়া (খ) পোলারন

২০.৪। শুষ্ক কোষ
Dry Cell

গঠন : এই কোষে একটি দস্তার চোঙের মধ্যস্থলে একটি কার্বন দণ্ড বসানো থাকে। কার্বন দণ্ডটি কোষের ধনাত্মক পাত ও দস্তার চোঙ ঋণাত্মক পাত হিসেবে কাজ করে [চিত্র ২০.৫]। কার্বন দণ্ডের উপরে একটি পিতলের টুপি থাকে। কার্বন দণ্ডের চারদিকে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড ও কাঠ–কয়লার গুঁড়ার মিশ্রণ রাখা হয়। মিশ্রণসহ কার্বন দণ্ডটিকে দস্তার চোঙের মধ্যে স্থাপন করে চোঙের ফাঁকা অংশ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের ঘন পেস্ট দ্বারা পূর্ণ করা হয়। পেস্ট যাতে শুকিয়ে না যেতে পারে সেজন্য দস্তার চোঙের উপরের মুখ পিচ, গালা, কাঠের গুঁড়া ইত্যাদি দ্বারা বন্ধ থাকে। গ্যাস বের হওয়ার জন্য পিচের মধ্যে একটা ছোট ছিদ্র থাকে। অতঃপর কোষের চোঙাকৃতি অংশকে কাগজে মুড়ে দেওয়া হয়।



চিত্র : ২০.৫

ক্রিয়া : এ কোষকে যখন কোনো বর্তনীতে সংযুক্ত করা হয়, তখন দস্তা ধীরে ধীরে দ্রবীভূত হতে থাকে এবং ইলেকট্রন ছেড়ে দেয়।

$$Zn \rightarrow Zn^{++} + 2e^-$$

দস্তার আয়ন এবং বিভব পার্থক্য সৃষ্টিকারী NH_4Cl-এর মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয় এবং দস্তা NH_4Cl থেকে ধনাত্মক আয়ন H^+ মুক্ত করে নিজে ঋণাত্মক আধান ধারণ করে, ফলে দস্তার খোলের বিভব হ্রাস পায়।

$$Zn^{++} + 2NH_4Cl \rightarrow ZnCl_2 + 2NH_3 + 2H^+$$

এদিকে হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) কার্বন দণ্ডের কাছে গিয়ে কার্বন দণ্ড থেকে দুটি ইলেক্ট্রন নিয়ে নিস্তড়িত হাইড্রোজেন গ্যাসে পরিণত হয়। কার্বন দণ্ড ইলেকট্রন দান করে ধনাত্মক আধানযুক্ত হয় এবং এর বিভব বৃদ্ধি পায়। ফলে দস্তার খোল থেকে কার্বন দণ্ডের দিকে ইলেকট্রন প্রবাহিত হয়ে তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি করে।

চিত্রে পিতলের টুপির নিকট একটি সরু ছিদ্র পথ থাকে যার মধ্য দিয়ে NH_3 গ্যাস বাইরে নির্গত হয়।

ব্যবহার : টর্চ লাইট, ট্রানজিস্টর, ক্যালকুলেটর, সাইকেলের আলো জ্বালানো ইত্যাদিতে এই কোষের বহুল ব্যবহার রয়েছে।

উদাহরণ ২০.১। কোনো একটি তড়িৎকোষের দুই প্রান্তে সংযুক্ত কোনো পরিবাহক তারের মধ্য দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে 10^{17} টি ইলেকট্রন ডান দিক থেকে বাম দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহের মান ও দিক নির্ণয় কর। ইলেকট্রনের আধান 1.6×10^{-19}C।

সমাধান :

এখানে,

ইলেকট্রনের চার্জ, $e = 1.6 \times 10^{-19}$C.

প্রতি সেকেন্ড প্রবাহিত ইলেকট্রন সংখ্যা $n = 10^{17}$

মোট চার্জ, $Q = ne$

$= 10^{17} \times 1.6 \times 10^{-19}$C

সময়, $t = 1s$

তড়িৎপ্রবাহ, $I = ?$

আমরা জানি,

$$I = \frac{Q}{t}$$

$$= \frac{10^{17} \times 1.6 \times 10^{-19}\ C}{1s}$$

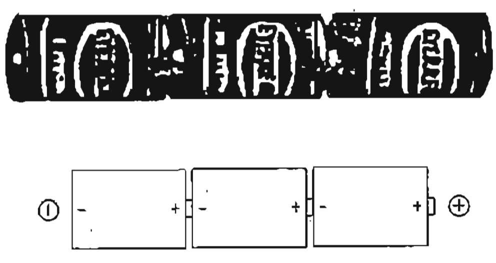
$$= 1.6 \times 10^{-2} Cs^{-1}$$

$$= 1.6 \times 10^{-2} A$$

∴ ধনাত্মক আধানের প্রবাহের দিক তড়িৎপ্রবাহের দিক হিসেবে ধরা হয় এবং ধনাত্মক আধান ইলেকট্রনের বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়। সুতরাং তড়িৎপ্রবাহ তারের মধ্যে বাম থেকে ডান দিকে হবে।

২০.৫। ব্যাটারি
Batteries

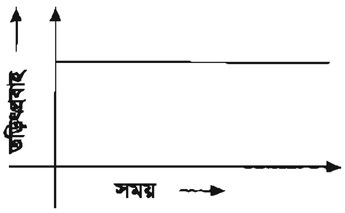
আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তায় একটি তড়িৎকোষকে ব্যাটারি বলে উল্লেখ করা হলেও প্রকৃতপক্ষে ব্যাটারি বলতে একাধিক কোষের সমবায়কে বোঝায়। ২০.৬ চিত্রে কয়েকটি কোষের সমন্বয়ে গঠিত ব্যাটারি দেখানো হয়েছে।



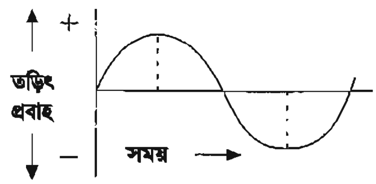
চিত্র ২০.৬ : ব্যাটারি

২০.৬। তড়িৎপ্রবাহের প্রকারভেদ

চল তড়িৎ দুই প্রকারের, যথা–সমপ্রবাহ (Direct Current বা D.C) এবং পর্যাবৃত্ত প্রবাহ (Alternating Current বা A.C)।



চিত্র ২০.৭ : সমপ্রবাহ

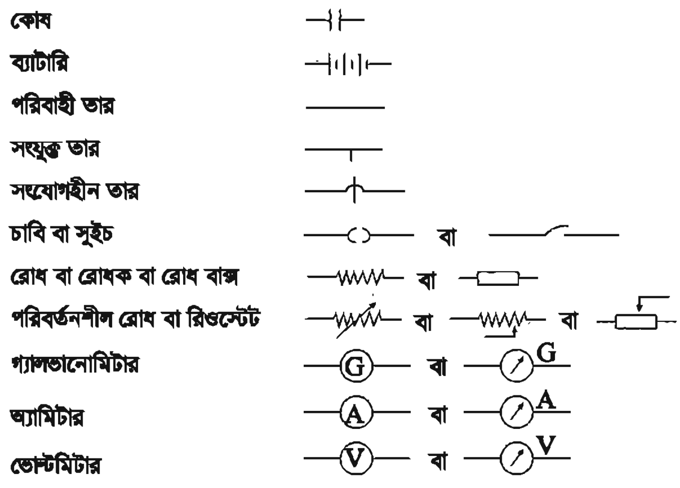


চিত্র ২০.৮ : পর্যাবৃত্ত প্রবাহ

তড়িৎপ্রবাহ যদি সর্বদা একই দিকে প্রবাহিত হয় বা সময়ের সাথে যদি তড়িৎপ্রবাহের দিকের কোনো পরিবর্তন না হয় তাহলে সেই প্রবাহকে সমপ্রবাহ বলে [চিত্র ২০.৭]। তড়িৎকোষ থেকে আমরা সমপ্রবাহ পাই। যে তড়িৎপ্রবাহ নির্দিষ্ট সময় পর পর দিক পরিবর্তন করে অর্থাৎ যে তড়িৎপ্রবাহের দিক পর্যাবৃত্তভাবে পরিবর্তিত হয় তাকে পর্যাবৃত্ত প্রবাহ বলে। আমাদের দেশে বাসায় যে পর্যাবৃত্ত প্রবাহ ব্যবহার করা হয় তা প্রতি সেকেন্ডে পঞ্চাশবার দিক পরিবর্তন করে। পর্যাবৃত্ত প্রবাহের দিক পরিবর্তনের ধরন সাধারণত একটি সাইন রেখা (sine curve)–এর মতো [চিত্র ২০.৮]।

২০.৭। তড়িৎ বর্তনী
Electric Circuit

তড়িৎপ্রবাহ চলার সম্পূর্ণ পথকে তড়িৎ বর্তনী বলে। যখন কোষের পাত দুটিকে বা তড়িৎ উৎসের দুই প্রান্তকে এক বা একাধিক রোধক, তড়িৎ যন্ত্র বা উপকরণের সাথে যুক্ত করা হয়, তখন একটি তড়িৎ বর্তনী তৈরি হয়। চিত্রে তড়িৎ বর্তনীর চিত্র আঁকার সময় যে সকল প্রতীক ব্যবহার করা হয় তার কয়েকটি দেখানো হল।



চিত্র : ২০.৯

বর্তনীতে সংযোগ :

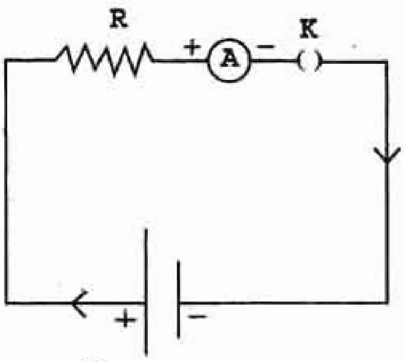
সাধারণত বর্তনীতে তড়িৎ যন্ত্র ও উপকরণসমূহ দুইভাবে সংযুক্ত করা হয়। এই সংযোগগুলো হল :

(১) অনুক্রম সংযোগ এবং

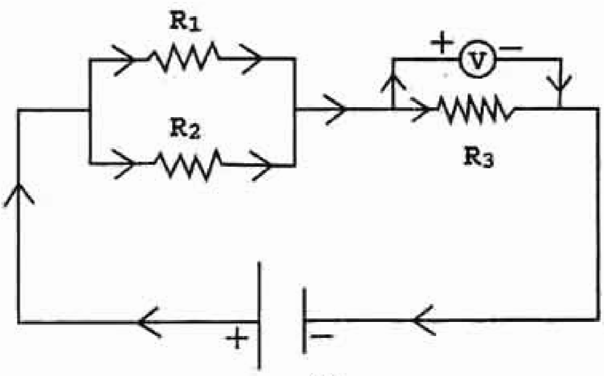
(২) সমান্তরাল সংযোগ।

১। **অনুক্রম সংযোগ** : যদি বর্তনীতে রোধ, তড়িৎ যন্ত্র বা উপকরণসমূহ এমনভাবে সংযুক্ত হয় যে একটির পর একটি পর্যায়ক্রমে থাকে, অর্থাৎ প্রথমটির এক প্রান্তের সাথে দ্বিতীয়টির এক প্রান্ত, দ্বিতীয়টির অপর প্রান্তের সাথে তৃতীয়টির একপ্রান্ত এবং এইরূপে সব কয়টি সাজানো থাকে, তবে সেই সংযোগকে অনুক্রম সংযোগ বলে। অনুক্রম সংযোগে সব কয়টির মধ্য দিয়ে সমান প্রবাহ প্রবাহিত হয়।

চিত্র (২০.১০) এ রোধ R, অ্যামিটার A এবং চাবি K–কে অনুক্রমে সংযুক্ত করা হয়েছে।
প্রবাহ পরিমাপ করার জন্য অ্যামিটার ব্যবহৃত হয় এবং একে বর্তনীতে অন্যান্য উপকরণের সাথে অনুক্রমে যুক্ত করা হয়। অ্যামিটারের রোধ খুবই কম হওয়ায় এটি বর্তনীতে কোনো রোধ সৃষ্টি করে না, ফলে এটি ব্যবহার কালে বর্তনীর মূল প্রবাহের কোনো পরিবর্তন হয় না। অনেক অ্যামিটারের প্রান্তদ্বয়ে + এবং – চিহ্ন থাকে। এক্ষেত্রে + চিহ্নিত প্রান্তকে অবশ্যই কোষের ধনাত্মক পাতের সাথে যুক্ত করতে হবে। যদি ভুলক্রমেও বিপরীত সংযোগ দেওয়া হয় তাহলে যন্ত্রের অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম ও সুবেদী কুণ্ডলী পুড়ে বা ছিঁড়ে গিয়ে যন্ত্রটিকে নষ্ট করে দিতে পারে। অনেক সময় তড়িৎ বর্তনীতে প্রবাহের উপস্থিতি বোঝার জন্য গ্যালভানোমিটার নামক একটি যন্ত্রও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।



চিত্র : ২০.১০



চিত্র : ২০.১১

২। সমান্তরাল সংযোগ : কোনো বর্তনীতে দুই বা ততোধিক রোধ, তড়িৎ উপকরণ বা যন্ত্র যদি এমনভাবে সংযুক্ত থাকে যে সব কয়টির এক প্রান্ত একটি সাধারণ বিন্দুতে এবং অপর প্রান্তগুলো অপর একটি সাধারণ বিন্দুতে সংযুক্ত হয় তবে সেই সংযোগকে সমান্তরাল সংযোগ বলে। সমান্তরাল সংযোগে প্রত্যেকটির মধ্য দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন তড়িৎ প্রবাহ চলে কিন্তু প্রত্যেকটির দুই সাধারণ বিন্দুর বিভব পার্থক্য একই থাকে। চিত্র ২০.১১ এ রোধ R_1 ও রোধ R_2 সমান্তরালভাবে এবং রোধ R_3 ও ভোল্টমিটার V সমান্তরালভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে।

কোনো রোধকের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য পরিমাপের জন্য ভোল্টমিটার ব্যবহৃত হয় এবং এই কারণে রোধকের দুই প্রান্তের সাথে একে সমান্তরালে যুক্ত করতে হয়। ভোল্টমিটারের রোধ খুব বেশি হয় এবং সমান্তরাল সংযোগের ফলে এটি খুব কম তড়িৎপ্রবাহ গ্রহণ করে। ফলে এটি ব্যবহার করলে বর্তনীর মূল প্রবাহের কার্যত কোনো পরিবর্তন হয় না। ভোল্টমিটারের প্রান্তে + এবং – চিহ্ন থাকে এবং + চিহ্নিত প্রান্তকে অবশ্যই কোষের ধনাত্মক পাতের সাথে যুক্ত করা হয়। উল্টোভাবে সংযুক্ত করলে যন্ত্রটি নষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

২০.৮। ও'মের সূত্র
Ohm's Law

কোনো পরিবাহকের দুই প্রান্তের মধ্যে বিভব পার্থক্য থাকলে তার মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ চলে। এই প্রবাহের পরিমাণ নির্ভর করে পরিবাহকের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য, পরিবাহকের আকৃতি ও উপাদান এবং পরিবাহকের তাপমাত্রার ওপর। একটি নির্দিষ্ট পরিবাহকের তাপমাত্রা স্থির থাকলে তার মধ্য দিয়ে যে প্রবাহ চলে তা শুধু এর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের ওপর নির্ভর করে। এ সম্পর্কে জর্জ সাইমন ও'ম (১৭৮৬–১৮৫৪) একটি সূত্র প্রণয়ন করেন– যা ও'মের সূত্র নামে পরিচিত।

ও'মের সূত্র : তাপমাত্রা স্থির থাকলে কোনো নির্দিষ্ট পরিবাহকের মধ্য দিয়ে যে তড়িৎপ্রবাহ চলে তা পরিবাহকের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সমানুপাতিক।

ব্যাখ্যা : ধরা যাক, AB একটি পরিবাহক, এর দুই প্রান্তের বিভব যথাক্রমে V_A ও V_B (চিত্র ২০.১২)। যদি $V_A > V_B$ হয়, তাহলে পরিবাহকের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য হবে, $V = V_A - V_B$ এবং A থেকে B বিন্দুর দিকে

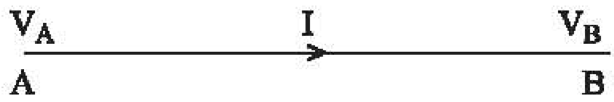
তড়িৎপ্রবাহ চলবে। এখন স্থির তাপমাত্রায় পরিবাহকের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহ I হলে ও'মের সূত্রানুসারে,

$I \alpha V$

বা, $I = GV$

এখানে G একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক, একে পরিবাহকের তড়িৎ পরিবাহিতা (conductance) বলে। G-এর বিপরীত রাশি $R = \frac{1}{G}$ উপরিউক্ত সমীকরণে বসালে আমরা পাই,

$$I = \frac{V}{R} \quad \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \qquad (২০.২)$$



চিত্র : ২০.১২

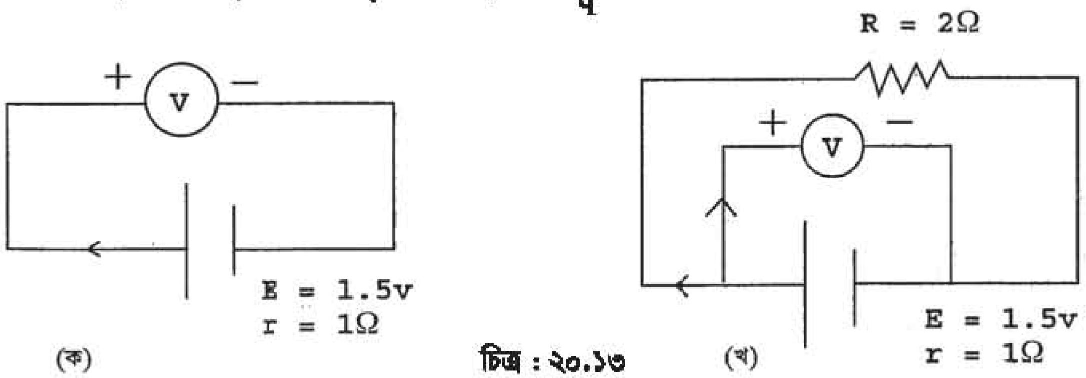
এখানে R একটি ধ্রুব সংখ্যা, R-কে পরিবাহকের রোধ বলে। এটি পরিবাহকের দৈর্ঘ্য, প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল, উপাদান ও তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে। (২০.২) সমীকরণ থেকে ও'মের সূত্রকে নিম্নোক্তভাবে লেখা যায়। তাপমাত্রা স্থির থাকলে কোনো পরিবাহকের মধ্য দিয়ে যে তড়িৎপ্রবাহ চলে তা ঐ পরিবাহকের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সমানুপাতিক এবং রোধের ব্যস্তানুপাতিক।

২০.৯। তড়িচ্চালক শক্তি
Electromotive Force (e.m.f.)

আমরা ইতোমধ্যেই জেনেছি যে কোনো পরিবাহকের মধ্য দিয়ে নিরবচ্ছিন্ন তড়িৎপ্রবাহ পেতে হলে এর দুই প্রান্তে বিভব পার্থক্য বজায় রাখতে হয়। এই বিভব পার্থক্য বজায় রাখার জন্য অনবরত শক্তির যোগান দেওয়া প্রয়োজন হয়। আর এই শক্তি পাওয়া যায় কোনো তড়িৎ উৎস থেকে– যেমন তড়িৎকোষের রাসায়নিক শক্তি বা ডায়নামোর যান্ত্রিক শক্তি থেকে। তড়িৎকোষে রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে বর্তনীতে তড়িৎপ্রবাহ চালনার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপন্ন হয়। তড়িচ্চালক বল যাকে সাধারণভাবে ভোল্টেজ (voltage) নামেও অভিহিত করা হয়, তা দ্বারা তড়িৎ উৎসের এ তড়িৎ বলের পরিমাপ পাওয়া যায়। এক কুলম্ব আধানকে কোষ সমেত কোনো বর্তনীর এক বিন্দু থেকে সম্পূর্ণ বর্তনী ঘুরিয়ে আবার ঐ বিন্দুতে আনতে যে কাজ সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ তড়িৎকোষ যে তড়িৎ শক্তি সরবরাহ করে, তাকে ঐ কোষের তড়িচ্চালক শক্তি বলে।

q কুলম্ব আধানকে সম্পূর্ণ বর্তনী ঘুরিয়ে আনতে যদি w কাজ হয়, তাহলে 1 কুলম্ব আধানকে সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে আনতে

$\frac{w}{q}$ কাজ করা হয়। অতএব, কোষের তড়িচ্চালক শক্তি $E = \frac{w}{q}$



চিত্র : ২০.১৩

যেহেতু কাজের একক জুল (J) এবং আধানের একক কুলম্ব (C), সুতরাং তড়িচ্চালক শক্তির একক JC^{-1} অর্থাৎ ভোল্ট (V)।

কোনো কোষের তড়িচ্চালক শক্তি (e.m.f.)1.5V বলতে বুঝায় 1C আধানকে ঐ কোষ সমেত কোনো বর্তনীর এক বিন্দু থেকে একবার সম্পূর্ণ বর্তনী ঘুরিয়ে ঐ বিন্দুতে আনতে 1.5J কাজ সম্পন্ন হয়।

দেখা যায় যে তড়িচ্চালক শক্তি এবং বিভব পার্থক্যের একক ভোল্ট। আসলে কোনো কোষের তড়িচ্চালক শক্তিকে ঐ কোষসহ কোনো বর্তনী তৈরি করলে কোষটি বর্তনীর বিভিন্ন অংশে যে বিভব পার্থক্যের সৃষ্টি করে তাদের সমষ্টিরূপে গণ্য করা যায়।

কোষের তড়িচ্চালক শক্তি E–এর একটি অংশ V ব্যয়িত হয় বর্তনীর বাইরের রোধকের ভিতর দিয়ে আধান চালনা করতে আর বাকি অংশ ব্যয় হয় কোষের মধ্য দিয়ে আধান চালনা করতে। E সবসময়ই V–এর চেয়ে বড় হয়, কেবলমাত্র যখন তড়িৎকোষ তড়িৎপ্রবাহ প্রেরণ করে না অর্থাৎ কোষটি কোনো বর্তনীতে যুক্ত থাকে না, তখন $E = V$ হয়। এই অবস্থায় কোষের দুই পাতের সাথে একটি ভোল্টমিটার সংযুক্ত করলে যে পাঠ পাওয়া যায়, তাই ঐ কোষের তাড়িচ্চালক শক্তি। সুতরাং মুক্ত অবস্থায় কোষের দুই পাতের বিভব পার্থক্য কোষের তড়িচ্চালক শক্তি নির্দেশ করে। E এবং V–এর পার্থক্য, কোষের অভ্যন্তরে আধানকে কোষের অভ্যন্তরীণ রোধ r অতিক্রম করতে প্রয়োজনীয় যে ভোল্টেজ তা নির্দেশ করে। সুতরাং বর্তনীর তড়িৎপ্রবাহ I হলে, $E - V = Ir$। আবার বর্তনীর বাইরের রোধ R হলে $V = IR$।

সুতরাং $E - V = Ir$

বা $E - IR = Ir$

বা $E = I(R + r)$

বা $I = \frac{E}{R+r} = \frac{\text{তড়িচ্চালক শক্তি}}{\text{মোট রোধ}}$

$\therefore$ তড়িচ্চালক শক্তি = প্রবাহ × বর্তনীর মোট রোধ,

কিন্তু বিভব পার্থক্য = প্রবাহ × বাইরের রোধ।

যখন $r = 0\Omega$ তখন $E = V$, অর্থাৎ সম্পূর্ণ শক্তিই বাইরের বর্তনীতে ব্যবহারের জন্য পাওয়া যায়, কোষের মধ্যে কোনো শক্তিই 'হারিয়ে' যায় না। কিন্তু কোনো কোষই অভ্যন্তরীণ রোধহীন নয়, ফলে তড়িৎপ্রবাহ চলার সময় কিছু শক্তি কোষের মধ্যে হারিয়ে যায় বা নষ্ট হয় এবং বাইরের বর্তনীতে কোষের তড়িচ্চালক শক্তির সম্পূর্ণটা পাওয়া যায় না। এই হারিয়ে যাওয়া শক্তিকে হারান ভোল্ট (lost voltage) বলে।

সুতরাং প্রবাহ চলাকালীন সময়ে কোনো কোষের

তড়িচ্চালক শক্তি = প্রান্ত ভোল্ট + হারান ভোল্ট

বা $E = V + Ir$

এমতাবস্থায় কোনো কোষের দুই পাতের সাথে একটি ভোল্টমিটার যুক্ত করলে যে পাঠ পাওয়া যাবে, তা কোষের তড়িচ্চালক শক্তির চেয়ে কম হবে।

উদাহরণ : ধরা যাক 1Ω অভ্যন্তরীণ রোধের কোনো কোষের দুই পাতের সাথে একটি ভোল্টমিটার যুক্ত করলে পাঠ পাওয়া যায় 1.5V। সুতরাং এটিই কোষের তড়িচ্চালক শক্তি [চিত্র : ২০.১৩ ক]।

এখন ধরা যাক এই কোষের প্রান্তদ্বয়ের সাথে 2Ω-এর রোধ যুক্ত করা হল, ফলে এর মধ্য দিয়ে কোষ তড়িৎপ্রবাহ প্রেরণ করে। এখন কোষের দুই পাতের সাথে ভোল্টমিটার যুক্ত করলে পাঠ পাওয়া যাবে 1 V [চিত্র ২০.১৩ খ]। মনে হবে কোষটির $(1.5 - 1)$ V = 0.5V বুঝি হারিয়ে গেছে। এর ব্যাখ্যা নিম্নোক্ত উপায়ে দেওয়া যায়। বর্তনীতে তড়িৎপ্রবাহ I হলে,

$$I = \frac{E}{R+r}$$

এখানে, তড়িচ্চালক শক্তি, $E = 1.5V$

বর্তনীর বাইরের রোধ, $R = 2\Omega$

কোষের অভ্যন্তরীণ রোধ, $r = 1\Omega$

$$\therefore I = \frac{1.5V}{(2+1)\Omega} = 0.5A$$

এখন 2Ω এর রোধকের মধ্য দিয়ে এই $0.5A$ প্রবাহ চালনা করতে প্রয়োজনীয় বিভব পার্থক্য

$$V = IR$$

$$= 0.5A \times 2\Omega$$

$$= 1V$$

যা অবশ্যই ভোল্টমিটারের পাঠের সমান। ভোল্টমিটারটিকে কোষের দুই পাতের সাথে যুক্ত না করে যদি 2Ω রোধকের দুই প্রান্তের সাথে যুক্ত করা হত, তাহলে এর পাঠের কোনো হেরফের হত না। এর কারণ কোষ এবং রোধের সংযোগকারী তারগুলোর রোধ নগণ্য, ফলে সংযোগকারী তারগুলোর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যও উপেক্ষণীয়। সুতরাং কোষের পাতদ্বয়ের বিভব পার্থক্য, রোধকের প্রান্তদ্বয়ের বিভব পার্থক্যের সমান।

কোষের মধ্য দিয়ে প্রবাহ চালনার জন্য প্রয়োজনীয়

বিভব পার্থক্য = প্রবাহ × অভ্যন্তরীণ রোধ

$$= 0.5A \times 1\Omega$$

$$= 0.5V$$

যা কোষের 'হারান ভোল্ট' $(E - V)$-এর সমান।

সুতরাং যখন কোষ বাইরের রোধকের মধ্য দিয়ে প্রবাহ চালনা করে তখন কোষের প্রান্তীয় ভোল্ট হচ্ছে রোধকের মধ্য দিয়ে প্রবাহ চালনার জন্য প্রয়োজনীয় বিভব পার্থক্য। এটি কোষের তড়িচ্চালক শক্তির চেয়ে ছোট এবং এই দুইয়ের পার্থক্যই হচ্ছে 'হারান ভোল্ট', যা কোষের অভ্যন্তরীণ রোধের মধ্য দিয়ে প্রবাহ চালনার জন্য প্রয়োজনীয় বিভব পার্থক্য নির্দেশ করে।

২০.১০। তড়িৎ পরিবাহিতা
Electric Conductance

ও'মের সূত্র থেকে আমরা জানি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোনো পরিবাহকের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎপ্রবাহ এর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সমানুপাতিক। অর্থাৎ কোন পরিবাহকের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য V হলে এর মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ

$$I \alpha V$$

বা, $I = GV$

এখানে G সমানুপাতিক ধ্রুবক। একে পরিবাহকের পরিবাহিতা বলে।

$$\therefore G = IV$$

পরিবাহিতার একক সিমেন্স (Siemens)। প্রকৃতপক্ষে কোনো পরিবাহকের তড়িৎ পরিবাহিতা এর রোধের বিপরীত সংখ্যা। অর্থাৎ রোধ R হলে,

$$G = \frac{1}{R}$$

কোনো পরিবাহকের রোধ 0.5Ω হলে এর পরিবাহিতা,

$$G = \frac{1}{0.5\Omega} = 2\Omega^{-1} = 2S$$ ।

কোনো পরিবাহকের পরিবাহিতার মান নির্ভর করে পরিবাহকের উপাদান এবং তাপমাত্রার ওপরে। সাধারণভাবে সকল ধাতুই ভালো পরিবাহক অর্থাৎ ধাতব পদার্থের তড়িৎ পরিবাহিতা বেশি। আবার সকল ধাতুর পরিবাহিতা সমান নয়। যেমন রুপার পরিবাহিতা সবচেয়ে বেশি। আবার সিলিকন, জার্মেনিয়াম ইত্যাদির পরিবাহিতা সাধারণ তাপমাত্রায় খুবই সামান্য। এদেরকে অর্ধপরিবাহী (semiconductor) বলে। তাপমাত্রা বাড়লে প্রায় সকল পরিবাহকেরই পরিবাহিতা হ্রাস পায় এবং রোধ বৃদ্ধি পায়। তবে এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যেমন সিলিকন, জার্মেনিয়াম ইত্যাদি অর্ধপরিবাহী ধাতুর তাপমাত্রা বাড়লে এদের পরিবাহিতা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। কার্বন অর্ধপরিবাহী না হলেও তাপমাত্রার সাথে এর পরিবাহিতা বৃদ্ধি পায়।

২০.১১। রোধ
Resistance

তড়িৎপ্রবাহ মানে ইলেকট্রনের প্রবাহ। কোনো পরিবাহকের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রন নিম্ন বিভব থেকে উচ্চ বিভবের দিকে চলার সময় পরিবাহকের অভ্যন্তরস্থ অণু–পরমাণুর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ফলে এর গতি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং তড়িৎপ্রবাহ বিঘ্নিত হয়। পরিবাহকের এই ধর্মকে রোধ বলে। সুতরাং বলা যায় যে, পরিবাহকের যে ধর্মের জন্য এর মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ বিঘ্নিত হয় তাকে রোধ বলে।

ব্যাখ্যা : ও'মের সূত্র $I = \frac{V}{R}$ থেকে পাওয়া যায়, নির্দিষ্ট তাপমাত্রায়

$$R = \frac{V}{I} \quad \text{.... ....} \quad (২০.৩)$$

অর্থাৎ নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো পরিবাহকের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য ও প্রবাহের অনুপাত দ্বারা ঐ তাপমাত্রায় ঐ পরিবাহকের রোধ পরিমাপ করা হয়।

একক : রোধের একক ও'ম। একে গ্রিক অক্ষর Ω দ্বারা সূচিত করা হয়। (২০.৩) সমীকরণ থেকে দেখা যায় যে, $I = 1A$ এবং $V = 1V$ হলে $R = 1\Omega$ হয়। অর্থাৎ

যে পরিবাহকের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য এক ভোল্ট তার মধ্য দিয়ে যদি এক অ্যাম্পিয়ার তড়িৎপ্রবাহ চলে সেই পরিবাহকের রোধকে এক ও'ম বলে। $\therefore 1\Omega = 1VA^{-1}$

কোনো পরিবাহকের রোধ 100Ω বলতে বুঝায় এর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য $100V$ হলে এর মধ্য দিয়ে $1A$ তড়িৎপ্রবাহ চলবে।

বড় মানের রোধ পরিমাপের জন্য কিলোও'ম ($K\Omega$) এবং মেগাও'ম ($M\Omega$) একক ব্যবহার করা হয়। $1K\Omega = 1000\Omega$ বা, $10^3\Omega$ এবং $1M\Omega = 10^6\Omega$

২০.১২। মানবদেহের রোধ

গায়ের চামড়া শুকনো থাকলে মানবদেহের রোধের পরিমাণ প্রায় $50\ K\Omega$ থাকে। কিন্তু চামড়া ভেজা থাকলে এর রোধ অনেক কমে প্রায় $10\ K\Omega$ হয়। সুতরাং ভেজা অবস্থায় শরীরের রোধ কম হওয়ায় এর মধ্য দিয়ে বেশি প্রবাহ চলতে পারে। কোনো ত্রুটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক সুইচ, বালব, পাখা, হিটার, ইস্ত্রি, টেলিভিশন প্রভৃতি থেকে দেহের মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ মাটিতে চলে যায়। একে আমরা বৈদ্যুতিক শক্ (shock) বলি। যদি তড়িৎ প্রবাহ মাটিতে চলে না যেত তাহলে শক অনুভব করতাম না। সুতরাং ভেজা অবস্থায় কোনো বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম স্পর্শ করা বিপজ্জনক এবং এই কারণে ভেজা মাটিতে খালি পায়ে দাঁড়িয়ে সুইচ নাড়াচাড়া করা উচিত নয়। কাঠ বিদ্যুৎ অপরিবাহী বলে সাধারণত কাঠের উপর দাঁড়িয়ে বৈদ্যুতিক লাইনে কাজ করা হয়। কাঠ ভেজা হলে তড়িতাহিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু শুকনো কাঠের উপর দাঁড়িয়ে যদি তড়িৎপ্রবাহের দুটি তারের প্রান্ত স্পর্শ করা হয় তাহলে শক লাগবে। এজন্য হাতে রাবারের দস্তানা পরা উচিত।

আমরা অনেক সময় রাস্তার উচ্চ ভোল্টেজের কোনো বৈদ্যুতিক লাইনে নিরাপদে কোনো পাখিকে বসে থাকতে দেখি। পাখিটি শক লাভ করে না– কারণ বর্তনী সম্পূর্ণ না হওয়ায় পাখির ভিতর দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হয় না। কিন্তু যদি পাখিটি

অন্য তার স্পর্শ করে কিংবা ভূসংযুক্ত কোনো পরিবাহীর সংস্পর্শে আসে, তাহলে বর্তনী সম্পূর্ণ হবে এবং তার ভিতর দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হবার ফলে পাখিটি মরে যাবে। বাদুড় বা অন্যান্য যে সকল পাখিকে বৈদ্যুতিক তারে মৃত অবস্থায় ঝুলতে দেখা যায় তাদের ক্ষেত্রে এই ঘটনাই ঘটে।

২০.১৩। রোধের সূত্র
Laws of Resistance

কোনো পরিবাহকের রোধ চারটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে, যথা–

১। পরিবাহকের দৈর্ঘ্য
২। পরিবাহকের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল
৩। পরিবাহকের উপাদান এবং
৪। পরিবাহকের তাপমাত্রা

তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকলে পরিবাহকের রোধ এর দৈর্ঘ্য, প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এবং উপাদানের ওপর নির্ভর করে। রোধের এই নির্ভরশীলতার ওপর ভিত্তি করে দুইটি সূত্র আছে। তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকলে রোধের দুইটি সূত্র প্রযোজ্য হয়।

দৈর্ঘ্যের সূত্র : কোনো উপাদানের পরিবাহকের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল অপরিবর্তিত থাকলে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একটি পরিবাহকের রোধ এর দৈর্ঘ্যের সমানুপাতে পরিবর্তিত হয়।

পরিবাহকের দৈর্ঘ্য L, প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল A এবং রোধ R হলে, এই সূত্রানাসারে,

$R \alpha L$, যখন A অপরিবর্তিত থাকে।

ব্যাখ্যা : এই সূত্রানুসারে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একই পদার্থের তৈরী সুষম প্রস্থচ্ছেদের ভিন্ন ভিন্ন দৈর্ঘ্যের তারের রোধ ভিন্ন ভিন্ন হবে। পরিবাহকের দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ হলে রোধও দ্বিগুণ হবে। সুষম প্রস্থচ্ছেদের $4m$ দৈর্ঘ্যের কোনো পরিবাহকের রোধ যদি 100Ω হয় তাহলে একই উপাদানের একই প্রস্থচ্ছেদ বিশিষ্ট $8m$ দৈর্ঘ্যের পরিবাহকের রোধ হবে 200Ω। পরিবাহকটিকে মাঝখানে কেটে প্রতিটি দুই মিটার দৈর্ঘ্যের দুটি অংশে ভাগ করলে প্রত্যেক ভাগের রোধ 50Ω হবে।

প্রস্থচ্ছেদের সূত্র : নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট উপাদানের পরিবাহকের দৈর্ঘ্য অপরিবর্তিত থাকলে পরিবাহকের রোধ এর প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ

$R \alpha \frac{1}{A}$, যখন L ধ্রুব থাকে।

ব্যাখ্যা : এই সূত্রানুসারে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একই পদার্থের তৈরি সমান দৈর্ঘ্যের কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের পরিবাহকের রোধ ভিন্ন ভিন্ন হবে। অর্থাৎ একই উপাদানের এবং একই দৈর্ঘ্যের মোটা তারের চেয়ে চিকন তারের রোধ বেশি হবে। অর্থাৎ মোটা তারের মধ্য দিয়ে চিকন তারের চেয়ে বেশি ও সহজে তড়িৎ প্রবাহিত হবে। তারের প্রস্থচ্ছেদ দ্বিগুণ হলে রোধ অর্ধেক হয়ে যায়। বৃত্তাকার প্রস্থচ্ছেদের কোনো তারের ব্যাসার্ধ দ্বিগুণ বাড়ালে রোধ এক–চতুর্থাংশ হবে।

২০.১৪। আপেক্ষিক রোধ
Specific Resistance

নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট উপাদানের পরিবাহকের রোধ R শুধুমাত্র এর দৈর্ঘ্য L ও প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল A-এর ওপর নির্ভর করে, অতএব, রোধের সূত্র থেকে আমরা পাই,

$$R \alpha \frac{L}{A}$$

বা, $R = \frac{\rho L}{A}$ .... (২০.৪)

এখানে ρ একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক। একে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পরিবাহকের উপাদানের আপেক্ষিক রোধ বলে। (২০.৪) সমীকরণ থেকে দেখা যায় $\rho = \frac{RA}{L}$ । .... (২০.৫)
সুতরাং কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একক দৈর্ঘ্যের একক প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের কোনো পরিবাহকের রোধের সংখ্যামান আপেক্ষিক রোধের সংখ্যামানের সমান।

আপেক্ষিক রোধের একক Ωm।

0^0C তাপমাত্রায় তামার আপেক্ষিক রোধ $1.54\times10^{-8}\Omega$m, এর অর্থ হল 0^0C তাপমাত্রায় 1m দীর্ঘ এবং $1m^2$ প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট তামার বস্তুর রোধ হবে $1.54 \times 10^{-8}\Omega$।

উদাহরণ ২০.২। টেলিফোন তারের উপাদানের আপেক্ষিক রোধ $4.2\times10^{-8}\Omega$m । এর ব্যাসার্ধ 0.1cm হলে 12km লম্বা তারের রোধ কত হবে?

সমাধান :

এখানে,
আপেক্ষিক রোধ, $\rho = 4.2 \times 10^{-8}\Omega m$
তারের ব্যাসার্ধ, $r = 0.1cm = 10^{-3}m$
$\therefore$ তারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল, $A = \pi r^2$
$= 3.14 \times 10^{-6}m^2$
তারের দৈর্ঘ্য, $L = 12km = 12 \times 10^3m$
তারের রোধ, R = ?

আমরা জানি,
$R = \rho \frac{L}{A}$
$= \frac{(4.2 \times 10^{-8}\ \Omega m)(12 \times 10^3 m)}{3.14 \times 10^{-6}\ m^2}$
$= 160.51\Omega$
উ: 160.51Ω

২০.১৫। রোধের সন্নিবেশ
Combination of Resistances

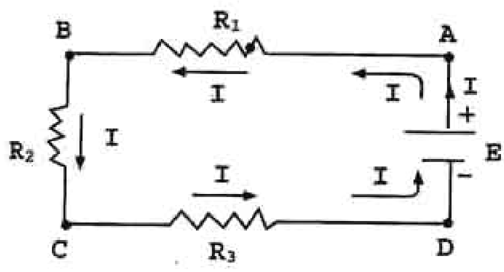
অনেক সময় বিভিন্ন প্রয়োজনে একাধিক রোধকে একত্রে সংযোগ করতে হয়। একাধিক রোধকে একত্রে সংযোগ করাকেই রোধের সন্নিবেশ বলে। দুই ধরনের সন্নিবেশ আমরা ব্যবহার করি, যথা– ১. অনুক্রমিক সন্নিবেশ (Series Combination) এবং ২. সমান্তরাল সন্নিবেশ (Parallel Combination)।

অনুক্রমিক সন্নিবেশ
Series Combination

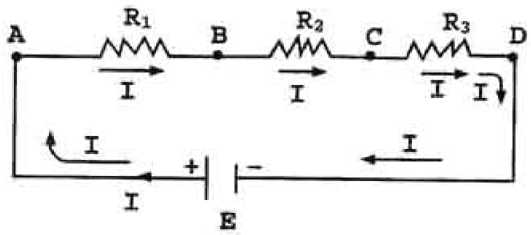
কতকগুলো রোধকে যদি পরপর এমনভাবে সাজানো হয় যে প্রথম রোধের শেষ প্রান্তের সাথে দ্বিতীয় রোধের প্রথম প্রান্ত, দ্বিতীয় রোধের শেষ প্রান্তের সাথে তৃতীয় রোধের প্রথম প্রান্ত এবং এভাবে বাকিগুলোও সংযুক্ত থাকে এবং প্রথম রোধের প্রথম প্রান্ত এবং শেষ রোধের শেষপ্রান্ত একটি বিদ্যুৎ উৎসের সাথে সংযুক্ত থাকে ফলে একই প্রবাহ সব কয়টি রোধের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় তাহলে সেই সংযোগকে রোধের অনুক্রমিক সন্নিবেশ বলে।

(২০.১৪ ক) এবং (২০.১৪ খ) চিত্রে দুইটি অনুক্রমিক সন্নিবেশ দেখানো হয়েছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে R_1, R_2 এবং R_3 রোধকে A এবং D বিন্দুর মাঝে অনুক্রমিকভাবে সংযুক্তি দেখানো হয়েছে।

প্রত্যেক ক্ষেত্রে এখানে A প্রথম রোধের প্রথম প্রান্ত এবং D শেষ রোধের শেষ প্রান্ত, যথাক্রমে তড়িৎ কোষ E- এর ধনাত্মক ও ঋণাত্মক প্রান্তের সাথে পরিবাহক তারের সাহায্যে যুক্ত করা হয়েছে।



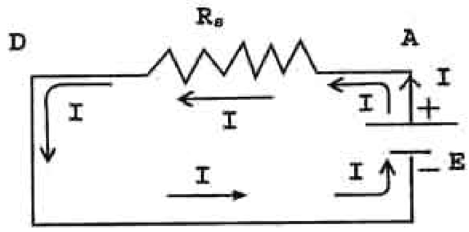
চিত্র : ২০.১৪ (ক)



চিত্র : ২০.১৪ (খ)

তুল্য রোধ নির্ণয় :

রোধের কোনো সন্নিবেশে রোধগুলোর পরিবর্তে সমমানের যে একটি মাত্র রোধ ব্যবহার করলে, বর্তনীর প্রবাহ ও বিভব পার্থক্যের কোনো পরিবর্তন হয় না উক্ত রোধকে ঐ সন্নিবেশের তুল্য রোধ বলে।



চিত্র : ২০.১৪ (ক)

ধরা যাক, A, B, C ও D বিন্দুর বিভব যথাক্রমে V_A, V_B, V_C এবং V_D। ধরা যাক প্রতিটি রোধের মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ হচ্ছে I বর্তনীর বিভিন্ন অংশে ও'মের সূত্র প্রয়োগ করে আমরা পাই, A ও B বিন্দুর মধ্যে বিভব পার্থক্য, $V_A - V_B = IR_1$
B ও C বিন্দুর মধ্যে বিভব পার্থক্য, $V_B - V_C = IR_2$
C ও D বিন্দুর মধ্যে বিভব পার্থক্য, $V_C - V_D = IR_3$ যোগ করে পাই, $V_A - V_D = I(R_1 + R_2 + R_3)$ .... (২০.৬)

এখন R_1, R_2 ও R_3 মানের রোধ তিনটিকে যদি R_S মানের এমন একটি রোধ দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয় যে, এতে বর্তনীতে একই প্রবাহ I চলে এবং A ও D বিন্দুর বিভব পার্থক্য $(V_A - V_D)$ অপরিবর্তিত থাকে তা হলে R_Sই হবে ঐ সমবায়ের তুল্য রোধ। তুল্য রোধের বেলায় ও'মের সূত্র প্রয়োগ করে আমরা পাই,

$$V_A - V_D = IR_S \quad \text{.... .... (২০.৭)}$$

(২০.৬) ও (২০.৭) সমীকরণ তুলনা করে পাওয়া যায়,

$$IR_S = I(R_1 + R_2 + R_3)$$

$$\therefore R_S = R_1 + R_2 + R_3 \quad \text{... ... ... (২০.৮)}$$

তিনটি রোধের পরিবর্তে যদি, R_1, R_2, R_3 .... R_n প্রভৃতি n সংখ্যক রোধ অনুক্রমিক সন্নিবেশে যুক্ত থাকে তাহলে তুল্য রোধ R_S হবে,

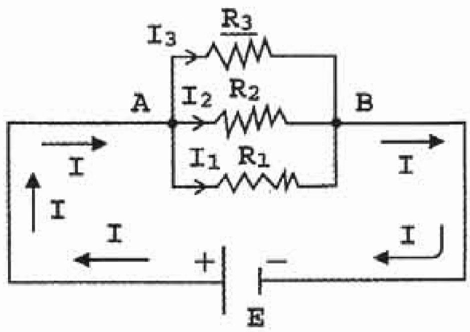
$$\therefore R_S = R_1 + R_2 + R_3 .... + R_n \quad \text{... ... ... (২০.৯)}$$

অর্থাৎ অনুক্রমিক সন্নিবেশে সংযুক্ত সকল রোধের সমষ্টি তুল্য রোধের সমান।

সমান্তরাল সন্নিবেশ
Parallel Combination

কতকগুলো রোধ যদি এমনভাবে সাজানো থাকে যে এদের সবার এক প্রান্ত একটি সাধারণ বিন্দুতে এবং অপর প্রান্তগুলো অন্য একটি সাধারণ বিন্দুতে সংযুক্ত থাকে এবং প্রত্যেকটি রোধের দুই প্রান্তে একই বিভব পার্থক্য বজায় থাকে তাহলে সেই সন্নিবেশকে রোধের সমান্তরাল সন্নিবেশ বলে।

(২০.১৫ক) চিত্রে একটি সমান্তরাল সন্নিবেশ দেখানো হয়েছে। এখানে R_1, R_2 ও R_3 রোধগুলোর এক প্রান্ত A বিন্দুতে এবং অপর প্রান্ত B বিন্দুতে যুক্ত করা হয়েছে।



চিত্র : ২০.১৫ (ক)

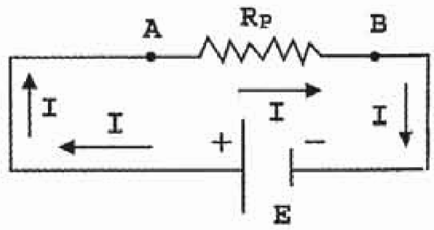
ধরা যাক, A ও B বিন্দুর বিভব যথাক্রমে V_A ও V_B এবং $V_A > V_B$। বর্তনীর মূল প্রবাহ I, A বিন্দুতে এসে তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে R_1, R_2 ও R_3 এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পুনরায় B বিন্দুতে মিলিত হয়। ধরা যাক, R_1, R_2 ও R_3 এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত প্রবাহের মান যথাক্রমে I_1, I_2 এবং I_3।

$$\therefore I = I_1 + I_2 + I_3 \quad \ldots\ldots \quad (২০.১০)$$

A ও B বিন্দুর মধ্যে তিনটি শাখায় ও'মের সূত্র প্রয়োগ করে আমরা পাই,

$$I_1 = \frac{V_A - V_B}{R_1}, I_2 = \frac{V_A - V_B}{R_2} \text{ এবং}$$

$$I_3 = \frac{V_A - V_B}{R_3}$$



চিত্র : ২০.১৫ (খ)

(২০.১০) সমীকরণে I_1, I_2 ও I_3–এর মান বসিয়ে

$$I = \frac{V_A - V_B}{R_1} + \frac{V_A - V_B}{R_2} + \frac{V_A - V_B}{R_3}$$

$$\text{বা, } I = (V_A - V_B)\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right) \ldots \ldots \quad (২০.১১)$$

এখন R_1, R_2, R_3 মানের রোধ তিনটির পরিবর্তে যদি R_p মানের এমন একটি রোধ বর্তনীতে সংযুক্ত করা হয় যেন A ও B বিন্দুর বিভব পার্থক্য $(V_A - V_B)$–এর কোনো পরিবর্তন হয় না এবং R_p–এর মধ্য দিয়ে মূল প্রবাহ I প্রবাহিত হয়, তাহলে R_pই হবে ঐ সন্নিবেশের তুল্য রোধ (চিত্র ২০.১২খ)। তুল্য রোধের বেলায় ও'মের সূত্র প্রয়োগ করে আমরা পাই,

$$I = \frac{V_A - V_B}{R_P} \quad \ldots \ldots \quad (২০.১২)$$

(২০.১১) ও (২০.১২) সমীকরণের তুলনা থেকে পাওয়া যায়,

$$\frac{V_A - V_B}{R_P} = (V_A - V_B)\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_1}\right)$$

$$\text{বা, } \frac{1}{R_P} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \quad \ldots \ldots \quad (২০.১৩)$$

তিনটি রোধের পরিবর্তে যদি R_1, R_2, R_3............R_n প্রভৃতি n সংখ্যক রোধ সমান্তরাল সন্নিবেশে সজ্জিত থাকে, তাহলে তুল্য রোধ R_p নিম্নোক্ত সমীকরণ থেকে পাওয়া যায়,

$$\frac{1}{R_P} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \ldots\ldots + \frac{1}{R_n} \quad \ldots \ldots \quad (২০.১৩ক)$$

অর্থাৎ সমান্তরাল সংযোগে সজ্জিত প্রতিটি রোধের বিপরীত রাশির সমষ্টি তুল্য রোধের বিপরীত রাশির সমান। সমান্তরাল সংযোগ সজ্জিত দুই বা ততোধিক রোধের তুল্য রোধ সংযোগের যে কোনো রোধের চেয়ে, এমনকি সবচেয়ে ছোট রোধের চেয়েও, ছোট হয়।

গাণিতিক উদাহরণ ২০.৩। একটি মোটর গাড়ির হেড লাইটের ফিলামেন্টের মধ্য দিয়ে 0.6A তড়িৎ প্রবাহিত হচ্ছে। এর প্রান্তদ্বয়ের বিভব পার্থক্য 12V হলে, ফিলামেন্টের রোধ কত?

সমাধান :

আমরা জানি,

$$I = \frac{V}{R}$$

বা, $R = \frac{V}{I}$

$= \frac{12V}{0.6A}$

$= 20\Omega$

উ: 20Ω

এখানে,
প্রবাহ, I = 0.6A
বিভব পার্থক্য, V = 12V
রোধ, R = ?

গাণিতিক উদাহরণ ২০.৪। একটি বৈদ্যুতিক ইস্ত্রির রোধ 50Ω। এর মধ্য দিয়ে 4.2A তড়িৎ প্রবাহিত হচ্ছে। এর উভয় প্রান্তের বিভব পার্থক্য নির্ণয় কর।

সমাধান :

আমরা জানি,

$V = IR$

$= (4.2A) \times (50\Omega)$

$= 210V$

উ: 210V

এখানে,
ইস্ত্রির রোধ, R = 50Ω
তড়িৎ প্রবাহ, I = 4.2A
বিভব পার্থক্য, V = ?

গাণিতিক উদাহরণ ২০.৫। একটি বৈদ্যুতিক বাল্বের ফিলামেন্টের রোধ 660Ω। এর দুই প্রান্তে বিভব পার্থক্য 220V। এর মধ্য দিয়ে কী পরিমাণ তড়িৎপ্রবাহ চলবে?

সমাধান :

আমরা জানি,

$$I = \frac{V}{R}$$

$$= \frac{220v}{660\Omega} = 0.33A$$

এখানে,
ফিলামেন্টের রোধ, R = 660Ω
বিভব পার্থক্য, V = 220V
তড়িৎপ্রবাহ, I = ?

উ: 0.33A

গাণিতিক উদাহরণ ২০.৬। 5Ω, 10Ω ও 15Ω মানের তিনটি রোধ আছে। এদের তুল্য রোধ নির্ণয় কর (i) যখন অনুক্রমিক সন্নিবেশে সংযুক্ত থাকে। (ii) যখন সমান্তরাল সন্নিবেশে সংযুক্ত থাকে।

সমাধান :

এখানে,
প্রথম রোধ, $R_1 = 5\Omega$
দ্বিতীয় রোধ, $R_2 = 10\Omega$
তৃতীয় রোধ, $R_3 = 15\Omega$
তুল্য রোধ, $R_s = ?$
(ii) সমান্তরাল সন্নিবেশে
তুল্য রোধ, $R_p = ?$

(i) অনুক্রমিক সন্নিবেশে আমরা জানি,
$R_s = R_1 + R_2 + R_3$
$= 5\Omega + 10\Omega + 15\Omega$
$= 30\Omega$

(ii) সমান্তরাল সন্নিবেশে আমরা জানি,

$$\frac{1}{R_P} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$= \frac{1}{5\Omega} + \frac{1}{10\Omega} + \frac{1}{15\Omega}$$

$$= \frac{6+3+2}{30} = \frac{11}{30}\Omega^{-1}$$

$$\therefore R_P = \frac{30}{11}\ \Omega$$

উত্তর : (i) 30Ω (ii) $\frac{30}{11}\ \Omega$

উদাহরণ ২০.৭। একটি তড়িৎকোষের তড়িচ্চালক শক্তি 1.5V। এর সাথে 3Ω এবং 7Ω রোধের দুটি তার অনুক্রমিক সন্নিবেশে সংযুক্ত করা হল। এদের মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহের মান নির্ণয় কর।

সমাধান :

প্রথম রোধ, $R_1 = 3\Omega$

দ্বিতীয় রোধ, $R_2 = 7\Omega$

কোষের তড়িচ্চালক বল, $E = 1.5V$

এখানে, রোধে দুটি অনুক্রমিক সন্নিবেশে সংযুক্ত বলে, তুল্য রোধ

$R_s = R_1 + R_2 = 3\Omega + 7\Omega = 10\Omega$

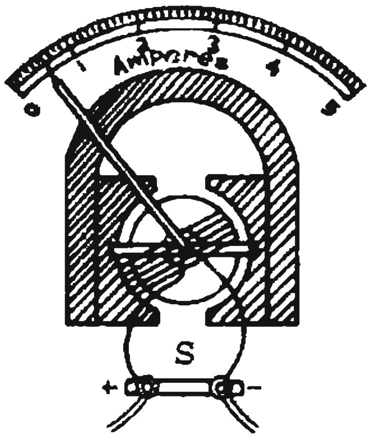
আবার, $I = \frac{E}{R_s} = \frac{1.5V}{10\Omega} = 0.15A$

উত্তর : 0.15A

২০.১৬। অ্যামিটার
Ammeter

যে যন্ত্রের সাহায্যে বর্তনীর তড়িৎপ্রবাহ সরাসরি অ্যাম্পিয়ার এককে পরিমাপ করা যায় তাকে অ্যামিটার বলে। অ্যামিটারকে বর্তনীর সাথে অনুক্রমিক সংযোগে যুক্ত করতে হয়।

এই যন্ত্রে একটি চলকুণ্ডলী জাতীয় গ্যালভানোমিটার থাকে। গ্যালভানোমিটার হচ্ছে সেই যন্ত্র যার সাহায্যে বর্তনীতে তড়িৎপ্রবাহের অস্তিত্ব ও পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। গ্যালভানোমিটার সম্পর্কে তোমরা পরে বিস্তারিত জানবে।



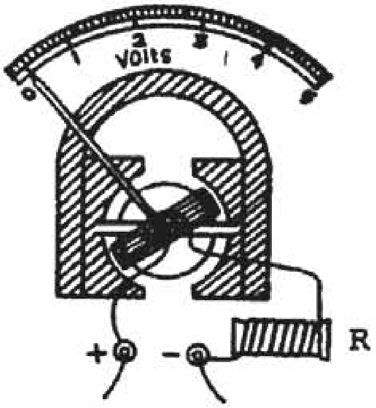
চিত্র : ২০.১৬

এই গ্যালভানোমিটারের কুণ্ডলীর বিক্ষেপ নির্ণয়ের জন্য কুণ্ডলীর তলের সমকোণে একটি সূচক বা কাঁটা লাগানো থাকে। সূচকটি অ্যাম্পিয়ার, মিলিঅ্যাম্পিয়ার বা মাইক্রোঅ্যাম্পিয়ার এককে দাগকাটা একটি স্কেলের উপর ঘুরতে পারে। কুণ্ডলীর সাথে সমান্তরালে একটি স্বল্পমানের রোধ থাকে। যেহেতু অ্যামিটারকে বর্তনীতে অনুক্রমিক সংযোগে যুক্ত করতে হয় তাই এর রোধ বর্তনীতে কার্যকর হয়, ফলে বর্তনীতে প্রবাহের মানের পরিবর্তন হতে পারে। এজন্যে কুণ্ডলীর সাথে সমান্তরালে একটি অল্প মানের রোধ সংযুক্ত করা হয়। এর ফলে অ্যামিটারের তুল্য রোধ খুব কমে যায় এবং এটি বর্তনীতে সংযুক্ত করলে বর্তনীর প্রবাহের তেমন কোনো পরিবর্তন হয় না।

অ্যামিটার একটি সমান্তরালে অল্পমানের রোধ সংযুক্ত অ্যাম্পিয়ারে দাগাঙ্কিত গ্যালভানোমিটার।

২০.১৭। ভোল্টমিটার
Voltmeter

যে যন্ত্রের সাহায্যে বর্তনীর যে কোনো দুই বিন্দুর মধ্যকার বিভব পার্থক্য সরাসরি ভোল্ট এককে পরিমাপ করা যায় তাকে ভোল্টমিটার বলে। বর্তনীর যে দুই বিন্দুর বিভব পার্থক্য পরিমাপ করতে হবে ভোল্টমিটারকে সেই দুই বিন্দুর সাথে সমান্তরালে সংযুক্ত করতে হয়।



চিত্র ঃ ২০.১৮

এই যন্ত্রে একটি চলকুণ্ডলী জাতীয় গ্যালভানোমিটার থাকে। কুণ্ডলীর বিক্ষেপ নির্ণয়ের জন্য কুণ্ডলী তলের সমকোণে একটি সূচক বা কাঁটা লাগানো থাকে। সূচকটি ভোল্ট এককে দাগাঙ্কিত একটি স্কেলের উপর ঘুরতে পারে। কুণ্ডলীর সাথে অনুক্রমিক সংযোগে একটি উচ্চমানের রোধ সংযুক্ত থাকে। বর্তনীর যে দুই বিন্দুর বিভব পার্থক্য পরিমাপ করতে হয় ভোল্টমিটারটিকে সেই দুই বিন্দুর সাথে সমান্তরালে সংযুক্ত করতে হয়। যেহেতু ভোল্টমিটারটি বর্তনীর দুই বিন্দুর সাথে সমান্তরালে সংযুক্ত করতে হয়, প্রবাহ ভোল্ট মিটারের মধ্য দিয়েও প্রবাহিত হয়, সুতরাং মূল প্রবাহের পরিবর্তন ঘটে। বর্তনীতে মূল প্রবাহের যাতে কোনো পরিবর্তন না হয় সেজন্য এর সাথে অনুক্রমিক সংযোগে একটি উচ্চমানের রোধ যুক্ত করা হয়। এই উচ্চমানের রোধটি মূল বর্তনীর সাথে সমান্তরালে যুক্ত হওয়ায় ভোল্টমিটারের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত নগণ্য মানের তড়িৎ প্রবাহিত হয়। তাত্ত্বিকভাবে ভোল্টমিটারের রোধ অসীম হওয়া উচিত; কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হয় না। তবে রোধের মান যথাসম্ভব বেশি নেওয়া হয়। ভোল্টমিটারকে ভোল্টে দাগাঙ্কিত উচ্চ রোধের গ্যালভানোমিটার হিসেবে ধরা যায়।

২০.১৮। তাড়িতক্ষমতা বা বৈদ্যুতিক ক্ষমতা
Electrical Power

কাজ করার হার অর্থাৎ একক সময়ে কৃত কাজকে ক্ষমতা বলে। কোনো পরিবাহক বা তড়িৎ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে এক সেকেন্ড ধরে তড়িৎপ্রবাহের ফলে যে কাজ সম্পন্ন হয় বা যে পরিমাণ তড়িৎ শক্তি অন্য শক্তিতে (আলো, তাপ, যান্ত্রিক শক্তি ইত্যাদি) রূপান্তরিত হয়, তাকে তাড়িতক্ষমতা বা বৈদ্যুতিক ক্ষমতা বলে।



চিত্র : ২০.১৮

আমরা জানি তড়িৎপ্রবাহ হচ্ছে আধানের প্রবাহ। ধরা যাক, AB পরিবাহকের মধ্য দিয়ে t সময়ে Q পরিমাণ আধান প্রবাহিত হচ্ছে। A ও B বিন্দুদ্বয়ের বিভব পার্থক্য $V_A - V_B = V$; এই আধান স্থানান্তরের জন্য কৃত কাজ W হলে

$W = VQ$

এবং ক্ষমতা, $P = \frac{W}{t} = \frac{VQ}{t}$ .... (২০.১৪)

$\therefore$ তড়িৎপ্রবাহ, $I = \frac{Q}{t}$

$\therefore P = VI$ ... ... (২০.১৫)

পরিবাহকের রোধ R হলে,

আবার ও'মের সূত্র থেকে, $V = IR$

$\therefore P = I^2R$ ... ... (২০.১৬)

$\because I = V/R$

$\therefore$ (২০.১৬) সমীকরণ থেকে $P = \frac{V^2}{R}$

অর্থাৎ $P = VI = I^2R = \frac{V^2}{R}$ ... ... (২০.১৭)

বৈদ্যুতিক ক্ষমতার একক ওয়াট (W) । প্রতিসেকেন্ডে এক জুল কাজ করার ক্ষমতাকে এক ওয়াট বলে।

$\therefore 1W = \frac{1J}{1s} = 1Js^{-1}$

(২০.১৭) সমীকরণে $V = 1V$ এবং $I = 1A$ হলে $P = 1W$ হবে। অর্থাৎ কোনো পরিবাহক বা তড়িৎ যন্ত্রের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য এক ভোল্ট হলে যদি এর মধ্য দিয়ে এক অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ প্রবাহিত হয় তবে ঐ পরিবাহকের বা তড়িৎ যন্ত্রের ক্ষমতা এক ওয়াট। $\therefore 1W = 1V \times 1A$
বৈদ্যুতিক ক্ষমতাকে কিলোওয়াট (kW) এবং মেগাওয়াট (MW) এককেও প্রকাশ করা হয়ে থাকে।
$1kW = 10^3W$ এবং $1MW = 10^6W$।

২০.১৯। তড়িৎ শক্তি
Electric Energy

V বিভব পার্থক্য বিশিষ্ট AB পরিবাহকের ভিতর দিয়ে t সময় ধরে Q আধান পরিবাহিত হলে কৃত কাজে ব্যয়িত শক্তি বা অন্য শক্তিতে (আলো, তাপ, যান্ত্রিক শক্তি ইত্যাদি) রূপান্তরিত তড়িৎ শক্তির পরিমাণ,

$W = VQ$ .... (২০.১৮)

ব্যয়িত শক্তির একক জুল।
(২০.১৮) সমীকরণে $V = 1V$ এবং $Q = 1C$ হলে $W = 1J$ অর্থাৎ কোনো পরিবাহকের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য এক ভোল্ট হলে এর এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে এক কুলম্ব আধান পরিবহণের জন্য ব্যয়িত শক্তিকে এক জুল বলে।
পরিবাহকের মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ I হলে $Q = It$
$\therefore W = VIt$
(২০.১৫) সমীকরণ থেকে, বৈদ্যুতিক ক্ষমতা $P = VI$

$\therefore W = Pt$ .... (২০.১৯)
(২০.১৯) সমীকরণ থেকে, $P = 1$ ওয়াট এবং $t = 1s$ সেকেন্ড হলে, $W = 1$ ওয়াট সেকেন্ড (Ws)। সুতরাং $1J = 1Ws$। অর্থাৎ এক ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন কোনো পরিবাহকের মধ্য দিয়ে এক সেকেন্ড ধরে তড়িৎ প্রবাহিত করলে যে পরিমাণ তড়িৎ শক্তি অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তাকে এক ওয়াট সেকেন্ড বলে।

আবার এক ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন কোনো পরিবাহকের মধ্য দিয়ে এক ঘণ্টা ধরে তড়িৎ প্রবাহিত করলে যে পরিমাণ তড়িৎ শক্তি অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তাকে এক ওয়াট–ঘন্টা (Watt–hour বা W–hr) বলে।

$$1\text{W-h} = 1\text{W} \times 1\text{h}$$
$$= 1\text{W} \times (60 \times 60)\text{s}$$
$$= 3600\ \text{Ws}$$
$$= 3600\ \text{J}$$

আন্তর্জাতিকভাবে সারা বিশ্বে তড়িৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান বাড়িতে, দোকানে, অফিস আদালতে, কলকারখানায় যে তড়িৎ সরবরাহ করে, তার পরিমাণ শক্তির একক অনুযায়ী করে। তড়িৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান কিলোওয়াট ঘণ্টা (Kilowatt hour বা kWh) এককে শক্তি পরিমাপ করে। এই একককে বোর্ড অব ট্রেড ইউনিট (B.O.T Unit) বা সংক্ষেপে শুধু ইউনিট বলে। আমরা যে তড়িৎ বিল পরিশোধ করি তা এই কিলোওয়াট ঘণ্টার জন্য। আমাদের বাড়িতে কত তড়িৎ শক্তি আমরা ব্যয় করি আলো জ্বালাতে, পাখা ঘুরাতে, টি.ভি চালাতে তা দেখার জন্য তড়িৎ বিভাগ থেকে মিটার বসানো থাকে। এই মিটার থেকে প্রত্যেক বাড়িতে কত তড়িৎ শক্তি খরচ হল কিলোওয়াট ঘণ্টা বা B.O.T Unit–এ তা পাওয়া যায়। এই হিসাব অনুসারে তড়িৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান তড়িৎ বিল তৈরি করে থাকে। এই প্রতিষ্ঠান প্রতি এককের একটি মূল্য ধার্য করে। সেই অনুযায়ী আমরা তড়িৎ বিল পরিশোধ করে থাকি। ব্যয়িত তড়িৎ শক্তির খরচ = ব্যয়িত তড়িৎ শক্তির মোট একক × প্রতি এককে খরচ।

B.O.T এককে তড়িৎ শক্তি ব্যয়ের হিসাব

যেহেতু এক কিলোওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন কোনো তড়িৎ যন্ত্র এক ঘণ্টা ধরে যে পরিমাণ তড়িৎ শক্তিকে অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত করে বা ব্যয় করে তাকে 1kWh বা B.O.T একক বলে।

সুতরাং ক্ষমতাকে ওয়াটে এবং সময়কে ঘণ্টায় প্রকাশ করলে, ব্যয়িত শক্তি

$$W = Pt\text{Wh} = \frac{Pt}{1000}\text{kWh} = \frac{Pt}{1000}\text{B.O.T}$$

প্রবাহকে অ্যাম্পিয়ারে, বিভব পার্থক্যকে ভোল্টে এবং সময়কে ঘণ্টায় প্রকাশ করলে,

$$W = VIt\ \text{Wh} = \frac{VIt}{1000}\ \text{kWh} = \frac{VIt}{1000}\ \text{B.O.T}$$

আবার, প্রবাহকে অ্যাম্পিয়ারে, রোধকে ও'মে এবং সময়কে ঘণ্টায় প্রকাশ করলে,

$$W = I^2Rt\ \text{Wh} = \frac{I^2Rt}{1000}\ \text{kWh} = \frac{I^2Rt}{1000}\text{B.O.T}$$

এবং রোধকে ও'মে, বিভব পার্থক্যকে ভোল্টে এবং সময়কে ঘণ্টায় প্রকাশ করলে,

$$W = \frac{V^2}{R}\ t\ \text{Wh} = \frac{V^2t}{1000R}\ \text{kWh} = \frac{V^2t}{1000R}\ \text{B.O.T}$$

$$W = \frac{Pt}{1000}\ \text{k Wh} = \frac{VIt}{1000}\text{kWh} = \frac{I^2Rt}{1000}\text{kWh} = \frac{V^2t}{1000R}\text{kWh} \ldots\ldots (২০.২০)$$

220V–60 W–এর অর্থ

বৈদ্যুতিক আলো পাওয়ার জন্য আমরা যে বালব ব্যবহার করি তার গায়ে দুটি সংখ্যার পাশে V এবং W লেখা থাকে। কোনো বালবের গায়ে 220 V এবং 60 W লেখা থাকলে বোঝা যায়। 220 V বিভব পার্থক্যে বাতিটি সংযুক্ত করলে বাতিটি সবচেয়ে বেশি আলো বিকিরণ করবে এবং প্রতি সেকেন্ড 60 Joule হারে বৈদ্যুতিক শক্তি আলো ও তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হবে।

উদাহরণ ২০.৮। 60 ওয়াটের একটি বালব প্রতিদিন 5 ঘণ্টা করে 30 দিন জ্বালালে কত ইউনিট বিদ্যুৎ শক্তি ব্যয় হবে?

আমরা জানি,

$W = \frac{Pt}{1000}$ kWh

$= \frac{60 \times 5 \times 30}{1000}$ kWh

$= 9$ kWh

এখানে,
ক্ষমতা, P = 60W
সময়, t = (5 × 30)h
=150h
ব্যয়িত শক্তি W = ?

উদাহরণ ২০.৯। একটি বৈদ্যুতিক ইস্ত্রিতে 220V এবং 1000W লেখা আছে। এর রোধ কত? প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ শক্তির মূল্য 2.00 টাকা হলে ইস্ত্রিটি 2 ঘণ্টা চালাতে কত খরচ পড়বে?

আমরা জানি,

$P = \frac{V^2}{R}$

$\therefore R = \frac{V^2}{P} = \frac{(220V) \times (220V)}{1000W}$

$= 48.4\Omega$

ব্যয়িত শক্তি W হলে,

W = Pt

= 1000 W×2h

$= \frac{1000 \times 2}{1000}$ kWh

= 2 kWh

∴মোট খরচ = 2× 2 = 4.00

উঃ 48.4Ω; 4.00 টাকা

এখানে,
বিভব পার্থক্য, V = 220V
ক্ষমতা, P = 1000W
রোধ, R = ?
সময়, t = 2hr
প্রতি এককের খরচ = 2.00/kWh
মোট খরচ, = ?

মোট খরচ = ব্যয়িত তড়িৎ শক্তি × প্রতি এককে খরচ

গাণিতিক উদাহরণ ২০.১০। একটি 100W-220V বালবের রোধ কত এবং এর মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ কত হবে?

আমরা জানি,

$P = \frac{V^2}{R}$

$\therefore R = \frac{V^2}{P}$

$= \frac{220V \times 220V}{100W}$

$= 484\Omega$

আবার, P=VI

$\therefore I = \frac{P}{V} = \frac{100W}{220V} = 0.455A$

উঃ 484Ω এবং 0.455A

এখানে,
বিভব পার্থক্য, V = 220V
ক্ষমতা, P = 100W
রোধ, R = ?
প্রবাহ, I = ?

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বৈদ্যুতিক হিটারের গায়ে লেখা ওয়াট শব্দ দ্বারা বুঝায়–

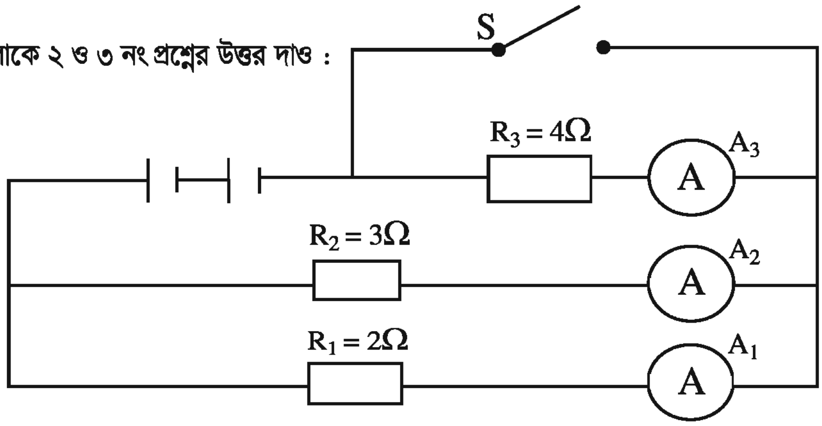
ক. যন্ত্র কর্তৃক ব্যবহৃত তড়িৎ শক্তির হার

খ. ভোল্টেজের মান যা দিয়ে যন্ত্রটি পরিচালিত হবে

গ. যন্ত্রটিতে যে পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহিত হবে তার মান

ঘ. যন্ত্রটি হতে যে পরিমাণ তাপ শক্তি নির্গত হবে তার পরিমাণ

প্রদত্ত বর্তনীর আলোকে ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



চিত্র

২। বর্তনীর চাবি S কে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রাখলে এর তুল্য রোধ কত হবে?

ক. 4.83 ও'ম খ. 5.20 ও'ম

গ. 1.073 ও'ম ঘ. 1.083 ও'ম

৩। যদি চাবি সংযুক্ত থাকে তবে :

i. অ্যামিটার A_1 এবং A_2 -এর পাঠ বৃদ্ধি পাবে

ii. অ্যামিটার A_1 এবং A_2 -এর পাঠের অনুপাত বৃদ্ধি পাবে

iii. অ্যামিটার A_3 -এর পাঠের কোনো পরিবর্তন হবে না

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i ও iii

৪। উচ্চ ভোল্টেজের বৈদ্যুতিক লাইনে পাখিদের নিরাপদে বসে থাকতে দেখা যায় কারণ :

i. পাখিরা ডিম পাড়ে এবং এদের পায়ের তালু বিদ্যুৎ কুপরিবাহী

ii. মাটির সাথে বৈদ্যুতিক লাইন ও পাখির সরাসরি সংযোগ না থাকা

iii. বর্তনী সম্পূর্ণ না হওয়া

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i
খ. iii
গ. i ও ii
ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

এস এস সি পরীক্ষার্থী আঃ রহমান তার নতুন পড়ার ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার জন্য একটি বর্তনীর নকশা প্রণয়ন করে। বর্তনী অনুসারে 100 ওয়াটের একটি বালব, 60 ওয়াটের একটি টিউব লাইট, 75 ওয়াটের একটি ফ্যান সংযোগ দেয়। বর্তনীতে ফিউজ সংযুক্ত করে। একদিন রহমান লক্ষ করল ফ্যান ঘুরছে না। পরীক্ষা করে দেখা গেল ফ্যানে কোনো ত্রুটি ছিল না। কিন্তু 100 ওয়াটের বালবটি ফিউজ হয়ে গেছে। রহিম বর্তনীর নকশা পরিবর্তন করে এবং পড়ার ঘরে নতুন করে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়।

ক. ওয়াট –এর সংজ্ঞা দাও।

খ. রহমান বর্তনীতে কেন ফিউজ ব্যবহার করেছিল ব্যাখ্যা কর।

গ. বর্তনী অঙ্কন করে ফ্যান না ঘোরার কারণ বর্ণনা কর।

ঘ. পরিবর্তিত বর্তনীটি অঙ্কন করে পূর্ববর্তী বর্তনীর সাথে এর তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

একবিংশ অধ্যায়

চৌম্বকবিদ্যা

MAGNETISM

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ চুম্বক, চুম্বকের কিছু কিছু ধর্ম ও ব্যবহার সম্পর্কে অবগত ছিল। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে তড়িৎ এবং চুম্বকত্ব পরস্পর সম্পর্কিত। তড়িৎপ্রবাহ চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে এবং একটি পরিবাহী কুণ্ডলীর কাছে কোনো চুম্বক আনা নেওয়া করলে সেখানে তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি করে। আজকাল তাই তড়িৎবিদ্যা ও চৌম্বকবিদ্যা একত্রে তাড়িতচৌম্বক বিদ্যা শিরোনামে যে কোনো পাঠ্য বই–এ আলোচিত হয়। এ অধ্যায়ে অবশ্য আমরা বিভিন্ন প্রকার চুম্বক, তাদের প্রভাব অঞ্চল তথা চৌম্বক ক্ষেত্র সম্পর্কে আলোচনা করব এবং সবশেষে চুম্বকত্বের আধুনিক মতবাদ উপস্থাপন করব।

২১.১। চুম্বক ও চুম্বকত্ব
Magnet and Magnetism

প্রাচীনকালে মধ্য এশিয়ার ম্যাগনেশিয়া নামক অঞ্চলে এক প্রকার খনিজ পাথর পাওয়া যায়। এগুলো লোহা ও লোহা জাতীয় পদার্থকে আকর্ষণ করে এবং ঐ জাতীয় একখণ্ড পাথরকে মুক্তভাবে ঝুলিয়ে দিলে তা এদিক ওদিক দুলতে দুলতে মোটামুটি উত্তর–দক্ষিণ বরাবর অবস্থান নেয়। ম্যাগনেশিয়া অঞ্চলে পাওয়া যায় বলে এগুলোকে ম্যাগনেটাইট বলা হত। এই দুইটি বিশেষ ধর্মসম্পন্ন পদার্থকে ম্যাগনেট বা চুম্বক বলে। এটি লোহার একটি যৌগিক পদার্থ যার রাসায়নিক সংকেত হল Fe_3O_4।

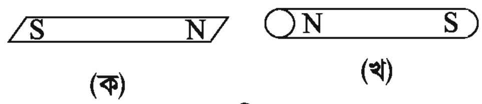
যে বস্তু চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে ফলে অন্য একটি চুম্বক বা চৌম্বক পদার্থের ওপর বল প্রয়োগ করে তাকে চুম্বক বলে। চুম্বকের বিশেষ ধর্ম দুটি হচ্ছে (১) আকর্ষণী ধর্ম ও (২) দিক নির্দেশক ধর্ম। কোনো চুম্বকের আকর্ষণী ও দিক নির্দেশক ধর্মকে এর চুম্বকত্ব বলে। চুম্বকত্ব চুম্বকের একটি ভৌত ধর্ম। এটি কোনো রাসায়নিক ধর্ম নয়। কেননা কোনো বস্তুকে চুম্বকে পরিণত করলে এর কোনো রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না।

২১. ২। প্রাকৃতিক চুম্বক ও কৃত্রিম চুম্বক
Natural and Artificial Magnet

খনিতে যে সকল চুম্বক পাওয়া যায় তাদেরকে প্রাকৃতিক চুম্বক বলে। প্রাকৃতিক চুম্বকের কোনো সুনির্দিষ্ট আকার থাকে না, এগুলো যে কোনো আকৃতির হতে পারে। এদের চুম্বকত্ব স্থায়ী কিন্তু শক্তিশালী হয় না। বর্তমান কালে প্রাকৃতিক চুম্বকের কোনো ব্যবহার নাই। প্রাচীন কালে নাবিকেরা দিক নির্দেশ করার জন্য প্রাকৃতিক চুম্বক ব্যবহার করতেন। এজন্য প্রাকৃতিক চুম্বককে তখন সন্ধানী পাথর (Load Stone) বলা হত। প্রাকৃতিক চুম্বক মধ্য এশিয়া, সাইবেরিয়া, কানাডা, স্ক্যানডিনেভিয়া, উরাল পর্বত ইত্যাদি স্থানে পাওয়া যায়।

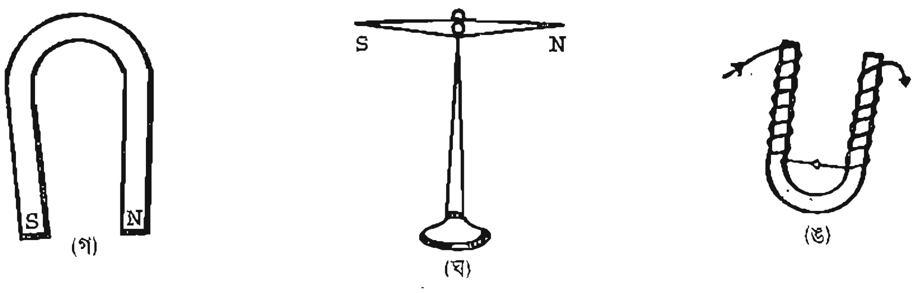
পরীক্ষাগারে কোনো চৌম্বক পদার্থকে (যেমন– লোহা, ইস্পাত, নিকেল) বিশেষ উপায়ে চুম্বকে পরিণত করা হলে তাকে কৃত্রিম চুম্বক বলে। কৃত্রিম চুম্বক নিয়মিত আকারের হয়ে থাকে। শিল্প ও বৈজ্ঞানিক কাজে এগুলো ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন আকারের কৃত্রিম চুম্বক তৈরি করা যায়। নিচে বিভিন্ন আকারের চুম্বকের বিবরণ দেওয়া হল :

দণ্ড চুম্বক : এটি আয়তকার বা বৃত্তাকার প্রস্থচ্ছেদের সুষম চুম্বকদণ্ড [চিত্র ২১.১ (ক) ও (খ)]



চিত্র : ২১.১

অশ্বখুরাকৃতি বা U–আকৃতির চুম্বক : এই প্রকার চুম্বকের আকার ঘোড়ার খুরের মতো বা ইংরেজি U-এর মতো হয়। [চিত্র ২১.১ (গ)]



চিত্র : ২১.১

শলাকা চুম্বক বা চুম্বক শলাকা : এটি খুব হালকা চুম্বকিত ইস্পাতের পাত। এই পাতের দুই মাথা সূঁচালো এবং মধ্যভাগ মোটা বা আগাগোড়া সুষম আকৃতির হতে পারে চিত্র (২১.১ ঘ)।

তাড়িতচুম্বক : এক টুকরা কাঁচা লোহাকে দণ্ডাকারে বা U-আকারে বাঁকিয়ে একে অন্তরিত তামার তারে জড়িয়ে তারের ভিতর দিয়ে তড়িত প্রবাহ চালনা করলে তাড়িতচুম্বক তৈরি হয়। যতক্ষণ তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হয় ততক্ষণই এর চুম্বকত্ব থাকে, তড়িত প্রবাহ বন্ধ করার সাথে সাথে চুম্বকত্ব লোপ পায় (চিত্র ২১.১ ঙ)।

অস্থায়ী বা কোমল ও স্থায়ী চুম্বক বা কঠিন চুম্বক (Temporary or Soft & Permanent or Hard magnet) :

কৃত্রিম চুম্বক দুই ধরনের হয়, যথা– অস্থায়ী বা কোমল চুম্বক (Temporary of Soft) এবং স্থায়ী বা কঠিন চুম্বক (Permanent or Hard magnet)। চুম্বক পদার্থকে কোনো চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে আনলে সেটি চুম্বকে পরিণত হয়। চৌম্বক ক্ষেত্রটি অপসারিত হওয়ার সাথে সাথে যে কৃত্রিম চুম্বকের চুম্বকত্ব বিলুপ্ত হয় তাকে অস্থায়ী চুম্বক বলে। সাধারণত কাঁচা লোহা, নিকেল ও লোহার সংকর ধাতু পারমালয় (Permalloy) অস্থায়ী চুম্বক তৈরি করে। বিদ্যুৎ চুম্বক তৈরি করতে, মটর, জেনারেটর, ট্রানসফরমার ইত্যাদি তৈরিতে অস্থায়ী চৌম্বক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। চৌম্বক ক্ষেত্র অপসারিত হলেও যে কৃত্রিম চুম্বকের চুম্বকত্ব সহজে বিলুপ্ত হয় না তাকে স্থায়ী চুম্বক বলে। প্রথম স্থায়ী চুম্বক তৈরি করা হয়েছিল ইস্পাত দিয়ে। এখন অনেক শক্তিশালী স্থায়ী চুম্বক তৈরি করা হচ্ছে।

এরা প্রধানত দুই ধরনের যথা (ক) সংকর চুম্বক (alloy magnet) (খ) সিরামিক চুম্বক (ceramic magnet)।

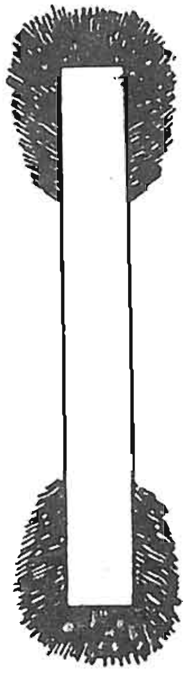
সংকর চুম্বক : এলনিকো (Alnico) সংকর– যা লোহা, নিকেল, কোবাল্ট, তামা এবং অ্যালুমিনিয়ামের মিশ্রণে তৈরি– শক্তিশালী স্থায়ী চুম্বক তৈরি করে। লোহার সংকরের মধ্যে শতকরা ০.৮ ভাগের বেশি কার্বন থাকলে তা স্থায়ী চুম্বক তৈরি করে। সম্প্রতি উদ্ভাবিত সবচেয়ে শক্তিশালী স্থায়ী চুম্বক হচ্ছে নিয়োডিমিয়াম বোরন আয়রন।

সিরামিক চুম্বক : ফেরাইট (Ferrite) নামে পরিচিত এক ধরনের যৌগিক পদার্থ– যা আয়রন অক্সাইড ও বেরিয়াম অক্সাইডের মিশ্রণে তৈরী– সিরামিক চুম্বক তৈরি করে। টেপরেকর্ডার এবং কম্পিউটারের স্মৃতির ফিতায় এই চুম্বক বহুল ব্যবহৃত হয়।

২১.৩। চৌম্বক মেরু
Magnetic Pole

একটি চুম্বককে লোহার গুঁড়ার মধ্যে ডুবালে দেখা যায় যে চুম্বকের গায়ে লোহার গুঁড়া লেগে আছে। চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে বলে এরকম হয়। কিন্তু লোহার গুঁড়া চুম্বকের গায়ে সব জায়গায় সমানভাবে লাগে না। চুম্বকের দুই

প্রান্তের কাছাকাছি স্থানে লোহার গুঁড়া সবচেয়ে বেশি লেগে থাকে (চিত্র ২১.২)। প্রান্ত থেকে চুম্বকের মধ্যভাগের দিকে আকৃষ্ট লোহার গুঁড়ার পরিমাণ কমতে থাকে এবং মধ্যস্থলে কোনো লোহার গুঁড়াই লেগে থাকে না। এ থেকে বোঝা যায় চুম্বকের প্রান্তের কাছাকাছি স্থানে এর আকর্ষণ ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি এবং মাঝখানের দিকে কমতে থাকে, ঠিক মধ্যস্থলে কোনো আকর্ষণ ক্ষমতাই থাকে না। কোনো চুম্বকের দুই প্রান্তের কাছাকাছি যে সংকীর্ণ অঞ্চলে আকর্ষণ ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি তাদেরকে চুম্বকের মেরু বা চৌম্বক মেরু বলে। মুক্তভাবে সাম্যাবস্থায় অবস্থিত কোনো চুম্বকের যে মেরু সর্বদা পৃথিবীর উত্তরদিকে মুখ করে থাকে তাকে উত্তর–সন্ধানী মেরু বা উত্তর মেরু বা N-pole আর যে মেরু সর্বদা দক্ষিণ দিকে মুখ করে থাকে তাকে দক্ষিণ সন্ধানী মেরু বা দক্ষিণ মেরু বা S-pole বলে। চুম্বকের সমধর্মীয় মেরু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং বিপরীত ধর্মীয় মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে। পৃথিবী একটি চুম্বকের ন্যায় আচরণ করে। পৃথিবীর ভৌগোলিক উত্তর মেরু আসলে পৃথিবীর চৌম্বক দক্ষিণ মেরু এবং ভৌগোলিক দক্ষিণ মেরু চৌম্বক উত্তর মেরু। এ জন্যই চুম্বকের উত্তর মেরু পৃথিবীর ভৌগোলিক উত্তর মেরুর দিকে আকৃষ্ট হয়।

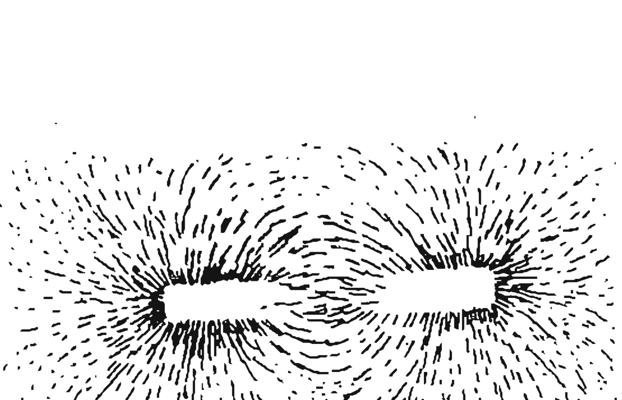


চিত্র : ২১.২

২১.৪। চৌম্বকক্ষেত্র ও বল রেখা
Magnetic Field and Magnetic Lines of Force

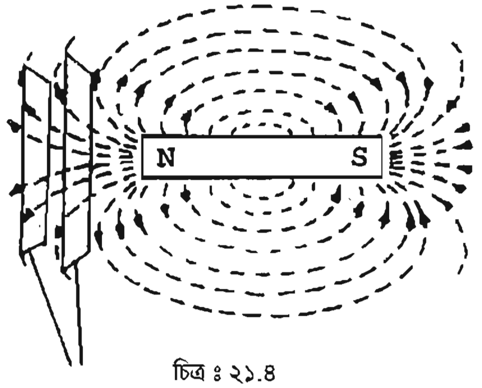
একটি দন্ড চুম্বকের উপর একখন্ড শক্ত কাগজ রেখে কাগজের উপর কিছু লোহার গুঁড়া নিয়ে আস্তে আস্তে টোকা দিলে দেখা যাবে যে লোহার গুঁড়াগুলো গায়ে গায়ে লেগে কতকগুলো বক্ররেখার আকারে সজ্জিত হয়ে চুম্বকের এক মেরু থেকে অন্য মেরু পর্যন্ত চলে গেছে (চিত্র ২১.৩)। চুম্বককে ঘিরে একটা অদৃশ্য বল লোহার গুঁড়াকে যে বক্ররেখাগুলোর আকারে বিন্যস্ত করে তাদেরকে চৌম্বক বলরেখা বলে। এই অদৃশ্য বল চুম্বকের চার দিকে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে বিরাজ করে যাকে ঐ চুম্বকের চৌম্বকক্ষেত্র বলে। ২১.৪ চিত্রে চুম্বক থেকে প্রসারিত রেখাগুলো চৌম্বক ক্ষেত্র নির্দেশ করছে। চৌম্বক ক্ষেত্রের যেখানে বলরেখাগুলো বেশি সংখ্যায় রয়েছে সেখানে চৌম্বক ক্ষেত্র বেশি প্রবল আর যেখানে বলরেখাগুলো পরস্পর থেকে বেশি দূরে রয়েছে সেখানে ক্ষেত্র দুর্বল। স্পষ্টতই চুম্বকের দুই প্রান্তে চৌম্বকক্ষেত্র সবচেয়ে শক্তিশালী।

চিত্র ২১.৪ থেকে আরো দেখা যায় যে চুম্বকের প্রান্ত থেকে যত দূরে যাওয়া যায় বলরেখাগুলোর মধ্যবর্তী দূরত্ব তত বেড়ে যায় অর্থাৎ চুম্বক থেকে দূরত্ব বাড়ার সাথে সাথে চৌম্বক ক্ষেত্রও দুর্বল হতে থাকে। চুম্বকের চারদিকে যে অঞ্চল জুড়ে বল রেখা ক্রিয়াশীল থাকে তাকে চৌম্বক ক্ষেত্র বলে।



চিত্র : ২১.৩

কোনো চুম্বকের চৌম্বক ক্ষেত্রে একটি উত্তর মেরু স্থাপন করলে এই উত্তর মেরুটি ঐ চুম্বকের উত্তর মেরুর জন্য একটা বিকর্ষণ বল অনুভব করে এবং দক্ষিণ মেরুর জন্য একটি আকর্ষণ বল অনুভব করে এবং মেরুটি মুক্ত হলে লব্ধি বরাবর একটা নির্দিষ্ট রেখা বরাবর চলে। এই রেখাই চৌম্বক বল রেখা। মুক্তাবস্থায় স্থাপিত বিচ্ছিন্ন উত্তর মেরু যে পথে পরিভ্রমণ করে তাকে চৌম্বক বল রেখা বলে। চৌম্বক ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে বলরেখার সাথে অঙ্কিত স্পর্শক ঐ বিন্দুতে চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক এবং বলরেখার সাথে লম্বভাবে অবস্থিত একক ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত বলরেখার সংখ্যা চৌম্বক ক্ষেত্রের তীব্রতার মান নির্দেশ করে।



চিত্র ঃ ২১.৪

চৌম্বক বল রেখা বদ্ধ বল রেখা। বল রেখাগুলো চুম্বকের উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরুর দিকে যায় বলে ধরা হয়। বল রেখাগুলো পরস্পরের ওপর আড়াআড়ি চাপ দেয়, ফলে দুইটি বল রেখার মধ্যে বিকর্ষণ হয়। দুটি বলরেখা কখনো পরস্পরকে ছেদ করে না। চৌম্বক বল রেখা উত্তর মেরু থেকে চৌম্বক পৃষ্ঠের সাথে লম্বভাবে বের হয় আর দক্ষিণ মেরুতে চৌম্বক পৃষ্ঠের সাথে লম্বভাবে প্রবেশ করে।

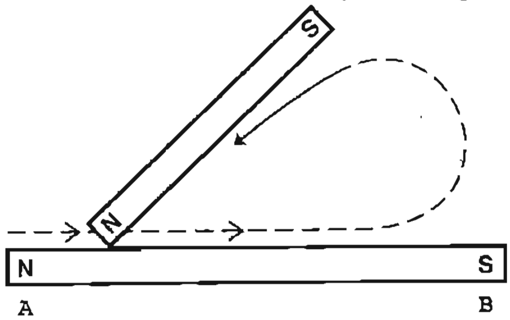
কম্পাস কাঁটার সাহায্যে চৌম্বক বল রেখা অঙ্কন
(Ploting of magnetic lines of force by compass Needle)

একটি ছোট কম্পাস কাঁটার সাহায্যে কোনো চৌম্বক ক্ষেত্রের বল রেখার চিত্র আঁকা যায়। (ব্যবহারিক অংশ দ্রষ্টব্য)

২১.৫। চৌম্বক ও অচৌম্বক পদার্থ
Magnetic & Non-Magnetic Materials

চৌম্বক ধর্ম অনুসারে পদার্থকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়, যথা– চুম্বক, চৌম্বক পদার্থ ও অচৌম্বক পদার্থ। চুম্বক হচ্ছে এমন বস্তু যা চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে ফলে চুম্বকের আকর্ষণী ও দিক নির্দেশক ধর্ম আছে। যে সকল পদার্থকে চুম্বক আকর্ষণ করে এবং যাদেরকে চুম্বকে পরিণত করা যায় তাদেরকে চৌম্বক পদার্থ বলে। সব থেকে সাধারণ চৌম্বক পদার্থ হচ্ছে লোহা ও লোহার যৌগ এবং সেইসব সংকর ধাতু যার মধ্যে লোহা বা ইস্পাত আছে। চৌম্বক পদার্থকে ফেরো চৌম্বক বা ফেরোম্যাগনেটিক পদার্থ (ferromagnetic materials) বলা হয়ে থাকে। ফেরো– শব্দটির অর্থই হচ্ছে লোহা। বেশির ভাগ চৌম্বক পদার্থে লোহা থাকে। লোহা ছাড়া আর যে মৌল চুম্বক দ্বারা দৃঢ়ভাবে আকৃষ্ট হয় তারা হচ্ছে নিকেল এবং কোবাল্ট।

যে সকল পদার্থকে চুম্বক আকর্ষণ করে না এবং যাদেরকে চুম্বকে পরিণত করা যায় না তাদেরকে অচৌম্বক পদার্থ বলে। লোহা, ইস্পাত, নিকেল ও কোবাল্ট বাদে প্রায় সবই অচৌম্বক পদার্থ । সোনা, রূপা, তামা, পিতল, অ্যালুমিনিয়াম, দস্তা, টিন ইত্যাদি ধাতুকে চুম্বক আকর্ষণ করে না–এরা অচৌম্বক পদার্থ। বেশির ভাগ অধাতু, যেমন, কাঠ, কাচ, কাগজ, চামড়া, প্লাস্টিক, রবার ইত্যাদিও চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় না– এরা অচৌম্বক পদার্থ।

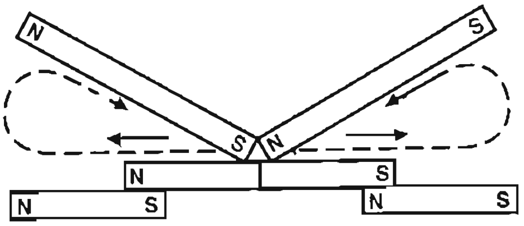


চিত্র : ২১.৫

২১.৬। কৃত্রিম উপায়ে চুম্বক তৈরি
(Artifical Method of Making Magnet)

কোনো চৌম্বক পদার্থকে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে চুম্বকে পরিণত করা যায় :

(ক) এক স্পর্শ পদ্ধতি : যে চৌম্বক পদার্থ AB-কে চুম্বকিত করতে হবে তাকে টেবিলের উপর স্থাপন করে একটি দণ্ড চুম্বক NS- এর এক প্রান্ত দণ্ডের A প্রান্তে স্থাপন করা হয় [চিত্র ২১.৫]। এরপর চুম্বকটিকে চিত্রানুযায়ী আনতভাবে টেনে দণ্ডের অপর প্রান্ত B-তে নেওয়া হয়। এরপর চুম্বকটি উঠিয়ে কয়েক বার এই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করা হয় কিন্তু সব সময়ই A প্রান্ত থেকে শুরু করে B প্রান্তে শেষ করা হয়। ফলে AB দণ্ডটি চুম্বকে পরিণত হয় এবং চুম্বকের যে মেরু দিয়ে টানা হয়েছে B–তে তার বিপরীত জাতীয় মেরুর সঞ্চার হয়। এই পদ্ধতিতে ঘর্ষণ যে প্রান্তে শেষ হয় সেই প্রান্তে ঘর্ষণকারী মেরুর বিপরীত জাতীয় মেরুর সৃষ্টি হয়।



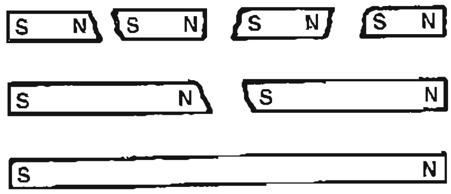
চিত্র : ২১.৬

(খ) পৃথক স্পর্শ পদ্ধতি : পরীক্ষণীয় চৌম্বক পদার্থটিকে টেবিলের উপর দুইটি দণ্ড চুম্বকের বিপরীত মেরুর উপর স্থাপন করা হয় [চিত্র ২১.৬]। এরপর দুটি দণ্ড চুম্বকের বিপরীত মেরু তবে যে চুম্বকদ্বয়ের ওপর পদার্থটিকে রাখা হয়েছে তার অনুরূপ মেরু পরীক্ষণীয় দণ্ডের ঠিক মধ্যস্থলে স্থাপন করা হয় এবং চুম্বকগুলোকে আনত অবস্থায় পরীক্ষণীয় দণ্ডের দুই প্রান্তের দিকে টেনে নেওয়া হয়।

এরপর চুম্বক দুটিকে উঠিয়ে পুনরায় দণ্ডের মাঝখানে আনা হয় এবং আবার একইভাবে ঘষা হয়। এইরূপ কয়েকবার করা হয়। এরপর পরীক্ষণীয় দণ্ডটিকে উল্টিয়ে এই পদ্ধতিতে আরো কয়েকবার ঘর্ষণ করা হয়। দণ্ডের যে প্রান্তে ঘর্ষণ শেষ হয় সেই প্রান্তে ঘর্ষণকারী মেরুর বিপরীত মেরু সৃষ্টি হয়।

এভাবে উৎপন্ন চুম্বক আরো বেশি শক্তিশালী হয়।

উপমেরু : ভুল বা অনিয়মিত পদ্ধতিতে চুম্বকনের সময় চৌম্বক পদার্থের দুই প্রান্তে সম–মেরু এবং মাঝখানে বিপরীত মেরু সৃষ্টি হতে দেখা যায়। চুম্বকের দুই প্রান্ত ব্যতিত অন্যত্র সৃষ্ট এই অনিয়মিত মেরুকে উপমেরু বলা হয়। একে অনুবর্তী মেরুও বলা হয়।

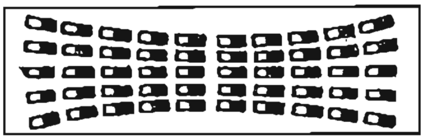


চিত্র : ২১.৭

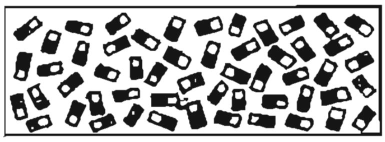
২১.৭। চুম্বকত্বের তত্ত্ব
Theories of Magnetism

আণবিক মতবাদ
Moleculer theory of magnetism

কোনো চুম্বককে কেটে যদি দুই খণ্ড করা হয় তাহলে প্রত্যেক খণ্ডই একটি স্বতন্ত্র চুম্বকের গুণাগুণ প্রদর্শন করবে। এদের প্রত্যেকেরই উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু থাকবে (চিত্র ২১.৭)। চুম্বককে মোট যত খণ্ডই করা হোক না কেন, এই একই ঘটনা ঘটবে অর্থাৎ প্রত্যেকটি খণ্ডই একটি স্বতন্ত্র চুম্বক হিসেবে আচরণ করবে। সুতরাং বলা যায়, যে কোনো চুম্বক দণ্ডই অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুম্বকের সমন্বয়ে গঠিত (চিত্র ২১.৮)। চৌম্বক পদার্থের প্রত্যেক অণুও এক একটি ক্ষুদ্র চুম্বক। কিন্তু তবুও চৌম্বক পদার্থ চুম্বকের ন্যায় আচরণ করে না। তার কারণ এই অণুচুম্বকগুলো চৌম্বক পদার্থের মধ্যে এলোমেলোভাবে সাজানো থাকে অর্থাৎ ক্ষুদ্র অণুচুম্বকগুলো একই দিকে মুখ করে থাকে না (চিত্র ২১.৯)। চৌম্বক পদার্থকে যখন চুম্বকে পরিণত করা হয় তখন এই অণুচুম্বকগুলো একই দিকে মুখ করে সজ্জিত হয় বলে তখন চুম্বকের ন্যায় আচরণ করে।



চিত্র : ২১.৮



চিত্র : ২১.৯

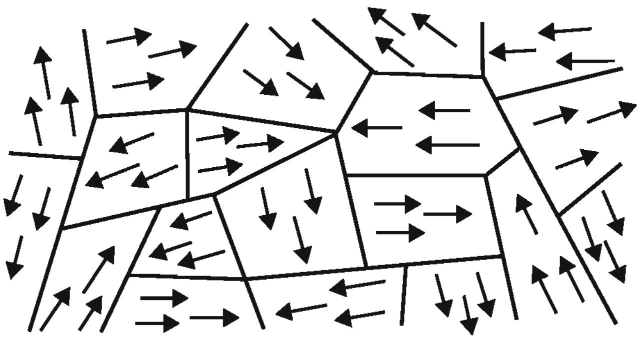
চুম্বকত্বের ডোমেইন তত্ত্ব
Domain Theory of Magnetism

ইলেকট্রন হচ্ছে চার্জযুক্ত কণা। একটা পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে যেমন ঘুরতে থাকে তেমনি লাটিমের মতো নিজের অক্ষের উপরেও পাক খায়। আমরা জানি, চার্জযুক্ত কণার গতির জন্য পরমাণুর মধ্যে প্রত্যেক ইলেকট্রন স্বতন্ত্র চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে। পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনগুলো যে কোনো অভিমুখে ঘূর্ণায়মান থাকে। কোনো পরমাণুতে যদি সমানসংখ্যক ইলেকট্রন বিপরীত অভিমুখে ঘূর্ণনরত থাকে তাহলে একটি ইলেকট্রন দ্বারা উৎপন্ন চৌম্বক ক্ষেত্র বিপরীত অভিমুখে ঘূর্ণায়মান অপর ইলেকট্রনের চৌম্বকক্ষেত্র দ্বারা নাকচ হয়ে যায়। অর্থাৎ ঐ পরমাণুতে কোনো লব্ধি চৌম্বক ক্ষেত্র থাকে না। এধরনের পরমাণু দ্বারা গঠিত পদার্থই হচ্ছে অচৌম্বক পদার্থ। এসকল পদার্থকে খুব শক্তিশালী কোনো চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে স্থাপন করলে চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে এই পদার্থের পরমাণুর ইলেকট্রনের ঘূর্ণন সামান্য প্রভাবিত হয়ে এ সকল পদার্থে খুবই ক্ষীণ চৌম্বকত্ব দেখা যেতে পারে যাকে ডায়াচৌম্বকত্ব (Diamagnetism) বলে। এ ধরনের অচৌম্বক পদার্থকে ডায়াচৌম্বক পদার্থ বলে। পানি, তামা, বিসমাথ, অ্যান্টিমনি ইত্যাদি ডায়াচৌম্বক পদার্থ।

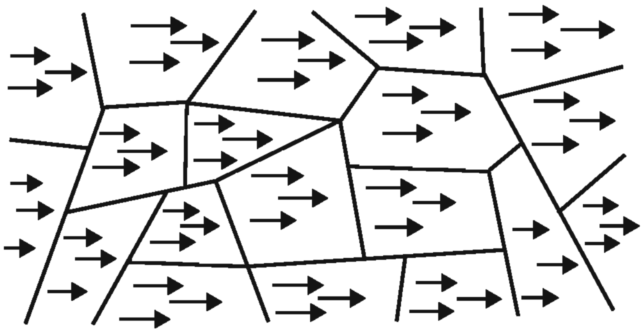
পক্ষান্তরে কোনো পরমাণুতে যদি বিপরীত অভিমুখে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান না হয় তাহলে প্রত্যেক ইলেকট্রন দ্বারা সৃষ্ট চৌম্বকক্ষেত্র পরস্পরের ক্রিয়া নাকচ করতে পারে না। ফলে পরমাণুটি একটি লব্ধ চৌম্বকক্ষেত্র লাভ করে। এরকম পরমাণুটি একটি ক্ষুদ্র চুম্বক হিসেবে আচরণ করে যাকে চৌম্বক দ্বিপোল (magnetic dipole) বলে। এরকম পরমাণু চুম্বক দ্বারা গঠিত পদার্থের ওপর যদি কোনো চৌম্বকক্ষেত্র প্রয়োগ করা না হয় তাহলে চৌম্বক দ্বিপোলগুলো বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকে ফলে পদার্থটিতে কোনো লব্ধ চৌম্বক ক্ষেত্র পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু যদি কোনো চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করা হয় তাহলে এই চুম্বক দ্বিপোলগুলো আংশিকভাবে বিন্যস্ত হয়ে সামান্য পরিমাণ চুম্বকত্ব প্রদর্শন করে। এদেরকে প্যারাচৌম্বক পদার্থ (paramagnetice material) বলে।

ফেরোচৌম্বক পদার্থে (Ferromagnetic material) চৌম্বক পরমাণুগুলোর মধ্যে একটি প্রবল চৌম্বক ক্ষেত্র কাজ করে। একে বলা হয় অভ্যন্তরীণ আণবিক চৌম্বক ক্ষেত্র। এর প্রভাবে পরমাণুগুলো এই চৌম্বক ক্ষেত্র ছাড়াই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিন্যস্ত হয়ে শক্তিশালী চুম্বকে পরিণত হয়। কিন্তু ফেরোচুম্বকের একটি সম্পূর্ণ দণ্ড বা খণ্ডের দেহ জুড়ে চৌম্বক পরমাণুগুলো অবিচ্ছিন্নভাবে বিন্যস্ত হয় না। কারণ সে ক্ষেত্রে প্রচুর চৌম্বক শক্তি এর মধ্যে জমা হবে। বাহ্যিক চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ না করলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুম্বকিত এলাকা বা ডোমেইনে (domain) বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রত্যেকটি ডোমেইন এক একটি স্বতন্ত্র চুম্বকের ন্যায় আচরণ করে। অসংখ্য চৌম্বক ডোমেইন নিয়ে গঠিত এ সকল ফেরোচৌম্বক পদার্থ সাধারণভাবে অচুম্বকিত মনে হয়, কারণ এই ডোমেইনগুলো বিভিন্ন দিক মুখ করে থাকে। লক্ষণীয় যে চুম্বকত্ব একটি ভেক্টর রাশি। ফলে এলোমেলোভাবে থাকলে এদের লব্ধি শূন্য হতে পারে। ফেরোচৌম্বক পদার্থ যখন চুম্বকিত নয় তখনও আসলে এর ডোমেইনগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে চুম্বকিত থাকে।

একটি অচুম্বকায়িত ফেরোচৌম্বক ধাতুখণ্ডে যেমন, এক খণ্ড লোহার ভিতরে এইসব চৌম্বক ডোমেইন সাধারণভাবে অনিয়মিত বা ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকে (চিত্র : ২১.১০ক)। ফলে এই লৌহ খণ্ডের সামগ্রিক চুম্বকত্ব শূন্য অর্থাৎ সাধারণ লোহা চুম্বক হিসেবে আচরণ করে না। কিন্তু এই লৌহ খণ্ডটিকে যদি কোনো বহিঃচৌম্বক ক্ষেত্রে (যেমন সলিনয়েড দ্বারা সৃষ্ট) স্থাপন করা হয় তাহলে ডোমেইনগুলো চৌম্বক ক্ষেত্রের বল রেখার সাথে সমান্তরালে নিজেদেরকে স্থায়ীভাবে বিন্যস্ত করে। ফলে একটি সামগ্রিক চুম্বকায়নের আবির্ভাব ঘটে এবং লৌহখণ্ডটি স্থায়ীভাবে চুম্বকত্ব লাভ করে। প্রযুক্ত চুম্বক ক্ষেত্রটি সরিয়ে নিলেও এর চুম্বকত্ব নষ্ট হয় না। সলিনয়েডের মধ্যে লৌহখণ্ডটি স্থাপন করলে একটি শক্তিশালী চুম্বক তৈরি হয় যাকে তড়িৎচুম্বক বলে। কাঁচা লোহার ডোমেইনগুলোকে



(ক)



(খ)

চিত্র : ২১.১০

বহিঃচৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে সহজে বিন্যস্ত করে চুম্বকে পরিণত করা যায় কিন্তু চৌম্বক ক্ষেত্রের অপসারণে এরা আবার বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ফিরে যায়। ফলে এদের চুম্বকত্বও নষ্ট হয়ে যায়। এজন্যে কাঁচা লোহাকে কলিংবেলের মতো যেখানে অস্থায়ী চুম্বকের প্রয়োজন হয় সেখানে ব্যবহার করা হয়। ইস্পাতের ক্ষেত্রে ডোমেইনগুলো সহজে বিন্যস্ত হতে চায় না। এজন্য বেশ শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রয়োজন হয় এবং একবার চুম্বকে পরিণত হলে সহজে চুম্বকত্ব হারায় না। এ জন্য ভালো স্থায়ী চুম্বক তৈরি করতে ইস্পাতের প্রয়োজন হয়। একটি চুম্বককে তাপ প্রয়োগ করলে বা হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করলে এর চুম্বকত্ব বিনষ্ট হয়। সাধারণ তাপমাত্রায় ফেরোচৌম্বক পদার্থে চৌম্বক ডোমেইনগুলো সুবিন্যস্ত অবস্থা বজায় রাখতে পারে কিন্তু তাপ প্রয়োগ করলে ডোমেইনগুলো পুনরায় এলোমেলো হয়ে যায় এবং চুম্বকত্বের বিলোপ ঘটে। কোনো চুম্বকে তাপ প্রয়োগ করলে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় চুম্বকের চুম্বকত্ব লোপ পায়। এই তাপমাত্রাকে কুরি তাপমাত্রা বলে। বিভিন্ন পদার্থের জন্য এই তাপমাত্রা বিভিন্ন হয়ে থাকে। লোহার কুরি তাপামাত্রা প্রায় 770°C।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। চুম্বকের ডোমেইন তত্ত্ব অনুসারে

i. পরমাণুর দুইটি ইলেকট্রনের ঘূর্ণনের অভিমুখ বিপরীত হলে পরমাণুতে লব্ধি চৌম্বকক্ষেত্র থাকে না,

ii. শক্তিশালী চুম্বকের সাহায্যে অচৌম্বক পদার্থের ইলেকট্রনের ঘূর্ণন দিককে প্রভাবিত করা যায়,

iii. পরমাণুর বিজোড় সংখ্যক ইলেকট্রনের কারণে পদার্থটি একটি ক্ষুদ্র চুম্বকের ন্যায় আচরণ করে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

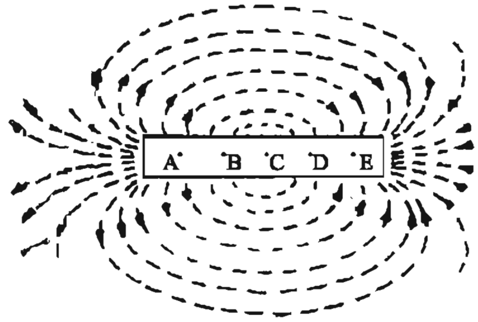
গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

২। নিচের কোনটি ডায়াচৌম্বক পদার্থ ?

ক. লোহা খ. নিকেল

গ. পানি ঘ. ইস্পাত

নিচের চিত্র থেকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



চিত্র

৩। বক্র রেখাগুলোর নাম কী?

ক. চৌম্বক বলরেখা খ. চৌম্বক বক্ররেখা

গ. চৌম্বক সরল রেখা ঘ. চৌম্বক রেখা

৪। কোন বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ বল কাজ করবে?

ক. A ও C খ. B ও D

গ. A ও D ঘ. A ও E

সৃজনশীল প্রশ্ন

ঋতুর খেলনার ভাঙা অংশটুকু ফ্রিজের গায়ে লাগাতেই আটকে গেল। সে সেই ভাঙা অংশটুকু অন্যান্য পদার্থের সংস্পর্শে আনল। কিছু পদার্থের সাথে টুকরাটি আটকে থাকল আবার কিছু পদার্থে আটকে থাকল না। অতি উৎসাহী হয়ে খেলনার ভাঙা অংশটি সে দেয়ালে ছুড়ে মারার পর দেখল ভাঙা অংশটি আর পূর্বের ন্যায় আচরণ করছে না।

ক. খেলনার ভাঙা অংশটি কী?

খ. খেলনার ভাঙা টুকরা সব পদার্থকে আকর্ষণ করল না কেন?

গ. ছুড়ে মারার পর খেলনাটি আর পূর্বের ন্যায় আচরণ করল না কেন, ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ছোড়ার পর খেলনাটির আচরণের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দাও।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

তাড়িতচুম্বক
ELECTROMAGNET

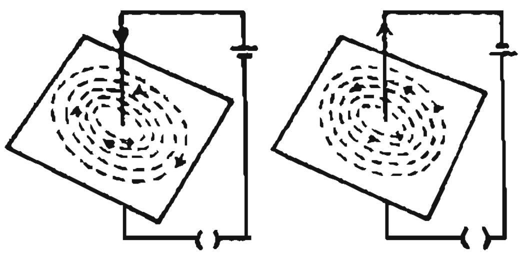
কোনো চুম্বকের চারপাশে যে এলাকা পর্যন্ত চুম্বকটির প্রভাব বিস্তৃত তাকে বলা হয় ঐ চুম্বকের চৌম্বকক্ষেত্র। কোনো বিন্দুতে চৌম্বকক্ষেত্রের অভিমুখ হল, ঐ বিন্দুতে কোনো চুম্বকের উত্তর মেরুকে স্থাপন করলে মেরুটি চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে যে দিকে চলমান বা গতিশীল হয় সে দিক। এরকম একটি মেরু যে পথ অনুসরণ করে বা যে পথে চলে তাকে বলা হয় চৌম্বকক্ষেত্র রেখা বা চৌম্বক বলরেখা। চৌম্বকক্ষেত্রকে এভাবেও সংজ্ঞায়িত করা যায়, যে অঞ্চলে চৌম্বক বলরেখা ক্রিয়াশীল তাকে বলা হয় চৌম্বকক্ষেত্র।

চুম্বকত্বের উৎস শুধু চুম্বকই নয়। পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে, কোনো তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ চালালে এর চারপাশে চৌম্বকক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়।

আমরা এ অধ্যায়ে তড়িৎ প্রবাহজনিত চৌম্বকক্ষেত্র এবং দণ্ডচুম্বক ও সলিনয়েডের চৌম্বকক্ষেত্রের তুলনা, তড়িৎবাহী তারের ওপর চৌম্বকক্ষেত্রের ক্রিয়া, তাড়িতচৌম্বক আবেশ, মোটর ও জেনারেটরের মূলনীতি, তড়িৎ সরবরাহ ও ট্রান্সফরমারের ব্যবহার ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করব।

২২.১। তড়িৎ প্রবাহজাত চৌম্বকক্ষেত্র
Magnetic Field due to Electric Current

ওয়েরস্টেড ১৮২০ সালে আবিষ্কার করেন যে, তড়িৎবাহী তারের সাথে চৌম্বকক্ষেত্র বিজড়িত। কোনো সোজা খাড়া তারের দরুন চৌম্বক ক্ষেত্ররেখা বা বলরেখাগুলো হল তারটিকে ঘিরে কতকগুলো সমকেন্দ্রিক বৃত্ত (চিত্র ২২.১)। এই বৃত্তগুলোর সমতল তারের সাথে লম্ব। তারের কাছাকাছি চৌম্বকক্ষেত্রের প্রাবল্য বেশি, তার থেকে দূরে যেতে থাকলে চৌম্বকক্ষেত্রে প্রাবল্য কমতে থাকে।

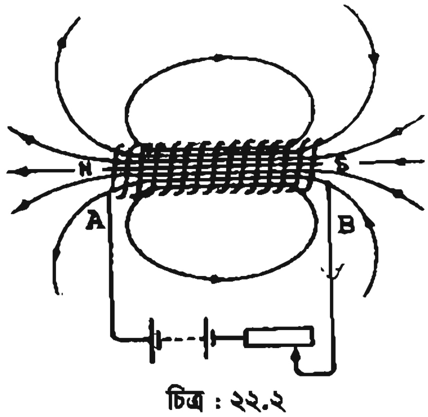


চিত্র : ২২.১ তড়িৎবাহী তারের দরুন চৌম্বকক্ষেত্র

এই চৌম্বকক্ষেত্রের অভিমুখ ডানহাতি নিয়মে বের করা যায়। বৃদ্ধাঙ্গুলি খাড়া রেখে ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ করলে বৃদ্ধাঙ্গুলি যদি তড়িৎপ্রবাহের অভিমুখ নির্দেশ করে তাহলে অন্য আঙ্গুলগুলো দিয়ে চৌম্বক ক্ষেত্রের অভিমুখ নির্দেশিত হবে। চৌম্বক বলরেখাগুলোর দিক তড়িৎপ্রবাহের দিকের (অভিমুখের) ওপর নির্ভর করে। যেমন, সোজা তারে তড়িৎপ্রবাহ খাড়া নিচের দিকে হয়। চৌম্বকক্ষেত্রের বলরেখাগুলো ঘড়ির কাঁটার দিকাভিমুখী হবে। তড়িৎপ্রবাহের দিক পরিবর্তন করলে ক্ষেত্রের অভিমুখও বিপরীতমুখী হয়ে যায়; কিন্তু ক্ষেত্র-প্যাটার্ন বা বিন্যাস একই থাকে। তারটিকে কুণ্ডলী পাকিয়ে সলিনয়েড তৈরি করে চৌম্বকক্ষেত্রের প্রাবল্য বাড়ানো যায়।

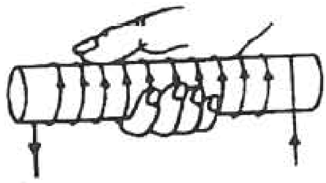
২২.২। সলিনয়েড
Solenoid

সলিনয়েড হল কাছাকাছি বা ঘনসন্নিবিষ্ট অনেকগুলো পেঁচযুক্ত লম্বা বেলনাকার কয়েল বা তারকুণ্ডলী। একটি লম্বা অন্তরিত পরিবাহক তারকে স্প্রিং-এর মতো বহুপাকে ঘনসন্নিবিষ্ট করে সাজালে বা কয়েল তৈরি করলে সলিনয়েড তৈরি হয়। অন্তরিত বেলনাকার চোঙের উপর তার পেঁচিয়ে সলিনয়েড তৈরি করা যেতে পারে। তারের প্রতিটি পাক বেলনের অক্ষের সাথে লম্বভাবে থাকে। (চিত্র : ২২.২)



চিত্র : ২২.২

সলিনয়েড দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ চালালে সলিনয়েডের প্রতিটি প্যাঁচ একটি একক কয়েল হিসাবে কাজ করে এবং চিত্রের মতো চৌম্বকক্ষেত্রের সৃষ্টি করে। এ ছাড়াও প্যাঁচগুলো একত্রে যে চৌম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি করে, তা কোনো দণ্ড চুম্বকের চারদিকের চৌম্বকক্ষেত্রের সদৃশ। কয়েলটি এমনভাবে আচরণ করে যেন এর একপ্রান্তে উত্তর মেরু ও অপর প্রান্তে দক্ষিণ মেরুর সৃষ্টি হয়েছে। কোনো সলিনয়েডের বলরেখার প্রকৃতি ঠিক একটি দণ্ডচুম্বকের বলরেখার মতো। দণ্ডচুম্বকের মতোই সলিনয়েডের দুই প্রান্ত দুই বিপরীত চৌম্বক মেরুর মতো আচরণ করে। সলিনয়েডের যে প্রান্তের দিকে তড়িৎপ্রবাহ ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরে বলে মনে হয় সেই প্রান্তে দক্ষিণ মেরুর সৃষ্টি হয় আর যে প্রান্তে তড়িৎপ্রবাহ ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘোরে বলে মনে হয় সেই প্রান্তে উত্তর মেরুর সৃষ্টি হয়। যখন কোনো চুম্বক শলাকাকে সলিনয়েডের A প্রান্তে আনা হয়, শলাকার দক্ষিণমেরু এর দিকে আকৃষ্ট হয়, শলাকাকে অপরপ্রান্তে (B প্রান্তে) আনা হলে এর উত্তর মেরু B প্রান্তের দিকে আকৃষ্ট হয়। যেন এটি একটি দণ্ড চুম্বক। সলিনয়েডে তড়িৎপ্রবাহের অভিমুখ বিপরীত করলে এর মেরুদ্বয়ও পাল্টে যায় এবং বলরেখাগুলোর অভিমুখ বিপরীতমুখী হয়।



চিত্র : ২২.৩

২২.২.১। সলিনয়েডসৃষ্ট চৌম্বকক্ষেত্রের প্রাবল্য
Intensity of Magnetic Field due to a Soleniod

সলিনয়েডের কোনো বিন্দুর ওপর চৌম্বকক্ষেত্রের প্রাবল্য দুইটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে :

১। **তড়িৎপ্রবাহের মান :** সলিনয়েডে প্রবাহের মান বৃদ্ধি করলে এর চৌম্বকক্ষেত্রের প্রাবল্য বৃদ্ধি পায়।

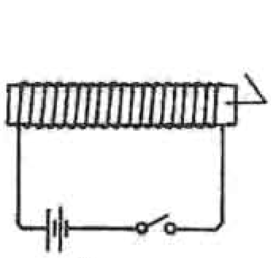
২। **প্রতি একক দৈর্ঘ্যে প্যাঁচ বা পাকের সংখ্যা :** প্রতি একক দৈর্ঘ্যে পাকের সংখ্যা বৃদ্ধি করলে চৌম্বকক্ষেত্রের প্রাবল্য বৃদ্ধি পায়।

২২.২.২। সলিনয়েডের ভিতরকার বস্তুকে চুম্বকায়িতকরণ : তাড়িতচুম্বক।
Magnetization of a body inside a Solenoid : Electromagnet

আমরা জানি যে, সলিনয়েডের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত করলে অধিকাংশ বলরেখা কয়েলের কেন্দ্রে ঘনীভূত হয় এবং সলিনয়েডের চৌম্বকক্ষেত্র দণ্ড চুম্বকের চৌম্বকক্ষেত্রের মতো হয়। সলিনয়েডের ভিতর কোনো লোহার দণ্ড বা পেরেক ঢুকিয়ে সলিনয়েডে তড়িৎপ্রবাহ চালালে দণ্ড বা পেরেকটি চুম্বকে পরিণত হয়। তখন দণ্ড বা পেরেককে বলা হয় তাড়িতচুম্বক। তড়িৎপ্রবাহ বন্ধ করলে দণ্ড বা পেরেক আর চুম্বক থাকে না। তড়িৎপ্রবাহের দিক পরিবর্তন করলে তাড়িতচুম্বকের মেরু বিপরীত হয়ে যায়।

২২.৩। তাড়িতচুম্বকের প্রাবল্যের বৃদ্ধি
Increase of Intensity of Electromagnet

আমরা জানি যে, তড়িৎবাহী সলিনয়েডের ভিতর কোনো লোহার দণ্ড বা পেরেক ঢুকালে তা চুম্বকে পরিণত হয়। আরো একটি লক্ষণীয় ব্যাপার হল লোহার দণ্ড বা পেরেক শুধু চুম্বকেই পরিণত হয় না, সলিনয়েডের নিজের যে চৌম্বকক্ষেত্র রয়েছে তাকেও শক্তিশালী বা প্রবল করে। এর কারণ কী?



তাড়িত চুম্বক

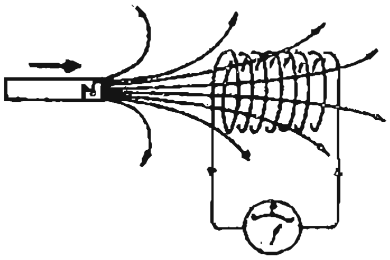
এর কারণ হল, দণ্ড পেরেকটি যখন তাড়িতচুম্বকে পরিণত হয়, তখন এটি তার নিজের চৌম্বকক্ষেত্র তৈরি করে। ফলে সলিনয়েডের চৌম্বকক্ষেত্র ও পেরেকের চৌম্বকক্ষেত্র মিলে

সলিনয়েড থেকে বেশি চৌম্বকক্ষেত্র পাওয়া যায়। তড়িৎপ্রবাহ চলাকালীন এটি বেশ শক্তিশালী চুম্বকে পরিণত হয়। তাড়িত চুম্বকের প্রাবল্য নিম্নোক্তভাবে বাড়ানো যায়।

– সলিনয়েডের তারের ভিতর দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ বাড়িয়ে।

– সলিনয়েডের পাক বা পেঁচের সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

– লোহার দণ্ড বা পেরেককে U-অক্ষরের মতো বাঁকিয়ে মেরু দুইটিকে আরও কাছাকাছি এনে।



চিত্র : ২২.৪

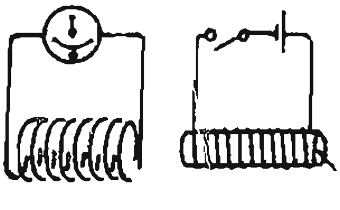
২২.৪। তাড়িতচৌম্বক আবেশ
Electromagnetic Induction

ওয়েরস্টেডের তড়িৎপ্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানীরা চিন্তা করতে থাকেন চৌম্বকক্ষেত্র থেকে তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি করা যায় কি– না? ইংল্যান্ডে মাইকেল ফ্যারাডে, আমেরিকায় জোসেফ হেনরি এবং রাশিয়াতে এইচ. এফ. ই. লেনজ এ বিষয়ে কাজ শুরু করেন এবং তিনজনই পৃথক পৃথকভাবে সাফল্য লাভ করেন। কিন্তু মাইকেল ফ্যারাডে তাঁর পরীক্ষালব্ধ ফলাফল প্রথম প্রকাশ করেন, তাই তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে তাড়িতচৌম্বক আবেশের আবিষ্কর্তা হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। আসলে তাড়িতচৌম্বক আবেশ বর্ণনার আগে আমরা দুইটি পরীক্ষার কথা বলব যা ফ্যারাডে করেছিলেন। এ দুটো পরীক্ষা ফ্যারাডের পরীক্ষা নামে খ্যাত।

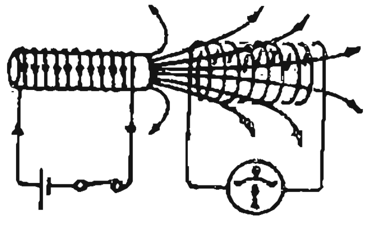
পরীক্ষা–১ : কার্ড বোর্ডের একটি চোঙের গায়ে অন্তরিত তার পেঁচিয়ে তারের দুই প্রান্তে একটি সুবেদী গ্যালভানোমিটার যুক্ত করা হয়। এখন একটি দণ্ড চুম্বকের দক্ষিণ মেরুতে দ্রুত চোঙের ভিতর আনা–নেওয়া করলে গ্যালভানোমিটারের কাঁটার বিক্ষেপ ঘটবে। চুম্বক প্রবেশ করানোর সময় গ্যালভানোমিটারের কাঁটার বিক্ষেপ যে দিকে ঘটবে চুম্বককে বের করানোর সময় বিক্ষেপ ঘটবে তার বিপরীত দিকে।

চুম্বকটিকে স্থির রেখে এবার যদি গ্যালভানোমিটারসহ কুণ্ডলীটিকে চুম্বকের দিকে দ্রুত নেওয়া হয় তাহলেও গ্যালভানোমিটারে ক্ষণিক বিক্ষেপ দেখা যাবে। কুণ্ডলীটিকে চুম্বক থেকে দূরে সরিয়ে নিলে বিক্ষেপ বিপরীত দিকে দেখা যাবে।

পরীক্ষা–২ : অন্তরিত তামার তারের দুটি বদ্ধ কুণ্ডলী নেওয়া হয়। প্রথম কুণ্ডলীতে শুধু একটি সুবেদী গ্যালভানোমিটার সংযুক্ত। দ্বিতীয় কুণ্ডলীতে একটি তড়িচ্চালক শক্তির উৎস, একটি পরিবর্তনশীল রোধ ও একটি টেপা চাবি সংযুক্ত [চিত্র ২২.৫]। যে কুণ্ডলীতে তড়িচ্চালক শক্তির উৎস সংযুক্ত তাকে মুখ্য কুণ্ডলী বলে। আর যে কুণ্ডলীতে গ্যালভানোমিটার সংযুক্ত সেটি গৌণ কুণ্ডলী। মুখ্য কুণ্ডলীতে তড়িৎপ্রবাহ চালালে গৌণ কুণ্ডলীর গ্যালভানোমিটারে ক্ষণিক বিক্ষেপ দেখা যায়। আবার তড়িৎপ্রবাহ বন্ধ করার সময়ও গ্যালভানোমিটারে বিক্ষেপ দেখা যায়। তবে এবার বিক্ষেপ বিপরীত দিকে হয়।



প্রবাহ বন্ধ



প্রবাহ চলছে

চিত্র : ২২.৫

মুখ্য কুন্ডলীর তড়িৎপ্রবাহ ক্রমাগত পরিবর্তন করতে থাকলে গ্যালভানোমিটারে বিক্ষেপ দেখা যাবে। এ ক্ষেত্রে তড়িৎপ্রবাহ বৃদ্ধির সময় বিক্ষেপ যেদিকে হবে তড়িৎপ্রবাহ হ্রাসের সময় বিক্ষেপ তার বিপরীত দিকে হবে।

মুখ্য কুন্ডলীর তড়িৎপ্রবাহ স্থির রেখে যদি কুন্ডলীদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব পরিবর্তন করা হয় তাহলেও গ্যালভানোমিটারে ক্ষণিক বিক্ষেপ দেখা যাবে। দূরত্ব বৃদ্ধি করলে বিক্ষেপ যেদিকে হবে, দূরত্ব হ্রাস করলে বিক্ষেপ তার বিপরীত দিকে হবে।

উপরের পরীক্ষা থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষ করা যায়। গ্যালভানোমিটারে বিক্ষেপ বর্তনীতে তড়িচ্চালক শক্তি তথা তড়িৎপ্রবাহের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। এই তড়িচ্চালক শক্তিকে আবিষ্ট তড়িচ্চালক শক্তি এবং প্রবাহকে আবিষ্ট তড়িৎপ্রবাহ বলে।

চুম্বক ও কুন্ডলীর মধ্যবর্তী আপেক্ষিক গতি বন্ধ হয়ে গেলে গ্যালভানোমিটারে শূন্য বিক্ষেপ দেখা যায়। আপেক্ষিক গতি যত বেশি হয় বিক্ষেপের পরিমাণও তত বৃদ্ধি পায়। সুতরাং বলা যায়, চুম্বক ও কুন্ডলীর মধ্যবর্তী আপেক্ষিক গতি যতক্ষণ থাকে আবিষ্ট তড়িৎপ্রবাহও ততক্ষণ স্থায়ী হয় এবং এর মান আপেক্ষিক গতির মানের ওপর নির্ভর করে।

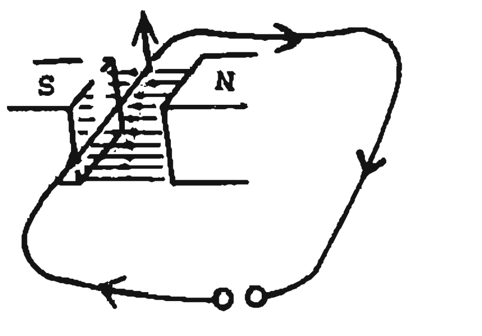
চুম্বকের মেরু পরিবর্তন করলে আবিষ্ট তড়িৎপ্রবাহের দিকও পরিবর্তিত হয়। চুম্বকের মেরু শক্তি বৃদ্ধি করলে আবিষ্ট তড়িৎপ্রবাহের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং কোনো তার বা তার কুন্ডলীর কাছে আমরা যদি কোনো চুম্বককে নাড়াচাড়া করি, বা আনা–নেওয়া করি বা কোনো চুম্বকের নিকট কোনো তার কুন্ডলীকে আনা–নেওয়া করি তাহলে তার কুন্ডলীতে তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন হয়। একে তাড়িতচৌম্বক আবেশ বলে। কোনো তড়িৎবাহী তার বা বর্তনীর নিকট কোনো তার কুন্ডলী আনা–নেওয়া করলেও তার কুন্ডলীতে তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন হয়। একে তাড়িতচৌম্বক আবেশ বলে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, একটি গতিশীল চুম্বক বা তড়িৎবাহী বর্তনীর সাহায্যে অন্য একটি সংবন্ধ বর্তনীতে ক্ষণস্থায়ী তড়িচ্চালক শক্তি ও তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন হওয়ার পদ্ধতিকে তাড়িতচৌম্বক আবেশ বলে। মুখ্য কুন্ডলীতে প্রবাহের সূচনা ও সমাপ্তির সময়ে গৌণ কুন্ডলীতে আবিষ্ট তড়িৎপ্রবাহ দেখা যায়। মুখ্য কুন্ডলীতে তড়িৎপ্রবাহ পরিবর্তন হলেও গৌণ কুন্ডলীতে তড়িৎপ্রবাহ আবিষ্ট হয়।

দ্বিতীয় পরীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, দুইটি কুন্ডলীর মধ্যবর্তী আপেক্ষিক গতি যতক্ষণ বজায় থাকে গৌণ কুন্ডলীতে আবিষ্ট তড়িৎপ্রবাহও ততক্ষণ স্থায়ী হয়।

২২.৫। তড়িৎ প্রবাহবাহী তারের ওপর চুম্বকের প্রভাব
Effect of Magnet on Current Carrying wire

আমরা জানি যে, তড়িৎবাহী তার নিজস্ব একটি চৌম্বকক্ষেত্রের সৃষ্টি করে। শক্তিশালী চুম্বকের বিপরীত মেরুদ্বয়ের মধ্যে সৃষ্ট চৌম্বকক্ষেত্র এবং তড়িৎবাহী তারের চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়া ঘটে। ফলে চিত্রে প্রদর্শিত পরিস্থিতিতে তারটি উপরের দিকে লাফিয়ে ওঠে। তড়িৎপ্রবাহের দিক পরিবর্তন করলে নিচের দিকে নামে। এর ফলে বোঝা যায় যে, একটি বল তারের ওপর কাজ করছে।



নিম্ন ভোল্টেজ তড়িৎ উৎস
চিত্র : ২২.৬

২২.৬। বৈদ্যুতিক মোটর
Electric Motor

তড়িৎবাহী তারের ওপর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে তৈরি হয়েছে বৈদ্যুতিক মোটর।

যে তড়িৎ যন্ত্র তড়িৎ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে

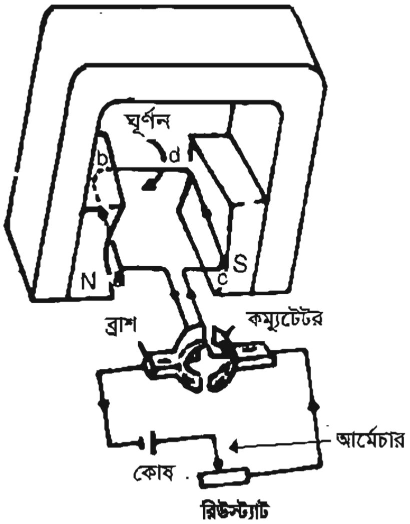
তাকে বৈদ্যুতিক মোটর বা তড়িৎ মোটর বলে। তড়িৎ মোটর দুই প্রকারের; যথা—

(ক) ডি. সি. মোটর

(খ) এ. সি. মোটর

নিচে একটি ডি. সি. মোটরের গঠন ও কার্যপ্রণালি আলোচনা করা হল।

চিত্র ২২.৭ এ একটি ডি. সি. মোটরের গঠন দেখানো হয়েছে। এতে থাকে—



চিত্র : ২২.৭

১. ক্ষেত্র চুম্বক : U–আকৃতির একটি স্থায়ী বা তাড়িতচুম্বক এই যন্ত্রের ক্ষেত্র চুম্বকের কাজ করে।

২. আর্মেচার : কাঁচা লোহার মজ্জার উপর অন্তরিত তামার তার জড়িয়ে আর্মেচার তৈরি করা হয়। আর্মেচার মূলত একটি আয়তকার কুণ্ডলী বা কয়েল। সরল চিত্র অঙ্কনের কারণে চিত্রে লোহার মজ্জা দেখানো সম্ভব হল না।

৩. কমুটেটর : শক্ত তামার কতকগুলো খণ্ড অভ্রের পাতের দ্বারা পরস্পর থেকে অন্তরিত করে কমুটেটর তৈরি করা হয়।

৪. ব্রাস : কার্বন অথবা তামা দ্বারা ব্রাস তৈরি করা হয়।

আর্মেচারের কুণ্ডলীর দুই প্রান্ত কমুটেটরের দুই পাতে সংযুক্ত থাকে। ব্রাসের মাধ্যমে কমুটেটরের সাথে বহিঃবর্তনী সংযুক্ত। বহিঃবর্তনীতে একটি তড়িচ্চালক বলের উৎস ও পরিবর্তনশীল রোধ বা রিউস্ট্যাট থাকে।

ক্রিয়া : বহিঃবর্তনী থেকে আর্মেচার কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে cdba অভিমুখে তড়িৎ প্রবাহিত হলে কুণ্ডলী ঘুরতে শুরু করে। দুইটি বিপরীত মুখী চৌম্বক বলের ক্রিয়ায় কুণ্ডলীতে ঘূর্ণন উৎপন্ন হয়। ঘূর্ণনের অভিমুখ ফ্লেমিং–এর বামহস্ত নিয়ম থেকে পাওয়া যায়। কুণ্ডলীতে তড়িৎ প্রবাহ বাড়ালে ঘূর্ণনের বেগও বৃদ্ধি পায়।

যখন কুণ্ডলীটি ঘুরে তখন এতে অল্প পরিমাণ তড়িচ্চালক শক্তি আবিষ্ট হয়। এই সময় কুণ্ডলীটি ঐ চৌম্বক ক্ষেত্রে ঘুরে চৌম্বক বলরেখার সাথে নিজেকে স্থাপিত করতে চায়। কুণ্ডলীর ঘূর্ণনের সাথে সাথে কমুটেটরও ঘুরে। কুণ্ডলীর তল যখন উল্লম্ব অবস্থায় আসে তখন গতি জড়তার জন্য কুণ্ডলীটি একই দিকে আরো একটু এগিয়ে যায়।

কুণ্ডলীর এ অবস্থায় ব্রাস ও কমুটেটর অংশের মধ্যে স্থান পরিবর্তন হয় ফলে কুণ্ডলীতে তড়িৎপ্রবাহ abdc অভিমুখে ক্রিয়া করে এবং কুণ্ডলীকে একই দিকে আরো ঘুরিয়ে দেয়।

বৈদ্যুতিক মোটরে তড়িৎ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করা হয়। মোটরের দ্রুতি ও ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্য বাড়াতে হয়। চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্য নিম্নোক্তভাবে বাড়ানো যায় :

১. কারেন্ট বা তড়িৎপ্রবাহ বৃদ্ধি করে

২. আর্মেচারে পাক সংখ্যা বৃদ্ধি করে

৩. অধিকতর শক্তিশালী চুম্বক ব্যবহার করে

৪. কয়েলের দৈর্ঘ্য ও বেধ বাড়িয়ে

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যে বৈদ্যুতিক মোটর ব্যবহার করা হয় তা এই নীতিতে কাজ করে। কিন্তু এদের ক্ষমতা ও ঘোরার মসৃণতা বৃদ্ধির জন্য এতে অতিরিক্ত উপাংশ যোগ করতে হয়। একমাত্র একটি কয়েল বা কুণ্ডলীর পরিবর্তে অনেকগুলো কয়েল বা কুণ্ডলী তৈরি করা হয় এবং কেন্দ্রীয় অক্ষের চারদিকে তাদেরকে বৃত্তাকারে সাজানো হয়।

এদের প্রত্যেকটিকে তার নিজ নিজ কমুটেটরের সাথে সংযুক্ত করা হয়। এটি নিরবচ্ছিন্ন ও মসৃণভাবে ঘুরতে সহায়তা প্রদান করে।

ব্যবহার : বৈদ্যুতিক পাখা, পাম্প, রোলিং মিল ইত্যাদিতে তড়িৎ মোটর ব্যবহৃত হয়।

২২.৭। জেনারেটর বা ডায়নামো
Generator or Dynamo

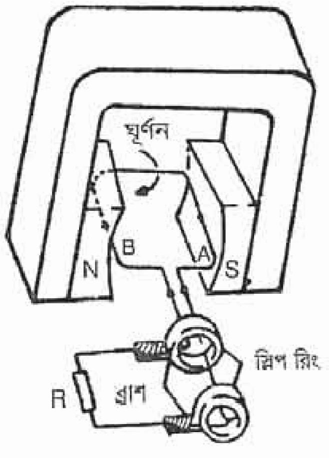
যে তড়িৎযন্ত্রে যান্ত্রিক শক্তিকে তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত করা হয় তাকে জেনারেটর বলে। তাড়িতচৌম্বক আবেশের ওপর ভিত্তি করে এই যন্ত্রের মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত। জেনারেটরও দু প্রকার হতে পারে। যথা—

১। এ. সি. জেনারেটর বা এ. সি. ডায়নামো

২। ডি. সি. জেনারেটর বা ডি. সি. ডায়নামো।

এসি জেনারেটর অধিক প্রচলিত বিধায় এর সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল :

গঠন : এতে একটি চুম্বক NS থাকে। একে ক্ষেত্র চুম্বক বলে। চুম্বকের মধ্যবর্তী স্থানে একটি কাঁচা লোহার পাতের উপর একটি তারের আয়তাকার কুণ্ডলী (চিত্র AB) থাকে। কাঁচা লোহার পাতটিকে আর্মেচার বলে। আর্মেচারটিকে চুম্বকের দুই মেরুর মধ্যবর্তী স্থানে যান্ত্রিক উপায়ে সম–দ্রুতিতে ঘুরানো হয়। আয়তাকার কুণ্ডলীর দুই প্রান্ত দুইটি স্লিপ রিং–এর সাথে সংযুক্ত থাকে। স্লিপ রিং দুইটি আর্মেচারের সাথে একই অক্ষ বরাবর ঘুরতে পারে। দুটি কার্বন নির্মিত ব্রাস এমনভাবে স্থাপন করা হয় যেন তারা যখন আর্মেচার ঘুরতে থাকে তখন স্লিপ রিং দুইটিকে স্পর্শ করে থাকে। ব্রাস দুটির সাথে বহিঃবর্তনী রোধ R সংযুক্ত থাকে।



চিত্র : ২২.৮

ক্রিয়া : যখন আর্মেচারটিকে ঘুরানো হয় তখন আর্মেচার কুণ্ডলী চৌম্বক ক্ষেত্রের বলরেখাগুলোকে ছেদ করে এবং তাড়িত চৌম্বক আবেশের নিয়মানুযায়ী কুণ্ডলীতে তড়িচ্চালক শক্তি আবিষ্ট হয়। এখন কুণ্ডলীটির দুই প্রান্ত বহিঃবর্তনীর সাথে সংযুক্ত থাকায় বর্তনীতে পর্যাবৃত্ত তড়িৎপ্রবাহের উৎপত্তি হয়। আবিষ্ট তড়িৎপ্রবাহের মান প্রধানত চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্য ও ঘূর্ণন বেগের ওপর নির্ভর করে। কুণ্ডলীর একবার ঘূর্ণনের মধ্যে আবিষ্ট তড়িৎপ্রবাহের অভিমুখও একবার পরিবর্তিত হয়। এভাবে যান্ত্রিক শক্তি থেকে পরিবর্তী প্রবাহ উৎপন্ন হয়।

২২.৮। রূপান্তরক বা ট্রান্সফর্মার
Transformer

একটি কুণ্ডলী বা কয়েলে তড়িৎপ্রবাহ পরিবর্তন করে অন্য কয়েলে আবিষ্ট তড়িচ্চালক শক্তি বা তড়িৎ উৎপাদনের পরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস রয়েছে ট্রান্সফর্মারে।

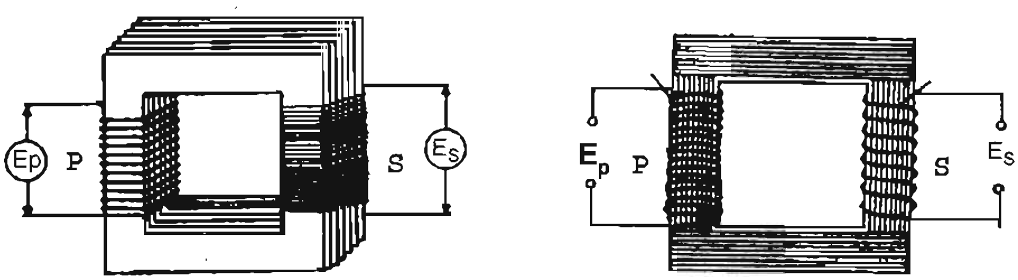
যে যন্ত্রের সাহায্যে পর্যাবৃত্ত উচ্চ বিভবকে নিম্ন বিভবে বা নিম্ন বিভবকে উচ্চ বিভবে রূপান্তরিত করা যায় তাকে রূপান্তরক বা ট্রান্সফর্মার বলে। তাড়িতচৌম্বক আবেশের ওপর ভিত্তি করে এই যন্ত্র তৈরি করা হয়। ট্রান্সফর্মার সাধারণত দুই প্রকারের হয়। যথা–

১. উচ্চধাপী বা আরোহী বা স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার (Step up Transformer) ও ২. নিম্নধাপী বা অবরোহী বা স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার (Step down Transformer)।

যে ট্রান্সফর্মার অল্প বিভরের অধিক তড়িৎপ্রবাহকে অধিক বিভবের অল্প তড়িৎপ্রবাহে রূপান্তরিত করে তাকে উচ্চধাপী বা আরোহী বা স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার বলে। আর যে ট্রান্সফর্মার অধিক বিভবের অল্প তড়িৎপ্রবাহকে অল্প বিভবের অধিক তড়িৎপ্রবাহে রূপান্তরিত করে তাকে নিম্নধাপী অবরোহী বা স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার বলে।

গঠন : একটি কাঁচা লোহার আয়তাকার মজ্জা বা কোর–এর বিপরীত বাহুতে অন্তরিত তার পেঁচিয়ে ট্রান্সফর্মার তৈরি করা হয়। [চিত্র ২২.৯]। কোরের যে বাহুর কুন্ডলীতে পরিবর্তী প্রবাহ বা বিভব প্রয়োগ করা হয় তাকে মুখ্য কুন্ডলী বলে। আর যে কুন্ডলীতে পরিবর্তী বিভব আবিষ্ট হয় তাকে গৌণ কুন্ডলী বলে।

উচ্চধাপী ট্রান্সফর্মারের মুখ্য কুন্ডলীর চেয়ে গৌণ কুন্ডলীতে পাক সংখ্যা বেশি থাকে। আর নিম্নধাপী ট্রান্সফর্মারে মুখ্য কুন্ডলীর চেয়ে গৌণ কুন্ডলীর পাক সংখ্যা কম থাকে।



ধরা যাক n_p পেঁচ বিশিষ্ট মুখ্য কুন্ডলীতে E_p পরিবর্তী বিভব প্রয়োগ করার ফলে এই কুন্ডলীতে I_p প্রবাহ পাওয়া গেল। এই প্রবাহ মজ্জাটিকে চুম্বকিত করে চৌম্বক বলরেখা উৎপন্ন করে যা মুখ্য কুন্ডলীতে একটি আবিষ্ট তড়িচ্চালক শক্তি উৎপন্ন করে। চৌম্বক বলরেখার যদি কোনো ক্ষরণ না হয় তাহলে গৌণ কুন্ডলীর প্রতি পাকেও একই সংখ্যক বলরেখা সংযুক্ত হবে। ফলে গৌণ কুন্ডলীতেও তড়িচ্চালক শক্তি আবিষ্ট হবে। গৌণ কুন্ডলীর পাক সংখ্যা n_S এবং গৌণ কুন্ডলীতে আবিষ্ট তড়িচ্চালক শক্তি E_S হলে,

$$\frac{E_p}{E_s} = \frac{n_p}{n_s} \quad \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots (২২.৩)$$

অর্থাৎ কুন্ডলীদ্বয়ের তড়িচ্চালক শক্তি এদের পাক সংখ্যার সমানুপাতিক।
যখন $n_s > n_p$, তখন ট্রান্সফর্মারটি উচ্চধাপী এবং যখন $n_s < n_p$, তখন ট্রান্সফর্মারটি নিম্নধাপী ট্রান্সফর্মার। কোনো ক্ষমতার অপচয় না ঘটলে মুখ্য কয়েলে প্রযুক্ত সকল ক্ষমতা গৌণ কয়েলে সরবরাহ হবে।

সুতরাং,
মুখ্য কয়েলের ভোল্টেজ × মুখ্য কয়েলের তড়িৎপ্রবাহ = গৌণ কয়েলের ভোল্টেজ × গৌণ কয়েলের তড়িৎপ্রবাহ
অর্থাৎ $E_pI_p = E_sI_s$

$$\therefore \frac{E_p}{E_s} = \frac{I_s}{I_p}$$

এর অর্থ এই যে, কোনো ট্রান্সফর্মার যে হারে ভোল্টেজ কমায় ঠিক সে হারে তড়িৎপ্রবাহ বৃদ্ধি করে যাতে ক্ষমতার পরিমাণ সমান বা ধ্রুব থাকে।

সুতরাং ট্রান্সফর্মার ভোল্টেজ ও তড়িৎপ্রবাহ উভয়কেই রূপান্তর করে।

দূরদূরান্তে তড়িৎ প্রেরণের জন্য আরোহী বা উচ্চধাপী ট্রান্সফর্মার ব্যবহৃত হয়। নিম্নধাপী বা অবরোহী ট্রান্সফর্মার ব্যবহৃত হয় নিম্ন ভোল্টেজ ব্যবহারকারীর যন্ত্রপাতি যেমন রেডিও, টেলিভিশন, টেপরেকর্ডার, ভিসি আর, ভিসিপি, ইলেকট্রিক ঘড়ি, ওয়াকম্যান ইত্যাদিতে।

উদাহরণ : ২২.১। একটি ট্রান্সফর্মারের মুখ্য কুণ্ডলীতে ভোল্টেজ 5V এবং প্রবাহ 3A । গৌণ কুণ্ডলীর ভোল্টেজ 10 V হলে, গৌণ কুণ্ডলীর প্রবাহ নির্ণয় কর।

সমাধান :

আমরা জানি,

$$\frac{E_p}{E_s} = \frac{I_s}{I_p}$$

বা, $I_s = \frac{E_p}{E_s} \times I_p = \frac{5V \times 3A}{10V} = 1.5A$

উ: 1.5 A.

এখানে,
মুখ্য কুণ্ডলীর ভোল্টেজ, E_p=5V
গৌণ কুণ্ডলীর ভোল্টেজ, E_S = 10 V
মুখ্য কুণ্ডলীর প্রবাহ, I_p = 3 A
গৌণ কুণ্ডলীর প্রবাহ, I_S = ?

উদাহরণ : ২২.২। একটি ট্রান্সফর্মারের মুখ্য কুণ্ডলীর পাক সংখ্যা 30, ভোল্টেজ 210 V। এর গৌণ কুণ্ডলীর পাক সংখ্যা 100 হলে ভোল্টেজ কত?

সমাধান :

আমরা জানি,

$$\frac{E_p}{E_s} = \frac{n_p}{n_s}$$

বা, $E_s = \frac{n_s}{n_p} \times Ep$

$\frac{100}{30} \times 210\ V = 700V$

উ: 700V.

এখানে,
মুখ্য কুণ্ডলীর পাক সংখ্যা n_p=30
মুখ্য কুণ্ডলীর ভোল্টেজ, E_p = 210 V
গৌণ কুণ্ডলীর পাক সংখ্যা, n_s = 100
গৌণ কুণ্ডলীর ভোল্টেজ, E_S = ?

উদাহরণ : ২২.৩। একটি ট্রান্সফর্মারের মুখ্য কুণ্ডলীর পাক সংখ্যা 15 এবং গৌণ কুণ্ডলীর পাক সংখ্যা 90, মুখ্য কুণ্ডলীর তড়িৎপ্রবাহ 5 A হলে গৌণ কুণ্ডলীর প্রবাহ কত?

সমাধান :

আমরা জানি,

$$\frac{I_s}{I_p} = \frac{n_p}{n_s}$$

বা, $I_s = \frac{n_p}{n_s} \times Ip$

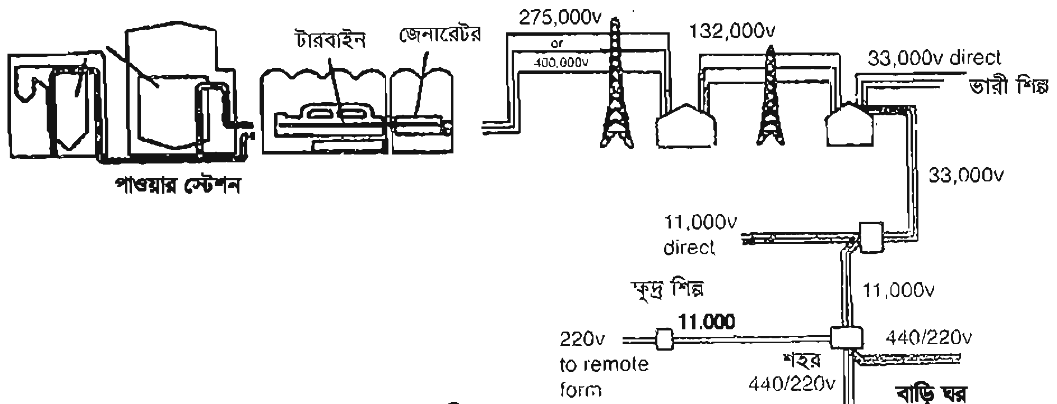
$\therefore I_s = \frac{15}{90} \times 5\ A = \frac{5}{6}\ A = 0.83\ A$

উঃ 0.83 A

এখানে,
মুখ্য কুণ্ডলীর পাক সংখ্যা n_p=15
গৌণ কুণ্ডলীর পাক সংখ্যা n_s = 90
মুখ্য কুণ্ডলীর প্রবাহ, I_p = 5 A
গৌণ কুণ্ডলীর প্রবাহ, I_S = ?

২২. ৯। দূর–দূরান্তে তড়িৎ প্রেরণ
Transmission of electricity at long distance

আমরা জানি পাওয়ার স্টেশন বা তড়িৎ উৎপাদন কেন্দ্রে তড়িৎ উৎপাদন করা হয়। এই তড়িৎ উৎপাদন করা হয় পানির বিভর শক্তিকে ব্যবহার করে বা বিভিন্ন জ্বালানি (যেমন তেল, গ্যাস বা কয়লা) পুড়িয়ে উৎপাদিত তাপ শক্তি ব্যবহার করে। উৎপাদিত তড়িৎ দূরদূরান্তে দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত হয়, তাই তড়িৎকে উৎপাদন কেন্দ্র থেকে একটি প্রেরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সারা দেশে পাঠানো হয়। এই ব্যবস্থায় পাওয়ার স্টেশনগুলো পরস্পরের সাথে সংযুক্ত থাকে। এই ব্যবস্থার নাম জাতীয় গ্রিড। তড়িৎ প্রেরণ করা হয় তারের মাধ্যমে। এ তার উঁচু টাওয়ারের মাধ্যমে টানানো থাকে। তোমরা আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এ ধরনের টাওয়ার (চিত্র ২২.১০) দেখে থাকবে। এসব তারে অনেক উচ্চ ভোল্টেজের তড়িৎ থাকে। কিন্তু তড়িৎপ্রবাহের মান থাকে কম। এসব তারে ২৭৫০০০ থেকে ৪,০০,০০০ V পর্যন্ত তড়িৎ থাকে। পাওয়ার স্টেশন থেকে তড়িৎকে ২৫,০০০ V পাঠানো হয় এবং তড়িৎপ্রবাহের মান থাকে ২০০০০ অ্যাম্পিয়ার। এই ভোল্টেজকে একটি বিরাট আরোহী (স্টেপ আপ) ট্রান্সফর্মারের সাহায্যে বিবর্ধিত করা হয়। তখন ভোল্টেজের মান হতে পারে ২৭৫,০০০ থেকে ৪০০,০০০ V । এই জন্য তড়িৎপ্রবাহ (তড়িৎ কারেন্ট) কে অনেক কমিয়ে ফেলতে হয়। উদাহরণস্বরূপ ৪০,০০০ V ২০০০ A থেকে কমিয়ে ১২৫ A করা হয়। প্রেরক তারে যে রোধ থাকে তা খুবই সামান্য কিন্তু এই রোধ তাৎপর্যপূর্ণ। তারের ভিতর দিয়ে যত বেশি তড়িৎপ্রবাহ চলে, ততই এটি উত্তপ্ত হতে থাকে। এই তাপশক্তি পারিপার্শ্বিক বায়ুতে ছড়িয়ে পড়ে। তাপশক্তির উৎপাদনে তড়িৎ ব্যয় হয় এবং অপচয় ঘটে। এছাড়া তার যত বেশি উত্তপ্ত হয় এর রোধও বাড়তে থাকে। সুতরাং V বাড়ালে এবং তড়িৎপ্রবাহের মান কমালে শক্তি বা ক্ষমতার অপচয় কম হয়।



চিত্র : ২১.১০

উচ্চ ভোল্টেজের এবং কম মানের তড়িৎপ্রবাহ গ্রাহকের ব্যবহার উপযোগী নয়, তাই এই ভোল্টেজ আবার অনেকগুলো অবরোহী বা নিম্নধাপী ট্রান্সফর্মারের মধ্য দিয়ে চালনা করা হয়। এতে ভোল্টেজ কমে যায় এবং তড়িৎপ্রবাহের মান বৃদ্ধি পায়। ফলে এই তড়িৎ গ্রাহক ব্যবহারের উপযোগী হয়। বাংলাদেশে এই উচ্চ ভোল্টেজকে কমিয়ে ২২০ V নিয়ে আসা হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। তড়িৎ মোটরের ক্ষেত্রে–

ক. তাপ শক্তি তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় খ. তাপ শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়

গ. তড়িৎ শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় ঘ. যান্ত্রিক শক্তি তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়

২। অধিক দূরত্বে তড়িৎ প্রেরণের সময় ভোল্টেজ বাড়ানো হয় এবং তড়িৎপ্রবাহ কমানো হয় যেন–

i. তড়িৎ অতিদ্রুত গন্তব্যে পৌঁছায়

ii. তাপ শক্তি উৎপাদনে তড়িতের অপচয় কম হয়

iii. প্রেরক তার অধিক তড়িৎ বহন করে

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

একটি ট্রান্সফরমারে প্রাথমিক কয়েলের পাক সংখ্যা 100। এটি 220 V এসিকে 11KV এসিতে রূপান্তর করে। উপরের তথ্য থেকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

৩। বর্ণিত ট্রান্সফরমারের গৌণ কুণ্ডলীর পাকসংখ্যা–

i. ১০০ এর চেয়ে বেশি

ii. ১০০ এর চেয়ে কম

iii. ১০০ এর সমান হবে

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i ও iii

৪। গৌণ কুণ্ডলীর পাক সংখ্যা কত?

ক. 4500 খ. 4800

গ. 5000 ঘ. 5500

সৃজনশীল প্রশ্ন

সুমন বাসায় 220V বিদ্যুৎ লাইন ব্যবহার করে রেডিও চালায়। একদিন তার পরিবারের সব সদস্য বিবিসির সংবাদ শোনার জন্য বসেছিল। এমন সময় হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে যায়। এ সমস্যা তাৎক্ষণিকভাবে মিটানোর জন্য 1.5V এর চারটি ব্যাটারি ব্যবহার করে সংবাদ শোনে। এতে রেডিওতে 0.5A বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়।

ক. 'V' চিহ্নটির অর্থ কী?

খ. রেডিওতে ব্যাটারির সংযোগ ব্যাখ্যা কর।

গ. ব্যাটারির বর্তনীর মোট রোধ কত?

ঘ. 220V এর পরিবর্তে 1.5V এর চারটি ব্যাটারির সাহায্যে কীভাবে রেডিওটি চলে ব্যাখ্যা কর।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

ইলেকট্রনিকস

ELECTRONICS

আমাদের বাসগৃহে ফ্যাক্টোরিতে বা কল কারখানায়, অফিসে, ব্যাংক ও হাসপাতালে ইলেকট্রনিকসের ব্যবহার ক্রমেই বেড়ে চলছে। অর্ধপরিবাহী কৌশল (device) বা ডিভাইস যেমন ট্রানজিস্টর, সমন্বিত বর্তনী বা ইন্‌টিগ্রেটেড সার্কিট (integrated circuit) বা চিপ্‌স এর বিকাশ অন্যান্য জিনিসের সাথে আমাদের উপহার দিয়েছে পকেট ক্যালকুলেটর। এই ক্যালকুলেটরের মধ্যে থাকে ঘড়ি ও বাদ্যযন্ত্র। এছাড়া এই চিপসের কল্যাণে সম্ভব হয়েছে রোবট, মাইক্রোকম্পিউটার, টিভি গেইম্‌স, শিক্ষণকল, বানান লেখা ও গণিত শেখা ও শেখানোর যন্ত্র । এমনকি কোনো ব্যক্তির স্বাক্ষর চেনা বা শনাক্তকরণের যন্ত্র তৈরি করা সম্ভব হয়েছে চিপস আসার ফলে।

এই অধ্যায়ে অর্ধপরিবাহী, অর্ধপরিবাহী ডায়োড, ট্রানজিস্টর, তড়িৎ চুম্বক শক্তি ও তরঙ্গ, রেডিও, টেলিভিশন, রাডার, কম্পিউটার, ইত্যাদির গুরুত্ব ও ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২৩.১। অর্ধপরিবাহী

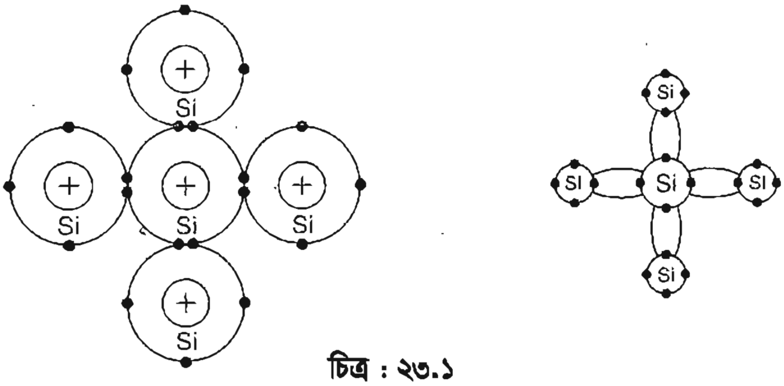
Semiconductors

আমরা এ পর্যন্ত পরিবাহক ও অপরিবাহক বস্তুর কথা জেনেছি। যেসব বস্তুর ভিতর তড়িৎ আধান (এবং তাপও) সহজে চলাচল করতে পারে তাদের বলা হয় পরিবাহক (conductor) এবং যেসব বস্তুর ভিতর দিয়ে তড়িৎ আধান চলাচল করতে বা পরিবাহিত হতে পারে না তাদের বলা হয় অন্তরক (insulator)। সাধারণত ধাতব পদার্থ তড়িৎ সুপরিবাহক হয়। এ রকম ধাতব পদার্থ হল তামা, রুপা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি। পরিবাহকের আপেক্ষিক রোধ কম প্রায় $10^{-8}\Omega m$ । পরিবাহকে অনেক মুক্ত ইলেকট্রন থাকে। এ জন্য পরিবাহকের দুইপ্রান্তে সামান্য বিভবান্তর ঘটলেই মুক্ত ইলেকট্রনগুলো তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি করে। অন্তরকের আপেক্ষিক রোধ বেশি, প্রায় $10^{11}\Omega m.$ ক্রমের। এতে মুক্ত ইলেকট্রন থাকে না। তাই সাধারণ তাপমাত্রায় এর ভিতর দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ ঘটে না।

অর্ধপরিবাহী বস্তু হল সেই বস্তু যার পরিবাহকত্ব অন্তরকের চেয়ে বেশি কিন্তু পরিবাহকের তুলনায় কম। তড়িৎপ্রবাহের জন্য পরিবাহী পদার্থটি সর্বোত্তম। কিন্তু তড়িৎপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অর্ধপরিবাহী পদার্থের ভূমিকা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত অর্ধপরিবাহী বস্তু হল কঠিন পদার্থ তবে কিছু তরল পদার্থও রয়েছে যারা অর্ধপরিবাহী। যেসব অর্ধপরিবাহী বস্তু সচরাচর ব্যবহৃত হয় তাদের মধ্যে রয়েছে সিলিকন, জার্মেনিয়াম, গ্যালিয়াম, আর্সেনাইড, ইনডিয়াম, অ্যান্‌টিমোনাইড এবং ক্যাডমিয়াম সালফাইড। এদের সকলেই কঠিন পদার্থ। অর্ধপরিবাহীর আপেক্ষিক রোধ $10^{-4}\sim\Omega m.$ ক্রমের। আমরা জানি তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সকল পরিবাহকের আপেক্ষিক রোধ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অর্ধপরিবাহী বস্তুর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে এর আপেক্ষিক রোধ কমতে থাকে বা হ্রাস পায়। অন্তরকেরও বৈশিষ্ট্য হল অতি উচ্চ তাপমাত্রায় এর আপেক্ষিক রোধ হ্রাস পায় এবং তখন অন্তরক বস্তু অর্ধপরিবাহী বস্তুর মতো আচরণ করে। সুতরাং অন্তরক উচ্চ তাপমাত্রায় অর্ধপরিবাহী এবং অর্ধপরিবাহী নিম্ন তাপমাত্রার অন্তরক রূপে কাজ করে।

অর্ধপরিবাহীর ইলেকট্রন ধাতুর ইলেকট্রনের চেয়ে বেশি দৃঢ়ভাবে এবং অধাতুর ইলেকট্রনের চেয়ে কম দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে। অর্ধপরিবাহীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে এসব ইলেকট্রন কাঁপতে থাকে। ফলে এদের বাঁধন ঢিলা হয়ে যায় বা মুক্ত হয়। সুতরাং তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে অর্ধপরিবাহীর পরিবাহকত্ব বৃদ্ধি পায়। অতি নিম্ন তাপমাত্রায় অর্ধপরিবাহীতে এমন কোনো মুক্ত ইলেকট্রন থাকে না যা আধান বাহক হিসাবে কাজ করতে পারে কিন্তু তাপমাত্রায় তাপীয় উত্তেজনার দরুন কিছু ইলেকট্রন মুক্ত হয় তাই কক্ষ তাপমাত্রায় অর্ধপরিবাহীতে স্বল্প তড়িৎ পরিবাহিত হয়।

সিলিকনের বহির্খোলকে থাকে চারটি ইলেকট্রন যা চারটি যোজন ইলেকট্রনরূপে কাজ করে (চিত্র ২৩.'১)। সিলিকনের সবচেয়ে স্থিত গড়নের জন্য এর চারটি ইলেকট্রন লাভ করা অর্থাৎ ভাগাভাগি বা শেয়ার (Share) করার প্রবণতা থাকে।



চিত্র : ২৩.১

সুতরাং, বিশুদ্ধ সিলিকনের পরমাণু এর বহিস্থ যোজন ইলেকট্রন বিশুদ্ধ সহযোগী অনুবন্ধের দ্বারা সংযুক্ত হয়, ফলে সিলিকনে কোনো মুক্ত ইলেকট্রন থাকে না। বিশুদ্ধ সিলিকন তাই উত্তম অন্তরক। সামান্য তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে কিছু কিছু অনুবন্ধ ভেঙে যায় এবং ইলেকট্রনের গতিশক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে, যতক্ষণ না বন্ধন মুক্ত হবার মতো যথেষ্ট শক্তি লাভ করে। এসব ইলেকট্রন চলাচলের জন্য মুক্ত থাকে, ফলে তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয়।

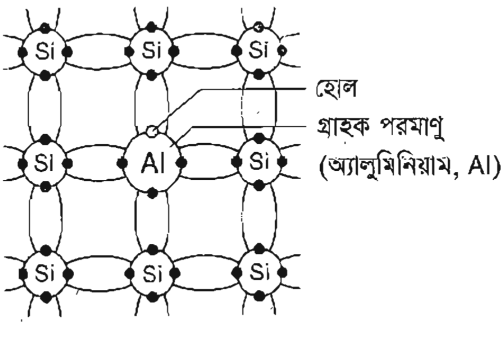
এছাড়াও, সিলিকনকে আরেকভাবে তড়িৎ পরিবাহী করা যায়। এই কাজটি করা হয় বিশুদ্ধ সিলিকনের সাথে খুব সামান্য ভেজাল নিয়ন্ত্রিতভাবে মিশিয়ে। কোনো অর্ধপরিবাহীর ভিতর দিয়ে কী পরিমাণ তড়িৎ পরিবাহিত হবে তা নির্ভর করে ঐ অর্ধপরিবাহী বস্তুতে ভেজালের উপস্থিতির পরিমাণের ওপর।

২৩.২। p-টাইপ ও n-টাইপ অর্ধপরিবাহী
p-type and n-type semiconductor

p-টাইপ অর্ধপরিবাহী

সিলিকনে পরিবাহকত্ব বৃদ্ধির একটি উপায় হল এর সাথে নিয়ন্ত্রিতভাবে অতি সামান্য খাদ (impurities) যোগ করা। একে বলা হয় ডোপায়ন (doping)। ডোপিত মৌলের প্রকৃতি থেকে নির্ধারিত হয় সিলিকন p-টাইপ (ধণাত্মক টাইপ) হবে না n-টাইপ (ঋণাত্মক টাইপ) হবে। যেসব মৌলের (যেমন অ্যালুমিনিয়াম, বোরন, গ্যালিয়াম বা ইনডিয়াম) বহির্খোলকে তিনটি যোজন (valence) ইলেকট্রন থাকে তাদের ভেজাল হিসেবে ব্যবহার করা হলে সিলিকন p-টাইপ বস্তুতে বা p-টাইপ অর্ধপরিবাহীতে পরিণত হয়।

এ সব পরমাণুর যারা সহযোজী অনুবন্ধে (Covalent Bond) কোনো ইলেকট্রন প্রদান করে না তাদের বলা হয় গ্রাহক (Acceptor) পরমাণু। গ্রাহক পরমাণুর বহির্খোলকে সাতটি যোজন ইলেকট্রন থাকে এর খোলকে একটি ইলেকট্রনের ঘাটতি থাকে। ফলে 'একটা ফাঁকা জায়গা বা হোল (Hole) সৃষ্টি হয়। সুতরাং, ব্যবস্থাটি একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করার জন্য তৈরি থাকে। এজন্য এ ধরনের কেলাসকে বলা হয় গ্রাহক। হোলটি একটি ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ হলে পরমাণুটির খোলকের গঠন স্থিত হয়। ধনাত্মক হোল ইলেকট্রনকে গ্রহণ করে ফলে ইলেকট্রন সিলিকনের মধ্যে গতিশীল বা চলমান থাকে। এভাবে ইলেকট্রন পরমাণু থেকে পরমাণুতে গমন করে। যে ইলেকট্রনটি হোলে চলে যায় তা যে পরমাণু থেকে আসে তাতে একটি হোল সৃষ্টি করে। সেই হোলকে দখল করার জন্য অন্য একটি ইলেকট্রন আসে। এই ইলেকট্রনটিও রেখে আসে আরেকটি হোল। এতে মনে হয় সৃষ্ট এই হোল যা ধনাত্মক চার্জের মতন কাজ করে, পদার্থের



চিত্র : ২৩.২ p-টাইপ অর্ধপরিবাহী

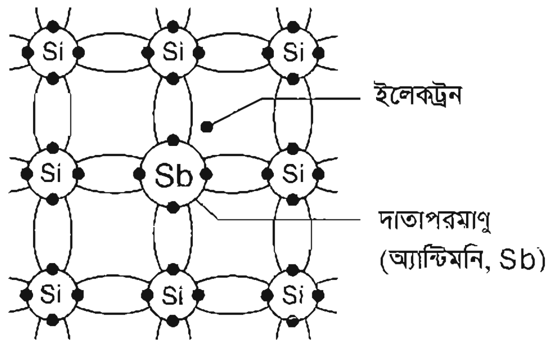
মধ্যে ইলেকট্রনের গতির বিপরীত দিকে চলছে। এখানে গরিষ্ঠ আধান বাহক (Major charge carrier) হল হোল। সুতরাং এই ধরনের পদার্থের নাম p-টাইপ অর্ধপরিবাহী।

লক্ষণীয় যে p-টাইপ অধপরিবাহীতে অতি সামান্য, অর্থাৎ প্রতি দশ লক্ষে একটি অণু খাদ হিসাবে মিশাবার ফলে ধনাত্মক আধান বহনকারী হোলের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়। যদি মূল অর্ধপরিবাহীটি সিলিকনের হয় তাহলে বিশুদ্ধ সিলিকনের অর্ধপরিবাহীতে আমরা সমান সংখ্যক ইলেকট্রন ও হোল বাহক পাই। এদের উভয়ের সংখ্যাই খুব কম। অর্থাৎ কক্ষ তাপমাত্রায় প্রতি সহস্র কোটি পরমাণুর জন্য আনুমানিক একটি করে ইলেকট্রন ও হোল বাহক সৃষ্টি হয়। কিন্তু ত্রিযোজী খাদ– পরমাণুর প্রত্যেকটি একটি করে হোল বাহক সৃষ্টি করে। এর ফলে p-টাইপ অর্ধপরিবাহীতে আধান বাহকরূপে হোলের সংখ্যা কয়েক সহস্র গুণ বৃদ্ধি পায়। খেয়াল রাখতে হবে p-টাইপ অর্ধপরিবাহীতে মুক্ত ধনাত্মক হোলের সংখ্যা বেশি হলেও কেলাসটির নিট আধান শূন্য। কারণ প্রতিটি মুক্ত ধনাত্মক হোলের জন্য একটি আবদ্ধ ইলেকট্রনও সৃষ্টি হচ্ছে যা আধান বাহকরূপে অংশ নিচ্ছে না।

n-টাইপ অর্ধপরিবাহী :

যে সব মৌলের (যেমন ফসফরাস, আর্সেনিক বা অ্যান্টিমনি) বহির্খোলকে ৫টি যোজন ইলেকট্রন থাকে তাদেরকে সিলিকন বা জার্মেনিয়ামের সাথে ভেজাল হিসেবে মিশালে তাদের প্রত্যেকটি পরমাণু কেলাসে অতিরিক্ত একটি ইলেকট্রন সরবরাহ করে। ফলে সিলিকন n-টাইপ বস্তুর ধর্ম প্রাপ্ত হয়। চিত্রে যে কেলাসটি দেখানো হয়েছে তাতে প্রতি অ্যান্টিমনি পরমাণু ব্যবস্থাটিকে একটি অতিরিক্ত ইলেকট্রন দান করে, এ জন্য একে বলা হয় দাতা পরমাণু (donor atom)।

অ্যান্টিমনি ৫টি যোজন ইলেকট্রনের মধ্যে ৪টি সিলিকনের পরমাণুর সাথে সহযোজী বন্ধন তৈরি করে। পঞ্চমটি অনেকটা মুক্ত থাকে এবং কেলাসে ঘোরাফেরা করে, যেমন ধাতব পরিবাহকে ইলেকট্রন মুক্তভাবে চলাফেরা করে। এই ইলেকট্রনকে তাপীয় শক্তি দ্বারা সহজেই সরিয়ে নেওয়া যায়। n-টাইপ বস্তুকে বলা হয় ইলেকট্রন সমৃদ্ধ বস্তু। n-টাইপ সিলিকন, সেই সিলিকন দিয়ে তৈরি যাতে সমান সংখ্যক মুক্ত ইলেকট্রন ও আবদ্ধ (bound) ধনাত্মক আধান যোগ করা হয়, যাতে নিট আধান শূন্য হয়।



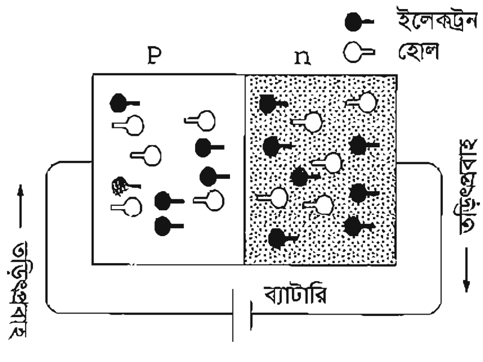
চিত্র : ২২.৩ n–টাইপ অর্ধপরিবাহী

অনেকের ধারণা এই যে, p-টাইপ বস্তু ধনাত্মক আধানযুক্ত বস্তু এবং n-টাইপ বস্তু ঋণাত্মক আধানযুক্ত বস্তু। এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। p-টাইপ ও n-টাইপ উভয়ই ধরনের বস্তুই আধান নিরপেক্ষ (neutral) ।

২৩.৩। অর্ধপরিবাহী ডায়োড
Semiconductor diodes

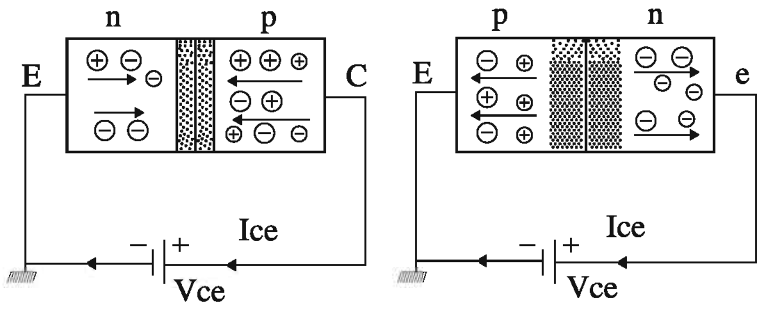
p-n জংশন ডায়োড

একটি p- টাইপ অর্ধপরিবাহী ও একটি n- টাইপ অর্ধপরিবাহী পাশাপাশি জোড়া লাগিয়ে p-n জংশন ডায়োড তৈরি করা হয়। এই জংশন তড়িৎপ্রবাহ একদিকে প্রবাহিত করে বা একমুখী করে তাই এর অপর নাম অর্ধপরিবাহী রেকটিফায়ার।



চিত্র : ২৩.৪ p-n জংশন ডায়োড

p-n জংশনে p- টাইপ ও n- টাইপ বস্তুর স্তর তৈরি হয়। ফলে বাইরে থেকে কোনো ভোল্টেজ প্রয়োগ না করলে তড়িৎপ্রবাহ চলে না।



(ক) সম্মুখী ঝোঁক (খ) বিমুখী ঝোঁক

চিত্র : ২৩.৫

p-n জংশনে যদি কোনো বহিস্থ ভোল্টেজ বা বিভব পার্থক্য প্রয়োগ করা হয় তাহলে তড়িৎপ্রবাহ ঘটে। ভোল্টেজ যদি এমনভাবে প্রয়োগ করা হয় যে ব্যাটারি বা সেলের ধনাত্মক প্রান্ত p- টাইপ বস্তুর সাথে এবং ঋণাত্মক প্রান্ত n টাইপ বস্তুর সাথে সংযুক্ত হয় তাহলে ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্ত ইলেকট্রনগুলোকে p টাইপ বস্তুর দিকে এবং ব্যাটারির ঋণাত্মক প্রান্ত হোলগুলোকে n- টাইপ বস্তুর দিকে টানবে। ফলে p– n জংশন ও বহিস্থ বর্তনীতে তড়িৎপ্রবাহ চলবে। এই প্রবাহকে বলা হয় সম্মুখী প্রবাহ (forward current) এই ধরনের সংযোগকে বলা হয় সম্মুখী ঝোঁক (forward bias)।

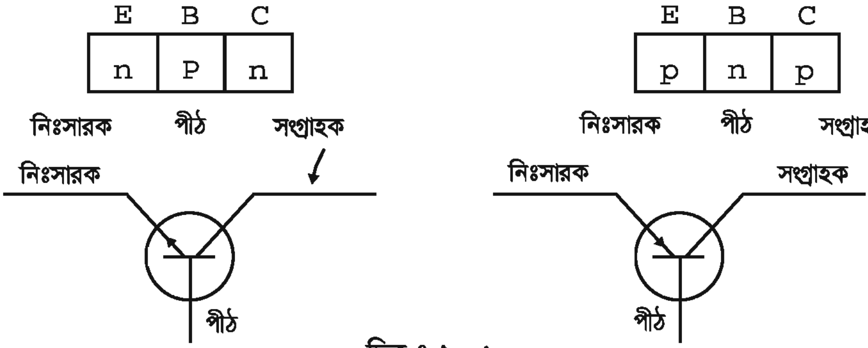
ভোল্টেজ যদি বিপরীত অভিমুখে প্রয়োগ করা হয় অর্থাৎ ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্ত যদি n- টাইপ এবং ঋণাত্মক প্রান্ত যদি p- টাইপ বস্তুর সাথে সংযুক্ত করা হয় তাহলে n- টাইপ বস্তুর মুক্ত ইলেকট্রন ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্তের আকর্ষণের ফলে n- টাইপ বস্তুতেই থেকে যাবে p-n জংশন পার হয়ে p টাইপ বস্তুতে যেতে পারবে না। p- টাইপ বস্তুর 'হোল'ও p- টাইপ বস্তুতেই থেকে যাবে। এতে জংশন দিয়ে কোন তড়িৎপ্রবাহ চলবে না। এ ধরনের সংযোগকে বলা হয় বিমুখী ঝোঁক (reverse bias)। উপরিউক্ত ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হলে p-n জংশন শুধু ইলেকট্রন এক অভিমুখে প্রবাহের অনুমতি দেয়। অর্থাৎ এই জংশনে ইলেকট্রনের একমুখী প্রবাহ এটি। সুতরাং এটি রেকটিফায়ার হিসেবে কাজ করে।

২৩.৪। ট্রানজিস্টর
Transistor

ট্রানজিস্টরের আবিষ্কার ইলেকট্রনিক্সের জগতে বিপ্লব এনেছে। ১৯৪৮ সালে ট্রানজিস্টর প্রথম আবিষ্কৃত হয়। এই ক্ষুদ্র অর্ধপরিবাহীটি তড়িৎ সংকেতকে বিবর্ধন করতে পারে এবং উচ্চ–গতি (high speed) সুইচ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। ট্রানজিস্টর তাই ইলেকট্রনিক সার্কিট বা বর্তনীতে বিবর্ধক ও সুইচ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

দুই শ্রেণী অর্ধপরিবাহীর (n- টাইপ ও p- টাইপ) তিনটি দিয়ে ট্রানজিস্টর তৈরি করা হয়। এতে একটি p- টাইপের কেলাসের উভয় পার্শ্বে একটি করে n- টাইপ কেলাস বা n- টাইপের কেলাসের উভয় দিকে একটি করে p- টাইপ কেলাস স্যান্ডউইচ করে যথাক্রমে n-p-n বা p-n-p জংশন তৈরি করা হয়। এদেরকে যথাক্রমে n-p-n ট্রানজিস্টর ও p-n-p ট্রানজিস্টর বলা হয়।

এরকমভাবে সজ্জিত কেলাসের প্রথমটিকে নিঃসারক (emiter), মাঝেরটিকে পীঠ (base) এবং অন্য পাশেরটিকে সংগ্রাহক (collector) বলা হয়। সুতরাং ট্রানজিস্টরে দুটি জংশন থাকে–প্রথমটি হল নিঃসারক–পীঠ জংশন, অপরটি সংগ্রাহক–পীঠ জংশন। স্বাভাবিক কার্যপ্রণালি (operation) অনুযায়ী নিঃসারক–পীঠ জংশন সম্মুখী ঝোঁক বিশিষ্ট



চিত্র ঃ ২৩.৬

এবং সংগ্রাহক–পীঠ জংশন বিমুখী ঝোঁক বিশিষ্ট। সম্মুখী ঝোঁক বা সম্মুখ বায়াস অবস্থায় একটি ক্ষুদ্র বিভব প্রয়োগ করা হলে পীঠ দিয়ে শুধু তড়িৎপ্রবাহই চলে তা নয় বরং পীঠ ও সংগ্রাহকের কারেন্ট প্রবাহে বাধাদানকারী প্রভাব (current blocking effect) কমিয়ে দেয়। ফলে জংশনটি তড়িৎ প্রবাহী বা কারেন্ট পরিবাহী হয়ে যায় এবং নিঃসারক ও সংগ্রাহকের মধ্যে তড়িৎ প্রবাহ চলে। পীঠ–এ বা অন্তর্গামী বর্তনীতে একটি ক্ষুদ্র তড়িৎপ্রবাহ সংগ্রাহক বা বহির্গামী বর্তনীতে ৫০ থেকে ১০০ গুণ বর্ধিত হয়ে প্রবাহিত হয়।

২৩.৫। অ্যামপ্লিফায়ার হিসাবে ট্রানজিস্টর

Transistor as Amplifier

যে যন্ত্র এর অন্তর্গামীতে (input) প্রদত্ত সংকেতকে বহির্গামীতে বিবর্ধিত (amplify) করে তাকে বলা হয় অ্যামপ্লিফায়ার। ইলেকট্রনিক অ্যামপ্লিফায়ার ক্ষুদ্র অন্তর্গামী সংকেতকে বৃহৎ বহির্গামী সংকেতে পরিণত করে। ট্রানজিস্টর অ্যামপ্লিফায়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কারণ তড়িৎপ্রবাহের পরিবর্তন বৃদ্ধি করতে বা বিবর্ধিত করতে ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয়। অন্তর্গামী হতে পারে তড়িৎপ্রবাহ বা ভোল্টেজ। ট্রানজিস্টরের পীঠ প্রবাহের (base current) সামান্য পরিবর্তন সংগ্রাহক প্রবাহের (collector current) বিরাট পরিবর্তন ঘটায়। ট্রানজিস্টর পীঠ–প্রবাহকে ৫০ থেকে ১০০ গুণ বাড়িয়ে দিয়ে সংগ্রাহক প্রবাহ হিসেবে প্রদান করতে পারে। এ জন্য বিভিন্ন ইলেকট্রনিক বর্তনীতে ট্রানজিস্টরকে অ্যামপ্লিফায়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

২৩.৬। তাড়িতচৌম্বক বিকিরণ

Electromagnetic Radiation

আলোক তরঙ্গ তাড়িতচৌম্বক বর্ণালি নামে পরিচিত একটি বিস্তৃত পাল্লার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অংশবিশেষ। আমরা জানি, তাড়িতচৌম্বক বর্ণালিতে থাকে দৃশ্যমান আলো, অবলোহিত বিকিরণ, বেতার তরঙ্গ, অতিবেগুনি বিকিরণ, এক্সরশ্মি ও গামারশ্মি।

যদিও বিভিন্ন তাড়িতচৌম্বক বিকিরণের উৎস বিভিন্ন এবং তাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে বিরাট পার্থক্য বর্তমান কিন্তু কিছু কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এদের মধ্যে মিল আছে। এসব বৈশিষ্ট্য হল :

১. তাড়িতচৌম্বক বিকিরণ ভ্যাকুয়ামে আলোর দ্রুতিতে ($3 \times 10^8 m/s$) সরলরেখায় চলে।

২. উৎস থেকে বিশেষ দূরত্বে বিকিরণের তীব্রতা বিপরীত বর্গীয় নিয়ম (Inverse square law) মেনে চলে। অর্থাৎ দূরত্বের বর্গের ব্যবস্তানুপাতে এদের তীব্রতা হ্রাস পেতে থাকে। দূরত্ব দ্বিগুণ হলে তীব্রতা এক–চতুর্থাংশ হয়ে যাবে।

৩. এ তরঙ্গ তাড়িতচৌম্বক এবং আড় তরঙ্গ।

৪. যথোপযুক্ত শর্তসাপেক্ষে তাড়িতচৌম্বক বিকিরণের সব ধরনের বিকিরণের মতো প্রতিফলন, প্রতিসরণ, অপবর্তন (diffraction) ও ব্যতিচার (interference) ঘটে।

৫. এদের সঞ্চালনের জন্য কোনো মাধ্যম প্রয়োজন হয় না। শূন্য মাধ্যমের মধ্য দিয়ে এরা সঞ্চালিত হতে পারে।

২৩.৭। বেতার তরঙ্গ
Radio Waves

তাড়িতচৌম্বক বিকিরণের মধ্যে আমরা বেতার তরঙ্গ নিয়ে আলোচনা করব। তাড়িতচৌম্বক বিকিরণের মধ্যে যেগুলোর তরঙ্গ–দৈর্ঘ্যের পাল্লা 10^{-4}m থেকে 5×10^4m তাদের বলা হয় বেতার তরঙ্গ। বেতার তরঙ্গকে আবার কয়েকটি উপবিভাগে ভাগ করা যায়। এরা হল মাইক্রোওয়েভ বা মাইক্রোতরঙ্গ; রাডারতরঙ্গ ও টেলিভিশন তরঙ্গ।

বেতার তরঙ্গ উৎপাদিত হয় তড়িৎ স্পন্দনের মাধ্যমে। সাধারণ কোনো অ্যারিয়েল বা অ্যানটেনা (antena) দ্বারা ইলেকট্রনকে স্পন্দিত করে বেতার তরঙ্গ উৎপাদন করা হয়। দূরবর্তী স্থানে শব্দ বা ছবি প্রেরণের জন্য এই বেতার তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়।

অ্যানটেনা দ্বারা বিকীর্ণ (radiated) যে তাড়িতশক্তি মুক্ত স্থানে (free space) তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ হিসেবে সঞ্চালিত হয়ে থাকে তাকে বলা হয় বেতার তরঙ্গ।

এই তরঙ্গের শক্তি তাড়িত ও চৌম্বক এই দুই ক্ষেত্রের মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত থাকে। মধ্যম (medium) ও দীর্ঘ (long) তরঙ্গের পথে বাধা থাকলেও অপবর্তনের মাধ্যমে তাদের পথের বাধা (পাহাড়–পর্বত) পেরিয়ে যেতে পারে। ফলে তরঙ্গ রেডিও সিগন্যাল প্রেরক অ্যানটেনা থেকে গ্রাহক যন্ত্রে পৌঁছায়। এছাড়া পৃথিবীর উর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলের আধানযুক্ত কণিকার স্তর দ্বারা মধ্যম ও দীর্ঘ বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়। ভূপৃষ্ঠ বাঁকা থাকা সত্ত্বেও দূরবর্তী স্থানে এ ধরনের তরঙ্গ সঞ্চালিত হতে পারে।

টেলিভিশন (VHF ও UHF) তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য ক্ষুদ্রতর। এরা উর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলের স্তর থেকে প্রতিফলিত হয় না এবং কোনো উঁচু বাধা (যেমন পাহাড়–পর্বত) দ্বারা খুব সামান্যই পরিবর্তিত হয়। গ্রাহকযন্ত্রে উত্তম সিগন্যাল পেতে হলে এই ধরনের তরঙ্গের জন্য প্রেরক অ্যানটেনা থেকে গ্রাহক (টিভি) অ্যারিয়েল পর্যন্ত ভ্রমণ–পথ সরলরেখা হওয়া উচিত। এ জন্য দূরবর্তী স্থানে টেলিভিশন তরঙ্গ কৃত্রিম উপগ্রহ বা (স্যাটেলাইট)–এর মাধ্যমে রিলে (relay) করা হয়।

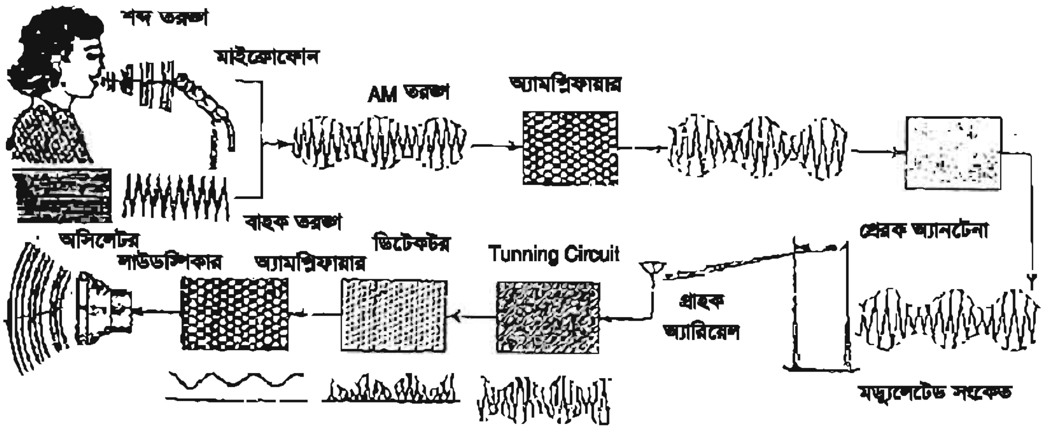
২৩.৮। রেডিও
Radio

রেডিও যোগাযোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এর সাহায্যে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে শব্দ, সংগীত, কোড বা যোগাযোগের অন্য কোনো সংকেত পাঠানো যায়। রেডিও আবিষ্কার বিকাশ ও উন্নয়নে যে সব বিজ্ঞানী অবদান রেখেছেন তারা হলেন জার্মানির হাইনরিখ হার্জ, বাংলাদেশের স্যার জগদীসচন্দ্র বসু, ইটালির গুগলিয়েলমো মার্কনি এবং আমেরিকান লী দ্য ফরেস্ট (Lee De Forest)

রেডিওতে আমরা শব্দ শুনতে পাই। এই শব্দ কীভাবে প্রেরিত হয় এবং কীভাবেই বা আমরা শুনতে পাই? কোন বেতার সম্প্রচার স্টেশনের স্টুডিওতে কোনো ব্যক্তি মাইক্রোফোনের সামনে কথা বললে, মাইক্রোফোন ঐ ব্যক্তির মুখ থেকে বের হওয়া শব্দতরঙ্গকে তড়িৎতরঙ্গে রূপান্তরিত করে। এই তড়িৎতরঙ্গকে বাহক তরঙ্গ (carrier wave) নামক এক প্রকার উচ্চ কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গের সাথে মিশ্রিত করা হয়। এই মিশ্রিত তরঙ্গকে বলা হয় মড্যুলেটেড বা রূপারোপিত তরঙ্গ। রূপারোপিত তরঙ্গকে বেতারতরঙ্গও বলা হয়। বেতারতরঙ্গকে অ্যামপ্লিফায়ার বিবর্ধিত করে প্রেরক যন্ত্রের অ্যানটেনার সাহায্যে শূন্যে (space) প্রেরণ করে। এই বেতার তরঙ্গ শূন্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং ভূমি তরঙ্গ (ground wave) ও আকাশ তরঙ্গ (sky wave) নামে দুই ধরনের তরঙ্গে ভাগ হয়। ভূমি তরঙ্গ সরাসরি গ্রাহক যন্ত্রের অ্যারিয়েলে পৌঁছায়। আমাদের ঘরে যে রেডিও বা ট্রানজিস্টর সেটটি থাকে তাহলো গ্রাহকযন্ত্র। আকাশতরঙ্গ আয়নমণ্ডলে (Ionosphere) প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে এবং গ্রাহকযন্ত্রের অ্যারিয়েলে ধরা পড়ে।

গ্রাহকযন্ত্র বেতার তরঙ্গকে গ্রহণ করে একে তড়িৎপ্রবাহে রূপান্তরিত করে। এরপর Demodulation বা বিরূপারোপন প্রক্রিয়ায় বাহকতরঙ্গ হতে শব্দসংকেত আলাদা করে নেওয়া হয়। অতঃপর অ্যামপ্লিফায়ার সাহায্যে তড়িৎপ্রবাহকে বিবর্ধিত করে এবং লাউড স্পিকারে প্রেরণ করে। লাউড স্পিকার তড়িৎ প্রবাহকে পুনরায় শব্দে রূপান্তরিত করে। এই শব্দ আমরা শুনতে পাই। সুতরাং তোমরা বুঝতে পারছ যে, রেডিওতে প্রেরক যন্ত্র থেকে শব্দ প্রেরণ করা হয় না।

শব্দ তরঙ্গকে তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গে (বেতার তরঙ্গে) রূপান্তরিত করে পাঠানো হয়, গ্রাহকযন্ত্র বেতার তরঙ্গ গ্রহণ করে লাউড স্পিকার একে শব্দে রূপান্তরিত করে।



চিত্র : ২৩.৭

২৩.৯। টেলিভিশন Television

টেলিভিশন হল এমন একটি যন্ত্র যার সাহায্যে আমরা দূরবর্তী কোনো স্থান থেকে শব্দ শোনার সঙ্গে বক্তার ছবি টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে পাই। স্কটিশ আবিষ্কারক লজি বেয়ার্ড ১৯২৬ সালে টেলিভিশনে চিত্র প্রেরণে সক্ষম হন। সেদিনকার টিভি শিল্পী ছিল একটি কথা বলা পুতুল।

টেলিভিশন কী করে কাজ করে

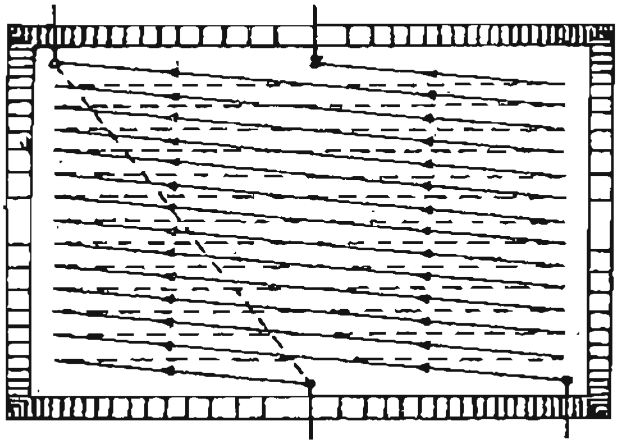
আমরা জানি টেলিভিশনে ছবি দেখার সাথে সাথে শব্দও শোনা যায়। টেলিভিশনে শব্দ ও ছবি প্রেরণের জন্য প্রয়োজন একটি প্রেরক স্টেশন। প্রেরক স্টেশনে থাকে প্রেরক যন্ত্র, যার সাহায্যে তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গরূপে শব্দ ও ছবি প্রেরণ করা হয়। শব্দ ও ছবি প্রেরণের জন্য টেলিভিশন প্রেরক স্টেশনে পৃথক প্রেরক যন্ত্র থাকে। একটি প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে শব্দকে তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গে রূপান্তরিত করে প্রেরণ করা হয়। অন্য একটি প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে ছবিকে তড়িৎ–সংকেতে রূপান্তরিত করে তা তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ হিসেবে প্রেরণ করা হয়। প্রথমে ছবি প্রেরণের কথাই বলা যাক। যে ছবি বা দৃশ্য প্রেরণ বা সম্প্রচার করতে হবে তার প্রতিবিম্ব বা ছবি লেন্সের মধ্য দিয়ে টেলিভিশন ক্যামেরার পর্দায় ফেলা হয়। এই ছবিকে টেলিভিশন ক্যামেরা তড়িতে রূপান্তরিত করে। এরপর তড়িৎকে রেডিও কম্পাঙ্ক পাওয়ার–এ রূপান্তরিত করা হয় এবং একে তাড়িতচৌম্বক বেতার তরঙ্গ হিসেবে প্রেরণ করা হয়। এই বেতার তরঙ্গ আমাদের বাড়ির ছাদে রাখা অ্যানটেনা বা ইনডোর অ্যানটেনায় সামান্য তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি করে। এই প্রবাহ অ্যারিয়েল দিয়ে আমাদের টিভি সেটে যায়, বিবর্ধিত হয় এবং ছবিতে রূপান্তরিত হয়। যে দৃশ্য প্রেরণ করতে হবে টেলিভিশন ক্যামেরার পর্দায় তার একটি ছবি ফেলা হয়।

ছবিকে তড়িৎ–সংকেতে রূপান্তর : স্ক্যানিং

টেলিভিশন ক্যামেরা কোনো দৃশ্যের ছবির উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল অংশকে তড়িৎ আধান বা চার্জে রূপান্তরিত করে। ক্যামেরার লেন্সের পিছনে থাকে একটি পর্দা বা মোজাইক। এই পর্দার উপর সিজিয়াম নামক একটি আলোক সংবেদী পদার্থের আস্তরণ থাকে।

ক্যামেরার লেন্সকে যখনই কোনো দৃশ্যের দিকে ফেরানো হয় বা নির্দেশ করা হয়, লেন্সে যে ছবিটি দৃশ্যমান হয় তা লেন্স মোজাইক পর্দায় ফোকাস করে, ফলে সিজিয়াম বিন্দুগুলো ইলেকট্রন নির্গমন করে, অর্থাৎ সিজিয়াম বিন্দুগুলো তড়িৎ চার্জ বা আধানযুক্ত হয়। ইলেকট্রন নির্গমনের সংখ্যা (উৎপাদিত তড়িতের পরিমাণ) সিজিয়াম বিন্দুর উপর পতিত

আলোর তীব্রতার ওপর নির্ভর করে। উজ্জ্বল আলো কোনো বিন্দুতে পতিত হলে তা থেকে বেশি ইলেকট্রন বের হয় এবং বেশি পরিমাণ তড়িৎ উৎপাদিত হয়। অনুজ্জ্বল বা ফ্যাকাসে আলো কোনো বিন্দুতে পতিত হলে তা থেকে কম সংখ্যক ইলেকট্রন নির্গত হয় এবং উৎপাদিত তড়িতের পরিমাণও হয় কম।



চিত্র : ২৩.৮

এভাবে ছবির উজ্জ্বল অংশ অধিক ইলেকট্রন এবং অনুজ্জ্বল অংশ কম ইলেকট্রন নিঃসরণ করে। ছবির উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল অংশ বা ছবির বিভিন্ন অংশের পার্থক্যের জন্য সিজিয়াম বিন্দু থেকে নির্গত ইলেকট্রনের পরিমাণও বিভিন্ন হয়। সুতরাং টেলিভিশন ক্যামেরায় পূর্ণাঙ্গ ছবিটি হয় তড়িৎ চার্জ বা ইলেকট্রন দ্বারা সৃষ্ট একটি পূর্ণাঙ্গ অভিন্ন ছবি। সিজিয়াম বিন্দুর তড়িৎ চার্জ নির্গমনের জন্য অন্য কারো সহায়তার প্রয়োজন হয় না। পরবর্তী ধাপ হল এই ক্ষুদ্র চার্জ বা আধান দ্বারা তড়িৎ প্রবাহ বা কারেন্টের সৃষ্টি হওয়া, এই তড়িৎ কারেন্ট বিবর্ধিতকরণ এবং বিবর্ধনের পর তাড়িতচৌম্বক বেতার তরঙ্গ হিসেবে টেলিভিশন অ্যারিয়েলে প্রেরণ।

ইলেকট্রনগান বা ইলেকট্রন নিক্ষেপকের সাহায্যে এই কাজটি করা হয়। ইলেকট্রনগান হল এমন একটি কৌশল বা যন্ত্র যা ইলেকট্রনের স্রোতকে সুইয়ের মতো চিকন রশ্মি হিসেবে ছুড়ে দেয়। ইলেকট্রনগানকে এমনভাবে তাক করা হয় যে, নির্গত রশ্মি (ইলেকট্রন বীম) মোজাইক পর্দার উপর অগ্র–পশ্চাৎ ও উপরে–নিচে আসা–যাওয়া করে। বীমের এই অগ্র–পশ্চাৎ এবং উপরে–নিচে গমনকে বলা হয় স্ক্যানিং বা স্ক্যানকরণ। এই স্ক্যানিং হয় লাইন ধরে ধরে বা লাইনে লাইনে–ছবির উপর বাম প্রান্ত বা কোনা থেকে নিচের ডান কোনায় গিয়ে শেষ হয়। ঠিক যেন লাইন ধরে ধরে বই পড়ার মতো। যে কোনো লাইনের ডান পাশের শেষ শব্দটি পাঠ শেষ করেই কোনাকুনি পরবর্তী নিচের লাইনের বাঁ পাশের কোনায় লাইনের প্রথম শব্দটি পাঠ করতে হয়।

ক্যামেরা কোনো বস্তুর চিত্রকে একের পর এক রেখার আকারে স্ক্যান করে। মার্কিন টেলিভিশন ব্যবস্থায় প্রথমে মোট ২৬২$\frac{১}{২}$টি রেখার একটি সেটকে স্ক্যান করে। একে বলা হয় ক্ষেত্র বা ফিল্ড। পরবর্তীতে ২৬২ $\frac{১}{২}$ টি রেখার অপর একটি সেটকে বা অপর একটি ফিল্ডকে স্ক্যান করে। দ্বিতীয় ফিল্ড প্রথম ফিল্ডের ফাঁকগুলো পূরণ করে। দুটি সম্পূর্ণ ফিল্ড (৫২৫টি রেখা) চিত্রের একটি ফ্রেম বা কাঠামো তৈরি করে। ইউরোপীয় ও আমাদের উপমহাদেশে টেলিভিশন ব্যবস্থায় চিত্রের একটি ফ্রেমের জন্য প্রয়োজন হয় ৬২৫টি রেখা। এই ব্যবস্থার ক্যামেরা প্রথম ফিল্ডে ৩১২ $\frac{১}{২}$টি এবং দ্বিতীয় ফিল্ডে ৩১২ $\frac{১}{২}$টি রেখাকে স্ক্যান করে। তড়িৎপ্রবাহকে এরপর একটি বিবর্ধকের সাহায্যে বাড়ানো হয় এবং তাড়িতচৌম্বক বেতার তরঙ্গে রূপান্তরিত করা হয়। এরপর একে বাহক তরঙ্গের সাহায্যে প্রেরক অ্যানটেনা থেকে প্রেরণ করা হয়।

শব্দ প্রেরণ

যে টেলিভিশনে চিত্র প্রেরণ করা হবে তা যখন ক্যামেরা সংগ্রহ করতে থাকে তখন উপস্থাপকের কণ্ঠস্বর বা ঐ দৃশ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট শব্দকেও মাইক্রোফোনের সাহায্যে সংগ্রহ করতে হয় এবং তা প্রেরণ করতে হয়। ক্যামেরার কাজ হল ছবিটিকে রূপান্তরিত করা এবং মাইক্রোফোনের কাজ হল শব্দকে তড়িতে রূপান্তরিত করা। মাইক্রোফোনের মধ্যে ডায়াফ্রাম নামে ধাতুর একটি পাতলা পাত থাকে। শব্দ দ্বারা এই ডায়াফ্রাম কম্পিত হয়। ডায়াফ্রাম হল মাইক্রোফোনের যন্ত্রের সেই অংশ যা কম্পনকে তড়িতে রূপান্তরের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। বিভিন্ন রকম শব্দের কম্পন ডায়াফ্রামকেও বিভিন্নভাবে কাঁপায়। ডায়াফ্রামের এই কম্পন মাইক্রোফোনে পরিবর্তনশীল তড়িৎপ্রবাহে রূপান্তরিত হয়। এর বহির্গমন ঘটে পর্যাবৃত্ত ভোল্টেজ হিসেবে। পর্যাবৃত্ত ভোল্টেজের প্রাবল্য ও কম্পাঙ্ক মূল শব্দের প্রাবল্য ও কম্পাঙ্কের ওপর নির্ভর করে। এই পর্যাবৃত্ত ভোল্টেজকে বিবর্ধিত করা হয় এবং প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে প্রেরণ করা হয়। টেলিভিশনের ক্যামেরা থেকে ছবির সংকেত এবং মাইক্রোফোন থেকে শব্দ সংকেত আমাদের ঘরে রাখা টেলিভিশন সেট বা গ্রাহক যন্ত্রে আসে।

টেলিভিশন সেটের সাহায্যে শব্দ ও ছবি গ্রহণ

আমরা বাড়িতে যে টেলিভিশন সেট ব্যবহার করি তা হল একটি টেলিভিশন গ্রাহক যন্ত্র। এতে শব্দ ও ছবি সংকেত গ্রহণের জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকে। যে কোনো টেলিভিশন সেটই কোনো না কোনো আউটডোর (বাড়ির ছাদে রাখা বা ঘরের বাইরে রাখা) অ্যানটেনা অথবা ইনডোর অ্যানটেনার সাথে তারের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে।

প্রেরক যন্ত্র কর্তৃক প্রেরিত তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ আমাদের টিভি সেটের অ্যানটেনায় আসে (বাহকের কম্পাঙ্কের সাথে টিভি সেটটি যদি টিউনিত করা থাকে, অথবা যে চ্যানেলে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হচ্ছে, টিভি সেটটি যদি সে চ্যানেলে ধরা থাকে) এবং তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি করে। এই তড়িৎপ্রবাহ তারের মাধ্যমে টেলিভিশন সেটের গ্রাহকযন্ত্রে যায়। টেলিভিশন সেটের শব্দ গ্রহণকারী গ্রাহকযন্ত্র এই তড়িৎ সংকেত গ্রহণ করে বিবর্ধিত করে এবং একমুখী বা রেকটিফাই করে। পরে একে লাউড স্পিকারের অন্তর্গামী প্রান্তে প্রদান করে। লাউড স্পিকার এই তড়িৎ সংকেতকে মূল শব্দে রূপান্তরিত করে। এই শব্দ আমরা শুনতে পাই।



চিত্র : ২৩.৯

অ্যানটেনার সাহায্যে টিভি সেট ছবির জন্য প্রেরিত তাড়িতচৌম্বক বাহক তরঙ্গ গ্রহণ করে। রেকটিফায়ার বাহক তরঙ্গ থেকে ভিডিও তড়িৎ সংকেতকে পৃথক করে, বিবর্ধকের সাহায্যে এই তড়িৎ সংকেতকে বিবর্ধিত করা হয় এবং ইলেকট্রনগানে তা প্রদান করা হয়।

কোনো টিভির পর্দাকে আমরা বাইরে থেকে চ্যাপ্টা কাচ খন্ড বা কাচের পর্দা হিসেবে দেখি। এটি আসলে কাচের পর্দা নয় বা চ্যাপ্টা কোনো কাচ খন্ডও নয়। এটি মোচাকৃতি একটি ক্যাথোডরে টিউব যার নাম পিকচার টিউব। আমরা বাইরে থেকে টিভির যে পর্দাটি দেখি সেটি আসলে পিচকার টিউবের সামনের অংশ। মোচাকৃতি পিকচার টিউবের পিছনের প্রান্তে ইলেকট্রনগান সংযুক্ত থাকে। ভিডিও সংকেত গ্রহণের পর ইলেকট্রনগান সুইয়ের ন্যায় সরু ইলেকট্রন বীম বা স্রোত ছুঁড়তে থাকে। সংকেতের তীব্রতার ওপর ইলেকট্রনের সংখ্যা নির্ভর করে।

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে, এই পিকচার টিউবে কী করে ছবির সৃষ্টি হয়। পিকচার টিউবের সম্মুখের অংশের (টিভি পর্দা হিসেবে যাকে আমরা দেখি) ভিতরের পিঠে একটি প্রতিপ্রভ রাসায়নিক পদার্থের প্রলেপ দেওয়া থাকে। এই প্রতিপ্রভ রাসায়নিক পদার্থটির নাম ফসফর। প্রতিপ্রভ পদার্থের ধর্ম হল, এতে কোনো তড়িৎ চার্জ বা ইলেকট্রন এসে পড়লে যে স্থানে ইলেকট্রন এসে পড়ে সে স্থানটি আলো বিকিরণ করে। টিভির পর্দার প্রতিপ্রভ ফসফরে ইলেকট্রনগান থেকে যখন ইলেকট্রন বীম এসে পড়ে তখন এই পর্দা থেকে আলো নিঃসৃত হয় বা এতে আলোক ঝলকের সৃষ্টি হয়। পতিত ইলেকট্রন বীমের তীব্রতা বা ইলেকট্রনের সংখ্যা অনুসারে নিঃসৃত আলোক ঝলকের তীব্রতা হয় অর্থাৎ পতিত ইলেকট্রনের সংখ্যা অনুসারে টিভির পর্দায় উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল আলোক বিন্দু বা ঝলকের সৃষ্টি হয়। আমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, টেলিভিশন ক্যামেরার ছবি স্ক্যান করার ব্যাপারটি। ছবির উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল অংশের জন্য যথাক্রমে অধিক সংখ্যক ইলেকট্রন ও কম সংখ্যক ইলেকট্রন আমরা পেয়েছিলাম। এখানে ঘটে উল্টো ঘটনা– ক্যামেরার আলোর তীব্রতা অনুসারে পেয়েছিলাম ইলেকট্রন সংখ্যা আর এখানে ইলেকট্রনের সংখ্যা অনুসারে পাওয়া যাচ্ছে আলোর তীব্রতা। ক্যামেরার ছবি থেকে পাওয়া গিয়েছিল ইলেকট্রন বা তড়িৎ সংকেত, এখানে তড়িৎ সংকেত থেকে পাওয়া যাচ্ছে উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল আলোক বিন্দু। এই উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল আলোক বিন্দুর সমন্বয়েই টিভির পর্দায় ফুটে উঠছে ক্যামেরার থেকে পাঠানো ছবি।

মোটামুটিভাবে এই হলো সাদাকালো টেলিভিশনের কার্যপ্রণালি।

রঙিন টেলিভিশন

রঙিন ও সাদা–কালো টেলিভিশনের মূল কার্যনীতিতে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। টেলিভিশনে রঙিন অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য যে সব মৌলিক যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় তা সাদা–কালো অনুষ্ঠান সম্প্রচারের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির মতোই। এছাড়া বিভিন্ন রঙ সম্পর্কিত তথ্য প্রেরণ ও গ্রহণের জন্য বাড়তি কিছু আলোকীয় এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হয়।

রঙিন টেলিভিশন ক্যামেরায় তিনটি মৌলিক রঙ (লাল, নীল এবং সবুজ)–এর জন্য তিনটি পৃথক পৃথক ইলেকট্রন টিউব থাকে। রঙিন টেলিভিশন গ্রাহক যন্ত্রেও তিনটি ইলেকট্রনগান থাকে। রঙিন টেলিভিশনের পর্দা তৈরি হয় তিন রকম ফসফর দানা দিয়ে। একটি বিশেষ রং শুধু তার বিশেষ রঙের ফসফরাস দানাগুলোকে আলোকিত করে। ফলে টেলিভিশন টিউবের পর্দায় একই সাথে ফুটে ওঠে লাল, নীল ও সবুজ রঙের বিন্দু এবং এদের বিভিন্ন রকম মিশ্রণে টেলিভিশনের পর্দায় ফুটে ওঠে রঙিন ছবির বিভিন্ন রং।

২৩.১০। রাডার
Radar

রাডার এমন একটি যন্ত্র যার সাহায্যে দূরবর্তী কোনো বস্তুর উপস্থিতি, দূরত্ব ও দিক নির্ণয় করা যায়। ইংরেজি RADAR শব্দটি Radio Detection And Ranging শব্দের সংক্ষেপিত রূপ। রাডারকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। রাডার হল, এমন একটি কৌশল বা ব্যবস্থা যার সাহায্যে রেডিও প্রতিধ্বনির মাধ্যমে কোনো বস্তুর উপস্থিতি জানা যায়। বস্তুটির অভিমুখ ও রেঞ্জ বা পাল্লা নির্ণয় করা যায়, বস্তুটির বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করা যায় এবং এ সব তথ্য বা উপাত্তকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়। যুদ্ধে শত্রু বিমানের উপস্থিতি ও গতিবিধি জানার জন্য মূলত এর উদ্ভব হলেও শান্তির সময় সমুদ্র ও আকাশে যথাক্রমে জাহাজ ও বিমানের পথ নির্দেশ, ঝড়ের পূর্বাভাস ইত্যাদি কাজে এটি ব্যবহৃত হয়।

রাডারে যেসব যন্ত্রপাতি থাকে তাদের তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় :

১। **একটি প্রেরক যন্ত্র** : এই যন্ত্র থেকে নির্দিষ্ট শক্তি বিকীর্ণ হয় বা প্রেরিত হয় যাতে দূরবর্তী বস্তুটি (যে বস্তুর উপস্থিতি ও অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা হবে) থেকে বিকিরণ প্রতিফলিত হতে পারে। রাডারে মাইক্রোওয়েভ বা অতি হ্রস্ব তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়।

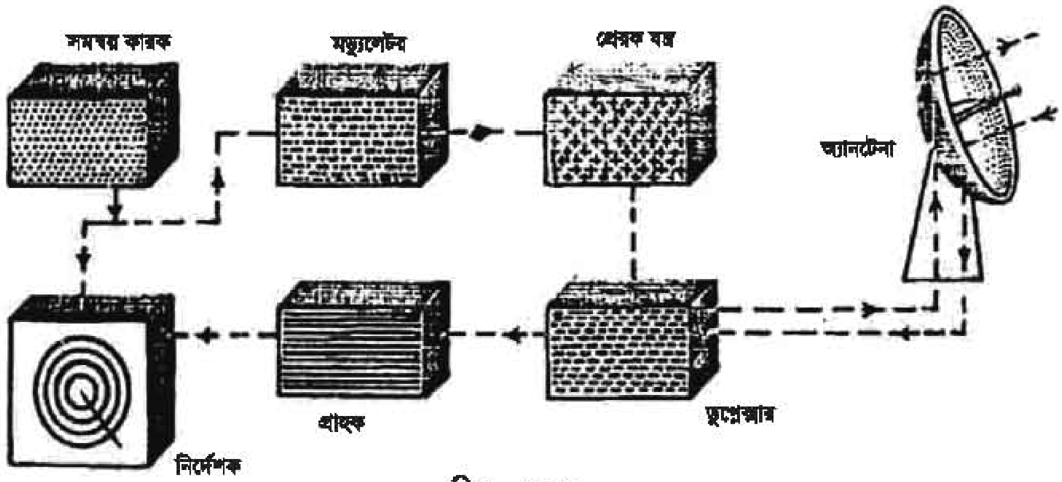
২। **একটি গ্রাহক যন্ত্র** : এটি প্রেরকযন্ত্র যে অবস্থানে থাকে সেখানেই অবস্থান করে। এর সাহায্যে লক্ষবস্তু থেকে প্রতিফলিত তরঙ্গ গ্রহণ করা হয়।

৩। **একটি নির্দেশক** : প্রাপ্ত তথ্যকে উপস্থাপনের জন্য থাকে একটি নির্দেশক (indicator)। এটি আসলে একটি ক্যাথোডরে টিউব।

৪। বিভিন্ন কার্যকে সমন্বিত করার জন্য এদের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি সময় বা কাল নির্ণায়ক বর্তনী থাকে। প্রেরক যন্ত্র রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি শক্তির ক্ষুদ্র ক্ষমতা সম্পন্ন পালস্ বা শব্দ উৎপাদন করে। উচ্চ দিকবিমুখী অ্যানটেনা ব্যবস্থা এই পালস বিকরিত বা বিকীর্ণ করে বা ছড়িয়ে দেয়। গ্রাহকযন্ত্রটি কোনো বস্তু থেকে প্রতিফলিত বিকিরণ বা প্রতিধ্বনি উদঘাটন বা গ্রহণ করে। নির্দেশক একে সংকেতে প্রকাশ করে। নির্দেশক বস্তুটির দূরত্ব, উন্নতি সংক্রান্ত তথ্য ক্যাথোড–রে টিউবের পর্দায় উপস্থাপন করে।

রাডারের কার্যপ্রণালি

নিচের ব্লকচিত্রে রাডারের কার্যাবলি দেখানো হল :



চিত্র : ২৩.১০

রাডারে অ্যামপ্লিফায়ারের ব্যবহার

রাডারের প্রেরকযন্ত্র থেকে প্রেরিত মাইক্রোওয়েভ (বেতার তরঙ্গ) এর ক্ষমতা কয়েক হাজার কিলোওয়াট হলেও বহু দূরবর্তী লক্ষবস্তু থেকে ঐ তরঙ্গ যখন প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে তখন তার ক্ষমতা খুব অল্প থাকে। এই জন্য প্রতিফলিত তরঙ্গকে বহুগুণ বিবর্ধিত করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই তরঙ্গের বিবর্ধনের জন্য অ্যামপ্লিফায়ার ব্যবহার করা হয়। অ্যামপ্লিফায়ারের সাহায্যে প্রতিফলিত সংকেতকে বিবর্ধিত করে নির্দেশকে প্রয়োগ করলে তা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

কোনো কোনো রাডারের সাথে কম্পিউটার, উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্র বা কৌশল (device) এবং স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রক যন্ত্র সংযুক্ত থাকে। এগুলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহার করা হয়।

রাডারের ব্যবহার

যুদ্ধে ব্যবহার

(১) দূর পাল্লায় শত্রু বিমান বা শত্রু জাহাজ খুঁজে বের করতে রাডার ব্যবহার করা হয়।

(২) আক্রমণাত্মক (offensive) ও রক্ষণাত্মক (defensive) যুদ্ধাস্ত্রের সঠিক নিয়ন্ত্রণে রাডার ব্যবহৃত হয়।

(৩) মিশাইল ব্যবস্থাকে ব্যবহারের নির্দেশনা (guidance) ও আদেশ (command) দানে ব্যবহৃত হয়।

শান্তিকালীন ব্যবহার

রাডারের বহুবিধ শান্তিকালীন ব্যবহার রয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকটি হল :

(১) বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ।

(২) সামুদ্রিক জাহাজ নিয়ন্ত্রণ ও সমুদ্র বন্দরের নিকট জাহাজের গতি নিয়ন্ত্রণ।

(৩) বিমানের ওঠা–নামা নিয়ন্ত্রণ।

(৪) চাঁদ ও নিকটবর্তী গ্রহদের নিয়ে গবেষণা।

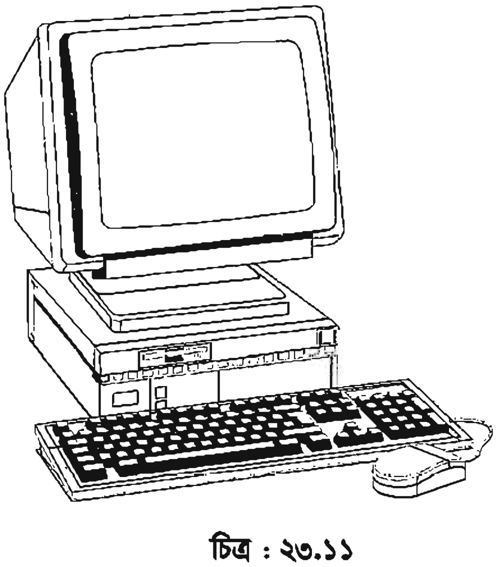
(৫) প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদির পূর্বাভাস।

২৩.১১। কম্পিউটার
Computer

আমরা কম্পিউটারের যুগে বাস করছি। যতই দিন যাচ্ছে কম্পিউটার ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। কম্পিউটার আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী হতে চলেছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্মের অনেক কিছুই কম্পিউটারের ব্যবহার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। কোনো কোনো এলাকা বা বিষয় যেমন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে কম্পিউটার হয়ে উঠেছে অপরিহার্য। কম্পিউটার গাণিতিক হিসাব কষতে পারে, গাণিতিক যুক্তি দিতে পারে। গাণিতিক হিসাব ছাড়াও কম্পিউটার কোনো কিছু পছন্দ করা বা নির্বাচন করা, নকল করা, তুলনা করা, ধারাবাহিকভাবে সাজানো ইত্যাদি বিভিন্ন কাজ করতে পারে। ব্যবসা, বাণিজ্য, প্রশাসন, শিক্ষা, শিল্প, চিকিৎসা, যোগাযোগ, প্রতিরক্ষা, বিনোদন প্রভৃতি ক্ষেত্রে কম্পিউটারের প্রয়োগ ও ব্যবহার দিন দিন বেড়ে চলেছে। ছয়টি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য কম্পিউটার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্র হিসাবে বিবেচিত। এই ছয়টি বৈশিষ্ট্য হল এর গতি (কাজ করার দ্রুততা), সঞ্চয় ক্ষমতা (তথ্য জমা করে রাখার ক্ষমতা), সঙ্গতিপূর্ণতা (consistency) এবং নির্ভুলতা বা সঠিকতা, ক্লান্তিহীনতা ও স্বয়ংক্রিয়তা। কম্পিউটার অবিশ্বাস্য দ্রুত কাজ করতে পারে, সেকেন্ডে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ গাণিতিক হিসাব করতে পারে।

কম্পিউটার কী?

কম্পিউটার শব্দের অর্থ গণক বা হিসাবকারী। কম্পিউটার শুধু একটি হিসাবকারী যন্ত্রই নয়, আরো অনেক কিছু। এই অধ্যায়ের ভূমিকায় তোমরা জেনেছ যে কম্পিউটার শুধু গাণিতিক হিসাবই কষে না, যুক্তি ও সিদ্ধান্তমূলক কাজও করে। মানুষের তুলনায় অত্যন্ত দ্রুত গতিতে, বিশ্বস্ততাসহ, অক্লান্তভাবে সঙ্গতিপূর্ণ ও নির্ভুলভাবে কাজ করে কম্পিউটার। কম্পিউটার নিজে ভুল করে না, কম্পিউটারের নির্দেশদানে বা প্রোগ্রামিং এ কোনো ভুল থাকলে ভুল হতে পারে। কম্পিউটার ভুল শনাক্ত করতে পারে কিন্তু নিজে নিজে ভুল সংশোধন করতে পারে না।

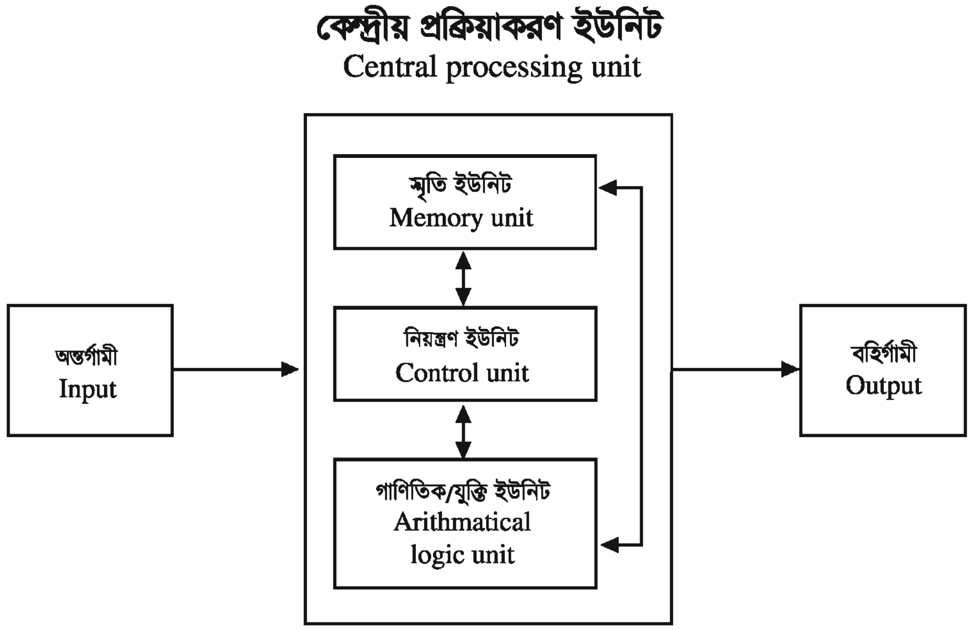


চিত্র : ২৩.১১

মানুষের মস্তিষ্কের ক্ষমতার সাথে কম্পিউটারের ক্ষমতার এটা একটা উল্লেখযোগ্য পার্থক্য।

কম্পিউটারের গঠন

কম্পিউটার একটি উন্নত ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা। কম্পিউটার তথ্য সংগ্রহ করে, সুনির্দিষ্ট নির্দেশ অনুযায়ী তথ্যকে প্রক্রিয়াজাত করে এবং প্রয়োজনানুযায়ী ফলাফল উপস্থাপন করে। কম্পিউটার যেখানে তথ্য গ্রহণ করে তাকে বলা হয় অন্তর্গামী (input) বা গ্রহণমুখ, যেখানে তথ্য প্রক্রিয়াজাত করে তাকে বলা হয় কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট (Central Processing Unit), যে প্রান্ত থেকে ফলাফল পাওয়া যায় তাকে বলা হয় বহির্গামী (out put) বা নির্গমন মুখ। নিচে কম্পিউটারের একটি মৌলিক কাঠামো দেওয়া হল :



চিত্র : ২৩.১২ : কম্পিউটারের মৌলিক কাঠামো

কম্পিউটারের ব্যবহার

আমরা অধ্যায়ের শুরুতেই বলেছি যে, আমাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে। কম্পিউটার ব্যবহারের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলো হল :

(১) চিকিৎসা
(২) ব্যবসা–বাণিজ্য
(৩) যাতায়াত ব্যবস্থা
(৪) শিল্প কারখানা
(৫) শিক্ষা
(৬) প্রতিরক্ষা
(৭) গবেষণা
(৮) মুদ্রণ
(৯) আবহাওয়ার পূর্বাভাস
(১০) ডিজাইনের কাজ।

(১) চিকিৎসা : চিকিৎসা ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। রোগীর পরিচয়, ঠিকানা, রোগের লক্ষণ, ইত্যাদি রেকর্ড করে রাখা, ওষুধ নির্বাচন, চোখ পরীক্ষা, এক্সরে বা অন্যান্য পরীক্ষায় কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়। এছাড়া হাসপাতালের হিসাবনিকাশ, রোগীর অ্যাপয়েন্টমেন্ট (পরবর্তী আসার দিন, তারিখ, সময়) ইত্যাদি কাজে কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়।

(২) **ব্যবসা–বাণিজ্য :** পণ্যের মজুদ নিয়ন্ত্রণ, ব্যবসায়িক যোগাযোগ, টিকেট বুকিং, ব্যাংকিং সিস্টেম, স্টাফদের বেতন, আয় ব্যয়ের বাজেট ও হিসাব নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ব্যবসায়িক কাজে কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়। এ সব কাজ কম্পিউটার স্বল্প সময়ে করতে পারে।

(৩) **যাতায়াত ব্যবস্থা :** জাহাজ, বিমান ও মোটরগাড়ি, ট্রেন ইত্যাদি যানবাহনের ট্রাফিক কন্ট্রোল, গতি নিয়ন্ত্রণ, টিকেট বুকিং ইত্যাদি কাজে কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়। এছাড়া মহাশূন্যযান পাঠানো, নিয়ন্ত্রণ, চালনা ইত্যাদিতে কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে।

(৪) **শিল্প কারখানা :** পণ্য উৎপাদনে স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ, পণ্যের গুণগত মান যাচাই, তথ্য সংগ্রহ, কর্মচারীদের বেতন ভাতা, কাজের সিডিউলের হিসাব ইত্যাদি কাজে কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে। পারমাণবিক রিএ্যাক্টর চালনা বা এই ধরনের জটিল ও আধুনিক সব যন্ত্রের ব্যবহারে কম্পিউটার অপরিহার্য।

(৫) **শিক্ষা :** শ্রেণীকক্ষে শিখন–শিক্ষণ, স্বশিখন, পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি কাজে কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়।

(৬) **প্রতিরক্ষা :** সেনাবাহিনী পরিচালনা, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণ, যোগাযোগ ইত্যাদি কাজে কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়।

(৭) **গবেষণা :** বিভিন্ন গবেষণা কর্মে কম্পিউটারের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজে কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়।

(৮) **মুদ্রণ :** কম্পিউটারের ব্যবহার মুদ্রণ শিল্পে বিপ্লব এনেছে। মুদ্রণের জন্য কম্পোজ, ডিজাইন ইত্যাদি কাজে কম্পিউটার ব্যবহারের ফলে অস্বাভাবিকভাবে মুদ্রণ ব্যয় কমে এসেছে।

(৯) **আবহাওয়ার পূর্বাভাস :** আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিতে বিপুল পরিমাণ তথ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ প্রয়োজন পড়ে এবং সবচেয়ে বড় কম্পিউটারগুলো এখানে ব্যবহৃত হচ্ছে।

(১০) **ডিজাইন কাজ :** কম্পিউটার মানুষের বুদ্ধিগত কাজে সহায়করূপে এখন ব্যবহৃত হতে পারে। ফলে স্থপতি, এমনকি শিল্পীদের ডিজাইনের কাজে কম্পিউটার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে সাহায্যকারীরূপে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। নিচের কোনটি অনুরূপ বা অবিকল?

ক. স্পিকার– শব্দ শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তর করে।

খ. অ্যানটেনা– তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গাকে তড়িৎপ্রবাহে পরিবর্তন করে।

গ. মডুলেটর– মডুলেটেড তরঙ্গা হতে অডিও সংকেত এবং বাহক তরঙ্গাকে পৃথক করে।

ঘ. স্ক্যানিং– ইলেক্ট্রন বীমকে টার্গেট প্লেটের সকল বিন্দুতে আঘাত করানোর প্রক্রিয়া।

২। যদি নিয়ন্ত্রিতভাবে সিলিকনের সাথে ইন্ডিয়াম মেশানো হয় তবে –

i. সিলিকন p টাইপ অর্ধপরিবাহী হয়

ii. সিলিকন ধনাত্মক চার্জগ্রস্ত হয়

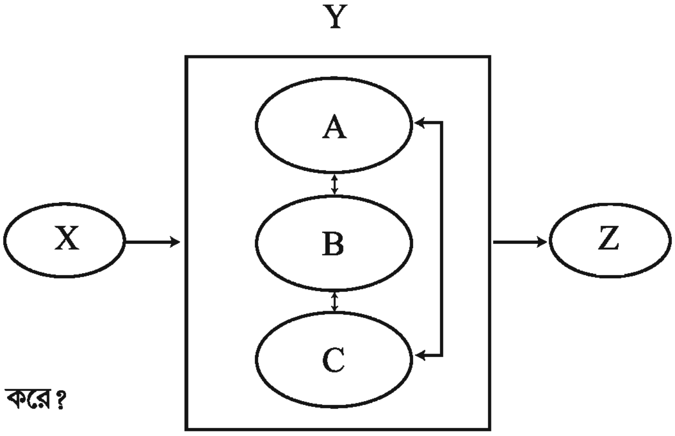
iii. সিলিকন n টাইপ অর্ধপরিবাহী হয়

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i খ. iii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

নিম্নে কম্পিউটারের মৌলিক কাঠামো প্রদান করা হল। এ থেকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



৩। A, B ও C অংশ সম্মিলিতভাবে কী কাজ করে?

ক. তথ্য সংগ্রহ করে CPU–তে প্রেরণ করে

খ. সংগৃহীত তথ্য সরাসরি out put–এ পাঠায়

গ. ফলাফল প্রদর্শন করে

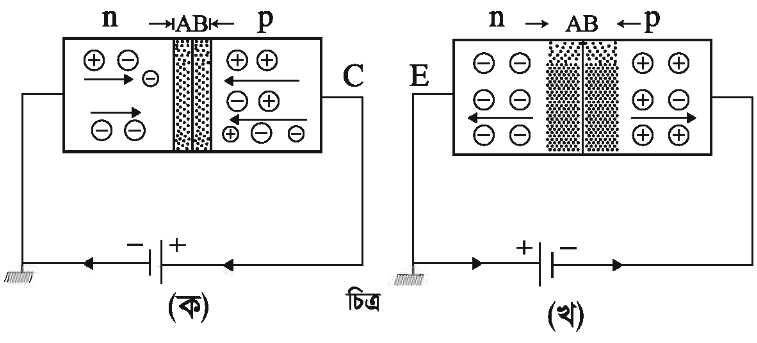
ঘ. সংগৃহীত তথ্য প্রক্রিয়াজাত করে

৪। কোন অংশটি নিয়ন্ত্রণ ইউনিট?

ক. Z খ. X

গ. B ঘ. C

সৃজনশীল প্রশ্ন



চিত্র

উপরের চিত্রদ্বয়ের আলোকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ক. চিত্রে AB অংশের নাম কী?

খ. চিত্র ‘ক’ ও ‘খ’–এ AB অংশের ভিন্ন প্রশস্ততার কারণ– ব্যাখ্যা কর।

গ. ‘ক’ চিত্র ব্যবহার করে কীভাবে AC প্রবাহকে DC প্রবাহে রূপান্তর করা যায় ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আমাদের দৈনন্দিন জীবনে AB অংশটির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান

MODERN PHYSICS

এক্সরে এক ধরনের তাড়িতচৌম্বক বিকিরণ। চিকিৎসাক্ষেত্র, শিল্প–কারখানা, গোয়েন্দা বিভাগ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই রশ্মির ব্যবহার রয়েছে। আলফা, বিটা ও গামা রশ্মি হল তেজস্ক্রিয় বিকিরণ। এসব বিকিরণের যেমন অনেক কল্যাণকর ব্যবহার রয়েছে তেমনি এসব বিকিরণ থেকে বিপদের সম্ভাবনাও আছে। এই অধ্যায়ে এক্সরে এর ধর্ম ও ব্যবহার; তেজস্ক্রিয়তা, তেজস্ক্রিয় মৌলের অর্ধায়ু, বিভিন্ন প্রকার তেজস্ক্রিয় রশ্মির ধর্ম, তেজস্ক্রিয়তার কল্যাণকর ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও এ অধ্যায়ে আছে মৌলিক কণিকা ও এদের ধর্ম এবং মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও গঠন উপাদান সম্পর্কে আলোচনা।

২৪.১। এক্সরে
X-Ray

এক্সরে হল ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট তাড়িতচৌম্বক বিকিরণ। এই রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 10^{-10}m এর কাছাকাছি। বিজ্ঞানী উলহ্হেলেম রন্টজেন ১৮৯৫ সালে এক্সরে আবিষ্কার করেন। একই সালে রন্টজেন লক্ষ করেন যে দ্রুতগতি সম্পন্ন ইলেকট্রন কোনো ধাতুকে আঘাত করলে তা থেকে উচ্চ ভেদন ক্ষমতা সম্পন্ন অজানা প্রকৃতির (আবিষ্কারের সময় প্রকৃতি অজানা ছিল পরে অবশ্য প্রকৃতি উদঘাটিত হয়েছে) এক ধরনের বিকিরণ উৎপন্ন হয়। এই বিকিরণকে বলা হয় এক্সরে বা এক্সরশ্মি (X-Ray)।

এক্সরে ও সাধারণ আলোর মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল এদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে। সাধারণ আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে 7×10^{-7}m থেকে 4×10^{-7}m –এর কাছাকাছি। এক্সরের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 10^{-8}m থেকে 10^{-13}m–এর কাছাকাছি। সাধারণ আলো দৃশ্যমান এবং বিভিন্ন রঙে বিভক্ত হয়। কিন্তু এক্সরে দৃশ্যমান নয়। সাধারণ আলোর পথে অস্বচ্ছ পদার্থ থাকলেই তা ভেদ করে যেতে পারে না। কিন্তু এক্সরে উচ্চ ভেদন ক্ষমতা সম্পন্ন । অনেক কিছু ভেদ করে যেতে পারে। এক্সরে আয়ন সৃষ্টিকারী বিকিরণ গ্যাসের মধ্য দিয়ে যাবার সময় গ্যাসকে আয়নিত করে, কিন্তু সাধারণ আলো তা করে না।

এক্সরে দুই প্রকার

(ক) কোমল এক্সরে (Soft X-ray) এবং

(খ) কঠিন এক্সরে (Hard X-ray)।

এক্সরে যন্ত্রে কম বিভব পার্থক্য প্রয়োগ করে যে এক্সরে পাওয়া যায় অর্থাৎ যে এক্সরের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত বেশি, ফলে ভেদনক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম, তাকে কোমল এক্সরে বলে। এক্সরশ্মি যন্ত্রের প্রযুক্ত বিভব পার্থক্য বেশি হলে যে এক্সরে উৎপাদিত হয় তাকে অর্থাৎ যে এক্সরের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত কম ও ভেদনক্ষমতা বেশি তাকে কঠিন এক্সরে বলে।

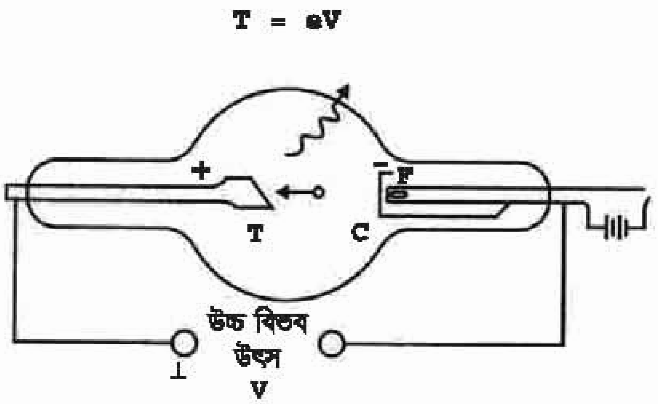
একক : এক্সরের একক হল রন্টজেন। এক রন্টজেন বলতে সে পরিমাণ বিকিরণ বুঝায় যা স্বাভাবিক চাপ ও তাপমাত্রায় এক মিলিমিটার বায়ুতে এক স্থির বৈদ্যুতিক আধানের সমান আধান উৎপন্ন করতে পারে।

বিজ্ঞানী রন্টজেন তড়িৎক্ষরণ নলে (Discharge tube) 10^{-3}mm পারদ চাপে বায়ুর মধ্যে তড়িৎক্ষরণের পরীক্ষা করতে গিয়ে লক্ষ করেন যে, নল থেকে কিছু দূরে অবস্থিত বেরিয়াম প্লাটিনোসায়ানাইড দ্বারা আবৃত পর্দায় প্রতিপ্রভার সৃষ্টি হচ্ছে। পরে তিনি আবিষ্কার করেন যে, তড়িৎক্ষরণ নল থেকে ক্যাথোড রশ্মি যখন নলের দেয়ালে পড়ে তখন এই রশ্মির উৎপত্তি হয়। তিনি এই রশ্মির নাম রাখেন এক্সরে বা এক্সরশ্মি।

দ্রুতগতি সম্পন্ন ইলেকট্রন কোনো ধাতুকে আঘাত করলে তা থেকে অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের এবং উচ্চ ভেদন ক্ষমতা সম্পন্ন অজানা প্রকৃতির এক প্রকার তাড়িতচৌম্বক বিকিরণ উৎপন্ন হয়। এ বিকিরণকে এক্সরে বা এক্সরশ্মি বলে।

২৪.২। এক্সরে উৎপাদন
Production of X-ray

চিত্রে একটি 'এক্সরে টিউব' এর প্রয়োজনীয় অংশসমূহ দেখানো হয়েছে। ফিলামেন্ট F–এর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎপ্রবাহ ক্যাথোড C-কে উত্তপ্ত করে। ফলে ইলেকট্রন তাপীয় নিঃসরণ প্রক্রিয়ায় ক্যাথোড থেকে মুক্ত হয়ে আসে। তারপর একটি অতি উচ্চ বিভব প্রভেদ V–এর দ্বারা ইলেকট্রনগুলো ত্বরিত হয় ও অ্যানোডরূপী লক্ষবস্তু T–তে আঘাত করে। ফলে এক্সরে উৎপন্ন হয়।



চিত্র : ২৪.১ একটি এক্সরে টিউবের প্রয়োজনীয় অংশ

এক্সরের ধর্ম
Properties of X-ray

বিভিন্ন পরীক্ষা–নিরীক্ষার মাধ্যমে এক্সরের নিম্নোক্ত ধর্মাবলি আবিষ্কৃত হয়েছে :

১। এ রশ্মি সরলরেখায় গমন করে।

২। এটি অত্যধিক ভেদন ক্ষমতা সম্পন্ন।

৩। এক্সরে তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ। তড়িৎ ক্ষেত্র বা চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা এটি বিচ্যুত হয় না।

৪। এটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য খুব ছোট, প্রায় 10^{-10}m এর কাছাকাছি।

৫। সাধারণ আলোর ন্যায় এক্সরের প্রতিফলন, প্রতিসরণ, ব্যতিচার, অপবর্তন ও পোলারায়ন হয়ে থাকে।

৬। ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর এর প্রতিক্রিয়া আছে।

৭। কোনো ধাতব পৃষ্ঠে এ রশ্মি পতিত হলে তা থেকে ইলেকট্রন নিঃসৃত হয়, সুতরাং এ রশ্মির আলোক তড়িৎ ক্রিয়া আছে।

৮। জিঙ্ক সালফাইড, বেরিয়াম প্লাটিনোসায়ানাইড প্রভৃতি পদার্থে এ রশ্মি প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করে।

৯। এটা আয়ন সৃষ্টিকারী বিকিরণ। গ্যাসের মধ্য দিয়ে যাবার সময় এটা গ্যাসকে আয়নিত করে।

১০। এটি আধান নিরপেক্ষ।

২৪.৩। এক্সরের ব্যবহার
Use of X-ray

এক্সরের বিভিন্ন ব্যবহার রয়েছে। এ রশ্মি চিকিৎসাবিজ্ঞানে, শিল্প কারখানায় ও গোয়েন্দাদের কাজে ব্যবহৃত হয়।

(ক) চিকিৎসাবিজ্ঞানে ব্যবহার
Use in Medical Science

১। স্থানচ্যুত হাড়, হাড়ে দাগ বা ফাটল, ভেঙে যাওয়া হাড় (fracture), শরীরের ভিতরের কোনো বস্তুর বা ফুসফুসের কোনো ক্ষত ইত্যাদির অবস্থান নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়।

২। ক্যানসারের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

৩। পরিপাক (Digestive) নালী দিয়ে খাদ্যবস্তুর গমন অনুসরণ, আলসার ও দাঁতের গোড়ায় আলসার নির্ণয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়।

(খ) শিল্পে ব্যবহার
Use in Industry

১। ধাতব ঢালাইয়ের দোষ–ত্রুটিপূর্ণ ওয়েল্ডিং, ধাতব পাতের গর্ত ইত্যাদি নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়।

২। কেলাস গঠন পরীক্ষায় এক্সরে ব্যবহৃত হয় এবং মণিকারেরা এর সাহায্যে আসল ও নকল গহনা শনাক্ত করতে পারেন।

৩। টফি, লজেন্স, সিগারেট ইত্যাদির মান বজায় আছে কিনা বা টফি ও লজেন্সে ক্ষতিকর কোনো কিছু মিশ্রিত হয়েছে কিনা তা জানার জন্য ব্যবহৃত হয়।

(গ) গোয়েন্দা বিভাগে ব্যবহার
Use in detective department

১। কাঠের বাক্স বা চামড়ার থলিতে বিস্ফোরক লুকিয়ে রাখলে তা খুঁজে বের করতে ব্যবহার করা হয়।

২। কাস্টমস কর্মকর্তারা চোরাচালানের দ্রব্যাদি খুঁজে বের করতে ব্যবহার করেন।

২৪.৪। তেজস্ক্রিয়তা
Radioactivity

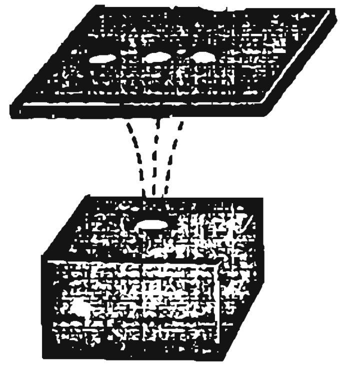
এক্স–রে আবিষ্কারের মাস তিনেক পরে ফরাসী বিজ্ঞানী হেনরী বেকরেল (Henry Becquerel, 1852-1908) ১৮৯৬ সালে এক্স–রে নিয়ে গবেষণাকালে এমন একটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রাকৃতিক ঘটনা আবিষ্কার করে ফেলেন যা সারা বিশ্বের বিজ্ঞান জগতে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করে। তিনি দেখতে পান যে, ইউরেনিয়াম ধাতুর নিউক্লিয়াস থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অবিরত বিশেষ ভেদনশক্তি সম্পন্ন রশ্মি বা বিকিরণ নির্গত হয়। তাঁর নামানুসারে এই রশ্মির নাম দেওয়া হয় 'বেকরেল রশ্মি'। বেকরেল লক্ষ করেন, যে মৌল থেকে এই রশ্মি নির্গত হয় তা একটি সম্পূর্ণ নতুন মৌলে রূপান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত এই রশ্মি নির্গমন অব্যাহত থাকে। প্রাকৃতিক এই ঘটনাটি সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত, মানব সৃষ্ট কোনো শক্তিই এই রশ্মি নির্গমন বন্ধ বা হ্রাসবৃদ্ধি করতে পারে না। পরবর্তীকালে মাদাম কুরি (Madame Marie Curie, 1867-1934) ও তাঁর স্বামী পীয়ারে কুরি (Pierre Curie, 1859-1906) ব্যাপক গবেষণা চালিয়ে দেখতে পান রেডিয়াম, পোলোনিয়াম, থোরিয়াম, অ্যাকটিনিয়াম, প্রভৃতি ভারী মৌলের নিউক্লিয়াস থেকেও 'বেকরেল রশ্মির' মতো একই ধরনের রশ্মি নির্গত হয়। এই রশ্মি এখন তেজস্ক্রিয় (radioactive rays) রশ্মি নামে পরিচিত। যে সকল মৌল হতে তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত হয় তাদেরকে তেজস্ক্রিয় মৌল বলে। তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গমনের এই ঘটনাকে তেজস্ক্রিয়তা (Radioactivity) বলে। প্রকৃত পক্ষে যে সকল মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা 82–এর চেয়ে বেশি তারা অস্থায়ী হয়ে থাকে। এ সকল মৌল আলফা (α), বিটা (β) ও গামা (γ) নামে তিন ধরনের শক্তিশালী রশ্মি নির্গমন করে কালক্রমে ভেঙে অন্যান্য লঘুতর মৌলে রূপান্তরিত হয়। যেমন রেডিয়াম ধাতু তেজস্ক্রিয়তার ফলে ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয়ে শেষে সীসায় পরিণত হয়। তেজস্ক্রিয়তাকে নিচের মতো করে সংজ্ঞায়িত করা যায়।

ভারী মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াস থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অবিরত আলফা, বিটা ও গামা রশ্মি নির্গমনের প্রক্রিয়াকে তেজস্ক্রিয়তা বলে।

২৪.৫। তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রকৃতি
Nature of radioactive rays

নিচের সহজ পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে নির্গত তিন ধরনের রশ্মির প্রকৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। একটি সীসার ব্লকে সরু লম্বা গর্ত করে (চিত্র ২৪.২) ঐ গর্তের মধ্যে রেডিয়ামজাত তেজস্ক্রিয় পদার্থ রাখা হল। গর্ত হতে সামান্য দূরে লম্বালম্বিভাবে একটি ফটোগ্রাফিক প্লেট রাখা হল যাতে রশ্মি প্লেটের উপর পড়তে পারে। এবার সমগ্র ব্যবস্থাটিকে একটি বায়ুশূন্য প্রকোষ্ঠের মধ্যে রেখে কাগজের তলের সাথে সমকোণে একটি শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করা হল। এখন ফটোগ্রাফিক প্লেট পরিস্ফুটিত করলে দেখা যাবে যে প্লেটের উপর তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দাগ রয়েছে। চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ না করলে প্লেটের উপর একটি মাত্র দাগ পাওয়া যেত। এ থেকে বোঝা যায় যে, মূল বিকিরণে তিন ধরনের রশ্মি আছে।

শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে এক ধরনের রশ্মি গেল সামান্য বেঁকে, অপরটি গেল উল্টোদিকে অপেক্ষাকৃত অধিক বেঁকে। তৃতীয়টি মোটেই বাঁকেনি। চৌম্বক ক্ষেত্রের অভিমুখ, কণাগুলোর গতির প্রারম্ভিক অভিমুখ এবং বিসরণের (Deflection) অভিমুখ থেকে সহজে বোঝা যায় প্রথম রশ্মিটি ধনাত্মক আলফা রশ্মি, দ্বিতীয় ঋণাত্মক বিটা রশ্মি এবং তৃতীয়টি আধান নিরপেক্ষ গামা রশ্মি। বিসরণ থেকে আরো বোঝা যায় আলফা রশ্মি বিটা রশ্মির তুলনায় অধিক ভারী।



চিত্র : ২৪.২

২৪.৬। তেজস্ক্রিয়তার বৈশিষ্ট্য
Characteristics of Radioactivity

১। যে সকল মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা 82–এর বেশি, সাধারণত সে সকল পরমাণু তেজস্ক্রিয় হয়।

২। তেজস্ক্রিয় পদার্থ সাধারণত আলফা, বিটা ও গামা এই তিন প্রকারের তেজস্ক্রিয় রশ্মি নিঃসরণ করে।

৩। তেজস্ক্রিয়তা একটি সম্পূর্ণ নিউক্লিয় ঘটনা। এর মাধ্যমে নিউক্লিয়াসের ভাঙনের ফলে একটি মৌল আর একটি নতুন মৌলে রূপান্তরিত হয়।

৪। তেজস্ক্রিয়তা একটি প্রাকৃতিক, স্বতঃস্ফূর্ত ও অবিরাম ঘটনা। চাপ, তাপ, বিদ্যুৎ বা চৌম্বক ক্ষেত্রের ন্যায় বাইরের কোনো প্রক্রিয়া দ্বারা এর সক্রিয়তাকে রোধ বা হ্রাসবৃদ্ধি করা যায় না।

২৪.৭। আলফা, বিটা ও গামা রশ্মির ধর্ম
Properties of Alpha, Beta and Gamma rays

২৪.৭.১। আলফা রশ্মির ধর্ম

১। আলফা রশ্মি ধনাত্মক আধানযুক্ত আলফা কণার প্রবাহ। এর আধান 3.2×10^{-19} coloumb.

২। এই রশ্মি চৌম্বক ও তড়িৎ ক্ষেত্র দ্বারা বিচ্যুত হয়।

৩। এই রশ্মি তীব্র আয়নায়ন সৃষ্টি করতে পারে।

৪। এর ভর বেশি হওয়ায় ভেদন ক্ষমতা কম।

৫। স্বাভাবিক চাপ ও তাপমাত্রায় কয়েক সেন্টিমিটার বায়ু বা ধাতুর খুব পাতলা শিট দ্বারা এর গতি থামিয়ে দেওয়া যায়।

৬। এই রশ্মি ফটোগ্রাফিক প্লেটে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।
৭। এই রশ্মি জিঙ্ক সালফাইড পর্দায় প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করে।
৮। এই রশ্মি প্রচণ্ড বেগে নির্গত হয়।
৯। এটি একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াস।
১০। এর ভর হাইড্রোজেন পরমাণুর চার গুণ।

২৪.৭.২। বিটা রশ্মির ধর্ম

প্রথম দিকে যে বিটারশ্মি দেখা গেছে তার ধর্ম নিম্নরূপ

১। এই রশ্মি ঋণাত্মক আধানযুক্ত।
২। এই রশ্মি চৌম্বক ও তড়িৎ ক্ষেত্র দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয়।
৩। এই রশ্মি অত্যন্ত দ্রুত নির্গত হয়। এর দ্রুতি আলোর দ্রুতির শতকরা ৯৮ ভাগ হতে পারে।
৪। এই রশ্মি অতি উচ্চ দ্রুতি সম্পন্ন ইলেকট্রনের প্রবাহ। এর ভর ইলেকট্রনের সমান অর্থাৎ 9.11×10^{-31} kg।
৫। ফটোগ্রাফিক প্লেটে এর প্রতিক্রিয়া আছে।
৬। এই রশ্মি প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করতে পারে।
৭। এর ভেদন ক্ষমতা আলফা রশ্মির চেয়ে বেশি এবং এটি 0.01m পুরু অ্যালুমিনিয়াম পাত ভেদ করতে পারে।
৮। গ্যাসে যথেষ্ট আয়নায়ন সৃষ্টি করতে পারে।
৯। কোনো পদার্থের মধ্য দিয়ে যাবার সময় এই রশ্মি বিক্ষিপ্ত হয়।
১০। এর পথরেখা বাঁকা এবং বায়ুতে এর কোনো পাল্লা নেই।

পরবর্তীতে ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট বিটা কণা নির্গত হতে দেখা গেছে। এরা ইলেকট্রনের প্রতি কণিকা।

২৪.৭.৩। গামা রশ্মির ধর্ম

১। এই রশ্মি আধান নিরপেক্ষ।
২। এই রশ্মি তড়িৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা বিচ্যুত হয় না।
৩। এর দ্রুতি আলোর সমান অর্থাৎ 3×10^{8} m/sec.
৪। আলফা ও বিটা রশ্মির চেয়ে এই রশ্মির ভেদন ক্ষমতা অনেক বেশি। এটি বেশ কয়েক সেন্টিমিটার পুরু সীসার পাত ভেদ করে যেতে পারে।
৫। স্বল্প আয়নায়ন ক্ষমতা সম্পন্ন।
৬। এই রশ্মি প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করতে পারে।
৭। ফটোগ্রাফিক প্লেটে এই রশ্মি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।
৮। এর কোনো ভর নেই।
৯। এটি তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ।
১০। এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য খুবই ক্ষুদ্র, তাই শক্তি খুব বেশি।

২৪.৮। তেজস্ক্রিয় মৌলের অর্ধায়ু
Half-life of a Radioactive Element

একটি তেজস্ক্রিয় মৌলের কতগুলো পরমাণু কোন সময়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে তা আমরা হিসাব করে বের করতে পারি। কিন্তু কোন পরমাণুটি কখন ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তা আমরা বলতে পারি না। পরমাণুর ক্ষয় বিবেচনার জন্য এক গুচ্ছ পরমাণু বিবেচনা করা হয়। যে সময়ে কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থের মোট পরমাণুর ঠিক অর্ধেক পরিমাণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তাকে ঐ পদার্থের অর্ধায়ু বলে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, কোনো মৌলে ১০০,০০০টি তেজস্ক্রিয় পরমাণু আছে। এর অর্ধেক অর্থাৎ ৫০,০০০ টি পরমাণু ক্ষয় পেতে অর্থাৎ কোনো নতুন মৌলে রূপান্তরিত হতে যে সময় লাগে তাকে ঐ পদার্থের অর্ধায়ু বলে।

২৪.৯। তেজস্ক্রিয়তার একক
Unit of radioactivity

তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপের জন্য যে একক ব্যবহার করা হয় তার নাম বেকেরেল। প্রতি সেকেন্ডে একটি তেজস্ক্রিয় বিভাজন বা তেজস্ক্রিয় ক্ষয়কে এক বেকেরেল বলে।

২৪.১০। তেজস্ক্রিয়তার ব্যবহার
Uses of Radioactivity

বর্তমান যুগে তেজস্ক্রিয়তার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে শেষ করা যায় না। চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিশেষ করে দুরারোগ্য ক্যানসার রোগ নিরাময়ের কাজে তেজস্ক্রিয়তার ব্যবহার আজ বহুল প্রচলিত। কৃষিক্ষেত্রে বিশেষ করে উন্নত বীজ তৈরির গবেষণায় তেজস্ক্রিয়তা সফলতার সাথে ব্যবহৃত হচ্ছে। শিল্প কারখানাতেও তেজস্ক্রিয়তা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। খনিজ পদার্থে বিভিন্ন ধাতুর পরিমাণ নির্ণয়ে উক্ত ধাতুর তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ (Isotope) তেজস্ক্রিয় প্রদর্শক (Radioactive tracer) হিসেবে বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে। এমনকি রোগ নির্ণয়ের কাজেও তেজস্ক্রিয় প্রদর্শককে সফলতার সাথে কাজে লাগানো হচ্ছে।

ঘড়িতেও তেজস্ক্রিয়তার ব্যবহার দেখা যায়। অনেক ঘড়ির কাঁটা ও নম্বর অন্ধকারে জ্বলজ্বল করতে দেখা যায়। এর কারণ হল তেজস্ক্রিয় থোরিয়ামের সাথে জিঙ্ক সালফাইড মিশিয়ে ঘড়ির কাঁটা ও নম্বরে প্রলেপ দেওয়া হয় ফলে এরা অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে।

২৪.১১। তেজস্ক্রিয়তার বিপদ
Danger of Radioactivity

তেজস্ক্রিয়তা আমাদের অনেক উপকারে লাগলেও এ থেকে বিপদের আশঙ্কাও রয়েছে বিপুল পরিমাণে। তেজস্ক্রিয় ক্ষয় বা বিভাজনের ফলে যে সকল রশ্মি বিকিরিত হয় তা জীবদেহে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সমর্থ। উচ্চ মাত্রার তেজস্ক্রিয় বিকিরণ মানবদেহে নানা রকম ক্যানসারের জন্ম দিতে পারে। দীর্ঘ দিন মাত্রাতিরিক্ত তেজস্ক্রিয় বিকরণের সংস্পর্শে থাকলে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়, মানসিক বিকার এমন কি বিকলাঙ্গতাও সৃষ্টি হতে পারে। তেজস্ক্রিয়তার ক্ষতিকর প্রভাব বংশ পরম্পরায়ও পরিলক্ষিত হয়। আজকাল তেজস্ক্রিয় বর্জ্য (Radioactive waste) সম্পর্কে নানা কথা পত্রপত্রিকায় দেখা যায়। পারমাণবিক চুল্লি বা অন্য বিকিরণ উৎসে দীর্ঘদিন ব্যবহৃত অকেজো যন্ত্রপাতি, জ্বালানি ও সরঞ্জামাদিকে বর্জ্য বলা হয়। এ সকল বর্জ্য পদার্থ তেজস্ক্রিয় বিকিরণের উৎস হিসেবে কাজ করে বলে এসকল বর্জ্য পদার্থ প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মানব জীবনের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ।

২৪.১২। মৌলিক কণিকা
Fundamental Particle

মৌলিক কণিকা হল সে সব অবিভাজ্য কণিকা, যা দিয়ে সকল বস্তু তৈরী। পদার্থবিজ্ঞানীগণ সব সময়ই পদার্থের গঠনের এই সর্বশেষ বা অবিভাজ্য কণিকার অনুসন্ধান করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে মনে করা হত যে, পদার্থ গঠনের মৌলিক উপাদান হল অণু ও পরমাণু। পরমাণুকে মনে করা হত অবিভাজ্য, মৌলিক কণিকা। পরে দেখা গেল পরমাণু বিভাজ্য এবং এতে রয়েছে ইলেকট্রন ও নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াস আবার গঠিত নিউট্রন ও প্রোটন নিয়ে। এভাবে পরমাণুর গঠন উপাদান পাওয়া গেল ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন। এর পর আবিষ্কৃত হয়েছে ইলেকট্রনের প্রতিকণা পজিট্রন। আবিষ্কৃত হয়েছে নিউট্রিনো, মেসন ইত্যাদি। অতি সম্প্রতি অনেক নতুন মৌলিক কণিকা শনাক্ত করা হয়েছে এবং এদের ধর্ম অনুসারে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এর চারটি শ্রেণী হল :

১। ব্যারিয়ন শ্রেণী (Baryon) : এই শ্রেণীতে রয়েছে নিউট্রন ও প্রোটন।

২। মেসন শ্রেণী (Meson) : এ শ্রেণীতে আছে K- মেসন ও π মেসন।

৩। লেপটন শ্রেণী (Lepton) : এই শ্রেণীতে রয়েছে ইলেকট্রন ও নিউট্রনো

৪। গেজ শ্রেণী (Gauge Particle) : এই শ্রেণীতে আছে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের কণা অর্থাৎ ফোটন।

মৌলিক কণিকার বৈশিষ্ট্য :

(১) সকল বিক্রিয়ায় এদের আধান/চার্জ, ভর–শক্তি ও ভরবেগ সংরক্ষিত থাকে।

(২) সকল ব্যরিয়ন ও লেপটনের স্পিন $\frac{1}{2}$, সকল মেসনের স্পিন 0 এবং ফোটনের স্পিন 1।

(৩) π^{o}– মেসন ও ফোটন ছাড়া সকল কণিকার স্বতন্ত্র প্রতিকণিকা আছে।

(৪) আধান ও চৌম্বক মোমেন্ট ছাড়া কণিকা ও প্রতিকণিকা একই রকম।

২৪.১৩। মহাবিশ্ব ও তার গঠন উপাদান
Universe and its Constituents

পৃথিবী আমাদের বাসভূমি। এটি সূর্যের একটি গ্রহ। আমাদের ঘিরে থাকা যে অসীম স্থান বা মহাবিশ্বের একটি অতিক্ষুদ্র ফুটকি (Speck) হল আমাদের এই পৃথিবী। সুতরাং আমাদের ঘিরে বা পৃথিবীকে ঘিরে যা কিছু আছে তাদের সকলকে নিয়েই মহাবিশ্ব। সূর্য হল এই বিশাল মহাবিশ্বের অসংখ্য নক্ষত্রের একটি। অর্থাৎ যেসব তারকা বা নক্ষত্র আমাদের রাতের আকাশকে আলোকিত করে তাদের মতো একটি নক্ষত্র হল সূর্য। এই নক্ষত্রগুলো পরস্পর থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। পৃথিবীতে যে পরিমাপের সাথে আমরা পরিচিত সে পরিমাপ দিয়ে নক্ষত্রের মধ্যকার দূরত্ব কল্পনা করা যায় না। এদের পরস্পর দূরত্ব মাপতে হয় আলোক বর্ষ দিয়ে। আমরা জানি যে, আলো প্রতি সেকেন্ডে প্রায় তিনলক্ষ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে। এক বৎসর সময়ে আলো যে পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করে তা হল এক আলোক বর্ষ। এই আলোক বর্ষের এককে নক্ষত্রদের দূরত্ব মাপা হয়। এখানে আমরা মহাবিশ্বের অসীমতা, এর উৎপত্তি ও গঠন উপাদান নিয়ে আলোচনা করব।

মহাবিশ্বের অধিকাংশ জায়গা ফাঁকা। এই মহাবিশ্বে আমাদের পরিচিত একটি জগৎ হল সৌরজগৎ। সূর্য ও তার নয়টি গ্রহ বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো এবং উল্কা, নীহারিকা, ধূমকেতু, কৃষ্ণবামন, কৃষ্ণগহ্বর ইত্যাদি নিয়ে সৌরজগৎ। সুতরাং পৃথিবী সৌরজগতের নয়টি গ্রহের একটি। আমরা বলেছি যে, নক্ষত্রগুলো মহাবিশ্বে পরস্পর থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। এসব নক্ষত্র আবার সুষমভাবে বণ্টিত নয়। এরা মহাবিশ্বে গুচ্ছ বা ক্লাস্টার বা দল তৈরি করে থাকে। এসব গুচ্ছ বা দলকে একত্রে বলা হয় গ্যালাক্সি বা ছায়াপথ। এসব ছায়াপথের সংখ্যা প্রায় একশত বিলিয়ন (এক হাজার কোটি)। সূর্য যে ছায়াপথে রয়েছে তাকে বলা হয় মিলকিওয়ে বা আকাশ গঙ্গা (Milky way)। এই ছায়াপথে রয়েছে 100 বিলিয়ন নক্ষত্র। আর আছে গ্যাস ও ধূলিকণা। মহাবিশ্বে তিন ধরনের আকৃতির ছায়াপথ দেখা যায় – সর্পিল ছায়াপথ, উপবৃত্তাকার ছায়াপথ, অনিয়মিত (irregular) আকৃতি বিশিষ্ট ছায়াপথ। ছায়াপথের সদস্যদের মধ্য নক্ষত্র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। রাতের মেঘমুক্ত চন্দ্রহীন আকাশে আমরা লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র দেখতে পাই। অনেক নক্ষত্র সুন্দর প্যাটার্নে বিন্যস্ত থাকে। এদের বিন্যাস অনুসারে বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে যেমন কালপুরুষ বা ওরিয়ন (orion), দেখতে তীর ধনুক হাতে শিকারির মতো। এছাড়া আছে লুব্ধক, বৃহৎ কুক্কুর মণ্ডল, সপ্তর্ষিমণ্ডল ও বৃশ্চিক। আধুনিক তত্ত্ব বলে যে, মহাবিশ্ব আপাত (apparently) প্রসারমাণ (expanding)। এই তত্ত্বের মতে, ছায়াপথগুলো কোনো এক সময় সংকুচিত অবস্থায় একত্রে ছিল এবং মহাবিশ্বের বিগ ব্যাং বা বৃহৎ বিস্ফোরণ বা মহাবিস্ফোরণের (big bang) মাধ্যমে উৎপত্তি হয়েছে।

নক্ষত্রদের জন্ম ও বিবর্তনও মজার। নক্ষত্রের জীবনচক্র শুর হয়েছিল ছায়াপথে নিজেদের মহাকর্ষ বলের প্রভাবে ভেঙে পড়া একটি ঘন মেঘ হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসের ত্বরণের মাধ্যমে। এই মেঘ প্রধানত হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস দিয়ে তৈরী এবং এর তাপমাত্রা ছিল প্রায়– 173°C। আমরা জানি যে, সকল বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

এই আকর্ষণ বলের নাম মহাকর্ষ। হাইড্রোজেনের মেঘ যদি ক্ষুদ্র হয় এবং পারিপার্শ্বিক অণুগুলো যদি পরস্পরের নিকটে না থাকে তাহলে তাদের পরস্পরের মধ্যকার আকর্ষণ এমন হয় না যে, তাদের আচরণের কোনো পরিবর্তন ঘটতে পারে। মেঘের আকার যদি বড় হয় তাহলে এর প্রতিটি অণুর মধ্যকার মহাকর্ষ বল বেশি হয়, ফলে মেঘকে ভিতরের দিকে টানে। ফলে নিজস্ব মহাকর্ষ বলের প্রভাবে মেঘগুলো সংকুচিত হতে থাকে একটি নাটকীয় প্রক্রিয়ায় এবং গ্যাসীয় মেঘ নক্ষত্রে পরিণত হয়। এই ঘন সংকোচনশীল গ্যাসীয় ভরকে বলা হয় প্রোটোস্টার (Protostar)।

প্রোটোস্টার যতই সংকুচিত হতে থাকে গ্যাসীয় মেঘের পরমাণুগুলোর পরস্পরের সাথে তত বেশি সংঘর্ষ ঘটে। ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সংকোচন লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে চলতে থাকে। ফলে অন্তঃস্থ তাপমাত্রা–173 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 10,000,000 (10^7) ডিগ্রি সেলসিয়াসে দাঁড়ায়। এই অতি উচ্চ তাপমাত্রার হাইড্রোজেন পরমাণু হিলিয়াম পরমাণুতে রূপান্তরিত হয় এবং এই প্রক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়। এই বিক্রিয়ার চারটি হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস সংযোজিত বা ফিউশনিত হয়ে একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াস তৈরি করে এবং যে বিপুল পরিমাণ শক্তি নির্গত হয় তা বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি হিসেবে আবির্ভূত হয়। এর তাপমাত্রা ও চাপ আরও বৃদ্ধি পায়। প্রোটোস্টার জ্যোতি ছড়াতে থাকে এবং নক্ষত্রে পরিণত হয়।

নক্ষত্রের ভিতরকার ক্রমবর্ধমান চাপ গ্যাসীয় বস্তুর আরও ভেঙে পড়াকে এগিয়ে দেয়। নক্ষত্রটি এই অবস্থায় দুটি পরস্পর বিপরীত অভিমুখী বলের প্রভাবে সূক্ষ্ম সাম্যাবস্থায় থাকে। এই দুটি বল হল মহাকর্ষীয় আকর্ষণ যা সংকুচিত করার প্রচেষ্টা চালায় এবং ফিউশন বিক্রিয়াকে প্রজ্বলিত করে। অপরটি ফিউশানের ফলে নির্গত শক্তি দ্বারা উৎপন্ন বা সৃষ্ট অন্তঃস্থ বা আভ্যন্তরীণ চাপ। এই সাম্যাবস্থা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বৎসর চলতে পারে। নক্ষত্রের ভিতরকার তাপমাত্রা ফিউশান বিক্রিয়াকে চালু রাখে। এই বিক্রিয়ার হার সংকোচনের চাপকে সুস্থিত বা সাম্যাবস্থায় রাখার জন্য যথোপযুক্ত থাকে। আমাদের সূর্য এখন তার বিকাশের এরকম একটি সাম্যাবস্থায় আছে। এর সৃষ্টি হয়েছিল 5,000 মিলিয়ন বৎসর পূর্বে, সূর্য ভবিষ্যতে আরও এই পরিমাণ সময় শক্তি বিকিরণ করতে থাকবে।

সূর্যের আছে নয়টি গ্রহ। আবার কোনো গ্রহের এক বা একাধিক উপগ্রহ আছে। পৃথিবীর একটি মাত্র উপগ্রহ, এটি হল চাঁদ।

২৪.১৪। মহাবিশ্বের উৎপত্তি
Creation of Universe

নক্ষত্রের কীভাবে উৎপত্তি হল তা আমরা জেনেছি। নক্ষত্র সৃষ্টি হয়েছিল ছায়াপথের অতি ঘন গ্যাসীয় ও ধূলি মেঘের মহাকর্ষীয় ভাঙনের ফলে। গ্রহের সৃষ্টি হয়েছে নক্ষত্রকে ঘিরে থাকা অবশিষ্ট গ্যাস ও ধূলিকণার ঘনীভবনের ফলে। এরপরও অনেক প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়নি। এরকম কয়েকটি প্রশ্ন হল– এই গ্যাসীয় মেঘ কোথা থেকে এল? এদের সৃষ্টি কীভাবে হয়েছিল? মহাবিশ্বের শুরু হয়েছিল কীভাবে? কীভাবে বস্তু বা পদার্থটি সৃষ্টি হয়েছে?

১৯২০ সালে এডুইন হাব্‌ল (Edwin Hubble) নামে একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্ট উইলসন অবজারভেটরিতে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি পর্যবেক্ষণ করেন যে, ছায়াপথগুলো স্থির নয় বরং পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এখন আমরা জানি যে, প্রত্যেকটি ছায়াপথ পরস্পর থেকে দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে– কোনো বেলুনকে ফুলালে বা ফুঁ দিয়ে বাতাস ভরে সম্প্রসারিত করলে এর গায়ের দাগগুলো যেমন দূরে সরে যায় ঠিক তেমনি। মনে কর কোনো বেলুনের গায়ের ফুট ফুট দাগগুলো যেন এক একটি ছায়াপথ। বেলুন যখন ফুলানো হয় তখন এই দাগগুলো পরস্পর থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, যে দাগগুলো পরস্পর থেকে বেশি দূরে তারা যেন বেশি দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে। হাব্‌ল বলেন, মহাবিশ্ব ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছে। বর্ণালির লাল অপসরণ (red shift) বা লোহিত ভ্রংশ থেকে বোঝা যায় যে, ছায়াপথগুলো দূরে সরে যাচ্ছে। আলোর উৎস যখন পর্যবেক্ষকের থেকে দূরে সরে যেতে থাকে, তখন আলোর কম্পাঙ্ক হ্রাস পেতে থাকে এবং দৃশ্যমান বর্ণালি লোহিত বা লাল রঙের দিকে সরে যায়, একে বলা হয় লাল অপসরণ বা লোহিত ভ্রংশ। হাবল দেখান যে, ছায়াপথের দূরে সরে যাওয়ার দ্রুতি তাদের পরস্পরের মধ্যকার দূরত্বের সমানুপাতিক। ছায়াপথের পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব যত বেশি তাদের সরে যাওয়ার দ্রুতি তত

বেশি। সুতরাং আমাদের মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে।

১৯২৭ সালে বেলজিয়ামের জ্যোতির্বিজ্ঞানী জি, লেমেটার (G. Lemaitre) মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের একটি ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, দূর অতীতে (15 বিলিয়ন বা 15 শত কোটি বৎসর পূর্বে) মহাবিশ্বের সমস্ত বস্তু সংকুচিত অবস্থায় একটি বিন্দুর মতো ছিল ঠিক যেন একটি অতি–পরমাণু (Superatom)। আজ থেকে 15 বিলিয়ন (১৫ শত কোটি) বৎসর পূর্বে এই অতি–পরমাণুর মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটে, ফলে মহাবিশ্ব অবিরতভাবে সম্প্রসারিত হতে থাকে। পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তু চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছুটতে থাকে। এসব পুঞ্জ থেকেই তৈরি হয়েছে ছায়াপথ, গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদি। সেই থেকে মহাবিশ্বের সবকিছু অবিরাম পরস্পর থেকে দূরে যাচ্ছে। আদি এই বিস্ফোরণকে বলাা হয় 'বিগ ব্যাং' বাংলায় একে বলা যেতে পারে "মহাবিস্ফোরণ" বা "বৃহৎ বিস্ফোরণ"।

পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং তাঁর "A Brief History of Time" (কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস) গ্রন্থে মহাবিশ্ব সৃষ্টির এই "বৃহৎ বিস্ফোরণ" তত্ত্বের পক্ষে যুক্তি দেন এবং পদার্থবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। নিচের কোনটি মৌলিক কণিকার বৈশিষ্ট্য?

ক. সকল বিক্রিয়ায় এদের চার্জের পরিবর্তন হয়

খ. চার্জ ও চৌম্বক মোমেন্ট ছাড়া কণিকা এবং প্রতিকণিকা একই রকম

গ. সকল বিক্রিয়ায় এদের ভর বেগের পরিবর্তন ঘটে

ঘ. ফোটন ও মেসন ছাড়া অন্য কণিকাসমূহের প্রতিকণিকা নেই।

২। একটি শক্তিশালী বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে যদি গামা রশ্মি প্রয়োগ করা হয়, তা হলে গামা রশ্মি–

i. বেঁকে যাবে

ii. একই পথে যাবে

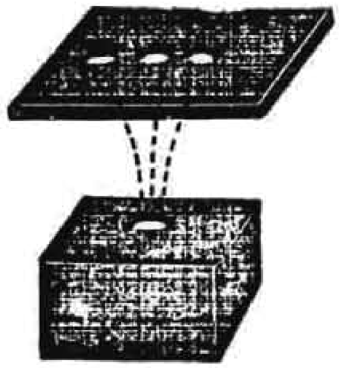
iii. ক্ষেত্র ভেদ করতে পারবে না

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i　　খ. ii

গ. i ও ii　　ঘ. ii ও iii

চিত্রটি অনুধাবন করে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



চিত্র

৩। চিত্রে প্রদর্শিত বাম দিকের দাগটি—

ক. α রশ্মির
খ. γ রশ্মির
গ. β রশ্মির
ঘ. x রশ্মির

৪। চিত্রানুযায়ী

i. চৌম্বক ক্রিয়ার কারণে ধনাত্মক, ঋণাত্মক এবং নিরপেক্ষ রশ্মি আলাদা হয়ে যায়
ii. ফটোগ্রাফিক প্লেটের কারণে রশ্মিগুলো আলাদা হয়ে যায়
iii. চৌম্বক ক্ষেত্রের ধনাত্মক আধান ঋণাত্মক রশ্মিকে এবং ঋণাত্মক আধান ধনাত্মক রশ্মিকে আকর্ষণ করে।

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i
খ. i ও ii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। রানী দশম শ্রেণীর ছাত্রী। একদিন খেলতে গিয়ে সে হাতে ব্যথা পেল। এতে হাত খুব ফুলে যায়। ডাক্তার তাকে x-ray করার পরামর্শ দেন। রানীর হাতটি শক্ত পাতদ্বারা আবৃত ছিল। x-ray করার পূর্বে পাত খুলে ফেলে x-ray করা হয়।

ক. x-ray কী?
খ. ডাক্তার x-ray করার পরামর্শ দিলেন কেন। কারণসহ ব্যাখ্যা কর।
গ. x-ray করার পূর্বে পাত খোলা হল কেন?
ঘ. x-ray এর সাথে সাধারণ আলোর একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণপূর্বক x-ray –এর ধর্ম ও ব্যবহার লিখ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

শক্তির উৎস ও ব্যবহার

SOURCES OF ENERGY AND ITS USES

যন্ত্রনির্ভর বর্তমান সভ্যতা শক্তি ছাড়া এক মুহূর্তও চলতে পারে না। জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের সাথে মানুষের শক্তির চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বাড়তি শক্তির প্রয়োজনে মানুষকে নিত্যনতুন শক্তির উৎসের সন্ধান করতে হচ্ছে। এ অধ্যায়ে শক্তির বিভিন্ন উৎস সম্পর্কে আলোচনার সাথে সাথে আধুনিক সভ্যতা বিকাশে শক্তির প্রয়োজনীয়তা ও এর গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হবে। সারা বিশ্বব্যাপী শক্তি সংকটের প্রেক্ষাপটে আগামী শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য আমরা কীভাবে নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে পারি সে সম্পর্কেও আলোকপাত করা হবে।

২৫.১। শক্তি ও শক্তির বিভিন্ন উৎস
Energy and Different Sources of Energy

যার প্রভাবে কোনো কাজ সম্পাদিত হয় তাকেই আমরা শক্তি বলি। শক্তির বিনিময়ে কাজ পাওয়া যায়। সকল জীবের বেঁচে থাকার জন্য শক্তির নিরবচ্ছিন্ন যোগান থাকতে হবে। তাই শক্তির সন্ধানে মানুষকে প্রাচীনকাল থেকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। প্রকৃতিতে প্রাপ্ত শক্তির ভান্ডার বা উৎস কমে যাচ্ছে দিন দিন, তাই শক্তির নতুন উৎসের সন্ধানে নানান রকম পরীক্ষা–নিরীক্ষা ও গবেষণা করছে মানুষ।

জীবেরা খাদ্য থেকে তাদের প্রয়োজনীয় শক্তি সংগ্রহ করছে। উদ্ভিদ কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানির সাহায্যে সূর্য কিরণ ও ক্লোরোফিলের উপস্থিতিতে নিজেরাই নিজেদের খাদ্য প্রস্তুত করে। প্রাণীরা খাদ্য সংগ্রহ করছে হয় উদ্ভিদ না হয় অন্য কোনো প্রাণীর দেহ থেকে। জীবের সমস্ত জৈবিক ক্রিয়ার মূলে রয়েছে এই শক্তি। মানুষের ক্ষেত্রে শক্তির এই প্রাথমিক চাহিদাটুকুতো আছেই, এ ছাড়া তার উন্নত জীবন যাপনের জন্য রয়েছে বাড়তি শক্তির চাহিদা।

আদিমকালে মানুষ সকল কাজে পুরোপুরি নির্ভর করত তার পেশিশক্তির ওপর। এরপর মানুষ পশুকে বশে আনল এবং পশুশক্তিকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতে লাগল। পশুশক্তির সাহায্যে কৃষিকাজ, জিনিসপত্র বহন ইত্যাদি কাজ করত মানুষ। এরপর এল যন্ত্রশক্তি। যন্ত্রশক্তি ব্যবহারের ফলে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি শুরু হল। শিল্প বিপ্লব ও বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার মানুষের পেশিশক্তি ও পশুশক্তির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে দিল। বাষপশক্তির সাহায্যে মানুষ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি চালাতে থাকল। এই বাষপশক্তি উৎপন্ন হত জীবাশ্ম জ্বালানি পুড়িয়ে। জীবাশ্ম জ্বালানি কয়লা, পেট্রোল ও ডিজেলের সাহায্যে মানুষ নানান রকম ইঞ্জিন চালাতে শিখল। সুতরাং জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার বাড়তে লাগল।

তড়িতের আবিষ্কার মানব সভ্যতাকে আরও একধাপ এগিয়ে দিল। যান্ত্রিক শক্তি থেকে তড়িৎ তৈরির কৌশল আবিষ্কৃত হল। এই যান্ত্রিক শক্তির তিনটি উৎস হল তাপশক্তি, (যা থেকে পাওয়া যায় তাপবিদ্যুৎ) জলশক্তি (যা থেকে পাওয়া যায় জলবিদ্যুৎ) ও পারমাণবিক শক্তি। তড়িৎ শক্তির ব্যবহার সবচেয়ে সুবিধাজনক বলে এবং একস্থান থেকে অন্য স্থানে দক্ষতার সঙ্গে ও দ্রুত স্থানান্তরিত করা যায় বলে সকল রকম যন্ত্রচালনায় মানুষ তড়িৎ ব্যবহার করতে লাগল। কিন্তু মানব সভ্যতার অগ্রগতির ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে শক্তির চাহিদা বাড়তে থাকল। মানুষ সন্ধান করতে থাকল শক্তির নতুন নতুন উৎসের। নিচে বিভিন্ন রকম শক্তির উৎস বর্ণনা করা হল।

২৫.২। জীবাশ্ম জ্বালানি (Fossil Fuel)

শক্তির অতি পরিচিত উৎস হল কয়লা, খনিজতেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস। এদের বলা হয় জীবাশ্ম জ্বালানি। কারণ জীবদেহ (প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয়ই) মাটির নিচে চাপা পড়ে লক্ষ লক্ষ বছর পর তা রূপান্তরিত হয় কয়লা, তেল বা প্রাকৃতিক গ্যাসে।

কয়লা : শক্তির উৎসগুলোর মধ্যে কয়লার পরিচিতি সবচেয়ে বেশি। কয়লা একটি জৈব পদার্থ। পৃথিবীতে এক সময় অনেক গাছপালা ছিল। বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও স্বাভাবিকভাবে গাছের পাতা বা কান্ড মাটির নিচে চাপা পড়ে এবং জমতে থাকে। গাছের পাতা ও কান্ড রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে কয়লায় রূপান্তরিত হয়। কয়লা পুড়িয়ে সরাসরি তাপ পাওয়া যায়। এটি একটি অতি পরিচিত জ্বালানি। তবে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার ছাড়াও কয়লা থেকে বহু প্রয়োজনীয় পদার্থ উৎপাদিত হয়। এদের মধ্যে রয়েছে কোলগ্যাস, আলকাতরা, বেঞ্জিন, অ্যামোনিয়া, টলুয়িন প্রভৃতি। রান্না করতে ও বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালাতে কয়লা ব্যবহৃত হয়। আধুনিক কালে কয়লার প্রধান ব্যবহার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রধান উপাদান কয়লা।

খনিজ তেল : শক্তির অন্যতম প্রধান উৎস খনিজ তেল বা পেট্রোলিয়াম। বর্তমান সভ্যতায় পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক। গ্রামের কুঁড়েঘর থেকে শুরু করে আধুনিকতম পরিবহণ ব্যবস্থা সর্বত্রই এর ব্যবহার রয়েছে। পেট্রোলিয়াম থেকে নিষ্কাশিত তেল পেট্রোল, পাকা রাস্তার উপর দেওয়া পিচ, কেরোসিন ও চাষবাষের জন্য ব্যবহৃত রাসায়নিক সার পাওয়া যায়। পরিবহণের জ্বালানি হিসেবে পেট্রোলের জুড়ি নেই। পেট্রোলিয়াম থেকে আরও পাওয়া যায় নানান রকম কৃত্রিম বস্তু। এগুলো হল টেরিলিন, পলিয়েস্টার, ক্যাশমিলন ইত্যাদি। এছাড়া পেট্রোলিয়াম থেকে তৈরি হয় নানান রকম প্রসাধনী। এতসব ব্যবহার থাকা সত্ত্বেও এর মূল ব্যবহার জ্বালানি হিসাবে। পেট্রোলিয়ামজাত সামগ্রীর প্রধান ব্যবহার হল তড়িৎ ও যান্ত্রিক শক্তি উৎপাদন। পেট্রেলিয়াম একটি ল্যাটিন শব্দ। এটি তৈরি হয়েছে পেট্রো ও অলিয়াম মিলে। ল্যাটিন ভাষায় পেট্রো শব্দের অর্থ পাথর এবং অলিয়াম শব্দের অর্থ তেল। সুতরাং পেট্রোলিয়াম হল পাথরের তেল অর্থাৎ পাথরের মধ্যে সঞ্চিত তেল। টারশিয়ারি যুগে অর্থাৎ আজ থেকে পাঁচ ছয় কোটি বছর আগে সমুদ্রের তলদেশে পাললিক শিলার স্তরে স্তরে গাছপালা ও সামুদ্রিক প্রাণী চাপা পড়ে যায়। বিভিন্ন রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে এরা রূপান্তরিত হয় খনিজ তেলে। আজকের স্থলভাগের অনেকাংশ প্রাগৈতিহাসিক যুগে সমুদ্রের তলদেশে ছিল।

প্রাকৃতিক গ্যাস : প্রাকৃতিক গ্যাস শক্তির অতি পরিচিত উৎস। বিশেষ করে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার ব্যাপক। উন্নত দেশগুলোতেও প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার খুব বেশি। বিভিন্ন শিল্প কারখানায় এর ব্যবহার রয়েছে। এর ব্যবহার প্রধানত জ্বালানি হিসেবে। বাংলাদেশে রান্নার কাজে এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। এছাড়াও ব্যবহার রয়েছে অনেক সার কারখানায়। গ্যাসের সাহায্যে তাপশক্তি উৎপাদিত হয় এবং তা থেকে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদিত হয় বিদ্যুৎ।

প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায় ভূগর্ভ থেকে। সুগভীর কূপ খনন করে ভূগর্ভ থেকে এ গ্যাস উত্তোলন করা হয়। পৃথিবীর অভ্যন্তরের প্রচণ্ড তাপ ও চাপ এই ধরনের গ্যাস সৃষ্টির মূল কারণ। পেট্রোলিয়াম কূপ থেকেও প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান মিথেন গ্যাস। প্রাকৃতিক গ্যাসের মধ্যে মিথেনের পরিমাণ শতকরা ৬০ থেকে ৯৫ ভাগ পর্যন্ত থাকতে পারে।

২৫.৩। জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার ও পরিবেশ দূষণ

জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারে পরিবেশ দূষণের সম্ভাবনা খুব বেশি। কয়লা থেকে তাপবিদ্যুৎ আহরণের ক্ষেত্রে কর্মীর মৃত্যুর হার পারমাণবিক রিয়াক্টরে কর্মরত কর্মীদের সমান। এছাড়া কর্মীদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। কয়লা খনির কাজ ও কয়লা পরিবহণের কাজে কর্মীর মৃত্যুর হার বেশি। কয়লা খনি এলাকায় আবহাওয়া সাধারণ অবস্থায় বেশি দূষিত হয়।

গাড়ি, এরোপ্লেন, জাহাজ ও ট্রেন চালাতে যে জীবাশ্ম জ্বালানি (কয়লা বা খনিজ তেল) ব্যবহার করা হয় তা থেকে পরিবেশ দূষিত হয়। মোটর গাড়ি ও কলকারখানার থেকে নির্গত ধোঁয়া পরিবেশ দূষিত করে।

২৫.৪। নিউক্লিয় শক্তি (Nuclear Energy)

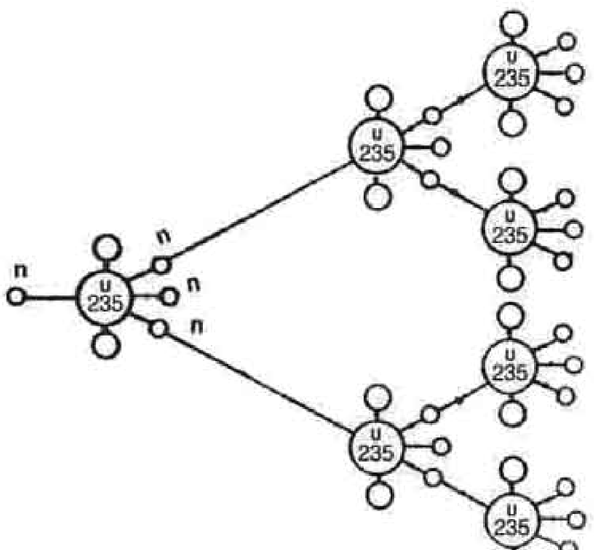
আমরা জানি এই মহাবিশ্বের সকল পদার্থই পরমাণু দিয়ে গড়া। কোটি কোটি বৎসর পূর্বে নক্ষত্রের অভ্যন্তরে পরমাণুর

সৃষ্টি হয়। পরমাণু তৈরিতে বিপুল পরিমাণ শক্তি ব্যবহৃত হয়েছিল। এই শক্তি তখন থেকেই পরমাণুর নিউক্লিয়াসে সঞ্চিত আছে। নিউক্লিয়াসকে ভেঙে বিভক্ত করলে এদের মধ্যে সঞ্চিত বিপুল শক্তি মুক্তি লাভ করে। নিউক্লিয়াস থেকে নির্গত এই শক্তিকে বলা হয় নিউক্লিয় শক্তি (Nuclear Energy)। নিউক্লিয়াস হল পরমাণুর কেন্দ্র। প্রকৃত পক্ষে পরমাণুর কেন্দ্র ভেঙেই নিউক্লিয় শক্তি উৎপন্ন হয় বলে একে পারমাণবিক শক্তি (Atomic energy) নামেও অভিহিত করা হয়। সুতরাং নিউক্লিয় ও পারমাণবিক শক্তি একই।

নিউক্লিয় শক্তির প্রকাশ প্রথম ঘটে ধ্বংসলীলার মাধ্যমে। ১৯৪৫ সালে আগস্ট মাসে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহর দুইটিতে নিউক্লিয় বোমার বিস্ফোরণ ঘটে ধ্বংস হয় শহর দুটি। ঐ দিন পরমাণুর শক্তির তীব্রতা ধ্বংসলীলার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়। মানবকল্যাণে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার প্রথম শুরু হয় ১৯৫৪ সালে। ঐ সময় তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রথম নিউক্লিয় তড়িৎকেন্দ্র তড়িৎ উৎপাদন শুরু করে। নিউক্লিয় তড়িৎকেন্দ্রে পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তিকে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে কোনো বিশেষ পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে যখন পারমাণবিক কণা (যেমন নিউট্রন বা প্রোটন) দিয়ে আঘাত করা হয় তখন তা ভেঙে প্রায় সমান দুইটুকরা হয়ে যায় এবং কিছু পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়। এই শক্তিকে বলা হয় নিউক্লিয় শক্তি। বিক্রিয়াটিকে বলা হয় নিউক্লিয় বিক্রিয়া।

এখন প্রশ্ন হল এই শক্তি কোথা থেকে আসে। দেখা গেছে পারমাণবিক কণার আঘাতের ফলে নতুন যে দুইটি নিউক্লিয়াস উৎপন্ন হয় তাদের মোট ভর মূল নিউক্লিয়াসের ভরের চেয়ে কিছু কম হয়। অর্থাৎ নিউক্লিয়াস ভাঙনের সময় কিছু ভর খোয়া যায়। এই খোয়া যাওয়া ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই শক্তির পরিমাণ আইনিস্টাইনের বিখ্যাত $E = mc^2$ সমীকরণের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। m এখানে খোয়া যাওয়া ভর আর c হচ্ছে আলোর দ্রুতি, শূন্যস্থানে যার মান সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার। কিন্তু একটি মাত্র নিউক্লিয়াসের ভাঙনের ফলে যে শক্তি নির্গত হয় তার পরিমাণ খুবই নগণ্য। তাহলে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য এত বিপুল পরিমাণ শক্তি আসে কোথা হতে?

আমরা জানি, দুই রকমের ইউরেনিয়াম পরমাণু আছে। একটি হল ইউরোনিয়াম–২৩৫ (U-235) অপরটি ইউরোনিয়াম–২৩৮ (U-238) এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল একে নিউট্রন দ্বারা আঘাত করলে পরমাণুটি প্রায় সমান দুই টুকরোয় বিভক্ত হয়, নির্গত হয় তিনটি নিউট্রন ও কিছু পরিমাণ শক্তি। নির্গত এই তিনটি নিউট্রন অন্য তিনটি ইউরেনিয়াম পরমাণুকে আঘাত করলে, তারা ভেঙে দুটুকরো হয় এবং নিউট্রন নির্গত হয় এবং তিনগুণ শক্তি নির্গত হয়। এভাবে পরমাণুর ভাঙন চলতে থাকে এবং নির্গত শক্তির পরিমাণ ও নিউট্রন সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।



চিত্র : ২৫.১

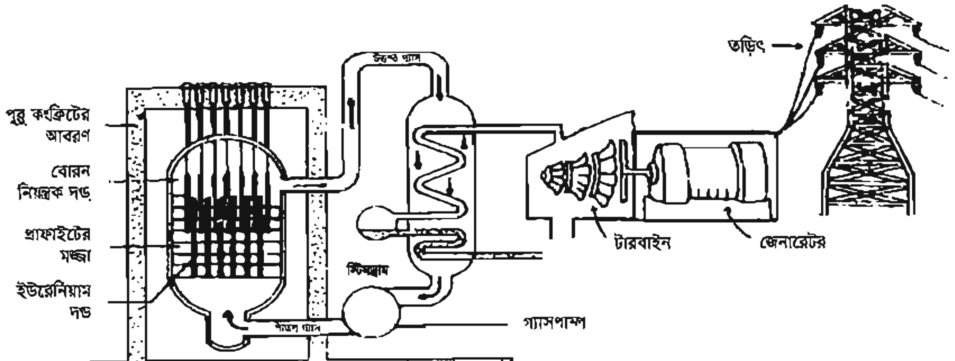
একে বলা চেইন বিক্রিয়া (Chain reaction) বা শৃঙ্খল বিক্রিয়া। এ বিক্রিয়া একবার শুরু হলে আপনা আপনি চলতে থাকে এবং নির্গত শক্তির পরিমাণ ও নিউট্রন সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই চেইন বিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ না করলে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।

২৫.৫। নিউক্লিয় বিক্রিয়ক বা নিউক্লিয় চুল্লি (Nuclear Reactor)

নিউক্লিয় চেইন বিক্রিয়াকে যে যন্ত্রে নিয়ন্ত্রণ করা হয় তার নাম নিউক্লিয় রিয়াক্টর (Nuclear Reactor) বা নিউক্লিয় বিক্রিয়ক। একে পারমাণবিক চুল্লি নামেও অভিহিত করা হয়। পারমাণবিক শক্তি থেকে তড়িৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয় পারমাণবিক চুল্লি। এই চুল্লিতে নিউক্লিয় বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে তাপ উৎপন্ন করা হয়। এই তাপ বাষ্পীয় টার্বাইন ঘোরানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। পারমাণবিক চুল্লির একটি সরল চিত্র নিচে দেওয়া হল।

পারমাণবিক চুল্লিতে থাকে একটি খুব দৃঢ় ও টেকসই ইস্পাতের পাত্র। যা প্রবল চাপেও ফাটবে না। এই পাত্রের ভিতর থাকে গ্রাফাইটের ইট দিয়ে তৈরি মুল বস্তু বা মজ্জা (core)। এই গ্রাফাইট মজ্জার ভিতর খাড়াভাবে কতকগুলো চ্যানেল বা খালি জায়গা থাকে। এই জায়গাগুলোতে ইউরেনিয়ামের দণ্ড দ্বারা পূর্ণ থাকে। খালি জায়গা ও ইউরেনিয়াম দণ্ডের মধ্যবর্তী স্থানে থাকে বোরন বা ক্যাডমিয়াম দণ্ড। ক্যাডমিয়াম বা বোরন দণ্ডকে চ্যানেলের বা খালি জায়গার মধ্যে ওঠানামা করানো যায়। এ সব দণ্ড নিউট্রন শোষণ করে নিউক্লিয় বিক্রিয়ার গতিকে মন্থর করে দেয়।

পারমাণবিক চুল্লিতে যে ইউরেনিয়াম ব্যবহার করা হয়, তা দু ধরনের পরমাণু সংমিশ্রণ। এদের মধ্যে ইউরেনিয়াম–২৩৫ খুব গুরুত্বপূর্ণ। ইউরোনিয়াম–২৩৫ পরমাণু স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভেঙে নিম্নতর ভর বিশিষ্ট পরমাণু সৃষ্টি করে। এই ঘটনা ঘটার সময় পরমাণু নিউক্লিয়াস শক্তি নির্গত হয় আর নির্গত হয় উচ্চ দ্রুতিসম্পন্ন কণিকা নিউট্রন। এদের একটি নিউট্রন যদি পার্শ্ববর্তী পরমাণু নিউক্লিয়াসকে আঘাত করে তা হলে এই নিউক্লিয়াসটি ভেঙে যায় এবং আরও নিউট্রন বেরিয়ে আসে। নিউক্লিয়াসের এই বিভাজনকে বলা হয় ফিশন (Fission)।



চিত্র : ২৫.২

২৫.৬ । নিউক্লিয় শক্তি ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা : ১। এই শক্তির সাহায্যে কম ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়।

২। স্বল্প জ্বালানি ব্যয়ে বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়।

৩। অন্যান্য শক্তি উৎস ফুরিয়ে গেলেও পারমাণবিক শক্তির উৎস নিঃশেষিত হওয়ার সম্ভাবনা কম।

অসুবিধা : ১। পারমাণবিক শক্তি প্রকল্প তৈরিতে সময় বেশি লাগে।

২। জ্বালানিকে ব্যবহার উপযোগী করে তোলা বেশ ব্যয় সাপেক্ষ।

৩। অত্যন্ত উচ্চমানের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা প্রয়োজন।

৪। যান্ত্রিক ত্রুটির ফলে দ্রুত মারাত্মক পরিবেশ দূষণ হয়।

শিল্পোন্নত দেশগুলোতে পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র আছে যা থেকে উৎপাদিত তড়িৎ তারা ব্যবহার করছে।

২৫.৭। নিউক্লিয় শক্তি থেকে বিপদ

পরমাণু থেকে যেমন বিপুল পরিমাণ শক্তি পাওয়া যেতে পারে তেমনি পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারে রয়েছে অনেক সমস্যা ও বিপদ। নিউক্লিয় বিক্রিয়ায় পরমাণু ভাঙার সময় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পারমাণবিক কণিকা যেমন ইলেকট্রন, নিউট্রন ও গামারশ্মি ইত্যাদি নির্গত হয়। এ গামারশ্মি জীব বিশেষ করে মানুষের জন্য ক্ষতিকর। এ রশ্মি মানুষের দেহে পড়লে দেহ পুড়ে যেতে পারে। এ ছাড়া হতে পারে জ্বর, বমি বমি ভাব। অকালে চুল পড়ে যেতে পারে এবং বেশি মাত্রায় পড়লে ক্যানসার ও টিউমার হতে পারে। এ রশ্মি অত্যধিক মাত্রায় পড়লে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

এছাড়া পারমাণবিক প্রকল্পের দুর্ঘটনা মানুষের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে। এ রকম হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের থ্রিমাইল আয়ল্যান্ড এবং সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার চেরনোবিল পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্রের দুর্ঘটনায়। এসব দুর্ঘটনায় কিছু লোক মারা যায়।

এসব পারমাণবিক দুর্ঘটনার ফলে প্রকল্পের আশেপাশের এলাকার বায়ুমণ্ডলে তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছড়িয়ে পড়ে। বায়ুর সাথে এসব তেজস্ক্রিয় পদার্থ পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। বায়ুমন্ডল থেকে এসব তেজস্ক্রিয় পদার্থ মাটিতে পড়লে উদ্ভিদ তা খাদ্যের সাথে গ্রহণ করে এবং কোনো প্রাণী ঐসব উদ্ভিদ খেলে তার দেহে তেজস্ক্রিয় পদার্থ প্রবেশ করে। গরু এ ধরনের ঘাস খেলে তার দুধেও তেজস্ক্রিয় পদার্থ এসে যায়। যে দুধ মানুষের জন্য ক্ষতিকর।

পারমাণবিক শক্তি প্রকল্পের দুর্ঘটনা থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয় ভষ্ম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের ক্ষতি করে। এছাড়া পারমাণবিক প্রকল্পের বর্জ্য পদার্থ নিষকাশন ব্যবস্থা ব্যয়বহুল। এ সব বর্জ্য পদার্থ বিপজ্জনক। পারমাণবিক শক্তি প্রকল্প থেকে বিপুল শক্তি পাওয়া গেলেও এ শক্তি ব্যবহারে বিপদের সম্ভাবনাকে বিবেচনায় আনতে হবে। সাবধান থাকতে হবে। আরও খেয়াল রাখতে হবে পারমাণবিক শক্তিকে যেন মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা হয়।

২৫.৮। নিউক্লিয় শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার

নিউক্লিয় শক্তির কথা শুনলেই হিরোশিমা, নাগাসাকির সেই বিভীষিকাময় দিনগুলোর কথা আমাদের মনে ভেসে ওঠে। কিন্তু নিয়ন্ত্রিত নিউক্লিয় চেইন বিক্রিয়ার ফলে যে বিপুল শক্তি সৃষ্টি করা যায় তা আমরা মানব কল্যাণে নিয়োজিত করতে পারলে বিশ্বব্যাপী শক্তি সংকট মোকাবিলা অনেকটা সহজ হয়ে যাবে। এজন্য অবশ্য প্রয়োজন বিশ্বনেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক সদিচ্ছা।

শক্তি সংকট মোকাবিলার পাশাপাশি কৃষি উন্নয়নে বিশেষ করে উন্নতজাতের বীজ উৎপাদনে পারমাণবিক শক্তি সফলতার সাথে ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে করে বিশ্বে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানেও পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার ব্যাপকহারে করা সম্ভব। রোগ নির্ণয়ের কাজে এবং বিভিন্ন ব্যাধির চিকিৎসার ক্ষেত্রেও তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহার করা হচ্ছে। সারা বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানীরা প্রতিদিন শান্তিপূর্ণকাজে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহারের নতুন নতুন ক্ষেত্র খুঁজে বের করেছেন। কিন্তু এই শক্তিকে শান্তির কাজে না ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করা হবে তা নির্ভর করে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যারা রয়েছেন তাঁদের ওপর। অবশ্য সাধারণ মানুষও এখন অনেক সচেতন, আর তাই তারাও সারা বিশ্বব্যাপী আন্দোলন করছেন পারমাণবিক শক্তিকে শান্তির কাজে ব্যবহারে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে।

২৫.৯। সৌরশক্তি (Solar Energy)

সূর্য থেকে যে শক্তি পাওয়া যায় তাকে বলা হয় সৌরশক্তি। আমরা জানি সূর্য সকল শক্তির উৎস। পৃথিবীতে যত শক্তি আছে তার সবই কোনো না কোনোভাবে সূর্য থেকেই আসা বা সূর্য কিরণ ব্যবহৃত হয়েই তৈরি হয়েছে। যেমন আধুনিক সভ্যতার ধারক জীবাশ্ম জ্বালানি (কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস) আসলে বহুদিনের সঞ্চিত সৌরশক্তি।

বায়ু প্রবাহও সৃষ্টি হয় সূর্য তাপের পার্থক্যের কারণে। তাই বায়ু থেকে যে শক্তি পাওয়া যায় তাও সূর্য থেকেই আসা। এ ছাড়া খাদ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণের কাজে সৌরশক্তির প্রয়োজন। খাদ্য ও বায়োমাস (Biomass) আমাদের শক্তির দুটো উৎস।

নদনদীর পানিপ্রবাহ কাজে লাগিয়ে যে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে তাও আসলে সূর্য থেকেই আসা। সৌরশক্তি সমুদ্র বা নদনদীর পানিকে বাষ্পীভূত করে মেঘ তৈরি করছে। তা বৃষ্টি হয়ে ভূপৃষ্ঠে নেমে এসে নদীর রূপ নিয়ে সমুদ্রে মিলিত হচ্ছে। নদনদীর এই স্রোত থেকে উৎপন্ন করা হচ্ছে জলবিদ্যুৎ।

প্রাচীনকাল থেকে মানুষ সূর্য কিরণকে সরাসরি ব্যবহার করছে কোনো কিছু শুকানোর কাজে। বর্তমানে সূর্যের শক্তিকে সবসময় ব্যবহারের জন্য মানুষ নানান রকম উপায় অবলম্বন করেছে। লেন্সের সাহায্যে সূর্য রশ্মিকে ফোকাস করে আগুন



চিত্র : ২৫.৩



চিত্র : ২৫.৪

জ্বালানো যায় (চিত্র : ২৫.৩)। সূর্য কিরণকে ধাতব চাকতির সাহায্যে প্রতিফলিত করে তৈরি হয় সৌরচুল্লি। এই চুল্লিতে রান্না করা যায় (চিত্র : ২৫.৪)।

সৌরশক্তিকে শীতের দেশে ঘরবাড়ি গরম রাখার কাজে ব্যবহার করা হয়।শস্য, মাছ, সবজি শুকানোর কাজে সৌরশক্তি ব্যবহৃত হয়। মাছ শুকিয়ে শুঁটকি তৈরি করে তা বহুদিন সংরক্ষণ করা যায়। সৌরশক্তির সাহায্যে বয়লারে বাষ্প তৈরি করে তার দ্বারা তড়িৎ উৎপাদনের জন্য টার্বাইন ঘুরানো হয়।

আধুনিক কৌশল ব্যবহার করে তৈরি হয়েছে সৌরকোষ। সৌরকোষের বৈশিষ্ট্য হল এর উপর সূর্যের আলো পড়লে এ থেকে সরাসরি তড়িৎ পাওয়া যায়। সৌরকোষের নানান রকম ব্যবহার রয়েছে।

১। কৃত্রিম উপগ্রহে তড়িৎ শক্তি সরবরাহের জন্য এই কোষ ব্যবহৃত হয়। এ জন্য কৃত্রিম উপগ্রহ বহুদিন ধরে তার কক্ষপথে ঘুরতে পারে।

২। বিভিন্ন ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি যেমন পকেট ক্যালকুলেটর, পকেট রেডিও, ইলেকট্রনিক ঘড়ি সৌরশক্তির সাহায্যে চালানো হচ্ছে।

আমাদের দেশেও সৌরকোষের পরীক্ষামূলক ব্যবহার শুরু হয়েছে। বরিশাল অঞ্চলে হাসপাতাল এবং তদসংশ্লিষ্ট এলাকায় বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর জন্য ১৯৮৯ সালে দুইটি সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। পটুয়াখালী জেলার মির্জাগঞ্জ থানায় সৌরবিদ্যুতের সাহায্যে একটি টেলিফোন অফিস চালানো হচ্ছে। এছাড়া বাংলাদেশে কৃষি জমিতে সেচের কাজে ব্যবহৃত পাম্প সৌর কোষের সাহায্যে চালাবার জন্য গবেষণা চলছে। সূর্য থেকে যে পরিমাণ শক্তি তার আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে তার ২০০ মিলিয়ন বা ২০ কোটি ভাগের একভাগ মাত্র পৃথিবীতে পৌঁছায়। এর অর্থ হল সূর্য থেকে ছড়িয়ে পড়া শক্তি দিয়ে ২০ কোটি পৃথিবী বেঁচে থাকতে পারে। তড়িৎ শক্তির সাথে তুলনা করলে পৃথিবীতে আসা সৌরশক্তির পরিমাণ ১৮ × ১০^{১৩} কিলোওয়াট। পৃথিবীর প্রতি বর্গমিটার আয়তনে যে পরিমাণ সৌরশক্তি নিয়ত পতিত হয় তার পরিমাণ ১.৩৬ কিলোওয়াট তড়িতের সমান।

সূর্যের শক্তির সবটুকু যদি ব্যবহারের সুবিধা বা ব্যবস্থা পৃথিবীতে থাকত তাহলে শক্তি নিয়ে পৃথিবীতে চিন্তা করতে হত না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি শক্তি ব্যবহারকারী দেশ। সে দেশে ৩২ মিনিটে যে পরিমাণ সৌরশক্তি পতিত হয় তা সবটুকু যদি ব্যবহার করা যেত তাহলে তা দিয়ে ঐ দেশের সারা বছরের শক্তির চাহিদা মেটানো যেত। পৃথিবীতে আগত সৌর শক্তির বেশির ভাগ বিভিন্ন কারণে ব্যবহার করা যায় না। এর মধ্যে যন্ত্রপাতির অভাব অন্যতম।

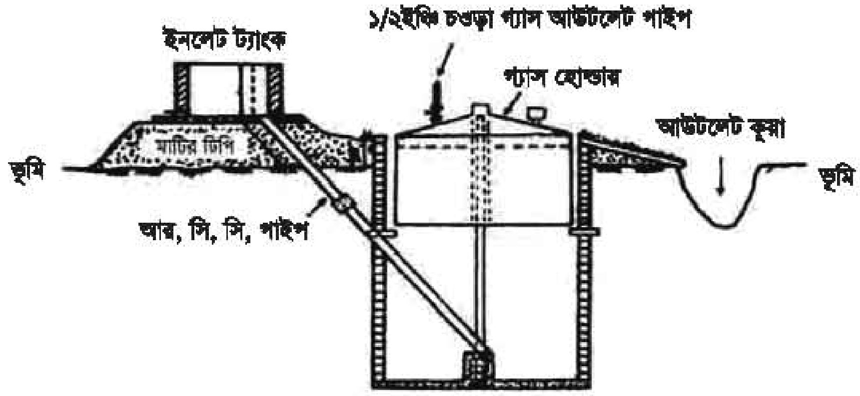
সৌরশক্তি ব্যবহারের সুবিধা হল এই শক্তি ব্যবহারে পরিবেশ দূষণের সম্ভাবনা কম। এই শক্তি ব্যবহারে বিপদের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। সৌরশক্তির সহসা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এই শক্তির তাই প্রচলিত শক্তি উৎস জীবাশ্ম জ্বালানির বিকল্প হিসেবে ব্যবহারের সম্ভাবনা খুব বেশি।

২৫.১০। বায়োগ্যাস (Biogas)

ঘোড়া ও গরু মহিষের বিষ্ঠার জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার বহু প্রাচীন। প্রাণীর বিষ্ঠা শক্তির এক রকম উৎস। গোবর শুকিয়ে তা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশ ও ভারতসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শুকনো গোবর জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তবে এই পদ্ধতিতে তাপ শক্তি পাওয়া যায় খুব কম। কারণ শতকরা ৮৫ ভাগ তাপশক্তি অব্যবহৃত থেকে যায়–বায়ুমণ্ডলে চলে যায়। এজন্যে বর্তমানে গরু মহিষ প্রভৃতি গবাদি পশুর গোবর কাজে লাগিয়ে তা থেকে গ্যাস তৈরি করে ব্যবহৃত হচ্ছে, এই গ্যাসকে বলা হয় বায়োগ্যাস। বাংলাদেশ, ভারত ও আফ্রো–এশীয় দেশে এই গ্যাস ব্যবহার বাড়ছে। রান্নার কাজে, বাতি জ্বালাতে ও পাম্প চালাতে এই গ্যাস ব্যবহৃত হয়।

প্রাণীর মলমূত্র বিশেষ করে গরু, ঘোড়া, মহিষ ইত্যাদির গোবর কিছু কিছু পচা গাছপালা পানির সাথে মিশালে ফারমেনটেশন বা গাজন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। এই গাজন প্রক্রিয়া ঘটে ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে। এসবের গাজনের ফলে মিথেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই গ্যাস রান্না, বাতি জ্বালানো ও পাম্প চালানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। অবশিষ্ট গোবরকে কৃষি জমিতে সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। কারণ অবশিষ্ট গোবরে সারের গুণাগুণ বজায় থাকে। ৪/৫ জনের একটি পরিবারের রান্না ও বাতি জ্বালানো গ্যাসের জন্য ২/৩টি মাঝারি ধরনের গরুর গোবরই যথেষ্ট।

বায়োগ্যাস প্লান্ট এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে গোবর ও পচা গাছপালা ঢোকানো ও বের করে নেওয়া যায়। এতে গ্যাসের সরবরাহ সব সময়ই থাকে। প্রয়োজনমতো গোবর দেওয়া যায় এবং অবশিষ্ট গোবর বের করে নিয়ে সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। বায়োগ্যাস প্লান্ট তৈরি করা খুবই সহজ। এই প্লান্টের একটি পূর্ণ চিত্র নিচে দেখানো হল :



চিত্র : ২৫.৫

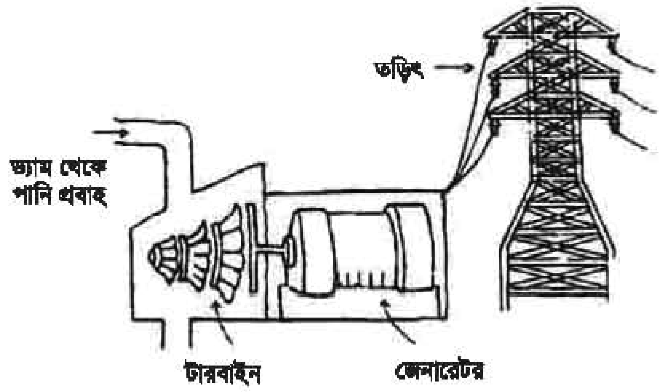
এই প্লান্টের প্রধান দুইটি অংশ—একটি কূয়া বা মাটির নিচে থাকে এবং অপরটি গ্যাস হোল্ডার যার ভিতরে গ্যাস জমা হয়। কূয়ার একদিকে মাটির উপরে থাকে একটি ইনলেট ট্যাঙ্ক যার মধ্যে প্রথমে ১ ঃ ২ অনুপাতে গোবর পানির মিশ্রণ তৈরি করে ইনলেট পাইপের মাধ্যমে তা কূয়ার মধ্যে নেওয়া হয়। এখন গ্যাস হোল্ডারটি তার নির্দিষ্ট জায়গায় বসিয়ে গ্যাসভালভ বন্ধ করে দেওয়া হয়। গ্যাস তৈরি শুরু হলে গ্যাস হোল্ডারটি আপনা আপনি উপরে ওঠে আসে। গ্যাস তৈরি শুরু হলে প্রথম ২/৩ দিন গ্যাস বের করে দিয়ে তারপর চুলা জ্বালিয়ে দেখতে হবে জ্বলে কি না। গ্যাস জ্বালানো শুরু হলে প্রতিদিন একই সময়ে গ্যাসের চাহিদা মোতাবেক পরিমাণ মত গোবর সমপরিমাণ পানির সাথে ইনলেট ট্যাঙ্কে জমা করে ভালভাবে মিশিয়ে কূয়ার মধ্যে নিতে হবে। কূয়ার অপরদিকে একটি আউটলেট পাইপ যুক্ত করা হয় যা দিয়ে গোবর সার বেরিয়ে আসে।

কোনো কোনো দেশে মানুষের বিষ্ঠা থেকেও জ্বালানি গ্যাস তৈরির প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু শৌচাগার ব্যবহারের সুযোগ ও অভ্যাস না থাকায় এবং কুসংস্কারজনিত কারণে মানুষের বিষ্ঠা থেকে বায়োগ্যাস তৈরির ব্যাপারটি এখনও জনপ্রিয় হয়নি।

২৫.১১। শক্তির অন্যান্য উৎস

পানি ঃ পানি শক্তির অন্যতম উৎস। পানির প্রবাহকে ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়, এই বিদ্যুৎকে জলবিদ্যুৎ বা পানি বিদ্যুৎ বলা হয়।

প্রবাহিত পানির স্রোতে তিন ধরনের শক্তি আছে—গতিশক্তি, বিভব শক্তি এবং পানির মধ্যে স্থিতিশীল চাপের জন্য সৃষ্ট গতিশক্তি। প্রবাহিত পানির স্রোতকে ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রক্রিয়াটি সহজ। পানির স্রোতের সাহায্যে একটি টার্বাইন ঘোরানো হয়।



চিত্র : ২৫.৬

এই টার্বাইনের ঘূর্ণন থেকেই এখানে যান্ত্রিক শক্তি ও চৌম্বকশক্তির সমন্বয় ঘটানো হয়।

প্রবাহিত পানির স্রোত থেকে যান্ত্রিক শক্তি সংগ্রহ করে চৌম্বক শক্তির সমন্বয়ে তড়িৎ উৎপাদন করা হয় বলে এই ধরনের তড়িতের নাম জলবিদ্যুৎ।

পানির জোয়ার–ভাটা : নদী বা সমুদ্রের পানির জোয়ার–ভাটার শক্তিকে ব্যবহারের প্রচেষ্টা মানুষ বহুদিন থেকে চালিয়ে যাচ্ছে। জোয়ার–ভাটার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন যন্ত্র চালনার ব্যাপারটি অনেক দিন আগেই উদ্ভাবিত হয়েছে। গত শতাব্দীতে লন্ডন শহরে জোয়ার–ভাটার শক্তির সাহায্যে একটি ইঞ্জিন চালানো হয়েছিল। ফ্রান্সে ১৯১৮ সালে জোয়ার–ভাটার শক্তির সাহায্যে চালানো যায় এমন ২০০টি যন্ত্রের পেটেন্ট নেওয়া হয়েছিল। জোয়ার–ভাটার শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরের ব্যাপারটি খুব বেশি দিনের নয়। ১৯৩৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং ১৯৪০ সালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের জোয়ার–ভাটা থেকে তড়িৎ শক্তি উৎপাদনের দুটি প্রকল্প স্থাপিত হলেও উৎপাদন ব্যয় অধিক থাকায় তা চালু করা যায়নি।

ফ্রান্সে জোয়ার–ভাটার শক্তির সাহায্যে চালিত দুইটি তড়িৎশক্তি প্রকল্প সফলতার সাথে কাজ করছে। এদের একটি ৯ মেগাওয়াট বিশিষ্ট উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন মার্লো তড়িৎ প্রকল্প, অপরটি ২৪০ মেগাওয়াট বিশিষ্ট উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন র‍্যান্স তড়িৎ প্রকল্প।

বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জোয়ার–ভাটার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তড়িৎ উৎপাদনের চেষ্টা চলছে।

বায়ু শক্তি : আদিম মানুষ ভয় পেত বায়ুকে। সভ্যতার বিকাশ ও বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এই বায়ুকে মানুষ তার বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করছে। আদিম মানুষ চার পাঁচটা পাখার সাহায্যে চক্র বানিয়ে বাতাসের সাহায্যে চক্র ঘুরাত। চক্রের ঘূর্ণনকে কাজে লাগিয়ে আদিম মানুষ কুয়া থেকে পানি তোলা, কৃষিসেচ, যব অথবা গম ভাঙানো, আখ মাড়াই, ধানকাটা, খড় কাটা ইত্যাদি কাজ করত। পরে মানুষ বাতাসকে কাজে লাগিয়ে কাঠ চেরাইয়ের মতো দুরূহ কাজও করেছিল।

পৃথিবীর বহু অঞ্চলে মানুষ এ ধরনের কাজে বড় বড় চক্রাকার এক ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করত, যার চলতি নাম হাওয়াকল বা বায়ুকল বা উইন্ড মিল। বাষ্পচালিত ও বিদ্যুৎ চালিত কল এসে উইন্ড মিলের ব্যবহার মানুষকে প্রায় ভুলিয়ে দিল। ফলে এল জীবাশ্ম জ্বালানি (কয়লা ও খনিজ তেল) চালিত যন্ত্র । মানুষ একেবারে ভুলে গেল বায়ুকলের কথা। এখন যখন কয়লা ও তেলের ভান্ডারে টান পড়তে শুরু করেছে, এসবের ব্যবহারে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, তখন মানুষ নতুন করে ভাবছে বায়ুকল বা উইন্ড মিলের কথা। তবে এখন হাওয়া কল ব্যবহৃত হচ্ছে তড়িৎ উৎপাদনের কাজে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উইন্ড মিল ব্যবহার করে তড়িৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে আছে। এর পর রয়েছে ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, ডেনমার্ক, ইত্যাদি দেশ উইন্ড মিল ব্যবহার করে তড়িৎ উৎপাদন করছে।



চিত্র : ২৫.৭

২৫.১২। আধুনিক সভ্যতা বিকাশে শক্তির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

মানব সভ্যতা যতই এগিয়ে যাচ্ছে, শক্তির চাহিদা ততই বাড়ছে। কারণ দিন যতই যাচ্ছে মানুষ উন্নত জীবন যাপনের জন্যে, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি করছে নতুন নতুন জিনিস। কোনো কিছুই শক্তির ব্যবহার ছাড়া তৈরি করা যায় না। নিম্নোক্ত কারণে শক্তির চাহিদা বাড়ছে।

১। **বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধি।** জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সকল রকম জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়ছে এবং তা তৈরি করতে ও যোগান দিতে অধিক শক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে।

২। **জাতীয় উন্নতির জন্য।** যে জাতি যত উন্নত হচ্ছে তত সমৃদ্ধি লাভ করছে, জীবনযাত্রার মান ততই উন্নত করছে। বেশি করে বাসস্থান তৈরি হচ্ছে দালান–কোঠা নির্মাণ হচ্ছে, মোটর সাইকেল, বিমান ইত্যাদির ব্যবহার বাড়ছে। এসব তৈরি ও ব্যবহারের জন্য বেশি শক্তির প্রয়োজন হচ্ছে।

৩। **ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি।** মানুষের জীবনযাত্রার মান যতই উন্নত হচ্ছে; তার ব্যক্তিগত সম্পদ যেমন রেডিও, টেপরেকর্ডার, টেলিভিশন, ভি সি আর, ভি সি পি, গাড়ি, মোটর সাইকেল, ফ্রিজ ইত্যাদি নানান রকম বিলাসসামগ্রীর ক্রয় ও ব্যবহার ততই বাড়ছে। ফলে শক্তির ব্যবহার বাড়ছে।

৪। উন্নত দেশগুলোর বিলাসবহুল জীবন ধারা ও বেহিসাবী পরিকল্পনা শক্তির চাহিদাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে।

২৫.১৩। শক্তির সংকট

পৃথিবীর শক্তির ভাণ্ডারে শক্তি অফুরন্ত নয়, সীমিত। শক্তির চাহিদা দিন দিন যত বাড়ছে, শক্তির সঙ্কট তত ঘনীভূত হচ্ছে। আধুনিক সভ্যতার মেরুদণ্ড হচ্ছে বর্তমান শক্তির উৎস–জীবাশ্ম জ্বালানি অর্থাৎ কয়লা, খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস। পৃথিবীর জনসংখ্যা ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগামী ৩৫ বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হবে। তাই শক্তির চাহিদাও অনেক বৃদ্ধি পাবে।

কয়লার প্রাচুর্য থাকলেও সবদেশে তা সমান নয় এবং কোনো কোনো দেশে কয়লা নেই। তবে আগামী শতকেও কয়লা শক্তির অন্যতম প্রধান উৎস হয়ে থাকবে।

পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যে তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে তা হল ১৪২ বিলিয়ন টন। এই ১৪২ বিলিয়ন টনের মধ্যে ৪৪ বিলিয়ন টন অর্থাৎ এক–তৃতীয়াংশ খরচ হয়ে গেছে। বাকি মজুদ ৯৮ বিলিয়ন টন এই শতকেই ফুরিয়ে যাবে।

অদূর ভবিষ্যতে ১৩২ বিলিয়ন টন তেলের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে যা দিয়ে আগামী শতকের (২১ শতকের) অর্ধেক চাহিদা মিটবে।

গ্যাসের সঞ্চিত ভাণ্ডার সম্পর্কে ঠিক হিসাব পাওয়া কঠিন। বিভিন্ন দেশের হিসাব অনুযায়ী সারা বিশ্বে প্রায় ৭২৩৬০ বিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস মজুদ আছে। যে হারে পৃথিবীতে গ্যাস খরচ হচ্ছে তাতে এই গ্যাসে ৩০০ বছর চলতে পারে। কিন্তু শক্তি হিসেবে গ্যাস হয়তো তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারবে না। পারমাণবিক শক্তি আগামী দিনগুলোতে শক্তির একটা প্রধান উৎস হতে পারে। পারমাণবিক প্রকল্প নির্মাণ ব্যয়বহুল এবং এ থেকে বিপদের সম্ভাবনাও আছে। শক্তির সংকট কাটানোর জন্য মানুষকে পারমাণবিক শক্তিকে নিরাপদভাবে কাজে লাগাতে হবে। আগামী শতকে শক্তির উৎস হিসেবে পারমাণবিক শক্তি সভ্যতার একটা প্রধান অঙ্গ হতে পারে। তবে এ থেকে বিপদের সম্ভাবনার কথাও ভাবতে হবে।

শক্তির একটি প্রধান উৎস সৌর শক্তি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সৌরশক্তির ব্যবহার দিন দিন বেড়ে চলেছে। বর্তমানে আমাদের দেশেও এই শক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য গবেষণা করা হচ্ছে। এই শক্তিকে আমাদের নানান রকমের প্রয়োজনীয় কাজে লাগাতে হবে। তবে একথা ঠিক আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন স্থানে বা কার্যে শক্তির অপচয় কমিয়ে আনা একটি প্রধান কর্তব্য।

২৫.১৪। শক্তি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

জীবাশ্ম জ্বালানির পরিমাণ এত সীমিত যে একদিন দেখা যাবে, এগুলো একবারেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমানোর জন্য প্রয়োজন শক্তির বিকল্প উৎস অনুসন্ধান করা বা বিকাশ লাভ ঘটানো। এসব উৎসের মধ্যে জল বিদ্যুৎও রয়েছে।

আমাদের সকলের ব্যক্তিগত দায়িত্ব হচ্ছে শক্তির অপচয় রোধ করা। দৈনন্দিন জীবনে আমরা নানা কাজে দিন দিন শক্তির ব্যবহার বাড়িয়েই চলেছি এবং সংগে সংগে একে ব্যাপকভাবে অপচয় করছি। অথচ একটু সচেতন হলে আমরা এই শক্তির অপচয়কে রোধ করতে পারব। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম (যেমন আলো, পাখা, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি) ব্যবহার করার সময় ছাড়া সব সময় এগুলো 'অফ' করে রাখা উচিত।

গাড়ি, বাস, ট্রাক, মোটর সাইকেল ইত্যাদি চালানোর সময় পথের মধ্যে যখন বিভিন্ন কারণে থামতে হয় তখন ইঞ্জিনের সুইচ বন্ধ করে রাখা উচিত।

ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা উচিত নয় কারণ এতে বিদ্যুৎ খরচ বেশি।

দৈনন্দিন জ্বালানির কাজে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার কমানো উচিত। এজন্য রান্নার সময় ছাড়া বাকি সময় চুলা বন্ধ করে রাখা উচিত। ম্যাচের কাঠি বাঁচানোর জন্য চুলা জ্বালিয়ে রাখা অত্যন্ত গর্হিত কাজ।

জীবনের ভিত্তি হচ্ছে শক্তি। শক্তি ছাড়া মানুষের জীবন অচল। শক্তি আছে বলেই পৃথিবীতে জীবন সম্ভব হয়েছে। শক্তি সংরক্ষণ দৈনন্দিন জীবনের অধিকাংশ খরচের হাত থেকে বাঁচাতে পারে। এখনও যদি আমরা শক্তির সংরক্ষণ ও এর যথাযথ ব্যবহার না করতে পারি তবে এ সম্পদ খুব দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই প্রত্যেকের উচিত শক্তির সংরক্ষণ করা।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান কোনটি?

ক. ইথেন খ. মিথেন

গ. অকটেন ঘ. বিউটেন

২। বৃষ্টির দিনে কোনটি ব্যবহার অসুবিধাজনক?

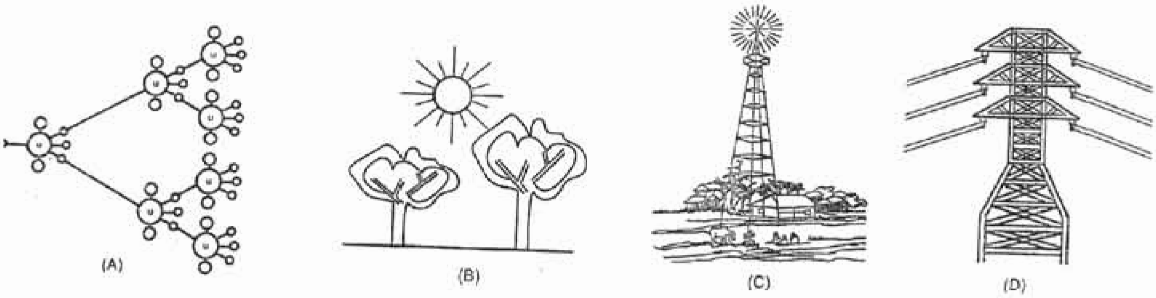
ক. নিউক্লিয় চুল্লি খ. উইন্ড মিল

গ. সৌরচুল্লি ঘ. মাটির চুলা

৩। বিশ্বে বর্তমানে মজুদ গ্যাসের পরিমাণ ৭২৩৬০ বিলিয়ন ঘনমিটার এবং প্রতিবছর ব্যবহৃত গ্যাসের পরিমাণ ২৪১২০০ মিলিয়ন ঘনমিটার হলে আগামী কত বছরে গ্যাস নিঃশেষ হয়ে যাবে?

ক. ২৭৫ বছর খ. ২৯০ বছর

গ. ৩০০ বছর ঘ. ৩১৫ বছর



চিত্র

৪। কোনটি থেকে সবচেয়ে বেশি ও পরিবেশ বান্ধব উপায়ে শক্তি পাওয়া সম্ভব?

ক. A খ. B

গ. C ঘ. D

৫। পারমাণবিক শক্তি –

i. উন্নতমানের বীজ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়

ii. সর্বদা মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হয়

iii. রোগ নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i ও iii

পারমাণবিক চুল্লিতে একটি তেজস্ক্রিয় মৌল জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের তেজস্ক্রিয় মৌল হতে তিন প্রকার রশ্মি নির্গত হয় যা জীব জগতের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

উপরের তথ্য থেকে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

৬। তেজস্ক্রিয় মৌল হতে নিচের কোন গুচ্ছের সবগুলো রশ্মি নির্গত হয়?

ক. x, γ, β খ. x, β, α

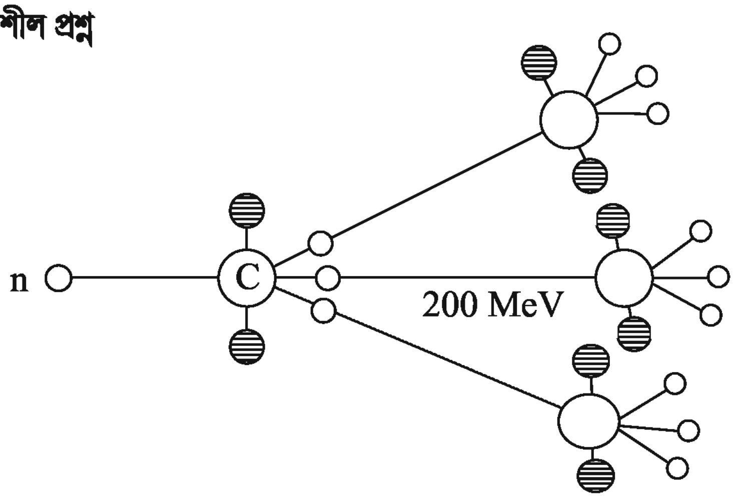
গ. লেজার, x, γ ঘ. α, γ, β

৭। সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর রশ্মি কোনটি?

ক. x রশ্মি খ. β রশ্মি

গ. αরশ্মি ঘ. γ রশ্মি

সৃজনশীল প্রশ্ন



চিত্র

ক. 'C' চিহ্নিত মৌলটির নাম কী?

খ. মৌলটিকে তেজস্ক্রিয় মৌল বলা হয় কেন?

গ. দ্বিতীয় স্তরের বিক্রিয়ায় নির্গত শক্তির পরিমাণ যুক্তিসহ নির্ণয় কর।

ঘ. উপরের বিক্রিয়াটি যদি অনিয়ন্ত্রিতভাবে ঘটে তার ফলাফল বিশ্লেষণ কর।

ব্যবহারিক

১। সূচনা

পদার্থবিজ্ঞানের পাঠ্যক্রম দুইটি অংশে বিভক্ত—তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক। পদার্থবিজ্ঞানের ব্যবহারিক ক্লাস, তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ হাতে কলমে পরীক্ষা করার সাথে সাথে আমাদের শিক্ষা দেয়, কীভাবে দক্ষতার সাথে কাজ সম্পন্ন করতে হয়, যা ব্যবহারিক জীবনে প্রতিপদক্ষেপে আমাদের প্রয়োজন হতে পারে। দক্ষতার সাথে কোনো কাজ সম্পন্ন করতে হলে তার জন্য পূর্ব প্রস্তুতির প্রয়োজন।

২। ব্যবহারিক কাজের উদ্দেশ্য

ল্যাবরেটরি বা গবেষণাগার হল শিক্ষার্থীদের ওয়ার্কশপ বা কর্মশালা। বিজ্ঞানের বিভিন্ন নীতির তাৎপর্য ও প্রয়োগ প্রদর্শনের জন্য ডিজাইনকৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এখানে ভৌত (এক্ষেত্রে পদার্থবিজ্ঞানের) নীতিসমূহ ও পরীক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করে। ব্যবহারিক কাজের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হল :

ক. পর্যবেক্ষণ ও উপাত্ত রেকর্ড করার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ লাভ।

খ. যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও সমন্বয় করার কৌশল জানা।

গ. পরীক্ষণের সীমাবদ্ধতা ও সামর্থ্য সম্পর্কে অনুধাবন।

ঘ. লেখচিত্রের সাহায্যে কোনো বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও নীতিকে উপস্থাপনের অভিজ্ঞতা অর্জন।

ঙ. উপাত্ত সংগ্রহ এবং নির্ভরযোগ্য উত্তর কর্ষণ বা যথাথ্য সম্পর্ক নির্ণয়ের সামর্থ্য সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসের বিকাশ সাধন।

যখন কোনো শিক্ষার্থী পরীক্ষালব্ধ উপাত্ত থেকে ফল হিসাব করতে সক্ষম হয় এবং সেই ফল যদি জ্ঞাত বা আদর্শ ফলের সাথে মিলে যায় তাহলে পরীক্ষণ সম্পাদন সম্পর্কে শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়, ফলে ভবিষ্যতে যে কোনো পরীক্ষণ সম্পাদন করার সামর্থ্য সম্পর্কে তার বিশ্বাস জন্মে।

৩। ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য প্রস্তুতি

ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য সপ্তাহে যে সময় বরাদ্দ থাকে তা যাতে পুরোপুরি কাজে লাগানো যায় সে জন্য ব্যবহারিক ক্লাসে যাওয়ার আগে প্রস্তুত হয়ে যেতে হয়। ক্লাসে কোন পরীক্ষাটি করতে হবে তা অন্তত এক সপ্তাহ আগে জেনে নিতে হয়। এই এক সপ্তাহ সময়ের মধ্যে পড়াশুনা করে পরীক্ষাটি সম্পর্কে ধারণা যতটা সম্ভব স্পষ্ট করে নেওয়া আবশ্যক। এ জন্য নিচের বিষয়গুলো জেনে নেওয়া দরকার :

ক. পরীক্ষার তত্ত্ব

খ. পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির বর্ণনা।

গ. পরীক্ষাটি কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে অর্থাৎ কাজের ধারা এবং

ঘ. ছক

এই সবই হচ্ছে বাড়ির প্রস্তুতি। ব্যবহারিক ক্লাসে অর্থাৎ পরীক্ষাগারে যাওয়ার সময় সাথে নিয়ে যেতে হবে :

ক. পদার্থবিজ্ঞান বই

খ. ব্যবহারিক খাতা দুটি : একটি খসড়া খাতা বা রাফ খাতা অপরটি আদর্শ খাতা বা ফেয়ার খাতা।

গ. স্কেল, পেনসিল, রবার, জ্যামিতি বক্স (যদি লাগে), ক্যালকুলেটর ও ছক কাগজ

৪। রাফ বা খসড়া খাতা (Rough Note Book)

ক্লাসে পরীক্ষাটি করার সময় যে সকল পাঠ পাওয়া যায়, পরীক্ষাটি সম্পন্ন করতে যে সকল অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় সেগুলো লিখে রাখতে হয়। প্রাপ্ত পাঠ থেকে হিসাব করে ফলাফল নির্ণয় এই খাতাতে করতে হয়। পরীক্ষা শেষে

শিক্ষককে দেখিয়ে এই খাতায় তাঁর স্বাক্ষর নিলে ভালো হয়। একটি রাফ ব্যবহারিক খাতা একজন ছাত্রের মানসিকতা ও দক্ষতার উত্তম প্রতিফলক। রাফ খাতায় আগে থেকে কাজের ধারা লিখে এবং ছক এঁকে রাখলে ক্লাসে পরীক্ষাটি করতে অনেক সুবিধা হয়।

৫। আদর্শ বা ফেয়ার খাতা (Fair Note Book)

ক্লাসে যে পরীক্ষাটি করা শেষ হয়ে যাবে আদর্শ বা ফেয়ার খাতায় সেটি লিখে ফেলতে হবে। মনে রাখতে হবে পরীক্ষার সময় এই ফেয়ার খাতা জমা দিতে হবে এবং সেজন্য আলাদাভাবে নম্বর বরাদ্দ আছে। ফেয়ার খাতার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও ধারাবাহিকতা বজায় রেখে গোছালোভাবে পরীক্ষার তত্ত্ব, যন্ত্রপাতি, কাজের ধারা, ফলাফল, সতর্কতা, সুবিধা–অসুবিধা ইত্যাদি লিখতে হবে। ফেয়ার খাতা লেখার পদ্ধতি পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

৬। পরীক্ষাগারে (In the lab.)

১. প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি হাতে নিয়ে পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত জায়গায় যেতে হবে। পরীক্ষাগারের মধ্যে অকারণ ঘুরে বেড়ানো নিতান্তই অবাঞ্ছনীয়। মনে রাখতে হবে ব্যবহারিক ক্লাসে শৃঙ্খলা ও শিষ্টাচার বজায় রাখা সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পূর্বশর্ত।

২. পরীক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে। দেখতে খুব সাধারণ হলেও পদার্থবিজ্ঞানের সবগুলো যন্ত্রপাতি অত্যন্ত মূল্যবান। তাই যন্ত্রপাতি সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে। কারণ কোনো যন্ত্র হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হলে সে দায়িত্ব তোমার। কোনো যন্ত্রের ব্যবহার না বুঝতে পারলে শিক্ষকের কাছ থেকে বুঝে নিতে হবে।

৩. পরীক্ষা সম্পর্কিত কোনো ধারণা অস্পষ্ট থাকলে তা ব্যবহারিক ক্লাসের শিক্ষকের কাছ থেকে বুঝে নিতে হবে।

৪. এর পর কাজের ধারায় বর্ণিত নিয়মানুযায়ী পরীক্ষাটি সম্পন্ন করতে হবে। পরীক্ষালব্ধ উপাত্তসমূহ রাফ খাতায় লিখে প্রয়োজনীয় হিসাব করে ফলাফল নির্ণয় করতে হবে।

৫. রাফ খাতা শিক্ষককে দেখিয়ে স্বাক্ষর নিতে হবে।

৬. যে পরীক্ষা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে সেটি ফেয়ার খাতায় নিচে আলোচিত পদ্ধতি অনুযায়ী লিখে পরবর্তী ক্লাসে শিক্ষককে দেখিয়ে তাঁর স্বাক্ষর নিবে। শুধু যে পরীক্ষাটি সম্পূর্ণ হয়েছে ফেয়ার খাতায় সেটিই লিখবে। অন্যের খাতা থেকে পাঠ কোনোক্রমেই ফেয়ার খাতায় লিখবে না।

৭। ব্যবহারিক ফেয়ার বা আদর্শ খাতা লেখার পদ্ধতি

ব্যবহারিক ফেয়ার বা আদর্শ খাতায় প্রতিটি পরীক্ষার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অবশ্যই লিখতে হবে :

১. পরীক্ষার নম্বর, ২. পরীক্ষার তারিখ, ৩. পরীক্ষণের নাম, ৪. তত্ত্ব, ৫. যন্ত্রপাতি, ৬. যন্ত্রের বর্ণনা, ৭. কাজের ধারা, ৮. হিসাব, ৯. ফলাফল, ১০. সতর্কতা এবং ১১. আলোচনা।

নিচে একে একে এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল :

১. **পরীক্ষার নম্বর :** ব্যবহারিক খাতার বাম দিকে উপরের কোণে পরীক্ষার নম্বর লিখতে হবে। [সিলেবাস বা স্কুলের ল্যাবরেটরিতে দেওয়া তালিকার অথবা ছাত্র/ছাত্রী যে ক্রমানুসারে পরীক্ষা সম্পাদন করে, সেই ক্রমানুসারে পরীক্ষার নম্বর দিতে হবে।]

২. পরীক্ষার তারিখ : যে দিন পরীক্ষাটি সম্পাদন করা হয় সেদিনের তারিখ পরীক্ষার নম্বরের নিচে লিখতে হবে।

৩. পরীক্ষণের নাম : সিলেবাস অনুযায়ী পরীক্ষার নাম লিখতে হবে।

৪. তত্ত্ব : তত্ত্বের শুরুতেই পরীক্ষার সাহায্যে যে রাশিটি নির্ণয় করতে হবে তার সংজ্ঞা দিতে হবে। [যেমন আয়তন, কোনো বস্তুর ঘনত্ব, উত্তল লেন্সের ফোকাস দূরত্ব নির্ণয়ের সময় প্রথমে এগুলোর সংজ্ঞা দিয়ে নিতে হবে।]

এরপর পরিমেয় রাশিটির সূত্র বা ফরমুলা অর্থাৎ সমীকরণটি লিখতে হবে। যেমন গোলকের আয়তনের ক্ষেত্রে,

$$V = \frac{1}{6}\pi d^3$$

এরপর উক্ত সমীকরণে ব্যবহৃত প্রতীকগুলো কী নির্দেশ করছে তা লিখতে হবে। যেমন উপরিউক্ত সমীকরণে

V = গোলকের আয়তন

d = গোলকের ব্যাস

$\pi = 3.14$ = একটি ধ্রুব সংখ্যা

পরীক্ষায় আমাদের যে রাশি বা যে সকল রাশি সরাসরি পরীক্ষার সাহায্যে নির্ণয় করতে হবে সেগুলোর জন্য সমীকরণ লিখতে হবে। যেমন উপরিউক্ত পরীক্ষায় আমাদের গোলকের ব্যাস নির্ণয় করে এর আয়তন হিসাব করতে হবে। সুতরাং, ব্যাস নির্ণয়ের প্রয়োজনীয় সূত্রটি লিখতে হবে। স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে কোনো গোলকের ব্যাস তথা যে কোনো দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের সূত্র হলো :

ব্যাস বা দৈর্ঘ্য = প্রধান স্কেল পাঠ (M)+ ভার্নিয়ার সমপাতন (V) × ভার্নিয়ার ধ্রুব (V.C) – [± যান্ত্রিক ত্রুটি (e)].

৫. যন্ত্রপাতি : পরীক্ষাটি সম্পাদনের জন্য যে সমস্ত যন্ত্র ও জিনিসপত্রের প্রয়োজন তার একটা তালিকা এখানে দিতে হবে।

৬. যন্ত্রের বর্ণনা : প্রধান যন্ত্রপাতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে হবে। এরপর কাজের ধারা লিখতে হবে।

কাজের ধারা কীভাবে লিখতে হবে তা শুরু করার আগে পরিমাপের সময় কী ধরনের ত্রুটি উদ্ভব হতে পারে সে সম্পর্কে একটু ধারণা দেওয়া দরকার। নিচে পরিমাপের ত্রুটি সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

পরিমাপের ত্রুটি

পরীক্ষাগারে কোনো রাশির মান নির্ণয় করতে হলে পরিমাপ করতে হয়। পরিমাপ কখনোই নির্ভুল হয় না। সব পরিমাপেরই সঠিকতার একটা সীমা আছে। যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করলেও একই রাশির পরিমাপের সময় একই পরীক্ষকের বিভিন্ন সময়ে পরিমাপ অথবা বিভিন্ন পরীক্ষকের একই সময়ে পরিমাপের বেলায় ভিন্ন ভিন্ন মান পাওয়া যেতে পারে। পরিমাপের সময় মূলত দুই ধরনের ত্রুটি দেখা যায়। যথা :

১. পর্যবেক্ষণ জনিত ত্রুটি ও ২. যান্ত্রিক ত্রুটি।

১. পর্যবেক্ষণ জনিত ত্রুটি : পর্যবেক্ষণ জনিত ত্রুটি বিভিন্নভাবে হতে পারে।

যেমন :

(i) ব্যক্তিগত ত্রুটি

(ii) প্রান্ত–দাগ ত্রুটি

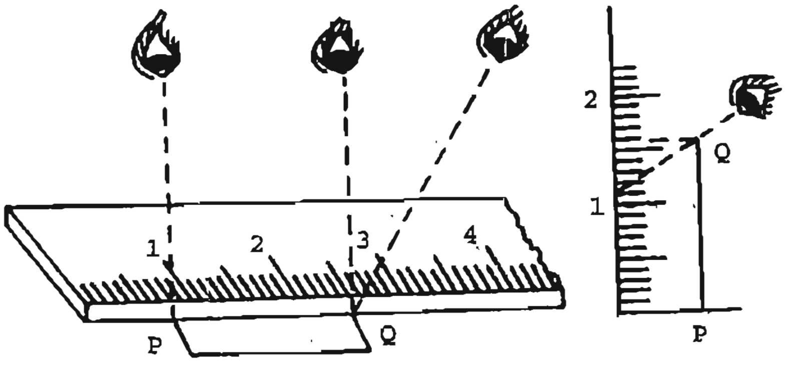
(iii) লম্বন ত্রুটি

(vi) পরিবেশগত ত্রুটি

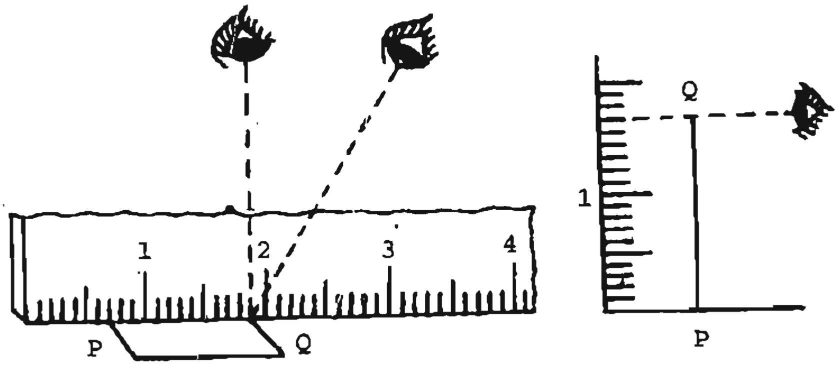
(i) ব্যক্তিগত ত্রুটি (Personal error) : যে কোনো পর্যবেক্ষণের মান বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য বিভিন্ন রকম হতে পারে। আবার একই ব্যক্তি একই পর্যবেক্ষণ কয়েকবার করলে প্রতিবারই পৃথক মান পাওয়া যেতে পারে। যেমন, কোনো এক সময় কয়েকজন পর্যবেক্ষক যদি একই সরল দোলকের দোলনকাল নির্ণয় করেন তাহলে দেখা যাবে যে, বিভিন্ন ব্যক্তির প্রাপ্ত মান বিভিন্ন হয়েছে। আবার একই ব্যক্তি যদি কয়েকবার দোলনকাল নির্ণয় করেন তাহলে প্রতিবারই পৃথক মান পাওয়া যেতে পারে। মাপের এই বিভিন্নতা ব্যক্তির চিন্তাধারা, মানসিকতা, শারীরিক অবস্থা সব কিছুর ওপর নির্ভর করে। এই প্রকার ত্রুটিকে ব্যক্তিগত ত্রুটি বলে। একই রাশির অনেকগুলো পাঠ নিয়ে গড় পাঠ বের করলে এই ত্রুটি কিছুটা কমানো যায়। তবে এই ত্রুটি একেবারে দূর করা যায় না।

(ii) প্রান্ত–দাগ ত্রুটি (End division error) : দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে কোনো স্কেলের প্রান্তের দাগ ক্ষয়ে যেতে পারে বা অস্পষ্ট হয়ে পড়তে পারে। ফলে, প্রান্ত-দাগ ব্যবহার করে পরিমাপ নিলে তাতে ভুল হয়ে যেতে পারে। তাই স্কেলের মাঝামাঝি অংশ ব্যবহার করে পাঠ নিলে এ ধরনের ত্রুটি এড়ানো যায়।

(iii) লম্বন ত্রুটি (Parallax error) : পর্যবেক্ষকের অবস্থানের বা দৃষ্টির দিক পরিবর্তনের সাথে সাথে কোনো লক্ষবস্তুর অবস্থানের আপাত পরিবর্তনকে লম্বন বলে। এ কারণে পরিমাপে যে ভুল হয় তাকে লম্বন ত্রুটি বলে। ১ নং চিত্রে পর্যবেক্ষকের চোখের অবস্থানের পরিবর্তনের সাথে Q বিন্দুর পাঠের কীরূপ পরিবর্তন হয় তা দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রে PQ বস্তুটি স্কেলের দাগের সংস্পর্শে না থাকার জন্য লম্বন ত্রুটির উদ্ভব হয়। ২ নং চিত্রে স্কেল ব্যবহারের ঠিক পদ্ধতি দেখানো হয়েছে। যখন পরিমেয় বস্তুটি স্কেলের দাগের সংস্পর্শে থাকে তখন চোখের অবস্থানের পরিবর্তনের জন্য পাঠের কোনো পরিবর্তন হয় না (২ নং চিত্রে বাম দিকের স্কেল)। কিন্তু বস্তুটি যদি স্কেলের দাগের সংস্পর্শে না থাকে তাহলে স্কেলটিকে দৃষ্টি রেখার সাথে সমকোণে রেখে পাঠ নিলে লম্বন ত্রুটি হবে না (২ নং চিত্রে ডান দিকের স্কেল)।



চিত্র–১ : স্কেল ব্যবহারের ভুল পদ্ধতি



চিত্র–২ : স্কেল ব্যবহারের ঠিক পদ্ধতি

(iv) পরিবেশগত ত্রুটি (Environmental error) : তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা ইত্যাদি নৈসর্গিক কারণে পরীক্ষালব্ধ পাঠ প্রকৃত পাঠ থেকে পৃথক হতে পারে। যেমন আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়ের সময় আমরা যে পানি ব্যবহার করি সে পানির তাপমাত্রা $4^{\circ}C$–এ থাকে না, পরীক্ষাগারের তাপমাত্রায় থাকে। এই পানি ব্যবহার করে যে আঃ গুরুত্ব পাওয়া যাবে তা প্রকৃত আঃ গুঃ হবে না। প্রকৃত আপেক্ষিক গুরুত্ব পাওয়ার জন্যে পরীক্ষালব্ধ মানকে পরীক্ষাগারের তাপামাত্রায় পানির আঃ গুঃ দিয়ে গুণ করতে হবে।

২. যান্ত্রিক ত্রুটি (Instrumental error) : পরীক্ষার জন্য যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় তাতে কিছু ত্রুটি থাকতে পারে। এসকল ত্রুটিকে যান্ত্রিক ত্রুটি বলে। যন্ত্রে প্রধানত যে সব ত্রুটি দেখা যায় তা নিচে আলোচনা কর হল :

(i) শূন্য ত্রুটি (Zero error)

(ii) পিছট ত্রুটি (Backlash error)

(iii) লেভেল ত্রুটি বা অনুভূমিক রেখা ত্রুটি (Level error or horizontal line error)

(i) শূন্য ত্রুটি : সাধারণত ভার্নিয়ার স্কেল, স্লাইড ক্যালিপার্স ও স্ক্রুগজের প্রধান স্কেলের শূন্য দাগ যদি ভার্নিয়ার বা বৃত্তাকার স্কেলের শূন্য দাগের সাথে না মেলে তাহলে এই ধরনের ত্রুটি দেখা দেয়। এর ফলে পরীক্ষালব্ধ পাঠ প্রকৃত পাঠের চেয়ে কম বা বেশি হতে পারে। শূন্য ত্রুটির পরিমাণ নির্ণয় করে আপাত পাঠ থেকে তা বিয়োগ করে প্রকৃত পাঠ নির্ণয় করা হয়।

(ii) পিছট ত্রুটি : যে সকল যন্ত্র স্ক্রু, নাট ইত্যাদি নীতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি সে সকল যন্ত্র সাধারণত একটু পুরানো হলে এই ধরনের ত্রুটি দেখা দেয়। কারণ বহু ব্যবহারের ফলে নাটের গর্ত বড় হয়ে যেতে পারে বা স্ক্রু ক্ষয় হয়ে আলগা হয়ে যায়। ফলে স্ক্রু উভয় দিকে একই পরিমাণ ঘূর্ণনের ফলে একই পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করে না। এই জাতীয় ত্রুটিকে পিছট ত্রুটি বলে। পাঠ নেওয়ার সময় স্ক্রুকে একই দিকে ঘুরিয়ে পাঠ নিলে এই ত্রুটির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

(iii) লেভেল ত্রুটি : নিক্তি, ট্যানজেন্ট গ্যালভানোমিটার, বিক্ষেপ চৌম্বক মান যন্ত্র ইত্যাদি যন্ত্রকে ঠিকমতো অনুভূমিক করে না নিলে পাঠ নির্ণয়ে ভুল হবে। লেভেলিং স্ক্রু বা স্পিরিট লেভেলের সাহায্যে যন্ত্রগুলো যথাযথ লেভেল করে নিতে হয়।

৭. কাজের ধারা :

ক. পর্যবেক্ষণ ও সন্নিবেশন

(i) যে যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে তার ক্ষুদ্রতম ঘরের মান কত দেখে নিতে হবে। যেমন স্লাইড ক্যালিপার্সের ক্ষেত্রে প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ঘরের মান 1 mm। আবার থার্মোমিটারের ক্ষুদ্রতম এক ঘরের মান $1^{0}C$ ইত্যাদি।

(ii) এবার যে যন্ত্রটি ব্যবহার করতে হবে তার কোনো ধ্রুব থাকলে তা নির্ণয় করতে হবে। যেমন স্লাইড ক্যালিপার্সের ক্ষেত্রে ভার্নিয়ার ধ্রুব; স্ক্রুগজ বা স্ফেরোমিটারের ক্ষেত্রে লঘিষ্ঠ গণন ইত্যাদি।

(iii) পরিবেশ সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ যেমন, কোনো বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়ের সময় পরীক্ষাগারের তাপমাত্রা এবং সেই তাপমাত্রায় পানির আপেক্ষিক গুরুত্ব জানতে হয়।

(iv) যান্ত্রিক ত্রুটি : যন্ত্রের কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি থাকলে তা নিয়ম অনুযায়ী নির্ণয় করতে হবে।

খ. পাঠ নির্ণয় : তত্ত্বানুসারে যে সকল রাশি নির্ণয় করতে হবে যন্ত্রপাতির সাহায্যে সেগুলোর পাঠ নির্ণয় করতে হবে। যেমন সরল দোলকের সাহায্যে g-এর মান নির্ণয় করতে হলে আমাদেরকে দোলকের কার্যকর দৈর্ঘ্য ও দোলনকাল নির্ণয় করতে হবে। কার্যকর দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের জন্য প্রথমে ববের ব্যাসার্ধ ও সুতার দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হবে এবং পরে দোলনকাল নির্ণয় করতে হবে।

গ. ছক বা টেবিল

প্রত্যেক রাশির জন্য টেবিল বা ছক করতে হবে।

ছক বা টেবিল করার নিয়ম :

(ক) উপর থেকে নিচে পর্যবেক্ষণ সংখ্যা

(খ) ডান থেকে বামে রাশির পরিমাপের প্রয়োজনীয় এককসহ প্রত্যেক কলামের শিরোনাম।

উদাহরণ :

দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের ছক

পর্যবেক্ষণ সংখ্যা	প্রধান স্কেল পাঠ Mcm	ভার্নিয়ার সমপাতন V	ভার্নিয়ার ধ্রুব V.C. cm	ভার্নিয়ার স্কেল পাঠ $F = V \times$ V.C. cm	আপাত দৈর্ঘ্য $l' = M + F$ cm	গড় আপাত দৈর্ঘ্য l' cm	যান্ত্রিক ত্রুটি $\pm e$ cm	প্রকৃত দৈর্ঘ্য $l = l' - (\pm e)$ cm
১ ২ ৩								

৮. হিসাব :

এখন প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ সূত্রে বসিয়ে প্রয়োজনীয় হিসাবের সাহায্যে ফলাফল নির্ণয় করতে হবে। হিসাব সব সময় ফেয়ার খাতার বাম দিকের সাদা পাতায় করতে হবে।

৯. ফলাফল : ছকের ঠিক নিচে প্রাপ্ত ফলাফলের মান যথাযথ এককসহ লিখতে হবে।

উদাহরণ :

সরল দোলকের সাহায্যে 'g'-এর মান নির্ণয়ের বেলায় ফলাফল হবে : g-এর মান $9.78 ms^{-2}$

১০. সতর্কতা : পরীক্ষায় ভুলের উৎস ও তার প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে।

পরীক্ষা নং ১

পরীক্ষণের নাম : স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে আয়তাকার বস্তুর আয়তন নির্ণয়

তত্ত্ব : কোনো বস্তু যে স্থান দখল করে থাকে তাকে সেই বস্তুর আয়তন বলে। কোনো আয়তাকার বস্তুর আয়তন V হলে,

$$V = l \times b \times h \quad \ldots \ldots \quad (1)$$

এখানে, l = বস্তুর দৈর্ঘ্য

b = বস্তুর প্রস্থ

h = বস্তুর উচ্চতা

স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্য যে কোনো দৈর্ঘ্যের পাঠ নির্ণয়ের সূত্র :

দৈর্ঘ্য = প্রধান স্কেল পাঠ (M) + ভার্নিয়ার সমপাতন (V) × ভার্নিয়ার ধ্রুবক (V.C.) – (± যান্ত্রিক ত্রুটি, e)

অর্থাৎ l বা b বা $h = M + V \times V.C. - (\pm e) \quad \ldots \ldots \quad (2)$

যন্ত্রপাতি : স্লাইড ক্যালিপার্স, আয়তাকার বস্তু।

কাজের ধারা :

১. স্লাইড ক্যালিপার্সের প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগের মান কত ও ভার্নিয়ার স্কেলে মোট ভাগ সংখ্যা কত তা লক্ষ করা হয় এবং এর থেকে যন্ত্রের ভার্নিয়ার ধ্রুবক নির্ণয় করা হয়।

২. এরপর স্লাইড ক্যালিপার্সের চোয়াল দুটো একত্রে মিলিয়ে ভার্নিয়ার স্কেলের শূন্য দাগের অবস্থান লক্ষ করে যান্ত্রিক ত্রুটি আছে কিনা দেখা হয়। থাকলে প্রয়োজনীয় হিসাবের সাহায্যে যান্ত্রিক ত্রুটির মান নির্ণয় করা হয়।

৩. এখন আয়তাকার বস্তুটির দৈর্ঘ্য বরাবর স্লাইড ক্যালিপার্সের দুই চোয়ালের মধ্যে স্থাপন করে চোয়াল দুটিকে বস্তুর দুই প্রান্তের সাথে স্পর্শ করানো হয়। এই অবস্থায় ভার্নিয়ারের শূন্য দাগ প্রধান স্কেলের যে দাগ অতিক্রম করে, সেই দাগের পাঠই হল প্রধান স্কেল পাঠ M।

৪. এই অবস্থায় ভার্নিয়ারের কত সংখ্যক দাগ প্রধান স্কেলের যে কোনো একটি দাগের সাথে মিলে যায় তা নির্ণয় করা হয়। এটি ভার্নিয়ার সমপাতন। ভার্নিয়ার সমপাতনকে ভার্নিয়ার ধ্রুবক দিয়ে গুণ করলে ভার্নিয়ার স্কেল পাঠ পাওয়া যায়।

৫. বস্তুটিকে দৈর্ঘ্য বরাবর কয়েকটি অবস্থানে বসিয়ে ৩ ও ৪ নং প্রক্রিয়া পুনরাবৃত্তি করা হয় এবং ছকে স্থাপন করা হয়।

৬. এরপর বস্তুটি প্রস্থ বরাবর স্লাইড ক্যালিপার্সের চোয়ালের মধ্যে স্থাপন করে ৩ ও ৪ নং প্রক্রিয়ায় কয়েক জায়গায় পাঠ নেওয়া হয় এবং ছকে স্থাপন করা হয়।

৭. এবার বস্তুটি উচ্চতা বরাবর স্লাইড ক্যালিপার্সের চোয়ালের মধ্যে স্থাপন করে ৩ ও ৪ নং প্রক্রিয়ায় কয়েক জায়গায় পাঠ নেওয়া হয় এবং ছকে স্থাপন করা হয়।

৮. প্রয়োজনীয় হিসাবের সাহায্যে বস্তুটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা নির্ণয় করে ১ নং সমীকরণে তা বসিয়ে আয়তাকার বস্তুটির আয়তন নির্ণয় করা হয়।

পর্যবেক্ষণ ও সন্নিবেশন :

ক. ভার্নিয়ার ধ্রুব নির্ণয় :

প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ঘরের মান, s = ... cm.

ভার্নিয়ার স্কেলের মোট ভাগ সংখ্যা, n =

$\therefore$ ভার্নিয়ার ধ্রুব, $V.C = \frac{s}{n}$ .... cm.

খ. যান্ত্রিক ত্রুটি নির্ণয় : যান্ত্রিক ত্রুটি নির্ণয় করা হয় (যদি থাকে)।

আয়তাকার বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা নির্ণয়ের ছক

আয়তকার বস্তুর	পর্যবেক্ষণ সংখ্যা	প্রধান স্কেল পাঠ Mcm	ভার্নিয়ার সমপাতন V	ভার্নিয়ার ধ্রুব V.C cm	ভার্নিয়ার স্কেল পাঠ F=V × V.C. cm	আপাত পাঠ M+F cm	গড় আপাত পাঠ x cm	যান্ত্রিক ত্রুটি ±e cm	প্রকৃত পাঠ x-(± e) cm
দৈর্ঘ্য l	1. 2. 3.								
প্রস্থ b	1. 2. 3.								
উচ্চতা h	1. 2. 3.								

হিসাব :

আয়তাকার বস্তুর আয়তন, $V = l \times b \times h\ cm^3$ ....

$= ....\ cm^3 = ...\ ....\times 10^{-6}\ m^3$

ফলাফল : প্রদত্ত আয়তাকার বস্তুর আয়তন = ... $\times 10^{-6}\ m^3$

সতর্কতা :

১। যন্ত্রের ভার্নিয়ার ধ্রুব সতর্কতার সাথে নির্ণয় করতে হবে।

২। যান্ত্রিক ত্রুটি আছে কিনা দেখতে হবে এবং থাকলে তা সতর্কতার সাথে নির্ণয় করতে হবে।

৩। যন্ত্রের চোয়াল দুটি বস্তুর গায়ে আলতোভাবে স্পর্শ করানো উচিত।

৪। পাঠ নেওয়ার সময় লম্বন ত্রুটি পরিহার করা উচিত।

পরীক্ষা নং ২

পরীক্ষণের নাম : স্ক্রু গজের সাহায্যে তারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল নির্ণয়

তত্ত্ব : ক্ষেত্রফল হল কোনো বস্তুর পৃষ্ঠ বা তলের পরিমাণ। কোনো তারকে প্রস্থ বরাবর দৈর্ঘ্যের সাথে লম্বভাবে ছেদ করলে যে তল পাওয়া যায় তার পরিমাণই হচ্ছে প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল। কোনো বৃত্তাকার প্রস্থচ্ছেদ বিশিষ্ট তারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল A হলে

$A = \pi r^2$

এখানে, r = তারের ব্যাসার্ধ

$\pi = \frac{22}{7}$, ধ্রুব সংখ্যা

এখন তারের ব্যাস d হলে $r = d/2$ সুতরাং,

$$A = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2$$

$$\therefore A = \frac{1}{4}\pi d^2 \qquad \dots \qquad (1)$$

স্ক্রু গজের সাহায্যে কোনো দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের পাঠ = রৈখিক স্কেল পাঠ (L) + বৃত্তাকার স্কেল ভাগ সংখ্যা (C) × লঘিষ্ঠ গণন L.C – (± যান্ত্রিক ত্রুটি, ±e)

$d = L + C \times L.C - (\pm e)$

যন্ত্রপাতি : স্ক্রু গজ, তার।

কাজের ধারা :

১। প্রথমে রৈখিক স্কেলের ক্ষুদ্রতম ঘরের মান ও বৃত্তাকার স্কেলের মোট ভাগ সংখ্যা দেখে নেওয়া হয়।

২। এর পর যন্ত্রের পিচ নির্ণয় করা হয়। বৃত্তাকার স্কেল সম্পূর্ণ একবার ঘুরালে এটি রৈখিক স্কেল বরাবর যে দৈর্ঘ্য অতিক্রম করে তাই হল যন্ত্রের পিচ। পিচকে বৃত্তাকার স্কেলের মোট ভাগ সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে লঘিষ্ঠ গণন (L.C) নির্ণয় করা হয়।

৩। এরপর স্ক্রু গজের যান্ত্রিক ত্রুটি আছে কিনা দেখে নেওয়া হয়। স্ক্রুগজের স্ক্রুর মাথা, B, সমতল প্রান্ত বিশিষ্ট দণ্ড

A-এর সাথে কেবল মাত্র স্পর্শ করালে [চিত্র–২.৪ ২.৫] যদি বৃত্তাকার স্কেলের শূন্য দাগ রৈখিক স্কেলের শূন্য দাগের সাথে মিলে যায় তাহলে যান্ত্রিক ত্রুটি শূন্য। কিন্তু যদি বৃত্তাকার স্কেলের শূন্য দাগ রৈখিক স্কেলের শূন্য দাগকে অতিক্রম করে যায় তাহলে যন্ত্রে ত্রুটি আছে আর সে ত্রুটি হবে ঋণাত্মক। এই অবস্থায় বৃত্তাকার স্কেলের যে কয় ঘর রৈখিক স্কেলের শূন্য দাগের উপরে থাকে, সেই ঘর সংখ্যাকে লঘিষ্ঠ গণন দ্বারা গুণ করে যান্ত্রিক ত্রুটির মান নির্ণয় করা হয়। আর যদি বৃত্তাকার স্কেলের শূন্যদাগ রৈখিক স্কেলের শূন্য দাগের নিচে থাকে তাহলে যান্ত্রিক ত্রুটি ধনাত্মক হবে। এই অবস্থায় বৃত্তাকার স্কেলের শূন্য দাগ রৈখিক স্কেলের শূন্য দাগের যে কয় ঘর পিছনে থাকে, সেই ঘর সংখ্যাকে লঘিষ্ঠ গণন দ্বারা গুণ করে যান্ত্রিক ত্রুটির মান নির্ণয় করা হয়।

৪। পরীক্ষাধীন তারটিকে A এবং B প্রান্তদ্বয়ের মাঝখানে রেখে স্ক্রুকে এক দিক বরাবর ঘুরিয়ে প্রান্তদ্বয়কে আলতোভাবে তারের গায়ে স্পর্শ করানো হয়।

৫। এই অবস্থায় রৈখিক স্কেলের শেষ যে দাগটি বৃত্তাকার স্কেলের বাম দিকে দেখা যায় সেই দাগের পাঠ নেওয়া হয়। এটি রৈখিক স্কেল পাঠ (L)। এবার দেখতে হবে বৃত্তাকার স্কেলের কোন সংখ্যক দাগ রৈখিক স্কেলের দাগের সাথে মিলে গেছে। বৃত্তাকার স্কেলের এই ভাগ সংখ্যাকে লঘিষ্ঠ গণন দিয়ে গুণ করে বৃত্তাকার স্কেল পাঠ (F) নির্ণয় করা হয়।

৬। এভাবে তারের অন্তত পাঁচটি বিভিন্ন জায়গায় পাঠ নিয়ে ছকে স্থাপন করা হয়।

৭। প্রয়োজনীয় হিসাবের সাহায্যে তারের ব্যাস বের করে সমীকরণ (1)–এ বসিয়ে তারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা হয়।

পর্যবেক্ষণ ও সন্নিবেশন :

ক. রৈখিক স্কেলের একভাগের মান = 1mm

খ. লঘিষ্ঠ গণনা নির্ণয় :

বৃত্তাকার স্কেল সম্পূর্ণ একবার ঘুরালে রৈখিক স্কেলে 1mm দৈর্ঘ্য অতিক্রম করে, সুতরাং পিচ = 1mm, বৃত্তাকার স্কেলের মোট ভাগ সংখ্যা =100

লঘিষ্ঠ গণন $(L.C) = \frac{1mm}{100} = 0.01mm$

গ. যান্ত্রিক ত্রুটি নির্ণয় করা হয় (যদি থাকে)

তারের ব্যাস নির্ণয়ের ছক

পর্যবেক্ষণ	রৈখিক স্কেল পাঠ L mm	বৃত্তাকার স্কেল ভাগ সংখ্যা C	লঘিষ্ঠ গণন L.C mm	বৃত্তাকার স্কেল পাঠ F=C×L.C mm	আপাত ব্যাস $d' = L + F$ mm	গড় আপাত ব্যাস d'' mm	যান্ত্রিক ত্রুটি ±e mm	প্রকৃত ব্যাস $d = d'' - (\pm e)$ mm
1. 2. 3. 4.								

হিসাব :

প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল, $A = \frac{1}{4}\pi d^2 \quad = \quad \ldots \quad \ldots \quad mm^2$

ফলাফল :

প্রদত্ত তারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল, $A = \quad \ldots \ldots \; mm^2$

$= \quad \ldots \quad \ldots. \quad \times 10^{-6} m^2$

সতর্কতা :

১। রৈখিক স্কেলের ক্ষুদ্রতম ঘরের মান, যন্ত্রের পিচ, লঘিষ্ঠ গণন সতর্কতার সাথে নির্ণয় করতে হয়।

২। রৈখিক স্কেল পাঠ ও বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ সংখ্যা সতর্কতার সাথে নির্ণয় করতে হয়।

৩। পাঠ নেওয়ার সময় লম্বন ত্রুটি পরিহার করতে হবে।

৪। পিছট ত্রুটি এড়ানোর জন্য স্ক্রুকে একই দিক বরাবর ঘুরিয়ে পাঠ নিতে হয়।

৫। A ও B প্রান্তদ্বয় যাতে খুব জোরে লেগে না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

পরীক্ষা নং ৩

পরীক্ষণের নাম : সরল দোলকের সাহায্যে কোনো স্থানের অভিকর্ষীয় ত্বরণ g-এর মান নির্ণয়

তত্ত্ব : অভিকর্ষ বলের প্রভাবে ভূপৃষ্ঠে মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তুর বেগ বৃদ্ধির হারকে অভিকর্ষীয় ত্বরণ বলে। একে g দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

সরল দোলকের দোলনকালের সমীকরণ থেকে আমরা জানি,

$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$

বা, $T^2 = 4\pi^2 \frac{L}{g}$

বা, $g = 4\pi^2 \frac{L}{T^2}$ … … … … … … … … … … … … … … (1)

এখানে, T = দোলনকাল

L = দোলকের কার্যকর দৈর্ঘ্য

g = অভিকর্ষীয় ত্বরণ

$\pi = \frac{22}{7}$, ধ্রুবসংখ্যা

বব সুষম গোলক হলে দোলকের কার্যকর দৈর্ঘ্য, সুতার দৈর্ঘ্য ও ববের ব্যাসার্ধের যোগফলের সমান হয়। অর্থাৎ সুতার দৈর্ঘ্য 1 ও ববের ব্যাসার্ধ r হলে, $L = 1 + r$।

যন্ত্রপাতি : হুক লাগানো ধাতব গোলক, সুতা, স্ট্যান্ড, মিটার স্কেল, স্লাইড ক্যালিপার্স ও থামা ঘড়ি।

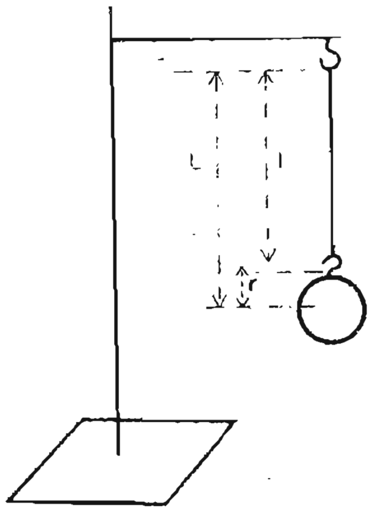
কাজের ধারা :

১. স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে ববের উল্লম্ব ব্যাস মেপে নেওয়া হয়। তিনবার পাঠ নিয়ে গড় ব্যাস নির্ণয় করা হয়। এই গড় মানের অর্ধেক হচ্ছে ববের ব্যাসার্ধ। (স্লাইড ক্যালিপার্সের শুধুমাত্র প্রধান স্কেল পাঠ নিলেই হবে অর্থাৎ মিলিমিটার পর্যন্ত পাঠ নিলেই হবে, মিলিমিটারের ভগ্নাংশের পাঠ না নিলেও চলে।)

২. স্ট্যান্ড থেকে সূতার সাহায্যে ববটি ঝুলিয়ে সরল দোলক তৈরি করা হয় (চিত্র ৩)।

৩. মিটার স্কেলের সাহায্যে ঝুলন বিন্দু থেকে ববের উপরিপৃষ্ঠ পর্যন্ত দৈর্ঘ্য মেপে তার সাথে ববের ব্যাসার্ধ যোগ করে দোলকের কার্যকর দৈর্ঘ্য, L নির্ণয় করা হয়।

৪. দোলকের স্থিরাবস্থায় ববের ঠিক পিছনের দেয়ালে বা টেবিলের উপর একটি চকের দাগ দেওয়া হয়। এবার ববটিকে একদিকে সামান্য টেনে ছেড়ে দেওয়া হয়। খেয়াল রাখতে হবে ববের কৌণিক সরণ যেন যথাসম্ভব কম হয়। দোলায়মান ববটি ডান দিকে যাওয়ার সময় চকের দাগটিকে অতিক্রম করার কালে থামা ঘড়ি চালিয়ে দেওয়া হয় এবং শূন্য থেকে গোনা শুরু করা হয়। ববটি পুনরায় ডান দিকে যাওয়ার সময় চকের দাগ অতিক্রম করলে এক হবে। এভাবে কুড়ি পর্যন্ত গোনা শেষ হলে থামা ঘড়ি থামিয়ে দেওয়া হয়। ঘড়িতে যে সময় পাওয়া যাবে তা হচ্ছে কুড়িটি দোলনের সময়। একই প্রক্রিয়ায় এই দৈর্ঘ্যের জন্য তিনবার কুড়িটি দোলনের সময় নির্ণয় করা হয় এবং তা থেকে কুড়ি দোলনের সময়ের গড় মান বের করা হয়। এই গড় সময়কে কুড়ি দিয়ে ভাগ করে দোলন কাল নির্ণয় করা হয়।



চিত্র ৩

৫. সুতার দৈর্ঘ্য পরিবর্তন করে দোলকের কার্যকর দৈর্ঘ্য L পরিবর্তন করা হয় এবং বিভিন্ন কার্যকর দৈর্ঘ্যের জন্য উপরিউক্ত প্রক্রিয়ায় দোলন কাল, T নির্ণয় করা হয়। প্রতিক্ষেত্রে $\frac{L}{T^2}$ বের করে গড় $\frac{L}{T^2}$ নির্ণয় করা হয়। এই গড় মান (1) নং সমীকরণে বসিয়ে g–এর মান হিসাব করা হয়।

পর্যবেক্ষণ ও সন্নিবেশন

ক. স্লাইড ক্যালিপার্সের প্রধান স্কেলের 1 ঘরের মান 1 mm = 0.1cm।

খ. থামা ঘড়ির ক্ষুদ্রতম 1 ঘরের মান = ...Sec

গ. ববের উল্লম্ব ব্যাস :

(i) .... cm

(ii) .... cm

(iii) .... cm

ববের গড় উল্লম্ব ব্যাস d = ... cm

ববের উল্লম্ব ব্যাসার্ধ $r = \frac{d}{2}$..... cm

দোলকের সাহায্যে $\frac{L}{T^2}$ নির্ণয়ের ছক

পর্যবেক্ষণ সংখ্যা	আংটাসহ সূতার দৈর্ঘ্য l cm	ববের ব্যাসার্ধ r cm	কার্যকর দৈর্ঘ্য L = l + r cm	20 দোলনের সময় t sec	দোলন কাল $T = \frac{t}{20}$ s	T^2 s^2	L/T^2 cms^{-2}	গড় L/T^2 cms^{-2}
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

হিসাব : $g = 4\pi^2 \quad \frac{L}{T^2} = \quad .... \quad ... \quad cms^{-2}$

ফলাফল : অভিকর্ষজ ত্বরণ, $g = \quad ...... ms^{-2}$

সতর্কতা :

১. দোলকের বিস্তার যেন খুব কম থাকে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

২. যেহেতু সুতার দৈর্ঘ্য মিটার স্কেলের সাহায্যে পরিমাপ করা হয় এবং মিটার স্কেলে 1mm এর চেয়ে কম দৈর্ঘ্য সঠিকভাবে মাপা সম্ভব নয় তাই ববের ব্যাস নির্ণয়ের সময় স্লাইড ক্যালিপার্সের শুধু প্রধান স্কেল পাঠ নিলেই চলে, ভগ্নাংশের মান নির্ণয়ের প্রয়োজন হয় না।

৩. L-এর মান যথাসম্ভব বেশি নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

৪. দোলনের সংখ্যা সঠিকভাবে গুনতে হবে অন্যথায় T -এর মান ভুল থেকে যাবে। g-এর মানের নির্ভুলতা T–এর মানের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

পরীক্ষা নং ৪

পরীক্ষণের নাম : মাপ চোঙ ও নিক্তি ব্যবহার করে অপ্রতিসম বস্তুর আয়তন ও ঘনত্ব নির্ণয়

তত্ত্ব : কোনো কঠিন বস্তু যে স্থান দখল করে থাকে তাকে সেই বস্তুর আয়তন বলে। আর বস্তুর একক আয়তনের ভর হচ্ছে তার ঘনত্ব।

কোনো কঠিন বস্তু তরল পদার্থে সম্পূর্ণ ডুবালে তা নিজের আয়তনের সমান তরল পদার্থ স্থানচ্যুত করে, কারণ একই জায়গায় একই সঙ্গে দুইটি বস্তু থাকতে পারে না। কঠিন বস্তু পানিতে ডুবানোর পূর্বে ও পরে মাপ চোঙের পানির উপরিভাগের পাঠ যথাক্রমে $V_1 cm^3$ এবং $V_2 cm^3$ হলে কঠিন বস্তুর আয়তন,

$$V = (V_2 - V_1)\ cm^3 \quad \ldots \ldots \ldots \quad (1)$$

এখন বস্তু খণ্ডটির ভর Mg হলে, এর ঘনত্ব d,

$$d = \frac{M}{V}\ \frac{g}{cm^3} = \frac{M}{V} \times 10^3\ kgm^{-3} \quad \ldots \ldots \ldots \quad (2)$$

কাজের ধারা :

১. একটি নিক্তির সাহায্যে পরীক্ষণীয় কঠিন বস্তুটির ভর নির্ণয় করা হয়।

২. মাপ চোঙের অর্ধেক পানি দ্বারা পূর্ণ করে পানির উপরিভাগের পাঠ নেওয়া হয়।

৩. কঠিন পদার্থটি সুতা দিয়ে বেঁধে সাবধানে চোঙের পানিতে ডুবানো হয় যেন তা চোঙের তলায় অবস্থান করে। এই অবস্থায় পানি স্থির হলে এর উপরিভাগের পাঠ নেওয়া হয়।

৪. মাপচোঙে বিভিন্ন পরিমাণ পানি নিয়ে ২ ও ৩ নং প্রক্রিয়া পুনরাবৃত্তি করা হয় এবং ছকে স্থাপন করা হয়।

৫. প্রয়োজনীয় হিসাবের সাহায্যে কঠিন বস্তুর আয়তন নির্ণয় করে ২ নং সমীকরণের সাহায্যে ঘনত্ব নির্ণয় করা হয়।

কঠিন পদার্থের ভর ও আয়তন নির্ণয়ের ছক

পর্যবেক্ষণ সংখ্যা	কঠিন বস্তুর ভর M g	পানির উপরিভাগের পাঠ কঠিন পদার্থ ডুবানোর		কঠিন পদার্থের আয়তন $V' = V_2 - V_1$ cm^3	গড় আয়তন V cm^3
		পূর্বে V_1 cm^3	পরে V_2 cm^3		
1.					
2.					
3.					

হিসাব :

কঠিন বস্তুর আয়তন $V = (V_2 - V_1)\ cm^3 = \ldots\ \ldots. \times 10^{-6} m^3$

কঠিন পদার্থের ঘনত্ব $d = \frac{M}{V} \times 10^3 kgm^{-3}$

ফলাফল : প্রদত্ত কঠিন পদার্থের আয়তন, $V = \ldots.\quad \ldots\ m^3$

প্রদত্ত কঠিন পদার্থের ঘনত্ব, $d = \ldots\ldots\ kgm^{-3}$

সতর্কতা :

১. যদি কঠিন বস্তুটি পানিতে দ্রবণীয় হয় তাহলে যে তরল পদার্থে কঠিন বস্তুটি অদ্রবণীয় এমন তরল পদার্থ ব্যবহার করতে হবে।

২. পাঠ নেওয়ার সময় চোখের দৃষ্টি রেখা পানির উপরিভাগের সাথে এক সমতলে থাকতে হবে।

পরীক্ষা নং ৫

পরীক্ষণের নাম : আর্কিমিডিসের সূত্র প্রয়োগ করে পানিতে অদ্রবণীয়, পানির তুলনায় ঘন কঠিন পদার্থের আয়তন ও ঘনত্ব নির্ণয়।

তত্ত্ব : কোনো পদার্থ যে স্থান দখল করে থাকে তাকে সেই পদার্থের আয়তন বলে। কোনো পদার্থকে তরল পদার্থে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত করলে পদার্থটি সমআয়তন তরল পদার্থ অপসারণ করে। অর্থাৎ অপসারিত তরলের আয়তন = বস্তুর আয়তন। আর্কিমিডিসের সূত্র থেকে আমরা জানি কোনো বস্তুকে কোনো স্থির তরলে সম্পূর্ণ বা আংশিক নিমজ্জিত করলে যে ওজন হারায় তা বস্তুটি দ্বারা অপসারিত তরল পদার্থের ওজনের সমান। পদার্থ দ্বারা অপসারিত তরল পদার্থের ওজন পরিমাপ করে পদার্থের আয়তন নির্ণয় করা হয়।

পদার্থের একক আয়তনের ভরকে এর ঘনত্ব বলে। আর্কিমিডিসের সূত্রের সাহায্যে নির্ণীত আয়তন দ্বারা পদার্থের ভরকে ভাগ করে ঘনত্ব নির্ণয় করা হয়।

ধরা যাক, পদার্থের বাতাসে ওজন = W g – wt

পদার্থের বাতাসে ভর = W g

পদার্থের পানিতে ওজন = W_1 g – wt

পরীক্ষাগারে তাপমাত্রার পানির ঘনত্ব = $\rho_t \, gcm^{-3}$

বস্তু দ্বারা অপসারিত পানির ওজন = $(W-W_1)$ g –wt

বস্তু দ্বারা অপসারিত পানির ভর = $(W-W_1)$ g

বস্তু দ্বারা অপসারিত পানির আয়তন, $V = \frac{W\text{-}W_1}{\rho_t}$ cm^3

বস্তুর আয়তন, $V = \frac{W\text{-}W_1}{\rho_t} \times 10^{-6} m^3$ ... ... (১)

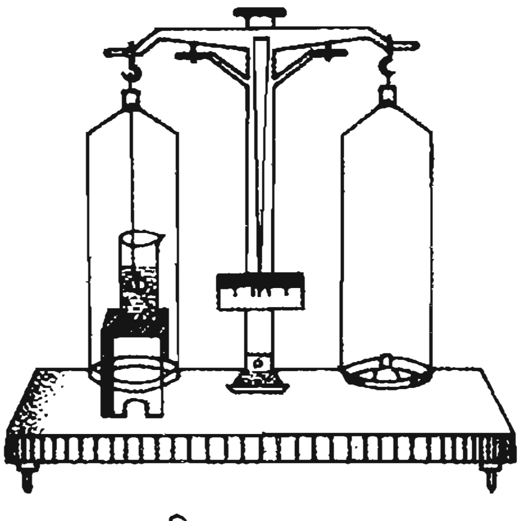
বস্তুর ঘনত্ব, $d = \frac{\text{ভর}}{\text{আয়তন}}$

$\therefore d = \frac{W\rho_t}{W\text{-}W_1} \quad \frac{g}{cm^3} = \frac{W\rho_t}{W\text{-}W_1} \times 10^3 m^{-3}$ ... (২)

যন্ত্রপাতি : উদনিক্তি, ওজনবাক্স, বিকার, পানি, সুতা, পিঁড়ি ও কঠিন পদার্থ যার আয়তন ও ঘনত্ব নির্ণয় করতে হবে।

কাজের ধারা :

১. উদ্‌নিক্তি লেভেল করে প্রথমে বস্তুর বাতাসে ওজন W নেওয়া হয়। একই প্রক্রিয়ায় তিনবার ওজন নিয়ে বস্তুটির বাতাসে গড় ওজন নির্ণয় করা হয়।



চিত্র : ৫

২. এর পর বস্তুটি একটি হালকা সুতার সাহায্যে নিক্তির বাম প্রান্তের আংটা হতে ঝুলানো হয়। তারপর কাঠের পিঁড়ির উপর স্থাপিত কাচপাত্রে রাখা পানির মধ্যে কঠিন বস্তুটিকে সম্পূর্ণ ডুবানো হয়। লক্ষ রাখতে হবে যেন নিক্তির পাল্লা পিঁড়ির গায়ে এবং বস্তুটি কাচপাত্রের গায়ে লেগে না থাকে (চিত্র ৫)। এই অবস্থায় বস্তুটির ওজন W_1 নির্ণয় করা হয়। একই প্রক্রিয়ায় তিনবার ওজন নিয়ে বস্তুটির পানিতে গড় ওজন নির্ণয় করা হয়।

৩. একটি থার্মোমিটারের সাহায্যে কক্ষ তাপমাত্রা নির্ণয় করা হয় এবং চার্ট থেকে পরীক্ষাগারের তাপমাত্রায় পানির ঘনত্ব দেখে নেওয়া হয়।

৪. প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ ছকে বসিয়ে প্রয়োজনীয় হিসাব করে আয়তন ও ঘনত্ব নির্ণয় করা হয়।

পর্যবেক্ষণ ও সন্নিবেশন :

পরীক্ষাগারে তাপমাত্রা t = ... ^{0}C

.... তাপমাত্রায় পানির ঘনত্ব, ρ_t = ... gcm^{-3}

বস্তুর বাতাসে ও পানিতে ওজন নির্ণয়ের ছক

পর্যবেক্ষণ সংখ্যা	বস্তুর বাতাসে ওজন W g–wt	গড় W g–wt	বস্তুর পানিতে ওজন W_1 g–wt	গড় W_1 g–wt
1.				
2.				
3.				

হিসাব : $V = \frac{W-W_1}{\rho_t} cm^3$

$d = \frac{W\rho_t}{W-W_1} gcm^{-3}$

ফলাফল : প্রদত্ত কঠিন পদার্থের আয়তন V = ...cm^3 = ... $\times 10^{-6}m^3$

প্রদত্ত কঠিন পদার্থের ঘনত্ব, d = ... gcm^{-3} =.......... $\times 10^3 kgm^{-3}$

সর্তকতা :

১. ওজন নেওয়ার পূর্বে নিক্তি ঠিক আছে কিনা দেখে নেওয়া হয়।

২. ওজন সবসময় চিমটা দ্বারা ওঠানো ও নামানো উচিত।

৩. ভারী ওজন পাল্লার মাঝখানে বসাতে হয়।

৪. বস্তুটি যেন সম্পূর্ণ ডুবে থাকে এবং বিকারের গায়ে লেগে না থাকে সেদিকে লক্ষ রাখা হয়।

৫. পিঁড়িটি যেন পাল্লার সাথে লেগে না থাকে।

৬. পদার্থ ডুবানোর ফলে বিকার থেকে যেন পানি উপচে না পড়ে এবং বস্তুর গায়ে যেন কোনো বুদ্‌বুদ্‌ না থাকে।

পরীক্ষা নং ৬

পরীক্ষণের নাম : সমতল দর্পণে আলোর প্রতিফলনের সূত্র পরীক্ষা এবং বস্তু ও প্রতিবিম্বের দূরত্বের সমতা যাচাই :

তত্ত্ব : আলো যখন বায়ু বা অন্য কোনো স্বচ্ছ মাধ্যমের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় অন্য কোনো মাধ্যমে বাধা পায় তখন দুই মাধ্যমের বিভেদতল থেকে কিছু পরিমাণ আলো প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসে। একে আলোর প্রতিফলন বলে। আলোর সুষম প্রতিফলন দুটি সূত্র মেনে চলে, যথা –

১. আপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণ সমান।

২. আপতিত রশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি ও আপতন বিন্দুতে প্রতিফলক পৃষ্ঠের উপর অঙ্কিত অভিলম্ব একই সমতলে অবস্থান করে।

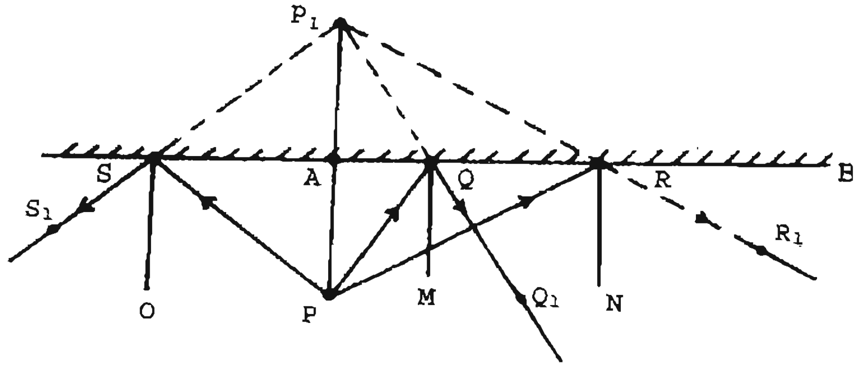
যে মসৃণ তলে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে তাকে দর্পণ বলে। প্রতিফলক পৃষ্ঠ সমতল হলে তাকে সমতল দর্পণ বলে। সমতল দর্পণের সম্মুখে কোনো বস্তু রাখলে দর্পণের পিছনে বস্তুটির একটি সোজা, অসদ বিম্ব গঠিত হয়। দর্পণের সম্মুখে দর্পণ থেকে যতদূরে বস্তু রাখা হয় দর্পণের পিছনে ঠিক ততদূরে বিম্ব গঠিত হয়।

যন্ত্রপাতি : সমতল দর্পণ, ড্রয়িং বোর্ড, কয়েকটি লম্বা পিন, সাদা কাগজ, স্কেল, চাঁদা ইত্যাদি।

কাজের ধারা :

১. বোর্ড পিনের সাহায্যে সাদা কাগজ ড্রইং বোর্ডের উপর আটকানো হল। দর্পণটিকে খাড়াভাবে ড্রইং বোর্ডের উপর বসিয়ে দর্পণের গা ঘেঁষে পেনসিল দিয়ে একটি দাগ AB দেওয়া হল (চিত্র ৬)।

২. দর্পণের সামনে P বিন্দুতে এবং দর্পণের গা ঘেঁষে Q বিন্দুতে একটি করে পিন খাড়াভাবে বসানো হল। এখন Q_1 বিন্দুতে আর একটি পিন এমনভাবে বসানো হল যেন এই পিনটি P ও Q পিনদ্বয়ের প্রতিবিম্বের সাথে একই সরল রেখায় অবস্থান করে।



চিত্র : ৬

৩. Q ও Q_1 পিন উঠিয়ে বিন্দুর অবস্থানে ছোট বৃত্ত এঁকে চিহ্নিত করা হল। এখন R ও S বিন্দুদ্বয়ে পিন বসিয়ে উপরিউক্ত নিয়মে R_1 ও S_1 বিন্দুতে পিন বসানো হলো। পিনগুলোর অবস্থান ছোট বৃত্ত এঁকে চিহ্নিত করে পিনগুলো সব সরিয়ে ফেলা হল।

৪. এখন দর্পণটি সরিয়ে PQ, PR, PS এবং QQ_1, RR_1, SS_1 বিন্দুগুলো সরলরেখা টেনে যোগ করা হল।

৫. এখন Q_1Q, R_1 R এবং S_1 S রেখাগুলো পিছনের দিকে বাড়িয়ে দেওয়া হল। রেখাগুলো সব P_1 বিন্দুতে মিলিত হল। প্রতিফলিত রশ্মিগুলো সব যেন P_1 বিন্দু থেকে অপসারিত হচ্ছে। সুতরাং P_1 বিন্দু হচ্ছে P বিন্দুর অবাস্তব প্রতিবিম্ব। PP_1 যোগ করা হল। PP_1 রেখা দর্পণকে A বিন্দুতে ছেদ করে।

৬. Q, R ও S বিন্দুতে চাঁদার সাহায্যে QM, RN ও SO লম্ব টানা হলো এবং আপতন কোণ, $i = \angle PQM$ এবং প্রতিফলন কোণ, $r = \angle Q_1QM$ মাপা হল। একইভাবে অপর আপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণগুলো মাপা হল।

৭. দর্পণ থেকে বস্তুর দূরত্ব AP এবং দর্পণ থেকে প্রতিবিম্বের দূরত্ব AP_1 পরিমাপ করা হল। প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ ছকে বসানো হল।

আপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণ এবং বস্তু ও প্রতিবিম্বের দূরত্বের ছক

পর্যবেক্ষণ সংখ্যা	আপতন কোণ i ডিগ্রি	প্রতিফলন কোণ r ডিগ্রি	বস্তুর দূরত্ব AP cm	বিম্বের দূরত্ব AP_1 cm
1.				
2.				
3.				

ফলাফল

সতর্কতা :

১. দর্পণটি সমতল হওয়া দরকার।

২. দর্পণটির কাচের বেধ পাতলা হতে হবে।

৩. আপতন কোণের মান বড় নেওয়া উচিত।

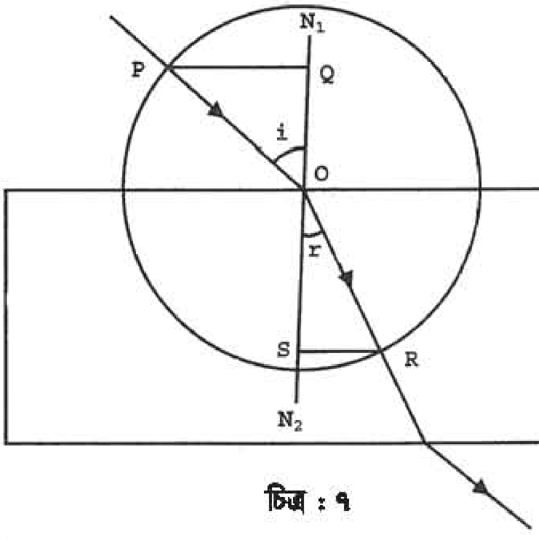
৪. পর পর অবস্থিত দুটি পিনের দূরত্ব কমপক্ষে ১০ সে. মি. নিতে হবে।

৫. কাগজে পিনগুলো এমনভাবে আটকাতে হবে যেন প্রত্যেকটি পিনের উচ্চতা একই হয়।

পরীক্ষা নং ৭

পরীক্ষণের নাম : আয়তাকার কাচফলকের সাহায্যে ফলকের উপাদানের প্রতিসরণাঙ্ক নির্ণয়

তত্ত্ব : আলোক রশ্মি শূন্যস্থান (বা বায়ু) থেকে কোনো স্বচ্ছ মাধ্যমে প্রতিসরিত হলে নির্দিষ্ট বর্ণের আলোর জন্য আপতন কোণের সাইন এবং প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত একটি ধ্রুব সংখ্যা হয়। এই ধ্রুব সংখ্যাকে ঐ মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক বলে।



চিত্র : ৭

PO আলোক রশ্মি O বিন্দুতে আপতিত হয়ে OR পথে প্রতিসরিত হলে এবং আপতন বিন্দুতে যদি N_1ON_2 লম্ব টানা হয় তাহলে $i = \angle PON_1$ ও $r = \angle RON_2$

$$\therefore \mu = \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{\sin \angle PON_1}{\sin \angle RON_2}$$ μ = মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক

$$= \frac{PQ/OP}{SR/OR}$$ i = আপতন কোণ

$$= \frac{PQ}{SR} \quad [\because OP = OR]$$ r = প্রতিসরণ কোণ

যন্ত্রপাতি : আয়তাকার কাচফলক, ড্রইং বোডং, পিন, সাদা কাগজ, কম্পাস, সেট স্কয়ার ইত্যাদি।

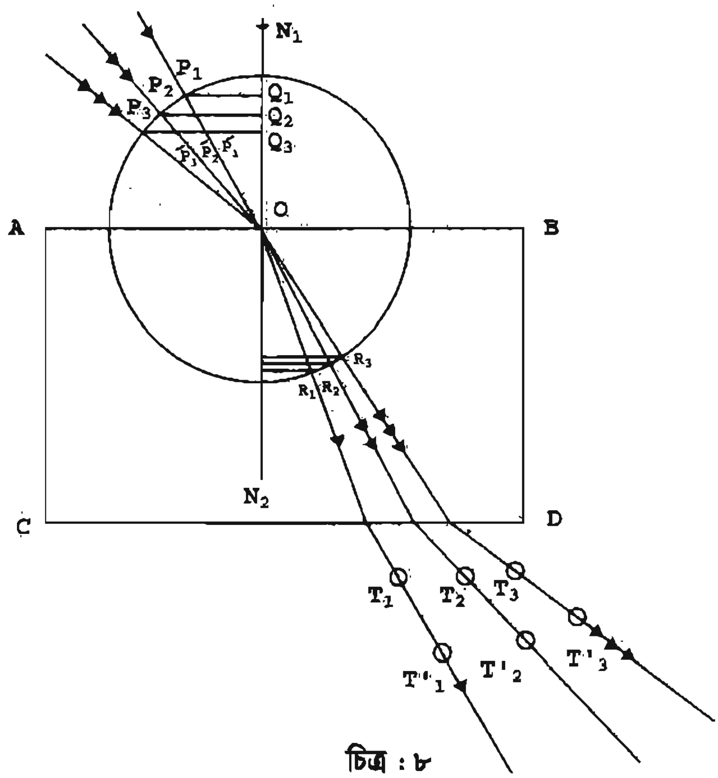
কাজের ধারা :

১. একখানি সাদা কাগজ পিনের সাহায্যে ড্রইং বোর্ডের উপর আটকে কাগজের উপর কাচফলকটি রেখে সুক্ষ্মাগ্র পেন্সিলের সাহায্যে এর পরিসীমা ABDC অঙ্কন করা হয় (চিত্র–৮)।

২. এবার কাচফলকের AB পার্শ্বে দুটি পিন P_1 ও P'_1 খাড়াভাবে আটকানো হল যাতে P_1 P'_1 সরলরেখা AB রেখার উপর O বিন্দুতে আনতভাবে মিলিত হয়। এখন লম্ব $N_1\ ON_2$ টানা হল।

৩. এরপর কাচফলকের CD- দিক থেকে কাচের ভিতর দিয়ে P_1 ও P'_1 এর প্রতিবিম্বের সাথে সরলরেখা করে অপর দুটি পিন T_1 ও T'_1 বসানো হয়।

৪. উপরিউক্ত প্রক্রিয়ায় P_2, P'_2 ও P_3, P_3' এবং T_2, T_2' ও T_3, T_3' পিনগুলো বসানো হল।



চিত্র : ৮

৫. এখন কাচফলক ও পিনগুলো সরিয়ে $P_1P'_1O$, $P_2P'_2O$ ও $P_3P'_3O$ রেখাগুলো টানা হল। এরা আপতিত রশ্মি, $T_1T'_1$, $T_2T'_2$ ও $T_3T'_3$ রেখাগুলো হচ্ছে নির্গত রশ্মি।

৬. T_1T_1', রেখাকে বর্ধিত করলে CD কে যে বিন্দুতে ছেদ করে, O থেকে সেই বিন্দু পর্যন্ত অঙ্কিত সরলরেখা $P_1P'_1$ আপাতিত রশ্মির জন্যে প্রতিসরিত রশ্মি। একই প্রক্রিয়ায় $P_2P'_2$ ও $P_3P'_3$ আপতিত রশ্মিগুলোর প্রতিসরিত রশ্মি অঙ্কন করা হয়।

৭. চাঁদার সাহায্যে আপতন কোণ ও প্রতিসরণ কোণগুলো পরিমাপ করা হয়।

৮. প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ ছকে বসিয়ে প্রয়োজনীয় হিসাবের সাহায্যে প্রতিসরণাঙ্ক নির্ণয় করা হয়।

পর্যবেক্ষণ সন্নিবেশণ :

প্রতিসরাঙ্ক নির্ণয়ের ছক

পর্যবেক্ষণ সংখ্যা	আপাতন কোণ i ডিগ্রি	sin i	প্রতিসরণ কোণ r ডিগ্রি	sin r	প্রতিসরণাঙ্ক μ	গড় প্রতিসরণাঙ্ক μ
১. ২. ৩.						

হিসাব :

$$\mu = \frac{\sin i_1}{\sin r_1} =$$
$$\mu = \frac{\sin i_2}{\sin r_2} =$$
$$\mu = \frac{\sin i_3}{\sin r_3} =$$

ফলাফল : বায়ুর সাপেক্ষে কাচের প্রতিসরণাঙ্ক , $\mu = 1.5$

সতর্কতা :

১. আপাতন কোণগুলো যথাসম্ভব বড় নেওয়া হয়।

২. পিনগুলো ঠিক খাড়াভাবে স্থাপন করা হয়।

৩. পিন স্থাপনের সময় সর্বদা পিনের গোড়ার দিকে লক্ষ রাখতে হয় এবং লম্বন ত্রুটি পরিহার করা হয়।

৪. সকল রেখা সূক্ষ্মাগ্র পেন্সিল দিয়ে আঁকা হয়।

৫. কোণগুলো পরিমাপের সময় সর্তক থাকতে হয়।

৬. পিন স্থাপনের সময় কাচফলক নাড়াচাড়া করা অনুচিত।

পরীক্ষা নং ৮

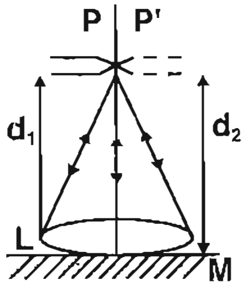
পরীক্ষণের নাম : প্যারাল্যাক্স পদ্ধতিতে উত্তল লেন্সের ফোকাস দূরত্ব নির্ণয়

তত্ত্ব : লেন্সের প্রধান অক্ষের সমান্তরাল এবং নিকটবর্তী রশ্মিগুচ্ছ প্রতিসরণের পর প্রধান অক্ষের উপর যে বিন্দুতে মিলিত হয় তাকে প্রধান ফোকাস বলে। আলোক কেন্দ্র থেকে প্রধান ফোকাস পর্যন্ত দূরত্বকে লেন্সের ফোকাস দূরত্ব বলে।

কোনো উত্তল লেন্সের প্রধান ফোকাসে প্রধান অক্ষের সাথে লম্বভাবে যদি একটি বস্তু রাখা হয়, তাহলে ঐ বস্তু থেকে নিঃসৃত আলোকরশ্মি লেন্সে প্রতিসরিত হয়ে প্রধান অক্ষের সমান্তালে চলে যায়। এখন লেন্সের পিছনে একটি সমতল দর্পণ যদি প্রধান অক্ষের সাথে সমকোণে রাখা যায় তাহলে প্রতিসরিত রশ্মিগুলো দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে একই পথে সমান্তরাল রশ্মি রূপে ফিরে আসে। এই সমান্তরাল রশ্মিগুলো লেন্সে প্রতিসৃত হয়ে পুনরায় প্রধান ফোকাসে মিলিত হয়। ফলে প্রধান ফোকাসে লক্ষবস্তুর একটি অসদ বিম্ব গঠিত হয়। অর্থাৎ লেন্সের উপরিপৃষ্ঠ থেকে পিনের শীর্ষ পর্যন্ত দূরত্ব d_1এবং দর্পণের উপরিপৃষ্ঠ থেকে পিনের শীর্ষ পর্যন্ত দূরত্ব d_2 হলে

ফোকাস দূরত্ব $f' = \frac{d_1 + d_2}{2}$ ।

যন্ত্রপাতি : উত্তল লেন্স , সমতল দর্পণ , লক্ষপিন, মিটার স্কেল, স্ট্যান্ড ও ক্ল্যাম্প।



চিত্র : ১

কাজের ধারা :

১. একটি খাড়া স্টান্ডের উপর একখানি সমতল দর্পণ, M, এবং দর্পণের উপর পরীক্ষাধীন লেন্স, L রাখা হয়। স্টান্ডের খাড়া বাহুর উপর একটি ক্ল্যাম্প আটকে তার সাথে একটি পিন আটকানো হয়।

২. ক্লাম্পটি খাড়া বাহু হতে সামান্য আলগা করে স্টান্ডের গা বেয়ে নিচের দিকে নামিয়ে লেন্সের উপর তলের খুব কাছাকাছি আনা হয়। এবার পিনটির শীর্ষ সামনে পিছনে করে শীর্ষকে লেন্সের অক্ষ বরাবর আনা হয়।

৩. এবার ক্লাম্পসসহ পিনটিকে স্টান্ডের গা বেয়ে উপরে তুলে এমন উচ্চতায় স্টান্ডে আটকানো হয় যেন পিনের বিম্বের শীর্ষ এবং পিনের শীর্ষ এই দুইয়ের মধ্যে প্যারাল্যাক্স বা দৃষ্টিভ্রম না থাকে অর্থাৎ এই অবস্থায় একচোখ বন্ধ করে মাথা ডানে বামে সরালে বিম্ব ও পিনের শীর্ষ যদি একসাথে এদিকে ওদিকে সরে এবং এদের মধ্যে কোনো ফাঁক সৃষ্টি না হয় তাহলে বুঝতে হবে এদের মধ্যে কোনো প্যারাল্যাক্স নেই। এই অবস্থায় পিনের শীর্ষ লেন্সটির ফোকাস বিন্দুতে অবস্থান করে।

৪. এখন লেন্সের উপরিপৃষ্ঠ থেকে পিনের শীর্ষ পর্যন্ত দূরত্ব এবং দর্পণের উপরিপৃষ্ঠ থেকে পিনের শীর্ষ পর্যন্ত দূরত্ব নির্ণয় করে এই দূরত্ব যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে ফোকাস দূরত্ব পাওয়া যাবে।

৫.কাজের ধারা ৩–৪ পর্যন্ত অন্তত আরো দু বার পুনরাবৃত্তি করে লেন্সের ফোকাস দূরত্ব নির্ণয় করা হয়। প্রাপ্ত উপাত্ত সমূহ ছকে বসানো হয়।

উত্তল লেন্সের ফোকাস দূরত্ব নির্ণয়ের ছক

পর্যবেক্ষণ সংখ্যা	লেন্সের উপরিপৃষ্ঠ থেকে পিনের শীর্ষ পর্যন্ত দূরত্ব d_1 cm	সমতল দর্পণের উপরিপৃষ্ঠ থেকে পিনের শীর্ষ পর্যন্ত দূরত্ব d_2 cm	ফোকাস দূরত্ব $f' = \frac{d_1 + d_2}{2} cm$	গড় ফোকাস দূরত্ব f cm
1. 2. 3.				

ফলাফল : প্রদত্ত উত্তল লেন্সের ফোকাস দূরত্ব, f = ... cm

সতর্কতা :

১. লক্ষ পিনটিকে লেন্সের অক্ষ বরাবর ওঠানামা করে পিনের শীর্ষ ও প্রতিবিম্বের শীর্ষ পরস্পর স্পর্শ করাতে হয় এবং এদের মধ্যে যাতে কোনো প্যারাল্যাক্স না থাকে সেদিকে লক্ষ রাখা হয়।

২. পরীক্ষায় পাতলা উত্তল লেন্স ব্যবহার করা হয়।

৩. লেন্স থেকে পিনের শীর্ষ পর্যন্ত দূরত্ব সতর্কতার সাথে পরিমাপ করা হয়।

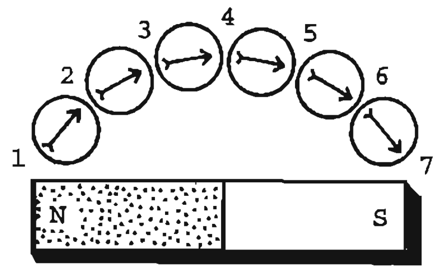
পরীক্ষা নং ৯

পরীক্ষণের নাম : কম্পাস কাঁটার সাহায্যে দণ্ড চুম্বকের বলরেখা নির্ণয় :

তত্ত্ব : যদি একটি উত্তর মেরুকে পৃথক করা যেত (যা বাস্তবে সম্ভব নয়) তাহলে কোনো চৌম্বক ক্ষেত্রে মুক্তাবস্থায় স্থাপিত বিচ্ছিন্ন উত্তর মেরু যে পথ পরিভ্রমণ করতো তাকে চৌম্বক বলরেখা বলে। চৌম্বক ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে বলরেখার সাথে অঙ্কিত স্পর্শক ঐ বিন্দুতে চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক নির্দেশ করে।

একটি ছোট কম্পাস কাঁটার সাহায্যে কোনো চৌম্বক ক্ষেত্রের বলরেখার মানচিত্র আঁকা যায়। কম্পাস কাঁটাটি কোনো স্থানে রাখলে তা ঘুরে ঐ স্থানের চৌম্বক বলরেখার স্পর্শক বরাবর স্থাপিত হয়। কাঁটাটি ছোট বলে এটি বলরেখা বরাবর স্থাপিত হয়েছে বলে বিবেচনা করা যায়।

যন্ত্রপাতি : কম্পাস কাঁটা, দণ্ডচুম্বক, সাদা কাগজ ও পেনসিল।



চিত্র : ১০

কাজের ধারা :

১। যে চুম্বকের চৌম্বক ক্ষেত্রের বলরেখা আঁকতে হবে সেটি একটি সাদা কাগজের উপর রেখে কম্পাস কাঁটাটি তার খুব নিকটে স্থাপন করা হয়।

২। কাঁটার দুই প্রান্ত পেনসিল দিয়ে ১ ও ২ বিন্দু চিহ্নিত করা হল । (চিত্র–১০)।

৩। বিন্দু দুইটি যোগ করে ঐ স্থানের বল রেখাটুকু পাওয়া গেল। এরপর কাঁটাটির এক প্রান্ত ২ চিহ্নিত বিন্দুর সাথে মিলিয়ে রাখা হল এবং কাঁটাটি স্থির হলে অপর প্রান্তে ৩ চিহ্ন দেওয়া হল। ২ ও ৩ যোগ করে ঐ স্থানের বলরেখা পাওয়া গেল।

৪। এভাবে উত্তর মেরু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত চুম্বকের উভয় পাশে তিন জোড়া বলরেখা আঁকলে চৌম্বক ক্ষেত্রের চারদিকে অনেকগুলো বল রেখা আঁকা যাবে।

সতর্কতা :

১। পরীক্ষা চলাকালে অন্য কোনো চুম্বক ও চৌম্বক পদার্থ দূরে রাখতে হবে।

২. দণ্ড চুম্বকের উত্তর মেরু ভৌগোলিক উত্তর দিকে এবং দক্ষিণ মেরু ভৌগোলিক দক্ষিণ দিকে থাকতে হবে।

৩. লম্বন ত্রুটি সর্বদা পরিহার করতে হবে।

পরীক্ষা নং ১০

পরীক্ষণের নাম : অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের সাহায্যে রোধ নির্ণয়

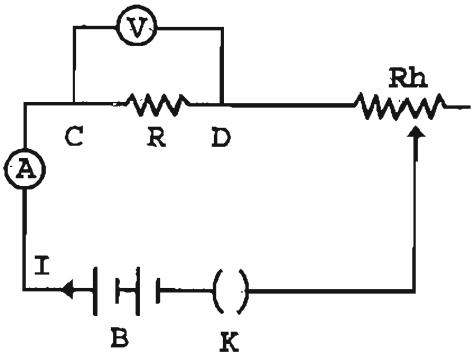
তত্ত্ব : নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে যে তড়িৎপ্রবাহ (I) চলে তা ঐ পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য (V) –এর সমানুপাতিক । অর্থাৎ গাণিতিকভাবে

$I \alpha V$

বা $\frac{V}{I}$ = ধ্রুব সংখ্যা = R,

এই R কে পরিবাহীর রোধ বলে।

যন্ত্রপাতি : অ্যামিটার, ভোল্টমিটার, রোধবাক্স, পরিবর্তনশীল রোধ বা রিউস্ট্যাট, চাবি, ব্যাটারি, শিরিষ কাগজ ইত্যাদি।



চিত্র : ১০

কাজের ধারা :

বর্তনী সংযোগ : ১. একটি ব্যাটারী B–এর ধনাত্মক পাতের সাথে অ্যামিটার A–এর ধনাত্মক প্রান্ত, অ্যামিটারের ঋণাত্মক প্রান্তের সাথে রোধ বাক্সের যে কোনো এক প্রান্ত, রোধ বাক্সের অপর প্রান্ত রিউস্ট্যাটের এক প্রান্ত এবং রিউস্ট্যাটের জকির সাথে চাবির এক প্রান্ত, চাবির অপর প্রান্তের সাথে ব্যাটারির ঋণাত্মক পাত তামার তার দ্বারা সংযুক্ত করা হয়।

২. রোধ বাক্সের যে প্রান্তের সাথে অ্যামিটারের ঋণাত্মক প্রান্ত সংযুক্ত করা হয়েছে সেই প্রান্তের সাথে একটি ভোল্টমিটারের ধনাত্মক প্রান্ত, ভোল্টমিটারের ঋণাত্মক প্রান্ত রোধ বাক্সের অপর প্রান্তের সাথে তামার তার দ্বারা সংযুক্ত করা হয়।

৩. রোধ বাক্স থেকে যে কোনো মানের প্লাগ ওঠানো হয়। এটাই স্থির মানের রোধ R এবং রিউস্ট্যাটে জকি যে কোনো অবস্থানে রাখা হয়।

৪. প্লাগ দিয়ে চাবি বন্ধ করা হয়। এতে তড়িৎপ্রবাহ শুরু হবে অ্যামিটার থেকে প্রবাহের মান I এবং ভোল্টমিটার থেকে স্থির মানের রোধের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য V–এর পাঠ নেওয়া হয়।

৫. রিউস্ট্যাটে জকির অবস্থান বদলে পরিবর্তনশীল রোধ পরিবর্তন করা হয়। ফলে বর্তনীতে প্রবাহের মান বদলে যাবে। পুনরায় অ্যামিটার থেকে প্রবাহের মান এবং ভোল্টমিটার থেকে বিভব পার্থক্যের মান দেখে নেওয়া হয়।

৬. পাঁচ ছয় বার ৫ নং ধারার পুনরাবৃত্তি করা হয়।

৭. প্রতিক্ষেত্রে R–এর মান বের করা হয়।

৮. রোধ বাক্সের রোধের মান পরিবর্তন করে সমগ্র পরীক্ষাটি পুনরায় করা যেতে পারে।

পর্যবেক্ষণ ও সন্নিবেশ :

১. অ্যামিটারের ক্ষুদ্রতম এক ভাগের মান = ... A

২. ভোল্টমিটারের ক্ষুদ্রতম এক ভাগের মান = ... V

৩. স্থির মানের রোধ = ... Ω

রোধ নির্ণয়ের ছক :

পর্যবেক্ষণ সংখ্যা	রিউস্ট্যাটের অবস্থান	অ্যামিটার পাঠ I Amp	ভোল্টমিটার পাঠ V Volt	রোধ $R' = \frac{V}{I}$ Ω	গড় রোধ R Ω
1.	R_1				
2.	R_2				
3.	R_3				
4	R_4				
5.	R_5				
6.	R_6				
7.	R_7				

ফলাফল : রোধ = ... Ω

সতর্কতা :

১. সংযোগ তারের প্রান্ত এবং সংযোগ স্ক্রু শিরিষ কাগজ দিয়ে ভাল করে পরিষ্কার করে নেওয়া হয়।

২. রোধ বাক্সের প্লাগগুলো শক্ত করে লাগানো হয়।

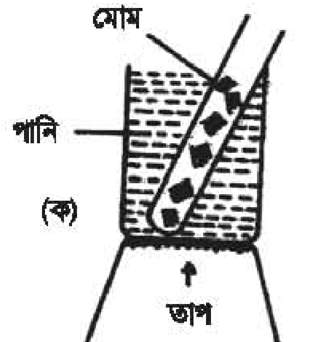
৩. তাপীয় ক্রিয়া পরিহার করার জন্য প্রতিবার পাঠ নেয়ার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা হয়।

৪. শুধু পাঠ নেওয়ার সময় ব্যাটারি সংযোগ দেওয়া হয়। অন্য সময় সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়।

পরীক্ষা নং ১১

পরীক্ষণের নাম : শীতলীকরণ লেখ পদ্ধতিতে—মোমের গলনাঙ্ক নির্ণয়

তত্ত্ব : স্থিরচাপে কোনো কঠিন পদার্থে তাপ প্রয়োগ করলে এর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। তাপমাত্রা একটা নির্দিষ্ট মানে পৌঁছালে কঠিন পর্দাথটি গলতে শুরু করে। এ সময়ে তাপ প্রয়োগ সত্ত্বেও সমুদয় কঠিন পদার্থ তরলে রূপান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত তাপমাত্রা স্থির থাকে। এরপর ঐ তরলের তাপমাত্রা বাড়ানো যায়। কোনো বস্তুর গলনের ঐ স্থির তাপমাত্রাকে এর গলনাঙ্ক বলে । সমুদয় কঠিন পদার্থ তরলে রূপান্তরিত হওয়ার পর তাপ প্রদান করলে এর তাপমাত্রা আবার বাড়তে থাকবে। এখন তাপ প্রদান বন্ধ করে ধীরে ধীরে ঠান্ডা হতে দিলে তাপমাত্রা কমতে থাকবে। তাপমাত্রা একটা নির্দিষ্ট মানে নামার পর তরল পদার্থ জমাট বাধতে শুরু করে। এই অবস্থায় যতই ঠান্ডা করা হোক না কেন সমস্ত তরল জমাট না বাঁধা পর্যন্ত তাপমাত্রা স্থির থাকে। তরলের ক্ষেত্রে জমাট বেঁধে কঠিনীভবনের ঐ স্থির তাপমাত্রাকে ঐ তরল পদার্থের হিমাঙ্ক বলে। কেলাসিত বিশুদ্ধ কঠিন পদার্থের গলনাঙ্ক তরল অবস্থায় হিমাঙ্কের সমান।



চিত্র : ১২

যন্ত্রপাতি : পানি ভরা একটি 250 সিসি বিকার ও একটি টেস্টটিউব, একটি স্টপওয়াচ, একটি থার্মোমিটার (0°C – 100°C), স্পিরিট ল্যাম্প একটি, তারজালসহ ট্রিপড স্ট্যান্ড, ক্লাম্পসহ স্ট্যান্ড, মোম এবং গ্রাফ কাগজ।

কাজের ধারা :

১. টেস্টটিউবের মধ্যে দুই –তৃতীয়াংশ পর্যন্ত মোম নেওয়া হয়।

২. পানি পূর্ণ বিকারে টেস্টটিউবটিকে হেলান দিয়ে দাঁড় করান হয় (চিত্র ১২)।

৩. বিকারের পানি এবার প্রায় ফুটানোর মতো করে গরম করা হয় যেন টেস্টটিউবের মোম গলে যায়।

৪. এবার টেস্টটিউব বিকার থেকে তুলে নিয়ে স্ট্যান্ড ও ক্লাম্পের সাহায্যে খাড়া অবস্থায় রাখা হয়।

৫. এবার থার্মোমিটারকে তরল মোমের মধ্যে স্থাপন করে ধীরে ধীরে নাড়া হয়।

৬. আধা মিনিট পর পর থার্মোমিটারের পাঠ নেওয়া হয় এবং ছকে লিপিবদ্ধ করা হয়। মোমের তাপমাত্রা 45°C না নামা পর্যন্ত থার্মোমিটারের পাঠ নেওয়া হয়।

৭. সময়কে X অক্ষ বরাবর এবং উষ্ণতাকে Y অক্ষ বরাবর স্থাপন করে লেখ আঁকা হয়। বিন্দুগুলোকে এমনভাবে রেখা দিয়ে সংযুক্ত করা হয় যেন একটি মসৃণ বক্ররেখা পাওয়া যায়। (চিত্র : ৯.১০)।

সময় (মিনিটে) ও তাপমাত্রা নির্ণয়ের ছক

পর্যবেক্ষণ সংখ্যা	সময় মিনিট	তাপমাত্রা° সেলসিয়াস
১।		
২।		
৩।		
৪।		
৫।		
৬।		
৭।		
৮।		
৯।		

ফলাফল : গ্রাফের সময় অক্ষের সমান্তরাল অংশ যে তাপমাত্রা নির্দেশ করে তাই হচ্ছে মোমের গলনাঙ্ক।

মোমের গলনাঙ্ক ... ... °C

সতর্কতা :

১. থার্মোমিটারটি টেস্টটিউবের তলায় লেগে গেলে সহজেই ভেঙে যেতে পারে, তাই খুব সাবধানে নাড়তে হবে।

২. থার্মোমিটারের পাঠ খুব সতর্কতার সাথে নিতে হবে।

৩. মোম একটি মিশ্র পদার্থ হওয়ায় এর গলনাঙ্ক সবসময় এক থাকে না।

২০১০ শিক্ষাবর্ষ

দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সমুদয় কাজই সাহস ও সকলের ওপর নির্ভরশীল

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা বাংলাদেশ

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য